সমগ্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

স্বামী সত্যানন্দদেব

সমগ্র রচনাবলী

(চতুর্থ খণ্ড)

স্বামী সত্যানন্দ

সূচীপত্র

প্রবন্ধাবলী

গীতি-আলেখ্য

অমরবল্লী

প্রবন্ধাবলী

প্রবন্ধাবলী-১

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া

অবতারপুরুষদের ও মহাপুরুষদের চিনতে পারা যেমন কঠিন তেমনি তাঁদের লীলাসঙ্গিনীদের চেনাও দুরাবগাহ। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীকে ঠাকুরের প্রকট অবস্থায় অনেকেই মর্যাদা দিতে পারেনি। আমরা জানি লাটুমহারাজ-কে একদিন ঠাকুর নিজে বলেন,—তুই যার ধ্যান করছিস সে বসে নহবতে ময়দা মাখছে—দেখে আয়। এরপরে লাটুমহারাজের আর কোনদিন ভুল হয়নি মা'র স্বরূপ বুঝতে। স্বামী সারদানন্দ একবার জনৈক ভক্তকে একটু দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন,—ঠাকুর যাঁকে বিবাহ করেছেন তাঁকে সাধারণ পর্যায়ে কখনও ফেলবে না। পাছে এই সাধারণ পর্যায়ে তাঁরা পড়েন সেজন্য ঠাকুরের অবর্তমানে শ্রীমার ফটো পর্যন্ত সাধারণ লভ্য ছিল না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও দেখি যে মহাপ্রভুর অবর্তমানে তিনি অর্গলবদ্ধ গৃহে সবসময় থাকতেন।

জীবনের উষালগ্নে দেখি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রথমেই চিনে নিয়েছিলেন শচীমাতাকে—গঙ্গাতীরে তাঁকে পূজায় এর প্রকাশ। শ্রীমার ব্যাপারে এটা কিন্তু একটি বিপরীত রূপ নিয়েছিল। এখানে শ্রীঠাকুরই নিজে মাকে চিনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—দেখগে জয়রামবাটির রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে কুটো বাঁধা আছে। লক্ষ্মীদেবীর বাল্যলীলার বহু মনোজ্ঞ চিত্র আমরা পাই। চৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁর অনবদ্য লেখনীতে যে পদ লিখেছেন, তার কিছুটা আমরা নীচে তুলে দিলাম—

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গা স্নান ॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন ॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহা করিল উদয়
বাল্য-ভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস
দেবপূজা ছলে দোঁহার হইল প্রকাশ ॥
প্রভু কহে আমা পূজ, আমি মহেশ্বর
আমারে পূজিলে পাবে অভিপ্সিত বর ॥

লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥
এই মতে লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে ॥

দান্তের 'Devina Comedia' অপেক্ষা বহুগুণে Divine এই প্রেমবৈবর্ত। কি অপার্থিব প্রেমের চিত্র!

লক্ষ্মীদেবী অপ্রকট হলে আমরা দেখি গঙ্গার তীর পটভূমিকায় আর একটি দিব্য চিত্র। দেখি আব একবার শচীদেবীকে আলুলায়িতকুন্তলা একটি ত্রয়োদশী কুমারী নিত্য প্রণাম ক'রছেন। চোখে মুখে ফুটে ওঠে চিরদিনের চিরচেনা এক মৌন ভাষা। ইনিই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া—শচীদেবী হয়তো পারেন না বুঝতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,

যে যার সে তার
যুগে যুগে অবতার ॥

আমাদের মনে পড়ে শ্রীশ্রীমা তখন তৃতীয়ার চন্দ্রলেখা। তিন বৎসর বয়েস। শিহড়ে হৃদয়রামের গৃহে বসেছে সঙ্গীতের আসর। শ্রীমাকে কোলে করে নিয়ে বসেছেন জনৈকা। সঙ্গীতের একটা বিশেষ মোহ আছে। স্বর্গ যেন নেমে আসে মর্ত্যের মাটিতে আর মর্ত্যও যেন উঠে পড়ে স্বর্গের দিকে। এই অমৃতময় মুহূর্তে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে শ্রীশ্রীমাকে,—বল দেখি সারু, তুই কাকে বিয়ে করবি? শ্রীশ্রীমাও তখন তাঁর বালাপরা স্বর্ণমুঠিটি তুলে দেখিয়ে দেন সঙ্গীতের আবেশে মগ্ন শ্রীগদাধরের দিকে। যুগনন্দিতা সারদার নিজের দয়িতকে চিনতে এতটুকু বিলম্ব হয় নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহে দেখি রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁন এগিয়ে এসেছিলেন বিবাহের সব খরচ নিয়ে। আমাদের মনে পড়ে এই বুদ্ধিমন্ত খাঁনকেই মহাপ্রভু জীবনদান করেছিলেন। হুসেন শাহ প্রথমজীবনে বুদ্ধিমন্তের চাকর ছিলেন। একদিন বুদ্ধিমন্ত তাঁকে কোন কারণে বেত্রাঘাত করেন এবং সে চিহ্ন তিনি সারাজীবন বহন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন বাংলার বাদশাহ হন তখন তাঁর বেগমের কথায় বুদ্ধিমন্তকে নিষিদ্ধ মাংস খেতে বাধ্য করেন। আর তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান পণ্ডিতদের কাছে জানতে চান। তাঁরা তপ্ত ঘৃত পান করে

মৃত্যু, এই বিধি দেন। তখন মহাপ্রভু বলেন, 'হরের্নামৈব কেবলম' এই মহামন্ত্র সর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত। ঠাকুরের বিবাহেও দেখি গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহা ঠাকুরের বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীঠাকুরের জীবনায়নে এমনি অনেক মিল পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু যেদিন সংসার ত্যাগ করেন সেদিন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা গুহাবাসী। সেকথা আগেই বলা হয়েছে সংসারের বহিরাগতদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ তাঁর সেইদিন থেকেই ছিন্ন হয়েছিল। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী শুনলেন, ঠাকুর, মাতৃনামে উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন, আনন্দে পঞ্চবটীতে কখন মাথা ঠুকছেন, কখন গভীর রাত্রে নির্বাসে ধ্যান করছেন। সেদিন মাও আপনহারা হয়ে পড়েছিলেন দয়িতের চিন্তায়। যেদিন মহাপ্রভু শ্রীপাট শান্তিপুর আসেন হরিনাম সংকীর্তনে দুইতট উছল করে, সেদিন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে কেবলমাত্র দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করবার অধিকার হয়েছিল, কিন্তু শ্রীঠাকুরের কাছে মার অবাধ নিমন্ত্রণ চিরদিনই ছিল। মা যেদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন প্রথমবার হৃদয়রামের কটুকথায় ফিরে যেতে হয়েছিল সত্য কিন্তু এরপর ঠাকুর নিজেই ডেকে পাঠালেন কল্যাণময়ীকে, আর সেদিন মথুরানাথের অবর্তমানে ঠাকুরের চিন্তাও হয়েছিল—কে মর্যাদা দেবে। মহাপ্রভুর কাছে সন্ন্যাসের আদর্শটা সবচেয়ে বড় হয়েছিল···অমৃতসাগরে দুটি ফুলের দুরকম প্রকাশ।

গার্হস্থ্যলীলার দুটি চিত্র আমরা তুলে ধরবো রসাস্বাদনকল্পে। ঠাকুরের কামারপুকুরের একটি অলস মধ্যাহ্ন। ঠাকুরের কথামৃত ঝ'রে প'ড়ছে। শ্রীমা তখন বালিকা বধূ—ঘুমিয়ে পড়েছেন। জনৈকা তাঁকে জাগিয়ে বলছেন—ওমা সারু, কত কথা হ'য়ে গেল শুনতে পেলিনে। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন,—ও না শুনে ভালই করেছে, ও শুনলে কি আর এখানে থাকতো! দৌড় মারতো। যেমন দেব তেমনি দেবী।

মহাপ্রভু যেদিন শেষ বিদায় নেন, চন্দ্রিমরাতির মধ্যভাগে সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বহুসজ্জায় সাজিয়েছিলেন তিনি। এদিন বড় করুণ মধুর হয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার জীবনে। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার জীবনেঠাকুরের অদর্শন চিরদূরপনেয় অন্ধকার এনে দিয়েছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর আর মিলন হয়নি। কিন্তু সারদামায়ের সঙ্গে ঠাকুরের নিত্যমিলন। যদিও শ্রীমা দূরেই থাকতেন সন্ন্যাসের চিরবিধি অনুসারে। নহবতেই থাকতেন কিন্তু এ বিরহ মধুর হয়ে উঠত যখন মা নহবতে থেকেও ঠাকুরের সঙ্গ পেতেন। দেখা গেছে ঠাকুর হয়তো বালক সারদাকে বলছেন,—শেয়ারের গাড়ী ভাড়া নিয়ে যেতে। সারদা গিয়ে দেখতেন

গাড়ীভাড়া ঠিক দুয়ারে নামানো আছে। মা দূরে থেকেও বুঝতে পেরেছেন ঠাকুরের অভিপ্রায়।—

মহামিলনের আর মহাবিরহের ভিতর কোন পার্থক্য নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর আর বড় একটা দেখতে পাইনা। তিনি তাঁর অর্গলিত জীবন, স্বেচ্ছায় তিনি যেটা গ্রহণ ক'রেছিলেন, তার পরিসমাপ্তি কোথায় তাও আমরা বড় একটা দেখতে পাইনা। কখনও কখনও হয়তো কোন ভক্ত অবলম্বির বাইরে থেকে কোন প্রশ্ন ক'রতেন, উত্তরও পেতেন। যেমন দেখি লোচনদাস যখন মহাপ্রভুর জীবনের একটি ঘটনা প্রকাশিত করেন, সে ঘটনা খুব গূঢ় ঘটনা। বিবাহ বাসরে মহাপ্রভু চলেছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে·· সহসা অর্গলদ্বারে শ্রীদেবী হন আঘাতিত। তাঁর সেই শ্রীপদ রক্তাক্ত হ'তে দেখে মহাপ্রভু নিজের চরণ দিয়ে সেই রক্তস্রোত বন্ধ করেন পাছে লোকে এই ঘটনা অবলম্বন ক'রে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে। এই ঘটনা স্বয়ং মহাপ্রভু ও শ্রীদেবী ছাড়া আর কেউ জানতো না। যাই হোক লোচনদাস যখন এই ঘটনাটি প্রকাশ করেন তখন বৈষ্ণব সমাজ এর প্রমাণ চান, এবং লোচনদাস শ্রীদেবীকেই এর মধ্যস্থ স্বীকার ক'রে নেন। শ্রীদেবী এটির যথার্থতা প্রকাশ করেন ঐ অবরোধ থেকেই। এই অবরোধ বোধহয় সে যুগে প্রয়োজন ছিল। আমরা জানি বাদশাহের যুগে এই অবরোধ বিশেষ প্রয়োজন ছিল, বিশেষ ক'রে নবদ্বীপের সমাজ তখন বড় ছিদ্রান্বেষী ছিল।

শ্রীমাকে কিন্তু অবরোধে থাকতে হয়নি। শ্রীঠাকুর তাঁকে জীবশিক্ষার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, ব'লে গিয়েছিলেন—কালে তোমার অনেক ছেলে হবে তাদের দেখতে হবে। আমি আর কি ক'রে গেলুম তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশী ক'রতে হবে।

আর তাই দেখি দেশ-দেশান্তরে মা ছুটে যাচ্ছেন, ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই তবু তাঁদের দিচ্ছেন দীক্ষা। মন্ত্রময়ীর কাছে কোন ভাষা বাধাস্বরূপ হ'তে পারেনি। আবার স্থানেরও কোন ঠিক ছিল না, হয়তো স্টেশনেই কাউকে দিচ্ছেন দীক্ষা। কুলি মেয়ে, এসে দাঁড়িয়েছে জানকী-মাঈ ব'লে— আর মা দিয়েছেন তাকে ব'লে দিব্য পথের নিরীখ। স্বামী পরিত্যক্তা রাজরাণী এসেছেন মা তাঁকেও দিয়েছেন কল্যাণের দিশা।

এমন ক'রে ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে আরম্ভ ক'রে বৃন্দাবন, মথুরা ইত্যাদি স্থান পরিক্রমা ক'রে এসেছেন মা, সঙ্গে সঙ্গে অজস্র দীক্ষার্থি দীক্ষা নিয়েছেন। আমরা পরবর্তীকালে পাই রুমাদেঈ নামে এক তিব্বতী মহিলা-

মার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ওদেশে দেবীরূপে সম্মানিতা হ'তেন। আর দেখি জনৈক ব্রহ্মচারী হিমালয় পরিভ্রমণকালে একটি মহিলার আর্ত ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়ে অদূরে একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন জনৈকা মুমূর্ষু অবস্থায় আকুলভাবে ক্রন্দন ক'রছেন,—এ মাঈ অব তক ন ভেজি—তখন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে শুনলেন তিনি শ্রীমার দীক্ষিত ও দেশের কন্যা—মার কাছে আশ্বাস পেয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর এক সন্তানকে দেবেন পাঠিয়ে। এঁর কাছেই হাতের লেখা এক পুঁথি ছিল, এটি বিশেষ ক্রিয়া-কলাপ সম্বলিত মন্ত্রের পুঁথি। সিদ্ধাই শক্তির এগুলি লিপিবদ্ধ প্রক্রিয়া। সেই পুঁথিগুলি প্রদানের পর এই সাধিকার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি এই পুঁথিখানি আর তাঁর দেহ জলসাই করবার নির্দেশ দিয়ে যান। ব্রহ্মচারীও তাঁর দেহ জলসাই করার পর পুঁথিগত মন্ত্রগুলি নির্দেশমত কণ্ঠস্থ ক'রে পরে সেটি বিসর্জন দেন।—প্রব্রজ্যা থেকে ফিরে এসে শ্রীমার কাছে সব নিবেদন করেন এবং শ্রীশ্রীমাও একথা স্বীকার করেন যে, এই সাধিকাকে তিনি শেষ সময়ের ওইরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিদেশী ভক্ত ডাক্তার হেলফ ও মিস গ্রে,—এঁরা সব এসেছেন মাকে দেখতে। তাঁদের আচরণ দিয়েই ব্যবহার ক'রেছেন হাসিমুখে। কেউ জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে আমাদের কালী সেকথা কেমন ক'রে জানবো। মা বলেন,—কালে বুঝতে পারবে। সত্যিই দেখি পরবর্তীকালে বিদেশ থেকে পত্র আসে,—কে তুমি জননী,—আমরা যখন ধ্যানে বসি তখন মেরীর পাশে এসে দাঁড়াও?

ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাগমশায়—একবার এক ঝুড়ি আম নিয়ে গিয়েছেন মার জন্য। মা সেই আম গ্রহণ করেন ও পরে নিজের হাতে নাগমশায়কে খাইয়ে দেন। নাগমশায়ও আনন্দে চীৎকার ক'রতে থাকেন,—বাপের চেয়ে মা দয়াল বাপের চেয়ে মা দয়াল। এর পিছনে একটি ইতিহাস আছে। নাগমশায় পূজার পর একদিন ঠাকুরকে দর্শন ক'রতে এসেছেন। ঠাকুর বুঝলেন এ বড় কঠিন ভক্ত—নিজে একটু গ্রহণ ক'রে প্রসাদ নাগমশায়কে দিয়ে দেন, সে দিন একাদশী তিথি।—সেই বিখ্যাত প্রসাদের স্বাদ গ্রহণের সময় নাগমশয় ভেবেছিলেন সেই প্রসাদ ঠাকুর তাঁকে খাইয়ে দেবেন, কিন্তু ঠাকুর এটি মায়ের জন্যেই রেখে দিয়েছিলেন। তাই দেখি মা, নাগমশায়কে খাইয়ে দিচ্ছেন—গিরীশঘোষ, যাঁকে পাঁচসিকা পাঁচ আনার ভক্ত বলে ঠাকুর পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, মা নির্বিচারে তাঁর বিছানা বালিশ ঝাড়ছেন, রোদে

দিচ্ছেন। চাঁদের চেয়েও অকলঙ্ক যে জীবন তাঁর এই মনকে নামিয়ে নিয়ে আসা এটি শ্রীমার পক্ষেই সম্ভব। আমরা এর আগে অন্য কোনও অবতার জীবনেও পাইনি।

ডাকাত বাবার কাহিনী আজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মা তেলোভেলোর প্রান্তরে গিয়েছিলেন হারিয়ে- অবশ্য এরকম ডাকাতকে আপন ক'রে নেওয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে পাইনা কিন্তু পাই নিত্যানন্দ প্রভুর অর্ধশক্তি জাহ্নবাদেবীর জীবনে। ইনিও শ্রীমার মতন পরিব্রাজিকা হ'য়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে সময় একস্থানে রাত্রিকালে ইনি ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে অবস্থান ক'রছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ডাকাত, সর্দার কুতুবুদ্দিন এই সংবাদ পেয়ে তার লোলুপতা নিবৃত্ত ক'রতে যাত্রা করে জাহ্নবাদেবীর শিবির অভিমুখে। পরিচিত গ্রাম, পরিচিত প্রান্তর, কিন্তু এই অন্ধকারের মানুষগুলি অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই জাহ্নবাদেবীর অবস্থান স্থানটিতে পৌঁছাতে পারেনি,—তারা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে। শেষে যখন প্রভাত হ'য়ে এসেছে তখন দেখা গেল শিবিরের পুরোভাগে জপ নিষণ্ণ জাহ্নবাদেবী। ডাকাতের দলের চোখ থেকে যেন অন্ধকার খসে পড়ে। তারা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। আর জাহ্নবাদেবী ও তাদের আশীর্বাদ করেন। তার পর তারা ডাকাতি করা সারা জীবনের মত পরিত্যাগ করে এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে।—সার্থক লিখেছেন আচার্য শঙ্কর—ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা। ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা···মহাপুরুষদের ক্ষণিক সঙ্গও পারের নৌকাই।

St Paul-এর প্রথম জীবনেও আমরা এমনি এক ঘটনা পাই। তিনি তখন Saul নামে পরিচিত। ক্রীশ্চানদের বন্দী করতে চলেছেন ডামাস্কাসের পথে। হঠাৎ শূন্যে জ্যোতিপ্রকাশ। শুনলেন তিনি,—Saul—Saul কেন আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রছ! এই জ্যোতিতে তিনি অন্ধ হ'য়ে যান। পরে ডামাস্কাসে Ananias নামে এক সাধুর সান্নিধ্যে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান আর সাধুত্বে পরিণত হন।

গম্ভীরালীলার সময় মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নবদ্বীপে শ্রীমতীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—যোগ্য পাত্র বিবেচনায়। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রভুর এই নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। এদিকে দেখি শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সাবর্ণি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে স্বামী যোগানন্দ, জননী সারদেশ্বরী মায়ের তত্ত্বাবধানের ভার নেন। ইনি মায়ের দীক্ষিতও ছিলেন। কিন্তু যোগানন্দের দেহ বেশীদিন থাকেনি। এঁরপর স্বামী সারদানন্দ নিজেকে মার দ্বারী বলে

পরিচয় দিতেন ও মার যথোচিত সেবার ভার নেন। উদ্বোধনের 'মায়ের বাটী' বলে যে গৃহ সেই গৃহ সারদানন্দ স্বামী নিজের দায়িত্বে ঋণ ক'রে তৈরী করেন। এটি বাগবাজারে। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার বাটীর চারদিকে যেমন বিরাট পাঁচিল দেওয়া থাকতো আর সেখানে যেতে হ'লে স্বরূপ দামোদরের হুকুম নিতে হ'ত, তেমনি সারদানন্দের অনুমতি ভিন্ন মা'র কাছে যাওয়া চলতো না। অবশ্য মা যখন দেশের বাটীতে থাকতেন তখন এসব বাধাবন্ধ ছিল না। গরীব দুঃখী সবাই এসে তাঁর কাছে বসে কথা বলতে পারতো। উদ্বোধনে মা'র বাড়ীতে সে সময় একটা ঘটনা ঘটে। সারদানন্দ মহারাজ যে সিঁড়ির কাছে ছিলেন একটি ভক্ত সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করেন,—মা কোথায়? সারদানন্দজী বলেন,—মা উপরে আছেন, তবে এখন দেখা হবে না। ভক্তটি তাঁকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে,—যাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে তিনি মঠ ও মিশনের সেক্রেটারী সারদানন্দ মহারাজ। তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ লজ্জিত হন ও মহারাজের নিকট ক্ষমা চাইতে আসেন। কিন্তু তিনি এমনই ক্ষমাশীল ছিলেন যে তিনি বললেন,—এমনি ব্যগ্রতা না থাকলে মাকে দেখা যায় না।

গার্হস্থ্য জীবনে মায়ের গৃহকর্মের অবধি ছিল না। কাঠের বাসন পরিষ্কার করা, পূজা করা, রন্ধন করা, ভক্ত ছেলেদের সবরকম অসুবিধা দেখা—সবই তাঁকে ক'রতে হ'ত। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার এ বিষয়ে কোন নিদর্শন আমরা পাইনা। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার তপস্যার একটি কঠোর দিক ছিল। তিনপ্রহর যাবৎ তিনি জপ ক'রতেন আর যে চালগুলি গুনে গুনে জপ ক'রতেন মাত্র সেইকটিই তিনি রন্ধন ক'রতেন আহার্য হিসাবে এবং এর থেকেই তিনি পাত্রাবশেষ রাখতেন। বৈকালে ভক্তরা এসে সেই মহাপ্রসাদ নিতেন ও ধন্য হ'য়ে যেতেন।

সারদেশ্বরী মা'র দুইবার পঞ্চতপা করার কথা আমরা জানি। চারদিকে চারটি আগুন জ্বেলে, মাথার উপর সূর্য, এরকম ক'রে সাতদিন ধরে জপ ক'রে কাটান যে কি বিরাট শক্তির পরিচায়ক তা সকলেই বুঝতে পারছেন। অসুস্থ শরীরেও দেখা যেত মা ঠিক চারটের সময় উঠে বসে জপ ক'রছেন। সেকালে জলে কুমীরের ভয় ছিল। তবুও শ্রীশ্রীমা চারটের সময় উঠে গঙ্গাস্নানে যেতেন ও একদিন একটি কুমীর জল থেকে উঠে সিঁড়িতে শুয়ে আছে আর শ্রীশ্রীমা অজানিতে তার মাথায় পা দিতে কুমীরটি জলে নেমে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখী ছিলেন জনৈকা ব্রাহ্মণ কন্যা কাঞ্চনা দেবী।

শ্রীশ্রীমারও দুইজন সখী ছিলেন, মার্থা ও মেরী—গোলাপমা ও যোগীনমা।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার শেষ পর্যায়ে দেখি, যে নিম্ববৃক্ষের তলে মহাপ্রভুর জন্ম সেই বৃক্ষটি কাটিয়ে মহাপ্রভুর এক সুন্দর গৌর মূর্তি তৈরী করেন, ও সেটি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর শ্রীমাকে তাঁর একটি ফটো দিয়ে বলেন,—কালে এ মূর্তি ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে। মা সে মূর্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কোয়ালপাড়া মঠে। এর পর বহু জায়গায় সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পূজিত হ'চ্ছে। শোনা যায় এই প্রতিষ্ঠিত দারু মূর্তিতে শ্রীমতী বিলীন হ'য়ে যান। অন্যদিকে আমরা পাই শ্রীঠাকুরও মার সঙ্গে সর্বদা থাকতেন। রেলের কামরায় মা হাত বার ক'রে ছিলেন। ঠাকুর দেখা দিয়ে বলেন,—হাতটা গুটিয়ে নাও। মার হাতে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সোনার ইষ্ট কবচটি ছিল। মা কাশীতে আরতি দর্শন ক'রে ফিরছেন, যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন কতকটা ধ্যানে আপনহারা হ'য়ে। এমন সময় ঠাকুর হাতে ধ'রে বাসায় পৌছে দিয়ে আসেন। ভোগের সময় হ'লে, মা ঠাকুরকে বলতেন,—ঠাকুর খাবে এস।

সেবার কোয়ালপাড়া মঠে হঠাৎ দেখা গেল মা যেন একটু অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। পরে শোনা যায় ঠাকুর এসেছিলেন আর মা আঁচল বিছিয়ে দিতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যান। এরকম বহু নিদর্শন আমরা পাই ঠাকুরের ও মায়ের একাত্মতার,—বৈষ্ণব মত-বিবেকে একেই বলে নিত্য-মিলন।

পুরানো কলকাতা

ঘোড়ায় টানা ট্রাম আমি দেখেছি ব'লে মনে হয় না তবে ঘোড়ায় টানা দমকলের গাড়ী আমি দেখেছি। আগুন লেগেছে, ফিনিক বাজারে যেতে বড় বড় ওয়েলারে টানা দমকল। হঠাৎ একদিন বিলেতি সাহেবের আঙ্গুল কেটে গেল, রুমাল দিয়ে চেপে ধ'রল ভ্রূক্ষেপ নাই। আমাদের একটা ট্রাইসাইকেল ছিল শুনেছি ওদেশ থেকে আনা, সেইটেই চড়ে হোয়াইওয়েলেডল-এর পাশ দিয়ে গেছি –রাস্তাগুলো দেখে মনে হ'ত যেন স্বর্গের রাস্তা—ঝকঝক ক'রছে। কাঁচের সো কেস তাতে গাডী সাজান। হক সাহেবের বাজারে গিয়ে কোল্ড-ড্রিঙ্ক খাওয়া—এসব সেদিনেব স্বর্গই মনে হ'ত। খিদিরপুর ডকেও গেছি সেই ট্রাইসাইকেলে চ'ড়ে। ডকের নীচে নামবার যে সিঁড়ি আছে তাতে একদিন প'ড়ে গেছি। একান্ত ভগবৎ কৃপায় সেই গড়ানে রাস্তা থেকে ফিরে এসেছি। আজও মনে প'ড়লে বুকটা কেমন ক'রে ওঠে।

টুকরো টুকরো কথায় ভেসে যায় সময়। ট্রাইসাইকেল যখন চড়ি, তখন স্বামিজীর ছবিটাও থাকে সঙ্গে। চিকাগোয় লেকচার দেওয়া ছবি, লম্বা কোটপরা সে ছবি আজকাল প্রায় দেখা যায় না। বরেন লাইব্রেরী তখন বোস কোম্পানীর ওষুধের দোকানের রোয়াকে ব'সত। আজকে তাদের নিজেদের প্রেস, বড় বইয়ের দোকান এসব হ'য়েছে। বরেন লাইব্রেরীর যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তখন এক প্যাঁটরা বই নিয়ে বসতেন সেই বারান্দায়। এঁর কাছেই আমার স্বামিজীর ছবি পাওয়া এবং বোধহয় এই থেকেই ধীরে ধীরে স্বামিজীর প্রভাব আমার জীবনে এসে প'ড়েছে। আজকের কলমুখরিত শ্যামবাজার-চৌমাথা তখনও গড়ে ওঠেনি, সিংহের মুখ আঁকা কলগুলো তখন সদ্য ব'সছে। শ্যামবাজারে আমরা তখন ক্রিকেটের ম্যাচ খেলে এসেছি। জুতো চুরি সেদিন হতো না তবে জুতো নিয়ে রঙ্গরহস্য সেদিন ছিল। খেলার পর দেখি আমাদের জুতোর শুঁড়গুলো কে বেঁধে রেখেছে। তবে খেলার মাঠে তখনও মারামারির রেওয়াজ ছিল। গড়ের মাঠে তখন স্টেডিয়াম তৈরী হয়নি। ডবল বেঞ্চি পেতে খেলা দেখা হ'ত। গর্ডন হাইল্যাণ্ডারের খেলা ছিল সেদিন। শিবে, ভিজে ভাদুড়ী তখনকার নামকরা খেলোয়াড়। খেলা দেখতে গেছি। হঠাৎ দেখা গেল মারামারি লেগে গেছে। আমি বেঞ্চির

তলায় প'ড়ে গেছি, দেখি ওপর দিয়ে সব লোক পাগলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর দাদা আমাকে বার ক'রে দোকানে নিয়ে গিয়ে লেমনেড খাওয়ায় আর বাড়ী গিয়ে যেন না বলি, সেকথাও চুপি চুপি বলে— দুদলের মারামারির ভেতরও প'ড়েছি, মারও খেয়েছি—বই কেড়ে নিয়েছে— এও ঘটেছে।

মধ্য কলকাতায় তখন ইলেকট্রিক ছিল না, টেলিফোন ছিল, লম্বা ঘড়ির মত টেলিফোনের যন্ত্রটা ছিল তাতে একটা যন্ত্র ছিল সেটি ঘোরালে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হ'ত। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তখন সারি সারি মুসলমানদের দোকান ছিল, কোনটাতে সিককাবাব ঝুলতো। কাশীপুরে তখন বি. টি. রোড দিয়ে গেছি, দিনের বেলায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকতো আর শেয়াল বেড়াতো, নিঝঝুম রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ীর তখন খুব চল ছিল, শেয়ারের গাড়ী। একবার গাড়ীর পিছনে চ'ড়ে এক ছিপটিও খেয়েছি। গাড়ীর কোচোয়ানকে তার জন্যে নিগ্রহ পেতে হ'য়েছিল। পুরানো কলকাতার নানা গোলমাল সত্ত্বেও কি জানি কেমন যেন একটা মোহ সৃষ্টি ক'রতো। হয়তো সিউড়ী থেকে ফিরছি, কলকাতার ইলেকট্রিক আলো দেখতে পেলেই যেন মনে হত, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সেকালের পাঠশালাতেও প'ড়েছি। কলকাতায় তখনও পাঠশালা ছিল। দীনার্তদের ছেলেরা পড়তো সেখানে। টিফিন বলে কোন কিছু তারা চোখেও দেখতে পেত না। এসব পড়ার ঘর পার হ'য়ে আমরা এসে পড়েছিলাম ব্রহ্মবয়েজ স্কুলে। সেখান থেকে আসি হিন্দুস্কুলে। ব্রহ্মবয়েজ স্কুলে আমরা পড়াশুনায় স্ট্যাণ্ড ক'রেছি। পড়াতে আনন্দ পেয়েছি—খেটেওছি। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যালয় পরিবর্তনে আমাদের জীবনে অনেক ক্ষতি এনে দিয়েছে।

কাশীপুরে থাকার কথা আর একটা বেশ মনে আছে। গানসেল ফ্যাক্টরীর ঘাটে গঙ্গাস্নানে যেতুম। গঙ্গাস্নানে যাওয়া একটা নেশার মত ছিল। ঠাকুমার সঙ্গে আমরা যেতুম। না যেতে পারলে ভীষণ মন খারাপ হ'ত। ভোরের গঙ্গা কি জানি এত ভাল লাগতো—ঠাকুমার সঙ্গে এই গঙ্গা স্নানের মোহ পেয়ে বসেছিল। যদিও সময় সময় গঙ্গায় ডুবে গেছি ঠাকুমাই টেনে তুলেছেন, সাঁতার জানতেন তিনি ভালই। ঘাটের উড়িষ্যাবাসী পাণ্ডারা কপালে চন্দন তিলক দিত। সেও একটা জীবনে মধুর স্মৃতি হ'য়েই আছে। ফিরে আসবার সময় ছোট ছোট খেলার ঘড়ি, লাট্টু কিনে আনা, এই স্মৃতিও জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে র'য়েছে। তখন কলকাতার রাস্তা নানারকমের নিব বিক্রী হ'ত। 'বলপয়েন্ট' 'জি' মার্কা এ সব কিনে জড়ো করার একটা স্বভাব,

এ সঙ্গে অল্পদামী ফাউণ্টেন পেন, এয়ার গান, এও রাখা হ'ত। মনে এই সব ছোটবেলার সংস্কার আজও কিছু কিছু র'য়ে গেছে। একটু বড় হ'য়ে রাস্তায় ঢেলে রাখা বই, সেই বইয়ের সংগ্রহ করা, সেও তখন থেকে স্থরু হয়েছে। জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে গরীব দুঃখীকে দেওয়া এগুলি অবশ্য একটু পরবর্তী কালে স্থরু। বাড়ীর সবারই সঙ্গে কালীঘাটে গেছি। হালদারদের বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা নুড়ি রাস্তা ছিল, সেদিক দিয়ে যেতে হ'ত। বেলপাতা, ফুল এসবের গন্ধভরা কালীঘাটে মার মন্দিরের কথা আজও মনে আছে আর মনে আছে সেখানকার প্রসাদী মিষ্টির কথা। সে সংস্কার আজও যেন কিছু কিছু র'য়ে গেছে দীর্ঘ দিনের অমিষ্ট মনে। আর সে মিষ্টির হাঁড়িতে আর কেউ যদি ভাগ বসাতো আমাদের চোখের সামনে আমাদের গাড়ীর ভেতরেই তাহলে কিন্তু আমাদের দুঃখের সীমা থাকতো না। টুকরো টুকরো ঘটনা হয়তো জীবনটাকে কিছু কিছু তৈরী করে সেজন্য তাদেরও দাম আছে। 'মুরে'র 'অরগ্যানিক ভিউ অফ লাইফ' হয়তো সবটাই সত্যি নয়। তখন নিচু ক্লাসে পড়ি—হঠাৎ একটি বন্ধুর হ'ল অসুখ। কদিন ইস্কুলে আসে না। শেষকালে তাকে দেখবার জন্যে কয়েকজনে মিলে গেলুম। চায়ের যে কোম্পানী ভট্টাচার্যিদের তাদেরই ছেলে, ভাল ছেলে। আমি ফার্স্ট হ'তুম আর সে হোত সেকেণ্ড, তাকে দেখতে যাচ্ছি। পথে ছেলেরা সব ওয়াটসানের গল্প ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিল। সে ছিল ক্লাসের সেরা ছেলে, ফার্স্ট হ'ত, তবে স্কু'ল যখন যেতো একটা গরুকে মাঠে নিয়ে যেতো আবার ফেরবার সময় সেটিকে নিয়ে আসতো। সেজন্য ছেলেরা ঠাট্টা ক'রতো—দেখো দুধে বেশী জল মিশিও না দুধের কারবার ক'রছো। বাৎসরিক পরীক্ষায় সেবার হেডমাস্টার তাকে প্রথম হওয়ার জন্য পুরস্কার তো দিলেনই আর তাছাড়া আর একটি পুরস্কার দিলেন—কারণ সে অক্ষম বিধবার গরুটিকে মাঠে নিয়ে গিয়ে তার উপকার ক'রতো বলে। সেদিন পথে ছেলেরা এই গল্পটিই ক'রতে ক'রতে যায়। বলা বাহুল্য সেদিন স্কুলে আসতে দেরী হওয়ায় আমাদের সাজা পেতে হ'য়েছিল ইস্কুলে, তবে পড়া ঠিক ঠিক হওয়ার জন্য সে সাজা বেশীক্ষণ হয়নি। বলা বাহুল্য সে ছেলেটি সেই অসুখেই মারা যায়। এই সব ছেলেরা স্কুলের টিফিনের সময় রাজা রাজা খেলার সঙ্গী হ'ত। আর রাজার রাজদণ্ড ছিল দরজার লোহার হুড়কো। বলা বাহুল্যই রাজা সাজতাম আমি। সেবার পরীক্ষায় রেজালটা ভাল হ'য়েছে। খেলার গল্প ক'রতে ক'রতে যাচ্ছি হেদোর পাশ দিয়ে, ছেলেরা কিনে খাওয়ালো নারকেলের আর চিংড়ী দেওয়া প্যাটী। আজও কেমন মনে র'য়ে গেছে।

এখানকার মত তখন ক্যামেরা এত সুলভ ছিল না। আমরা একটি ক্যামেরা কিনি ও ছবি কিভাবে Develop ক'রতে হয় তাও আমরা শিখে নি, আমি সে সময় তখনকার 3rd. ক্লাসে পড়ি। আমরা প্রথম ছবি তুলি ছাদ থেকে—নারকোলগাছ—ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে প'ড়েছে আকাশে। কলকাতা তখন এমন জনারণ্য ছিল না। ছাদ থেকে আমরা দৃশ্যটা তুলি। রাত্রিবেলা Redlight-এ আমরা Develop ক'রছি। প্রথম যখন ছবিটা একটু উঠেছে তখন আর আনন্দ ধরে না। তখনকার দিনে Redlight ছিল মোমবাতির। মোমবাতিটা হঠাৎ যখন নিবিয়ে যেতো তখন কম্বল ঢাকা দিয়ে ছোট ছেলের মত তাকে দোলাতে হ'ত। এরপর রোদে রেখে Printing করা তাও আমরা ক'রেছি। কলকাতার দিনগুলো তখন শান্ত আর উপদ্রব—শূন্য ছিল।

সেদিনের পূজো আমাদের চোখে কোন বিচারের বিষয় ছিল না—কি আর্টের পূজো, কি যন্ত্রপাতি দিয়ে পূজোমণ্ডপ সাজানো, এসব ছিল না। তখন বোধহয় আমাদের মাকে দেখার চেয়ে জামা দেখানো, জুতো দেখানো এরই বেশী ঝোঁক ছিল। বেছে বেছে জুতো জামা কেনা আজও হয়তো ছেলেদের একটা আনন্দের বিষয় হ'য়েই আছে।—সেদিন ফিনিক বাজারে গেছি জামা কিনতে, দোকান সব সাজানো ঝকঝকে কাঁচের আলমারি আর আলোতে। একটা নীল সিল্কের জামা নেবার জন্য ধ'রেছি বায়না। জামাটি বাইরে একটা দড়ি দিয়ে টাঙ্গানো ছিল। আজ মনে হয় বুদ্ধদেবের কথা,—হে গৃহনির্মাতা তোমাকে চিনেছি আর তুমি গৃহ নির্মাণ ক'রতে পারবে না। যাই হোক ১৯১৫ সালের কথা হবে। আমরা তখন স্যার কৈলাসবসুর বাড়ীতে পূজো দেখতে গেছি, পরে আমরা শুনেছিলাম ইনি ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তাঁর ছেলের একবার অসুখ হয়। অসুখের সময় আঙ্গুর খেতে চায়। সে সময় আঙ্গুর পাওয়া খুব সুলভ ছিল না। ঠাকুর দর্শন দেন রাত্রে আর বলেন, শীঘ্র আঙ্গুর আসবে। পরের দিন পেশোয়ারী এক ভক্ত আঙ্গুর নিয়ে আসেন। ...মেছোবাজারের কাছে মস্তবাড়ী, বড় হলঘর—মাকে সাজানো হয়েছে, থালাতে অনেক মোহর প'ড়েছে বোধহয় মাড়োয়ারী ভক্তরা দিয়েছে। প্রতিমা দেখা তো নয় কোনরকমে মাকে প্রণাম ক'রে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম। সেদিনও পূজোমণ্ডপে ভীড় জমতে পেতো না। রাস্তায় কতকগুলো মুসলমান ছোকরা মা'র বাড়ীর দরজার মঙ্গলঘটের ডাব নিয়ে দোলাতে দোলাতে যাচ্ছে, লাগলো একজনের পায়ে তিনি আমাদের দলের সেক্রেটারী, তিনিও ছাড়বার

পাত্র নন। দিয়েছেন দু'ঘা লাগিয়ে—তখন তারা গালাগালি দিয়ে রাস্তার অন্য ছোকরাদের ডাকলো। তখনকার দিনে পাথরের খোয়া বাঁধান রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে ধারে সেই খোয়া জড় করা রয়েছে। সেই খোয়া তুলে নিয়ে তারা রীতিমত যুদ্ধ স্নুরু ক'রে দিল। আমরাও ছাড়লাম না। দুধারে কাপড়ের, ওষুধের দোকানের শো-কেসের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে পাল্টা উত্তর দিতে দিতে ফিরে আসি। সেবারের পূজো দেখাটা একটু বিয়োগান্তই হ'য়েছিল তবে একটি কথা বেশ মনে হয় আমাদের সাহায্য ক'রতে কোনও ছেলে এগিয়ে আসেনি, কিন্তু তারা বেশ দলবদ্ধ হ'য়েছিল।

পূজোর কথা বলতে গিয়ে আমার সরস্বতী পূজোর একটি সত্যিকার বিয়োগান্ত ঘটনা মনে হ'চ্ছে। খুব সম্ভব এডোয়ার্ড ইনিষ্টিটিউট। হেদোর ধারে ইস্কুল ছিল। আমরা চাঁদা দিয়েছি—লুচিটুচি হ'য়েছে আমরা খেতে ব'সব। তখনকার দিনে খাওয়া-দাওয়া বেশ জুত ক'রে হোত। বড়দের সঙ্গে বোধহয় কিছু হ'য়েছে, দাদা দুচোখ রক্তবর্ণ ক'রে এসে হাজির, পাতে তখন লুচি আর সব খাবার জিনিস, তখন পাতা থেকে তুলে আনলে কি যে দাঁড়ায়। তখন হয়তো পাতে লুচি ফেলে উঠে আসার মত বৈরাগ্য আমার ছিল না।

স্কুলে ডিসিপ্লিন তখন এত ভাল ছিল—আর এত সব ভাল ছাত্র তৈরী হত যে বলবার যো নেই। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে নিত্যি প্রার্থনাতে আমাদের দাঁড়াতে হ'ত। এরপর যখন হিন্দুস্কুলে যাই সেখানকার ডিসিপ্লিনও আমাদের মাথা পেতে নিতে হ'য়েছে। হিন্দুস্কুলে রসময় মিত্র মশায় তখন হেডমাস্টার আর অ্যাসিস্টেণ্ট-হেডমাস্টার ব্রহ্মকিশোরবাবু। হিন্দুস্কুলে তখনকার দিনে ডিম-টিম ঢুকতে পেতোনা টিফিনের খাবার হিসেবে। লুচি, মিষ্টি, কচুরি এসব ছেলেরা কিনে খেতো। আলুকাবলী এসবও পাওয়া যেতো কিন্তু আমাদের লোভ প'ড়ে থাকতো হাঁসের ডিম আর চারটুকরো আলুর উপর। এটি বিক্রী হ'ত হিন্দুস্কুলের বাইরের দিকে গোলদীঘির ধারে। আমরা রেলিং-এর ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেটি কিনতুম কিন্তু হঠাৎ যেদিন দেখতাম নীচের দিকে মুখ করে হন হন ক'রে ব্রহ্মকিশোর বাবুর আবির্ভাব সেদিন সাধের খাবার আমাদের আধ-খাওয়া ক'রে ফেলে দিয়ে দৌড় দিতে হ'ত। দুজনেই খুব রাসভারী ছিলেন, এঁদের শিক্ষার একটা পদ্ধতি ছিল যে নীচের ক্লাস থেকে ছাত্রদের এনে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দেখাতেন তাদের লেখা কি কোন রচনা, বর্তমানে নাকি এরকম করে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অচল। আগেই ব'লেছি যে শিক্ষার সময় স্কুল বদলানো অনেক সময় ছেলেদের খুব ক্ষতিকর হয় বিশেষ ক'রে ছোটস্কুল

থেকে নামকরা স্কুলে গেলে বোধহয় এতে ছেলেদের পড়ার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কমে যায়। আর মাস্টাররাও অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের যদি নিম্নস্তরের ব'লে মনে করেন তবে তাঁদের'ও শিক্ষা দেবার চেষ্টাটা কম হয়ে যায়। যে ছেলে অপেক্ষাকৃত নিচু স্ট্যাণ্ডার্ডের স্কুলে ভাল ছেলে বলে গণ্য হ'য়ে পড়ার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করত পরে উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ড স্কুলে গিয়ে তার সেই আকর্ষণ কমে যায়। কারণ ভাল ছেলে বলে সেখানে গণ্য হ'তে পারে না। তবে বড় হবার স্বপ্ন না থাকলে বড় হওয়া যায় না। আমার মনে আছে পুস্তকের পিছন দিকে আমরা লিখে রাখতাম, ভাল ছেলে হব। আর বই-এর গ্রন্থকারের নামের পাশে নিজের নামটা লিখে এম. এ. এটাও রাখতাম লিখে, তখন কিন্তু বয়স খুবই অল্প ছিল। বড হবার স্বপ্ন সেদিনও দেখেছি। যাই হোক আমাদের সেদিনের কথা মনে আছে। শিক্ষকদের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল মনে হয় বর্তমানে তা বিরল। সাডে দশটার সময় আমরা ইস্কুলে গিয়ে দেখতাম রসময় বাবু তাঁর চোগাচাপকান প'রে ভাডার ঘোড়ার গাডী থেকে নামছেন তখন আমরা তাঁর পায়ের ধূলা নিতে ব্যস্ত হতাম। তখন হেডমাস্টারের বুট জুতো পরা প্রচলন ছিল। মনে আছে একটি ছেলে অন্যের পাতা দেখে নকল ক'রছিল। তখন হিন্দুস্কুল একতলা ছিল, দুতলা হয়নি। রসময় বাবু মাঝের বড় হলের একটা ধার থেকে আরম্ভ করেছিলেন তাকে চড মারতে। আর ভদ্রসন্তান চোর, অভাবে নয় নিজের সর্বনাশ করবার জন্য— এই সব বলে এক একবার বোঝান আর চড মারেন, মারতে মারতে হলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গেছিলেন। বলা বাহুল্য রসময় বাবু কীর্তনে যেমন খোল বাজাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি চঁড় মারাটাও যে সহজ হ'তনা সেটি না বললেই চলে।

তবে ইংরাজী শিক্ষার ক্লাসে আজও মনে আছে He dashed at the door এইটি হাত নেড়ে জোরাল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পডে ব্রহ্মকিশোর বাবুর—সিস্টার নিবেদিতার Cradle tales থেকে, শিবরাত্রির দিন উপবাসক্ষিণ্ণ শরীরে এসেছেন; ক্লান্তিতে ঢলে পডছেন তাই নিয়ে পড়াচ্ছেন Siva the great God। তখন শিবরাত্রির পরের দিন ছুটি থাকতো।

এই সব উন্নত চরিত্রের শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পেয়ে ছাত্রেরা বড় হ'ত একথা বাহুল্য। পিনাকী রঞ্জন, পতঞ্জলী ভট্টাচার্য, হেমেন রায় চৌধুরী ......এরা সব তখনকার দিনের কৃতী ছাত্র ছিল। ভাল ছাত্র তৈরী ক'রছেন

এঁরা। আর বাড়ীতে অভিভাবক যদি উন্নত চরিত্রের হয়, স্কুলে শিক্ষকেরা এমনি উন্নতমনা হন তবে ছাত্রদের ভাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গানসেল ফ্যাক্টরীর ধার দিয়ে যে গঙ্গার ঘাট আছে সেখান থেকে ছোট ছোট লোহার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম। আমার পিতা আমায় তিরস্কার ক'রেছেন,—তুমি না বলে এটা নিয়ে এসেছো ; এতে চুরি করা হয়। ছোটবেলার এই শিক্ষা আজও মনে আছে।

সাধুদের কত রকমারি দর্শনই না মিলেছে এই কলকাতায়।—মহাকালী পাঠশালার মহিয়সী মাতাজীর কথা মনে পড়ে। তিনি এসেছিলেন আমাদের ঘরে। পুরুষালী চেহারা। ব্যক্তিত্ব র'য়েছে চেহারায়। আমরা তখন এত ছোট যে তাঁর মহিমা বুঝতেও পারিনি। শিক্ষাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবার এই প্রচেষ্টা যে কত কঠিন ছিল একথা আজ আমরা বেশ বুঝি। অবশ্য শ্রীশ্রীমাকেও দেখেছি আরো ছোট বয়সে মার কোলে চ'ড়ে। সেদিন দক্ষিণেশ্বর গেছি মার সঙ্গে। তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ীই সম্বল। তখনই মাকে নহবতে দেখি তবে বোঝবার বয়স তখনও হয়নি। এর পর যখন বি. এ. ক্লাশে পড়ি তখন একবার ভোলাগিরি মহারাজাকে দেখতে যাই। জনৈক সহপাঠী নিয়ে যায়। জায়গাটা বিশেষ মনে নাই। একটি ছোট বাড়ী। ঘরটি ভরে গেছে। মহারাজকে বসিয়ে ভক্তরা সকলে আরতি করছে। গুরুর আরতি যে করণীয় একটা কাজ সে বিষয়ে সেদিনও চেতনা হয়নি। গিরিজীর অমল ধবল মূর্তি, চোখে একটি কাল চশমা সোনার ফ্রেমে বাঁধা। কি জানি মনে কোন দাগ কাটেনি সেদিন। সাধারণ ভাবেই ভেবেছি ইনি যদি সর্বজ্ঞ হন আমায় ডেকে প্রশ্ন ক'রবেন। যাই হোক সেদিনের সন্ধ্যা যেন বন্ধ্যাই হ'য়েছিল। আমি পড়াশুনার তাগিদে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি শেষ দৃশ্য আর দেখা হয়নি। মঠে গেছি সেবার। কয়েকজন সাধু সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ চলেছেন, আমার দিকে একটু দেখলেন তার পর চলে গেলেন। সেবার শ্রীমার মন্দির চত্বরে বসে অনেকক্ষণ কাটাই। এবারে মঠের কিছু কাজ ক'রেছিলাম। মনে আছে কয়েকটি ছবি, শ্রীমা ঠাকুরের ছবি আমি নিয়ে বিক্রী ক'রছি। সহসা একটি বৃদ্ধা বলেন,—বাবা ঐ ছবিটা একটু কম দামে দাওনা বাবা। পাশেই একজন বিহারী ছিল সে ব'লে ওঠে,—আরে উন্‌কো ইসিমে রোজী চল্‌তা, কিউঁ এই সা বোলতে হো—ইত্যাদি। দেখলাম আমার খদ্দরের জামা এই সব দেখে হয়তো দরদ বোধ ক'রছে। আমার অবশ্য আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল আমি বলে ফেলি,—মৈ ত বিদ্যার্থী হুঁ—গুরুকা লিয়ে ইয়ে সব

বিকৃতা। যাই হোক বৃদ্ধাকে নিজের পয়সা থেকেই সেই পট মূর্তি দিয়ে দিই।

আমার একটা নিয়ম ছিল যে কোন মঠ থেকেই প্রসাদ নিলে সেটি ফেরবার পথে দরিদ্র নারায়ণদের হাতে দিয়ে দেওয়া। বিডন্ স্কোয়ারে—তখন অনেক আতুর নারায়ণ পড়ে থাকতেন তাঁদের দিতাম। প্রসাদ চাইতে গিয়ে সেবার একটু ঝাঁঝাল উত্তর পাই। ফিরে আসছি—এক মুঠো আঁধার মনে নিয়ে। রাস্তায় দেখি কয়েকটি ছেলে বোধহয় স্বেচ্ছাসেবক। মনে পড়ে বেলুড় মন্দির থেকে বেড়িয়ে একটু অন্ধকার অন্ধকার জায়গায় সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কি খাচ্ছে। দেখে কেন জানিনা জিজ্ঞাসা করে প্রসাদ পেয়েছেন? আমি বলি না। উত্তরটায় বোধ হয় একটু অসন্তোষের আমেজ ছিল। চলে আসছি। তারা জোর ক'রে ধ'রে বলে, সে হবে না একটু প্রসাদ নিয়ে যেতেই হবে। আমি হতবাক! যেন ঠাকুরই এদের প্রেরণা দিলেন। জোর ক'রে ধ'রে দিল কিছু প্রসাদ। সেদিন আলোছায়া ঘেরা বেলুড়ের প্রান্তে শ্রীঠাকুরের এই দিব্য ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি। অবশ্য গুরুদেবের কাছে এর আগেই গেছি। স্বামী অভেদানন্দ তখন সদ্য এসেছেন। প্রথম দর্শন করি। মেছোবাজারে একটা ভাড়া বাড়ীতে নগেন ব্রহ্মচারী বলে জনৈক তখনকার কাজকর্ম দেখতো তার একটি ভাই আমাদের বয়সী হবে তাকে জিজ্ঞাসা করি। ফ্রাঙ্কডোরাকের বিখ্যাত ছবিটি ছিল একটি ঘরে একটি ইজেলের ওপর রাখা। একলা ঘরে ঢুকে ঐ জীবন্ত মূর্তি দেখে সারা গা যেন ছমছম করে উঠেছিল। তখন বি. এ. পড়ি। সব সময় যাওয়া যায় না। ক্লাশ ফাঁকি দিতে পারিনি কোন দিনই। একটা রাজ সাইকেলে চড়ে তখন যাওয়া আসা ছিল। অনেক সময় —মোটরের তলায় প'ড়তে প'ড়তে বেঁচে গেছি। তখনকার দিনে রাস্তায় এত ভিড় ছিল না কি গাড়ীর, কি লোকের।

কলকাতার সেদিনের কথায়—মনে পড়ে প্রথম গান্ধিজীর আন্দোলন। আমরা তখন বিদ্যাসাগরে পড়ি। সারদারঞ্জন তখন প্রিন্সিপ্যাল। J. R. Banerjee তাঁর নীচে। ছাত্ররা এসে জড়ো হ'য়েছে সরু গলির রাস্তা পেরিয়ে। আসুন সবাই—ব'লে ডাক দিচ্ছে আমাদের। জ্ঞানবাবু বেরিয়ে এসে তাদের বললেন, আপনারা ভেতরে গোলমাল ক'রবেন না। শিশির ভাদুড়ী মশাই আমাদের পড়াতেন। তিনি গেটের কাছে একটা গাছ ছিল, গাছটা কি গাছ ঠিক মনে নাই, সেই গাছে একটা হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কি ভেবে দেখলেন জানিনা। তবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন। এর পরের

ইতিহাস আমাকে না বললেও চলে। অভিনয়ের উন্নতি ক'রলেও অন্য দিকে সেটা বড় দুঃখ দেয়। আজও মনে আছে শুঁড়ি পাড়া রাস্তায় একটা পুরানো বাড়ীতে থাকতেন। কলেজের কিছু কাজে ডেকেছেন। তখন সকাল ৯টা। গিয়ে দেখি তখনও শুয়ে আছেন। বাড়ীটা দুমহলা ছিল, তিনি বাইরের মহলায় শুতেন। বোধ হয় রাত্রে কোথাও অভিনয় ছিল। তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে কিছু খেয়ে আমার সঙ্গে চললেন কলেজে। রাস্তায় চলেছেন মাথা উঁচু ক'রে—দেখে সত্যি গৌরব বোধ ক'রেছি। শুনেছি বলতেন, পেশাদারী থিয়াটারে ডাকলে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতেন, আমি এমেচার ছাড়া নামিনা। কলকাতার সে সব রাস্তা, বাড়ী ঘর আজ আর নাই বোধ হয়—shifting scenes of life।

এই সঙ্গে মনে পড়ে ছবি বিশ্বাসের কথা। সে তখন আমাদের সঙ্গে পড়তো। সেদিন কলেজে একটা অভিনয় হচ্ছে। কি অভিনয় ঠিক মনে নাই। তবে সেদিন আমরা খুব হাততালি দিয়েছিলাম যখন অভিনয়ের ভেতর অহেতুক তার হাতের তরোয়ালটা চালিয়েছিল। দেখতে বেশ সুপুরুষ ছিল সে। পরে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। পরে হিন্দু মুসলমানের বিসংবাদে শুনি আমারই আত্মীয় রামচন্দ্র এদের রক্ষা করে। কিন্তু বিধাতা তাকে বেশী-দিন রাখেন নি। ছবির রাজ্যে ছবি সত্য অপরাজেয় ছিল সেদিন।

যাই হোক স্বামিপাদ তখন একটা মঠে থাকেন, ইডেন হসপিট্যাল রোডে, আমি সাইকেলে চড়ে একদিন কলেজের পর সেখানে উপস্থিত। নীচে অনেক দোকান। অনেক কেনা বেচা। নীচে চারিদিকে মলিনতা—কত ভাত প'ড়ে রয়েছে। সচ্ছলতার দিন ছিল বলেই। যাকেই জিজ্ঞাসা করি—স্বামিজী এখানে কোথায় থাকেন? আদার ব্যাপারীরা কোন খবরই জানেনা। শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা সাইনবোর্ডে লেখা র'য়েছে স্বামীপাদের নাম। সাইকেলটি আর কোথায় রাখবো, কাঁধে ক'রে উপরে উঠে গেলাম। গাড়ীটি চাবি বন্ধ ক'রে গিয়ে দেখি ক্লাশ হচ্ছে গীতার। আমার তখন গীতার ক্লাশের প্রতি ভক্তি নাই। চলে আসি নির্বিচারে। এরপর একদিন শা—মহারাজের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি তখন নবাগত। ইনি পরে প্রেসিডেণ্ট হন আবার সে সম্মানের পদবী ছেড়েও দেন। এঁর সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখের কথা অনেকই হ'য়েছে। এর পরে আমার সাধু হবার ইচ্ছা শুনে নিজের সব কথা বলেন। জমিদারের ছেলে তিনি প্রথম বৈরাগ্যের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েন। পৌঁছে কিন্তু বিধি সাধেন বাদ। অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। কে আর

দেখবে। শেষে একটি ওদেশের বৃদ্ধা তাঁকে নিয়ে সেবাদি করেন। বাড়ীতে সংবাদ দেওয়ায় পিতা এসে নিয়ে যান বাড়ীতে। পূর্ববঙ্গে এঁর বাড়ী ছিল। আমার সাধু হবার সঙ্কল্পে বলেন, বেশী যারা চিন্তা করে তাদের সাধু হওয়া যায় না। ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সাধুদের জীবনটা কষ্টেরই তো। বলেন আমি যখন ওখানে একটা আশ্রমে যাই তখন সেখানে কারুর সঙ্গে মিশতে পেতাম না। যখনি কেউ বসে কথা বলছে দেখে যেতাম, তারা তখন সরে পড়তেন। কাজেই আমার আর সে আশ্রমে থাকা হ'ল না। স্বামিপাদ এখন আশ্রয় দিয়েছেন। যাই হোক স্বামিপাদের সঙ্গে কথা কইবার অবসর পেলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই। বললাম, আপনার উপদেশ। বললেন ক্লাশে এলেই হবে। আমি বলি, না -কিছু সাধন জিজ্ঞাসা আছে। কি করি, পিতা কি করেন এই সব পরিচয় নিয়ে একটু, ভিতর থেকে এবার বসলেন একটা চেয়ারে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। বলেন, তোদের জন্যেই তো বসে আছি। নইলে গঙ্গার ধারে নিভৃত নিরালা কোথাও থাকলে হ'ত। যাই হোক দীক্ষার প্রথম পর্ব এমনি ক'রেই অযাচিত ভাবেই এসে যায়।

তখন সেণ্ট্রাল এভিনিউ এর বাড়ীগুলো ভাঙ্গা হ'চ্ছে, নতুন বড় বড সব বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে। কারো সর্বনাশের ব্যবস্থা, কারোও পৌষমাস। আমি সে সব দেখে কলেজে যাই। বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে, নীচে বড় বড় দোকানের ব্যবস্থা হ'চ্ছে। দেখি আর মনকে বলি—এই ঐশ্বর্যের পথ চাও, না অন্য পথে থাকতে পারবে। বলা বাহুল্য তখন আমি কমার্সের ছাত্র। সেদিনের ইউনিভার্সিটির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে প্রথম প্রথম আমাদের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ ক্লাস হ'ত। পাশে হিন্দু হোস্টেল। মাঝে মাঝে পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে তাকিয়ে দেখতুম, বিশেষ সাড়া শব্দ পেতুম না। এখন শুনি হিন্দু হোস্টেলের তলা থেকে নানা আওয়াজ বেরোয় কম্যুনিস্ট, রাইটিস্ট, লেফ্টিস্ট ইত্যাদি। নীচে থেকে কেউ সব ডাক দেয়, বলে—ভাই সব নেমে এস, ইউনিভার্সিটি ভাঙ্গতে হবে। তখন কেউ ওপর থেকে ঝুড়ি নামিয়ে দেয়, বলে —ওগো বাবুরা, আমরা ব্রহ্মচারী, আমরা ওপর থেকেই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছি। তোমাদের দলে বিটিছেলেরা আছে। বলাবাহুল্য ছেলেগুলি সব বীরভূমের সর্দার বিশেষ। আরও পেছনের কথা, তখন আমরা বেশ ছোট, K. M. Das-এর নামকরা চটি জুতো যেখানে তৈরী হয় সেখানে আমরা থাকতুম। দেখতুম রাস্তার ছেলেরা খেলতো হয় পুরানো সাইকেলের রিমটা নিয়ে কড় কড় আওয়াজ করে চালাচ্ছে—নয়তো সুতোর কাটিমগুলো দিয়ে ছোট

ছোটগাড়ী তৈরী করে রাস্তায় ছেড়ে দিত, হাওয়ায় সেগুলো চলতো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ি ওড়ানোও তখন ছিল।

এই রাস্তায় ঘুড়ি ধরতে গিয়ে আমার জীবনে একবার বিপদ ডেকে আনি। বাগবাজারে সেনেদের বাড়ীর কাছে যে পার্কটা আছে তারই কাছে ডোমপাড়া ছিল। ডোমেদের অতি বিশ্বস্ত কুকুর একটি আমাকে কামড়ায়। আমার দোষ হ'চ্ছে তাদের পাড়াতে ঘুড়ি ধরতে গিয়েছিলাম। পাড়াটা আমরা যেখানে থাকতাম তার কাছেই। তখন সেই বিশ্বস্ত কুকুরটি আমাকে কামড়ায়। পাটা Acid দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, দাদা কুকুরটাকেও বন্দুক দিয়ে মেরে ফেললেন।

সাধারণ গরীবদের দরদ বোধহয় বেশীই ছিল। তখন এডোয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউটএ পড়ি। হেদোর ধারে স্কুল। ভারী বুট পরে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। প'ড়ে গিয়ে কাঁচে হাত কেটে গেল। রক্ত আর থামেনা শিরা কেটে গেল। দাদাতো স্কুলে চলে গেলো। বাড়ীতে কর্তাব্যক্তি কেউ নেই। মায়েরা কি ক'রবে ঠিক ক'রতে পারছেনা। ওপর থেকে নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে দেখে পাশের বস্তি থেকে লোকেরা ছুটে এসে প্রথমে ধুলো, কয়লা গুঁড়ো দিয়ে বেঁধে রক্ত থামাবার চেষ্টা ক'রলো। তাতেও কিছু হ'ল না দেখে একটা ঘোড়া-গাড়ী ডেকে অনেক দূরে আমাকে হসপিট্যালে নিয়ে গেল। সেদিনই বুঝেছিলাম গরীবের বুকটা গরীব নয়। সেখানে পরিষ্কার ক'রে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে। আমি ভয় পাবো বলে তারা বললো, খোকা এদিকে তাকিও না। তবে এদিনের মত কথায় কথায় টিটেনাস বা ইনজেকসান আমায় নিতে হয়নি। একি germ-এর শক্তি বাড়ছে না আমাদের শক্তি কমছে বুঝতে পারি না। সেখানে যে বাড়ীটায় আমরা থাকতাম সে বাড়ীটার নাম ছিল মানসকুটীর। এখান থেকে আমি বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যেতুম ঠাকুরমার সঙ্গে। গঙ্গাবাই আমার চিরকালের। আজও গঙ্গাস্নানের স্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখি। বোধহয় Sweetest songs are those/that tell us not of saddest thoughts, / but of distant thoughts. Shelleyর কবিতাটি একটু পালটে বলতে হ'ল। এই বাগবাজার ঘাটে আমরা কত দিন একসঙ্গে ব'সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ভাল ভাল বিষয়ের কথা বলছি। তখন আমরা জেটি অথবা জেটিতে বাঁধা নৌকার ওপরে বসে এসব কথাই বলেছি, শুভ কথায় বলেছি। টকি তখন ছিল না, Madan থিয়েটার্স তখন হ'য়েছে তাও আমরা এক আধবার গেছি। একবার মনে পড়ে দাদা যিনি পরবর্তীকালে

প্রথম D. Sc. হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে একটা নির্বাক চিত্র দেখতে গেছি—খুব তেষ্টা পেয়েছে। দাদা ধমক দিলেন। বললেন এখানে তোকে কোথায় জল দেবো। পাঁউরুটি আর জল এনে দিচ্ছে একটি কয়েদীকে, সেই ছবি দেখে আমার আরও জল তেষ্টা বেড়ে গেলো। পালাতে পারলে যেন বাঁচি। Intervalএ বোধহয় জল খেয়েছিলাম। অভিনয় দেখতে যাওয়া অবশ্য আমাদের খুব সহজই ছিল। তখনকার দিনের সমাজে প্রতিষ্ঠিত গিরীশ ঘোষ, নেপা বোস, অমৃতলাল বসু, অমর বোস—এঁরা সব পিতৃদেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, আসা যাওয়াও ছিল। একদিন বিকেলের দিকে, তখন আমরা মাণিক-তলায় থাকি ; নেপা বোস এসে হাজির কি দরকার ছিল জানি না। ঘরে একটা বিলিতি কুকুর ছিল, সে এসে দাঁড়াতেই রঙ্গপরঙ্গ দেখে খুব চেঁচাতে লাগল। নেপা বোস একবার একটু নেচে কুকুরটাকে বললেন, যা-যা কাপড় প'রে আয়। আর রাস্তার লোক সুবিধা পেয়েছে, কেউ কেউ বলছে একটা পাশ দেবেন। সেখানেই রঙ্গ সুরু হ'য়ে গেলো।

থিয়েটারে ওপরের যে Dress circle ছিল, সেখানে আমাদের বসতে দেওয়া হ'ত। তখন fan ছিল না, হাতপাখার ব্যবস্থা ক'রে দিত। গিরীশঘোষের হরিশচন্দ্র দেখতে গেছি। গিরীশচন্দ্র তখন নিজে চণ্ডালের পাঠ ক'রছেন। যখন "আঁখ উপাড়ে লেবো," বলে বড বড চোখ রক্তবর্ণ করে হাত বাড়াতেন তখন আমরা ভয়ে ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে মায়ের আঁচল ধরতুম। শঙ্করাচার্যের অভিনয়ে—শঙ্করাচার্য যখন গৃহত্যাগ করছেন তখন মহামায়ার অষ্টসখীরা গেরুয়া কাপড় পরে বিশিষ্টাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন। একটা গান ছিল,—'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে'—এই সব দেখে বোধহয় আমাদের নৈতিক জীবন কিছুটা তৈরীই হয়ে গিয়েছিল। মেবার পতন, এসব আমরাও দেখেছি, ঘুমঘুম চোখে। কারণ তখন সারারাত্রি ধরে থিয়েটার হ'ত। তখন স্টেজে নানারকম আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ছিল না সত্যিই তবে সেই সাদাসিদে অভিনয় দেখতে গিয়ে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলতুম। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেছেন,—আসল নকল এক।

অভিনয় দেখতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ে। বাড়ীর কর্তা, এঁরা আমরা যে অভিনয় দেখতে যাবো সেটা বেশ পছন্দ করতেন না, বিশেষ ক'রে সারারাত্রি জেগে। যাই হোক মেবার পতন D. L. Roy-এর অভিনয়টা আমাদের খুব ভাল লাগতো, যুদ্ধ বিগ্রহ, চন্দ্রগুপ্ত এসব। কবিগুরুর অভিনয়ের তখন তেমন চলন ছিল না। বাড়ীতে একটা গুপ্তি তলোয়ার

আমাদের ছিল। অন্ত অস্ত্রশস্ত্রে আমরা হাত দিতে পেতুম না। এই গুপ্তি তলোয়ারটা নিয়ে একদিন সেজ ভাইকে নিয়ে ছাদে হনুমানের দলকে যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছি। দুঃখের বিষয় সে যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ই হয়েছিল। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে আমরা সবরকম অভিনয় দেখা ছেড়েছি। সেবারে Prince of Wales আসেন, পিতৃদেবকে একটা মেডেল দিয়ে যান; বায়স্কোপে সেটা উঠেছিল। পিতৃদেব নিয়ে গেলেন এলিফিনস্টোন পিকচার্স প্যালেসে। সেদিন সেটা একটু গলিরাস্তার মাঝে ছিল। দেখলাম Prince-এর কাছে কেউ একটা দাঁড়াতে পায়নি, সব দূরে দূরে নিয়মমাফিক দাঁড়িয়ে আছেন, আর পিতৃদেবের সঙ্গে Prince কথা বলছেন। সেটা বোধহয় ১৯২১।২২ সালে হবে। এর পরে কিন্তু একটা অন্য ফিল্ম দেখানো হলো। কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে থেকে বললাম, আমি বাড়ী যাবো। পাশে সব বড় বড় অফিসাররা বসে আছেন। আমার বলতে একটু প্রথমে অসুবিধাই হচ্ছিল। তারপর অভিভাবকেরা বললেন, একলা যেতে পারবে? আমি তখন মরিয়া—কোন রকমে গেট দিয়ে বেরিয়ে যে দিকে দুচোখ যায় এগিয়ে চললাম। রাস্তা চিনতুম না। যদিও তখন আই. এ. পড়ছি। সাধু সঙ্কল্প তখন ঠিক করেছি। কোন রকমে রাস্তায় এসে দেখি আরদালী আসছে। সে আমাকে ট্রামে উঠিয়ে দিল। ফিরে আসতে আসতে মনে হ'ল আমি একটা বিক্রমের কাজ ক'রেছি। রাস্তায় আসতে আসতে মনটা খুব ভরে উঠেছিল, —মনে হ'ল একটা বিরাট নৈতিক জয় ক'রে এলাম।

বইএর পুরোনো পাতাগুলো ছবির মত উল্টে উল্টে দেখতে ভালই লাগে। সেবার গঙ্গার ধারে ঝড় উঠেছে ··বাগবাজারের ঘাট—সাইডিং এ কতকগুলো মালগাড়ী ছিল। জনৈক সঙ্গী ছিল সে গান গাইতে সুরু ক'রল। ভয় হচ্ছিল যদি মালগাড়ীটা চলতে আরম্ভ করে তা'হলে আমরা কোথায় চলে যাবো। সেবারে একটা রায়েট হয়ে গেছে—হিন্দু মুসলমানের রায়েট। আমরা আরদালীর সঙ্গে স্কুলে গেছি। তারপব ১৯২৪ এর রায়েটে একাকী কলেজে গেছি। তবে তখন এত বিভীষিকা ছিলনা। তখন খুব সহজেই সবকিছু Control হ'য়ে যেতো, শান্ত হ'য়ে যেতো। আমরা ৫।৬ দিনের মধ্যেই স্কুল কলেজ গেছি। ইংলিশ টমিরা ৩।৪টি ক'রে বন্দুক জড়ো ক'রে রেখেছে। ঘরে ঘরে সন্ত্রাস জেগেছে। গরুর গাড়ী থেকে যা পাচ্ছে কেড়ে কুড়ে নিচ্ছে। ফুটপাথ থেকে লাফিয়ে, ওল যাচ্ছে তার ওপরে প'ড়ে কেড়ে নিয়েই কামড়

দিয়েছে আর দেওয়ার পর তাদের কীর্তি আর না বললেই চলে। সব একেবারে লাফাতে লেগেছে কিসের মত সেটা আর না বলাই ভালো।

ছেলেমানুষের একটা কথা মনে ক'রে হাসিই পায়। সেবার পাঁজিতে বিজ্ঞাপন দেখি যে, পাঁচসিকেতে ছুরি, কলম, পেন্সিল, দোয়াত সব একসঙ্গে পাওয়া যায়।—কাকাকে ধ'রলুম যেতে হবে। তখন আমরা ফিনিক বাজারে থাকি, দোকানটা কাছেই। কাকাকে নিয়ে দোকানে গিয়ে দেখি একটা লম্বা ধূপকাঠির কৌটোর মত টিনের কৌটো, আর তার ভিতর ঐ সবগুলো রাখা র'য়েছে, অপ্রসন্ন মনে সেগুলো কিনি। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। রাস্তার ধারে গাদা ক'রে নানা রকম নিব বিক্রী হ'ত। এগুলো সংগ্রহ করা আমার একটা স্বভাব ছিল; আর ছিল গঙ্গার ঘাট থেকে ঠাকুমার সঙ্গে ফিরবার সময় একটা ক'রে খেলার ঘড়ি কিনে হাতে বাঁধা, আর তখন নতুন বেরিয়েছে একটি খেলনা, সেটি হ'চ্ছে চুম্বক পাথরের হাতে ক'রে ঘোরাবার মত লাট্টু, আর তার সঙ্গে থাকতো দু'একটা লোহার টুকরো সেগুলো সেই লাট্টুর সঙ্গে চলতো ফিরতো।

সিউড়ী থেকে তখন অনেক লোক আসতো, অসুখ-বিসুখই হোক কিংবা কলকাতায় কোন কাজে হোক তারা আসতো। ঐ সব গ্রামের লোকেদের ভয় দেখানো তখন আমাদের একটা মজার খেলা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও সেটা ভাল নয়। রাত্রিবেলা বালিশের একটা লম্বা খোল নিয়ে তাতে কালি ছিটিয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা নয়তো দোতলার গাছে কালো দড়ি বেঁধে টানা ও অদ্ভুত আওয়াজ করা, আর সেই আওয়াজে তারা ভয় পেতো। বড় হ'য়েও এক আধবার এ রকম ভয় দেখিয়েছি। তখন বি. এ. পড়ি। কোয়ার্টারের নীচে আরদালীরা থাকে। একদিন বাঘের চামড়ার রঙের মতন একটা বিভারের চামড়ার গায়ের কাপড় এসেছে, ভাবলাম এটা নিয়ে একটু মজা করা যাক। সেইটে জড়িয়ে নিয়ে নীচে নেমেছি, দেখি একজন আরদালী রুটি তৈরী করবার ব্যবস্থা ক'রছে। দরজার কাছে তার সামনেই উঁচু হ'য়ে ব'সতে সে একবার ঘরের এদিক একবার ওদিক ক'রতে লেগেছে—বলছে,—এ দাদা এ কেয়্যারে। বলা বাহুল্য তাড়াতাড়ি স'রে পড়েছিলাম।

পুরানো কলকাতার কথা মনে আছে, হিন্দু স্কুলে তখন পড়ি, অনেক সময় হেঁটে গেছি রাস্তা দিয়ে, তখন রাস্তার পাশে পাশে বেশীর ভাগ সব ছোট ছোট দোকান। তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সিতে পড়েন, আর আমরা হিন্দুস্কুলে পড়ি। হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ওটেন সাহেবকে মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেছি অবশ্য হেড মাস্টার মশায়ের ঐরূপ নির্দেশ ছিল।

তখন সুকিয়া স্ট্রীটে থাকি। ওখানে আমাদের খেলার মাঠ ও একটা ছোট পুকুরও ছিল। এই পুকুরটায় সবারই দেখাদেখি ছোট ছোট পুঁটিমাছ কখন কখন ধ'রেছি ছোট ছোট পিন বেঁকিয়ে। অনেক সময় ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হ'য়েছে। বাড়ীর মায়েদের সোনার চেন থেকে টুকরোগুলো নিয়ে আমাদের টফি করা হোত, আর এসব খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের পিকনিক হোত। হয়তো বৃষ্টি এসে গেছে উনুন গেল নিভিয়ে, আধ পোড়া আধ কাঁচা তাই কত ভাল লেগেছে। তখন যুদ্ধের সময়—ক্রিকেটের বলের দাম খুব বেশী ছিল। আমরা বলগুলোকে সেলাই ক'রে ক'রে চালাতুম, আর ব্যাটগুলো তাঁতে জড়িয়ে তাতে শিরিষের আঠা দিয়ে ঠিক করার ব্যবস্থা ক'রতুম।

সুকিয়া স্ট্রীটে যখন থাকি তখন সেখানে 'হেমাপোটো' বলে একটা বাজীর দোকান ছিল। আমার পৈতে উপলক্ষে কিছু বাজী দেখানো হ'চ্ছে। সাইলেণ্ট একটা বায়স্কোপও দেখান হ'চ্ছে। একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন—বড় একটা ডিম ভাঙ্গা হচ্ছে, বড় একটা পাখী তা' থেকে বেরুচ্ছে—ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে তাই দেখছেন। তাঁকে একটা টুল দেওয়া হ'ল আর বলা হ'ল বসে বসে দেখুন। এদিকে টুলটা সরিয়ে নেওয়া হ'ল। লোকটা একটু ক'রে নীচু হয় আবার টুল না পেয়ে আর একটু নীচু হয়। তারপর একেবারে মাটিতে বসে পড়লো—এরকম ছেলেমানুষীও তখন আমরা ক'রতুম।

স্কুল থেকে ফিরবার পথে ক্ষিদে পেলে গাড়ী-বারান্দার তলাতে যেসব দোকানে ছাতুর কচুরি ভাজতো সেই কিনে খেতে খেতে এসেছি। টাউনক্লাবের ক্যাপটেন ছিলাম। খেলাধূলার পর ছেলেদের গল্পপরিবেশনের পালা আমার ছিল। এইসব ক্লাবের ছেলেরা এখন চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে।

দীপান্বিতায় কলকাতার এতটা জোলুস ছিল না, তবে আমাদের চোখে সেটুকুই বেশ আনন্দের ছিল। নানারকম ঘুড়ি ওড়ানো, তাতে লম্বা লম্বা লেজের মতন দেওয়া, আবার ঘুড়িতে ছোট ছোট ফানুস লাগিয়ে দেওয়া এ সব তো ছিলই, তাছাড়া মনে আছে সেবার মস্ত দোতলা ফানুস—মানুষের মত, সেটা ওড়ানো হ'য়েছিল আর আমাদের জানাশোনা একটা মোটা মত লোক ছিল তার নাম ছিল মোহিত বাবু—সেই ফানুস যখন ওড়ে তখন আমরা মোহিত বাবু, মোহিত বাবু, বলে হাততালি দিয়েছিলুম। যাহোক ফানুস

ওড়াবার কাজে আমাদেরও কম আগ্রহ ছিল না। সারাদিন ধ'রে স্পিরিটে ঝুটিগুলো ভিজিয়ে রেখে স্পিরিট দিয়ে ধোঁয়া দিয়ে ফানুস ছাড়া হ'ত। ফানুসে নানা রকম লিখে দেওয়া হ'ত, নাম ঠিকানাও লেখা হ'ত।—সময় সময় এতে যে বিপদ হতো না তা নয়। প্রদীপ দিয়ে ঘর সাজানোতেও একটা প্রতিযোগিতা ছিল। প্রতিযোগিতা ক'রে তুবড়ী করা এখনও যেমন আছে তখনও তেমন ছিল। তবে তখন ক্লাব হিসেবে বেশী প্রতিষ্ঠান ছিল না। খেলাধূলা ছিল, কিন্তু এখন যেমন সর্বত্র ক্লাব গড়ে উঠেছে তখন সেরকম ছিল না। সার্বজনীন পূজাও তখন এখনকার মত ছিল না। কলকাতার সমাজ তখন এতরকম সমস্যা পীড়িত ছিল না। আমরা পলিটিক্স কাকে বলে বুঝতুম না। পড়াশুনা আর খেলাধূলা এই নিয়েই আমাদের দিন কেটে যেতো। পড়াশুনার পর—বাগবাজার বিচালী ঘাটে আমরা সব গিয়ে বসতাম. নানা শুভ আলোচনা আমাদের হ'ত। তার ভেতর বায়স্কোপ বা অভিনয়ের কথা নয়—নানা জীবনী প্রভৃতি আলোচনার বিষয় ছিল। গড়ের মাঠের খেলাধূলার আলোচনাও আমরা করতুম। গঙ্গার ধারে ঝড় এলে তখন আমাদের আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেতে হ'য়েছে। গঙ্গার ধারে সব মিলের দেওয়ালে গিয়ে কোনরকমে ঝড় আটকাতুম। মালগাড়াগুলো দাঁড়িয়ে থাকতো, জলের থেকে মাথা বাঁচাবার সময় সেখানে গিয়ে বসেছি। বেসুরো, বেতালা গানও গেয়েছি—হঠাৎ গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে পড়েছি আমরা।

কলকাতার তখন নূতন গড়ার দিক। বালীগঞ্জের ওদিকটায় তখন আমরা আছি, হয়তো দুচার দিনের জন্য—একদিন মিষ্টি কিনতে বেরিয়েছি আমি, কিন্তু ফিরে আর নিজেদের বাড়ী চিনতে পারছি না, ঢুকে পড়েছি একটা বাড়ীতে—একই রকম সব বাড়ী। একটি মা ও একটি মেয়ে বসে কথা বলছে, আমাকে দেখে ব'লছে, এস খোকা এস—। আমার বয়স তখন খুবই ছোট, আর আমি তখন আপনজনদের না দেখতে পেয়ে কিরকম হ'য়ে গেছি। পিছন ফিরে একেবারে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। মিষ্টি খাওয়া ভাল কি মন্দ, এ বিচার এখন নানাভাবে চলছে, কিন্তু ছোট্টবেলায় রাত্রে মাথার কাছে লুচি আর মিষ্টি রাখাই থাকতো। মিষ্টি কিনে নিয়ে আসছি—চিলে যে ছোঁ মারবে সে সব খেয়ালই নাই, নয় তো অত ছোটতে খেয়াল থাকার কথাই নয়। সত্যি সত্যি একটি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। একটি ভদ্রলোক আমার এই "ন যযৌ ন তস্থৌ" চেহারা দেখে পয়সা দিয়ে ব'লল,—এই নাও খোকা মিষ্টি কিনে খাও।

আমার ছোটবেলা থেকে খেলার একটা ঝোঁক ছিল। মনে আছে তখন নূতন ক্রিকেটের ব্যাট আর করগেট বল হ'য়েছে। প্রকাণ্ড চেহারার জনৈক সাহেব হঠাৎ আমাদের সঙ্গে খেলতে সুরু করেছে। সে এত জোরে বল দিয়েছে যে আমাদের স্টাম্প ভেঙ্গে গেছে। আর নূতন স্টাম্প ভেঙ্গে যাওয়ায় তখন মনও খুব খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। সেগুলি সাহেবটি কিনে দিয়েছিল কিনা তা আজ আর মনে নেই।

যখন সুকিয়া স্ট্রীটে থাকি—তখন লাট্টু আর গুলী খেলার জোর মরসুম। নানা রকম লাট্টু পাওয়া যেত। বাঘছাল, খুব ছোট ছোট লাট্টু, খুব বড লাট্টু, লাট্টু জিতে নেওয়া—উড়ন্ত লাট্টুখেলা—চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে গিয়ে ঘুরতো, এই ছিল উড়ন্ত লাট্টু। লাটু ছুঁড়ে দিয়ে হাতের তালুতে নিয়ে ঘোরান এই সব আমাদের খেলা ছিল। গুলিও কত রকম ছিল। লোহার গুলি, ছুন্নি গুলি। কোন কোন গুলি ছুঁড়ে দিয়ে সেটা টিক ক'রে মারা এ সমস্ত তখন আমাদের খেলা ছিল। কলকাতার রাস্তাতেই আমাদের সব খেলা চলতো।

ছোট ছোট বায়স্কোপ তখন পাওয়া যেত—সত্যিকারের বায়স্কোপ। তাতে একটি ছবিই ভরা থাকতো যেমন একটি ছেলেকে চাদরের ওপর লোফালুফি করছে, একজন লোক রেঁদা ঘসছে—ক্রমাগত এই রকম এক একটি বায়স্কোপে এক একটি জিনিস। এরকম বায়স্কোপ আমাদের ছোটবেলায় খেলার জিনিস ছিল।

গুলির মধ্যে লোহারটাই ছিল বড় বড। আমার আবার থিওরি ছিল—নানা রকম রঙ ক'রতাম গুলিতে। যেমন ঘাসের রঙ ক'রলে মাঠে সেটা চট ক'রে দেখতে পাওয়া যাবেনা। এই থিওরিতে মাঝে মাঝে মুস্কিল যে না হ'ত তা নয়। ছোট ছোট খেলার বন্দুক নিয়ে খেলতুম, এতে কর্ক লাগিয়ে ছোঁড়া হ'ত। একবার তাতে ছোট ছোট পেরেক ঢুকিয়ে ছুঁড়তে গেছি—বন্দুকটি খারাপ হ'য়ে গেলো। পিঁপড়ে মারা কল আবিষ্কার ক'রতে যাওয়া সেও এই থিওরির নেশায়, নতুন কিছু বার করার নেশায়। এক রকম প্লেন নিয়ে তখন খেলতুম, ছোট ছোট প্লেনে সুতো দিয়ে টেনে ছেড়ে দিলে বেশ খানিকটা পাক দিয়ে ঘুরতো গোল হ'য়ে।

বাগবাজারের সেনেদের বাড়ীর সামনে খেলার একটা জায়গা ছিল। ফুটবল খেলা হ'ত। সেবার বেশ একটা মজা হ'ল—একটা ছেলে দেখতে খুব মোটা সোটা—হঠাৎ খেলতে খেলতে পা ফস্কে গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলো—এই

পড়ায় সে আর উঠতে পারে না। সে এত মোটা যে তাকে ঠেলেঠুলে না তুললে উঠতেই পারলো না। আর একবার খেলা দেখছি, একটা সুদর্শন ছেলে খেলছে আর পেছন থেকে 'ফাউল' ক'রছে আর একটি ছেলে। ছেলেটি শেষকালে একবার মাত্র তাকে একটি ধমক দিয়েছিল,—Take care for future—দেখলাম ছেলেটির ধমকে কাজ হ'য়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা চলার পথে ন্যায়ের নীতি ধরে চলে তাদের একটা কথাই যথেষ্ট। এরপর আর সে ছেলেটিকে সেখানে খেলতে দেখেনি। এরকম আর একবার হয়েছিল তখন আমরা সব নতুন কলেজে ঢুকেছি। class বদল হবার সময় ছেলেরা হুড়োহুড়ি ক'রে ঢুকছে, একটি ছেলের গায়ে ধাক্কা লাগাতে সে কুৎসিত গালি দেয়। প্রত্যুত্তরে একটি চড় খেয়ে সে তখন শুয়ে প'ড়ল, তার মুখে তখন অন্য কথা—প্রফেসর বসেছিলেন তিনিও কিছু বলেননি। অসতের বিরুদ্ধে রুদ্র নয়নে দাড়াতে পারলে এমনিই হয়।

সেবার একটি পাড়ায় খেলতে গেছি। আমার খেলা দেখে একটি ভদ্রলোক তারিফ করে একটি এই প্রাইজ দেন। কিন্তু সব ছেলেরা সেটা নিয়ে নেয়, তারা বলে—বারে! অন্য পাড়া থেকে এসে আমাদের প্রাইজ নিয়ে যাবে, সে হবে না। আর একবার খেলতে গেছি—যাদের সঙ্গে খেলা তাদের দলে সব বড় বড় ছেলে, আর আমরা সব ছোট ছেলের দল খেলতে গেছি, তারা সবাই আসেনি, মাত্র তিনজন এসেছিল। তারা ঠিক করেছিল যে মারা-মারি করে খেলবে। এই মারামারি করার জন্য আমাদের কয়েকজন বেশ চোট খেয়েছিল। গ্রিয়ার পার্কে খেলতে গিয়ে একবার বেশ চোট খাই, বড়দের একজন কম পড়াতে জুনিয়ার গ্রুপ থেকে আমাকে নেয়, কিন্তু তারা এমন মারতে আরম্ভ করলো যে আমার আর খেলা হ'ল না। দর্শক যাঁরা ছিলেন তাঁরা সব হাঁ হাঁ করে উঠেছেন। আর একটা মজার জিনিস মনে পড়ছে—সেবার কি কারণে দাদা, ন্যাশনাল হোটেল যেটা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ছিল সেখানে আমায় নিয়ে গেছেন। হোটেলে খুব বড় একটা কুকুর ছিল, সে কুকুরটা জিভ বের করে আমার দিকে তাকিয়েছিল কিছু পাবার আশায়। পাঁচ টাকায় তখন যতটা খাবার পাওয়া যেতো একজনের পক্ষে সেটা বেশীই হত। সেইজন্য দাদা আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কখনও হোটেলে যাইনি, সেই প্রথম।

আর একবার হোটেলে খেতে গিয়ে ইস্কুলের সময় খুব ঠকেছিলাম। মল্লিকদের একটি ছেলে ধ'রে বসলো—বললে, চল পরোটা খেতে হবে। ঢুকে

বলে, তোর কাছে কি আছে দে, একসঙ্গে পয়সাটা দি। আমি সরল বিশ্বাসে আমার কাছে যা ছিল তাকে দিলাম, সে তখন তারই ওপর তার খাওয়াটা সেরে নিল।

পুরানো কলকাতার কতকগুলো ভয়াবহ ব্যাপার আজও মনকে নাড়া দেয়। মনে পড়ে ১৯২৬ সালের Riot—আমরা তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ঘরে ঘরে আগুন, এক এক পাড়াতে সব দলবদ্ধ হ'য়ে আগুন লাগানো, মারামারি চলেছে। ঠনঠনে কালীবাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে, লাঠিয়াল পুলিন দাস তখন ছেলেদের নিয়ে তা রক্ষা করেছেন।

কর্তৃপক্ষদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আপনারা থামাতে পারছেন না তো মিলিটারীদের ডাকুন না? তাতে উত্তর পাই, হঠাৎ মিলিটারীদের হাতে ছেড়ে দিলে Civil Government ফেল করল, তাতে দেশের অপমানও বটে আর নিয়মতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনতে সময়ও লাগবে, কাজেই প্রথম চেষ্টা হয় পুলিশের দ্বারা এই রায়ট থামানোর। যাইহোক কয়েকদিন এই তাণ্ডব নৃত্যের পর তখন টেগার্ট সাহেব, পুলিশের কর্তা, তিনি মিলিটারী ডাকেন। আমরা রাত্রে দোতলার বারান্দায় ভয়ে তটস্থ হয়ে শুনছি সেই নারকীয় চীৎকার—আর মাঝে মাঝে কয়েক রাউণ্ড ক'রে মিলিটারী ফায়ার। ফায়ারিং আমাদের মনে তখন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল—কি জানি কার যে সর্বনাশ হবে! রাজাবাজারে পেশোয়ারী গুণ্ডারা বন্দুক নিয়ে তৈরী, আর হিন্দু ছেলেদের কিছু কিছু বোমা তখন সুরু হ'য়েছে, আর বাঙ্গালীর লাঠি। সেদিনের কলকাতার বড় বড় রাস্তা জনশূন্য। আমি সাহস করে তখন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি—দূরে দূরে সব মিলিটারী Picket—১৭।১৮ বছরের সব বিলিতি টমি। লোকজন নেই, দোকানপাট সব বন্ধ। তারি মাঝে দেখি মুসলমানদের সব দুষ্টু ছেলেরা, street urchin যাদের আমরা বলি, তারা পাথর দিয়ে পাড়ার নিরীহ পায়রাগুলোকে মারবার চেষ্টা করছে। আমাদের তখন পরীক্ষা—এম. এ. দেবো—ভয়ে পড়াশুনো তখন একেবারে মাথায় উঠেছে। যাইহোক মিলিটারী কণ্ট্রোল হওয়াতে কয়েকদিনের ভেতর গোলমাল থেমে যায়। টেগার্ট সাহেব বিদ্যুতের মত চতুর্দিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্তি স্থাপন করলেন। মুসলমানদের নেতারা তখন সব হিন্দু Officers-দের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন—কলকাতায় হিন্দু রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে, পুলিশী রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা'রা মন্দির রক্ষা করতে চেষ্টা, যত্ন যা করেছে মসজিদ্ রক্ষা করতে তা করেনি। সেজন্য

তারা এক বিরাট অঙ্কের খেসারত চেয়েছিল। কিন্তু টেগার্টের প্রত্যুৎপন্নতার জন্য সে গোলমাল সহজেই মিটে যায়।

আর একবার মনে আছে সেবার জোড়াবাগানে থাকি। কাঠগোলা কাছেই। রাত্রি দুটো হবে। হঠাৎ খুব হৈ চৈ গোলমাল। ছাদে উঠে দেখি বৈশ্বানর জেগে উঠেছেন, লেলিহান শিখায় পট্‌পট্‌ শব্দ করে পুড়ছে সব। একাধারে ভয় ও বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। সেবার দুর্গাপূজাতেও হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ—এ সংঘর্ষের পিছনে ছিল ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ। মসজিদের সামনে 'দুর্গামাঈকী জয়' বলে যাওয়া চলবে না। আর এরাও ছাড়বে না। শেষে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। যারা প্রতিমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা প্রতিমা রেখে পালিয়ে গেলো। তখন এক মুস্কিল—প্রতিমার কি করা যায়। শেষে পুলিশের লোকেরাই রাতারাতি সে মূর্তি বিসর্জন দিয়েছে।

আর একবারের দুর্গাপূজা মনে আছে। কালীঘাটে আমার বড দাদা পূজামণ্ডপের কাছে গাড়ী করে যাবে কিন্তু পুলিশের নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে, কালীঘাটে মণ্ডপেব কাছে খুব ভীড় হয় বলে কেউ গাড়ী নিয়ে যেতে পাবে না—দাদা জোর ক'রে গাড়ী নিয়ে যেতে গেলে পুলিশে ধরেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে নালিশ জানাতে গেলে, পিতার কাছে দাদাকে শুনতে হয় যে, এ আইন তো আমিই করেছি, তোমাকে এ আইন অবশ্যই মানতে হবে। কালীঘাটে অষ্টমীতে পিতা নিজেই মার পূজায় যোগ দিতেন—পাটের জোড় পরে, রক্ত চন্দনের টিপ লাগিয়ে।

চোরের উপদ্রব চিরদিনই আছে, কিন্তু টেগার্ট সাহেবের সময় কোথায় চোরের উপদ্রব বেশী হচ্ছে তার একটা সালতামামি তিনি রাখতেন। এইটি দেখে তিনি চোরের উপদ্রব কমাবার চেষ্টা করতেন। একদিন আমি পড়াশুনা করছি—একজন কনস্টেবল এসে আমাকে বলছে,—মেজাভাই, টেগার্ট সাহেব আমার উপর বিগড়েছে, কারণ আমি চোর ধরতে পারছি না। যাইহোক আমার কাছে জানালে আমি তখন বললুম, তুমি কি করে চোর ধরতে যাও—উত্তর এল—কাহে, খড়ঁাও পড়কে। কনস্টেবলটি সাধু প্রকৃতির। আমি বললাম, খড়ঁাও পরে কি চোর ধরা যায়, আওয়াজে তো চোর পালাবে? তখন থেকে সে খড়ম ছেড়ে খালি পায়ে চোর ধরতে সুরু করে। বলাবাহুল্য চোরের উপদ্রব সেবার কমেছিল।

১৯২৪ সালের কথা হবে, হেদোতে আমরা কলেজের ছেলেরা জটলা করি, পড়ার চর্চাও হয়। সেবার মনে আছে, একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়তো,

দেখা হলেই বলতো, কাল থেকে পড়া আরম্ভ করবো। চা কিনেছি, স্টোভ কিনেছি, কাল থেকে রাত জেগে পড়া স্থরু করবো। এরকম ছেলেও ছিল আবার পতঞ্জলী ভট্টাচার্যের মতন ছেলে, তুটি কান বন্ধ করে জোরে জোরে পড়তো তাও দেখেছি। তিনি পরবর্তীকালে Finance Officer হয়েছিলেন। যাইহোক এই হেদোয় বেড়াতে বেড়াতে আমরা একদিন সত্যেন দত্তর দেখা পাই। কি রকম আধাভোলা ভাব, বেড়াতেন একটা কালো চশমা চোখে—দেখে বোঝাই যেতো না যে তিনিই এত বড় ছন্দের কবি—সত্যেন দত্ত। কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি, আপন মনে চুপচাপ বেড়াতেন।

আরেক বারের কথা, আমার তখন মাথায় একটা টিকি ছিল। ক্লাসের সঙ্গীদের এইটির উপর ভীষণ নজর পড়লো। একদিন ক্লাসের প্রফেসর পড়াচ্ছেন, টিকিতে পড়লো টান, প্রফেসর দেখেও কিন্তু দেখলেন না।—ক্লাসের শেষে বাইরে এসে ছেলেটিকে ধরেছি সে তখন আম্‌তা আম্‌তা করছে। আমি তাকে বললুম,—তুমি মনে করেছো আমি কোন জঙ্গল থেকে এসেছি—কিন্তু তা নয় আমি এই কলকাতারই ছেলে। টিকি টানাটানি করার চেয়ে হাতা-হাতি করাই ভাল।

আর একবার আমার এই টিকিটি কাটার জন্য একটি ছেলে নতুন কাঁচি নিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে বসে আছে। বিকেলে গেছি তার সঙ্গে দেখা করতে, সে বললে,—তোমার টিকিটি কেটে আমি Souvenir করে রাখবো। আমি জোর গলায় বললুম—বেশ তো, পারতো কাটো!—যাই হোক সে যাত্রায় টিকি কাটা আর হয়নি।

কলেজের আর একটি ঘটনা বেশ মনে আছে। হঠাৎ একটি ছেলে জুতো সমেত এক লাথি মারে। আমিও বলি—ত্যাখো ব্রাহ্মণকে লাথি মারার ফল আছে। সে বলে,—যা—যা—অনেক ব্রাহ্মণ দেখেছি। তারপর দিন গেছি, সে পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে। আমি তাকে বললুম—একি হ'ল? সে উত্তরে বললে,—ভাই, হকি খেলতে গিয়ে স্টিকে লেগেছে। তবে! আর ব্রাহ্মণকে লাথি মারবে? সে বললে—তা মারবো তো কি হয়েছে। আচ্ছা বেশ দেখ আবার লাথি মেরে—এবার গ্যাংরিন হবে।—সে ভয় পেয়ে বলে,—না—দাদা—না—আর কাজ নেই।

কাশীপুরের কথা আগে কিছু বলেছি, তখন খুব মোটা মোটা শেয়াল দিনেও বেড়াতো। বি. টি. রোড তখন দিন তুপুরেও ঝিঁঝিঁ করতো। আজকের সঙ্গে তুলনা করলে সেদিনের বি. টি. রোড চেনাই যাবে না। দিনে দিনে

কাশীপুর বরানগর হর্ম্যনগরী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনে পড়ে আজকে যখন কেনা জামরুল খাই, মিষ্টিও লাগে কিন্তু সেই ছোটবেলায় কাশীপুরে থাকতে পাঁচিলে চেপে গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া জামরুল বোধহয় জীবনে আর পাওয়া যাবে না; অবশ্য এর পরেও গাছ থেকে পাড়া জামরুল খেয়েছি। বড় হয়ে তৃষিত হয়ে দেখতুম কাকগুলো এক একটা ঠোক্কর দিয়ে জামরুল ফেলে দিচ্ছে তখন সত্যিই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠতো। কলকাতার ভিতরে যখন থেকেছি তখন আম পাড়ার কথা মনে নেই, তবে আমড়া পেড়েছি অনেক—ইঁট দিয়ে, আর বয়স্যদের সঙ্গে সেই আমড়া খাওয়া ভুলবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের,—সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম—কলকাতায় ছিলনা, তবে একবার বীরভূমের জাম্বুড়ী গ্রাম থেকে ফিরছি একটা ছই লাগানো গরুর গাড়ী করে, মাঝ রাস্তায় ঝড়ে পড়ে যাই—চারিদিক তোলপাড় করে ঝড় এসেছে—এরকম দেখা অভ্যাস ছিল না, দেখলাম গাড়ীগুলো চালকরা গুছিয়ে রাখলে আর গরুগুলোকে খুলে দেওয়া হল—আর গ্রামের সব ছেলেদের সে কি আম কুড়োবার ধুম! আর একবার ঝড়ে পড়ি,—ময়ূরাক্ষী ও কানা নদীর মাঝখানে যে চর, সেখানে আমাদের মাটির আশ্রমে—গভীর রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়—গভীর সেই রাত্রে আম কুড়োবার ধুমের চেয়েও আমাদের ছেলেদের নামের ধুম লেগেছিল বেশী! 'ঝড়ের মাতন লাগলো গাছের আগাতে,—মন থাকে না ঘরে থাকাতে।'

এই গানটি লেখা হল। সেই নির্জন জায়গায় ঝড়ের মাতনে কেউই ভয় তো পায়নি বরং সাঁওতালদের মাদল নিয়ে তারা নৃত্যে বেশ মজা করেছিল। সে সব দিন আর ফেরার কথা নয়। এই আম কুড়াবার সঙ্গে মনে রয়ে গেছে চোড়লের কিছু ঘটনা। চোড়লে কাকাদের বাড়ী,—এঁরা বিখ্যাত গোস্বামী বংশের। সেবার এক বিয়ে উপলক্ষে গেছি তখন নীচু ক্লাসে পড়ি, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকতো না, যে সব 'আলে' বিষধর সব সাপ থাকতো, লোক যাতায়াত করতো না, সেই আল দিয়ে ছুটোছুটি করেছি। হঠাৎ বিষধর সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, আমিও ছাড়বার পাত্র নই—লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেছি তার মাথার উপর দিয়ে। এখানে আম পাড়বার ধুম লাগতো। চোড়লের বৈষ্ণববাড়ীর ছেলে, গুরুবাড়ী—কেউ কিছু বলতো না। এই বৈশাখে ঝড় ওঠার সঙ্গে সেই সব ছেলেবেলার দিনের কথা খুব মনে পড়ে যায়।

এই সঙ্গে একটা করুণ ঘটনা মনে পড়ে, নূতন জামাইকে নিয়ে সবাই বেড়িয়েছি, সকলে ধরে বসলো অজয়ের পুল থেকে লাফাতে হবে। দুঃখের

বিষয় জামাইটির পেট জোড়া পিলে, সে কেবলই বলে,—আমার পিলে উলটিয়ে যাবে। অন্যান্য ছেলেরাও ছাড়বে না। আমাকেও ধরেছে অজয়ের সেই উঁচু পুল থেকে লাফাতে হবে। দুষ্টুমিতে আমিও পিছ পা নই, ওই উঁচু থেকে লাফ দিলাম—আর সকলে মিলে জামাইকে ঠেলে ফেলে দিল পুলের নীচে। ব্যাস—সে একেবারে ব্যাঙের মত হাত পা ছড়িয়ে পড়ল আর ওঠে না—সকলেরই ভয়, কি হবে—যদি জ্ঞান না ফেরে? সকলে মিলে তাকে তুলে মুখে জলটল দিতে কোন রকমে জ্ঞান হল। এরপর কলকাতার ছেলে আর গ্রামের ছেলেদের একটা লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় লড়াইয়ের আগে মুখে অনেক প্যাচ কষাকষির পর গ্রামের ছেলেদের হারই হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য। আর একবার ঠিক করা হল, ট্রেন যায় ওপর দিয়ে আর লাইনের নীচে পুলের উপর যে ফাঁক থাকে সেখানে শুয়ে ট্রেন চলা দেখতে হবে। সেখানে শুয়ে থেকেছি মাথার উপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল। ভয়ও লাগছে আর ভালও লাগছে। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখছি, মাথার উপর দিয়ে চাকাগুলো ঘট্ ঘট্ শব্দ করে পেরিয়ে যাচ্ছে। আর এর সঙ্গে রাধাগোবিন্দের প্রসাদী লুচি ও চিনির স্বাদ এমন করে জড়িয়ে আছে যা ভুলবার নয়। একবার দাদার সঙ্গে অজয় পার হচ্ছি একটা জায়গায় ডুব জলে পড়ে গেছি, কোন রকমে লাফিয়ে লাফিয়ে সেবার বাঁচিয়েছিলাম নিজেকে। একহাতে তখন আবার একটা সত্যিকারের বন্দুক, সেটা ছিল দাদার হাতের হাতিয়ার। অজয়ের বালিতে বাঘের মত পায়ের চিহ্ন আমরা এঁকে রেখে যেতাম। গোসাইবাড়ীর ছেলেরা দেখতাম, আগুন নেভানো জলের বালতি থাকতো পুলের ওপর তাতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বোলতো,—এই চানজল (চরণামৃত) রেখে যাচ্ছি। রাত্রে অবশ্য বেরোবার জো ছিল না, স্নিগ্ধ আলোয় বসে বসে সাধারণ একটা ফাউণ্টেন পেনকে কি করে Waterman করা যায় তারই চেষ্টা চলতো আর ধারে পাশে ছোট ছেলেমেয়েরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতো, দেখতো কলকাতার ছেলের কীর্তি। তখন নিজেকে বেশ একজন বিচক্ষণ বলেই মনে হত।

সন্ধ্যাছাওয়া অজয়ের বুকে উদাস চোখে চাইতে আজও মনটা কেমন করে। সে সব দিন ছিল স্বপ্নাতুর···

··· ··· ··· ··· ·

জীবনে পথের দিশা কোন দিনই হারাইনি, তবে পথ আমাকে ভুলিয়েছে কয়েকবার। ছোটবেলা, পথ ভুলে অন্য লোকের বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। ঢুকে

পড়ে হতচকিত হয়ে গেছি মাকে না দেখতে পেয়ে। বড় হয়ে সেবার শ্যামবাজারে পথ হারিয়েছি। শ্যামবাজার যদিও গড়ে উঠতে দেখেছি তবুও সেদিন পথ হারিয়ে চলে গেছি। অবশ্য আরও ছোটবেলায় বীরভূমে ঠাকুমার সঙ্গে গিয়ে পথ হারিয়ে গিয়েছিলুম আমি। মুচিরাম গুড়ের কথা বঙ্কিম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আমার জীবনেও এক মুচিরাম জুটে গিয়েছিল। এর মিষ্টি করে বলা ঘুটু বাবু—আমার আজও মনে আছে। সেবার বছর তখন বয়স ছয় কি সাত হবে, সবারই সঙ্গে একটা ছই লাগানো গরুর গাড়ীতে করে গেছি বক্রেশ্বর তীর্থে। শিবরাত্রির মেলায় বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়েছে। অনেক গরুর গাড়ী পাশাপাশি রয়েছে, অনেকে গরুর গাড়ীর নীচে খাওয়া দাওয়া সারছে, এক একটা গরুর গাড়ীর তলায় একটা একটা ঘর বসে গিয়েছে। মুচিরাম আমাকে কি একটা কথা বলে দিয়েছে রাগিয়ে, আমি তো হাতে একটা বেত নিয়ে তাকে তাড়া করেছি, সেতো গাড়ীর এপাশ ওপাশ করে গা ঢাকা দিলে আর আমি গেলুম হারিয়ে। কি আর করি—আমার চিরন্তন প্রথা আজও সেটা আছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছি হতাশ হয়ে। গাড়ী চিনতে পারছি না কোন্‌টা আমাদের। গরুর গাড়ীর কোন ছাপ নেই, নম্বরও নেই—আর নীচে সব একরকমের ব্যবস্থা; কাজেই আমি চিনতে পারছি না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি বুড়ি ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে আসছেন। আমি তো অকুলে কুল পেলাম। আর একবার আমার বলা আছে এলিফেনস্টোন পিকচার্স হল থেকে ফিরবার পথে পথ হারিয়ে একরকম হতাশ হয়ে চলেছিলুম। আর একবার এক বন্ধু নিয়ে যায় মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাছে। মহারাজের সঙ্গে দেখা করার পর বন্ধুটি তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়, এদিকে আমি পথ চিনিনা। হতাশ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে চলতে এসে শ্যামবাজারে ট্রাম ধরি। তখন বাস এতো হয়নি। আর একবার এটা কিন্তু বীরভূমেতে, দ্বাদশীর দিন ভাণ্ডিরবনে গিয়েছি গোপাল দর্শনে—দেখে যেন মায়ের মূর্তি মনে হয়েছিল সেবার। ফিরবার পথে পথ হারিয়ে অন্য দিকে চলে যাই। জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে আসি বাড়ীতে। আর একবার জান্থড়ীতে গ্রামটা দেখতে বেরিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেললুম, একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে ফিরে আসি চাষবাড়ীতে; সেবার চাষবাড়ী দেখতে গিয়েছিলুম। খড়ের গাদায় শুয়ে কি সুখ তাও সেবার বুঝেছিলুম। সেবার যুদ্ধের সময় গ্রামের লোকেদের যুদ্ধের কথা শোনার কত যে

ঔৎসুক্য দেখেছি। কিন্তু ডি. এল. রায়ের—'এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ দিয়ে যায়, এসব গান তাদের কাছে বলতে গিয়ে, 'উলোর বনে মুক্তো ছড়ান হয়েছে।'

আরও একবার বীরভূমে কুলেরাতে সখ করে ভিক্ষে করতে গিয়ে পথ হারিয়ে এক ডোবাতে পড়ে যাই। সেবার,—'দীঘির সেই শীতল কালো, তারি মাঝে মরণ ভালো,'—হয়নি ; সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আমায় টেনে তুললেন। বলাবাহুল্য উদভ্রান্তের মতই চলেছিলুম। পথের যিনি দিশারী, তিনিই পথ দেখিয়েছেন বার বার।

খড়দহর স্মৃতিটি আজও বড় করে মনে আছে। ছোট্ট একটা জায়গায় রাত্রে শুয়ে থাকা, সান্ত্বনার মধ্যে একটা রঙচঙে বাক্স কেনা হয়েছিল। রাত্রে ওরকম ছোট জায়গায় ঘুম আর আসতে চায় না। এই খড়দহে সেবার বড় হয়ে অনেকের সঙ্গে আশ্রমের গাড়ীতে করে বেড়িয়েছি—পথ চিনি না, সকলকে জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে শ্যামচাঁদের দর্শন পাই আর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পান্নার শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে ধন্য হই। এটি নাকি তিনি তাঁর জটার মধ্যে নিয়ে বেড়াতেন। সেদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মূর্তি, শ্যামসুন্দরের মূর্তি, ফুলের সুবাসের মত আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যিনি পথ ভুলান তিনিই আবার পথ দেখান।

দুদিন আগে বাসুকী দোলা দিয়ে গেছে কলকাতায়, ক্ষণিকের সে দোলা। মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা একেবারে শিশু মন নিয়ে তখন খেলছি একটা ঘরে গেলাসের উপর গেলাস চাপিয়ে। হঠাৎ গেলাসগুলো ছিটকে পড়ে একাকার হয়ে গেলো, ভয় পেয়ে গেছি—টিনের জায়গাগুলো সব ঠকঠক করে কাঁপছে, এটা খুবই শৈশবের কথা। আরেকটা মনে আছে, বীরভূমে তখন থাকি। হঠাৎ পিতা জাগিয়ে তুলে দেন। ভয়ে বিপর্যয়ে ছুটে নেমে আসি দোতলা থেকে! আর একবার, সেবার ধ্যান করছি কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না, কিসে যেন মনটা বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। ঠাকুর ঘর থেকে বাইরের ছাদে এসে বসেছি, ধ্যান হচ্ছে না বলে নিজেকে নির্যাতনও করেছি। কিছুক্ষণ বসে আছি হঠাৎ জোরে দোলা দিয়ে উঠলো সব। ঠাকুর ঘর ছিল উপরে। ঠাকুরদের নামিয়ে নিয়ে আসতে গিয়ে সিঁড়িতে একবার এদিক একবার ওদিক হচ্ছে পা, যাই হোক কোন রকমে তুলসীতলায় এসে ঠাকুরদের ধরে নিয়ে বসে থাকি, দেখি সামনে নারকেল গাছগুলো উন্মত্তের মতো দুলছে। কাছেই একটা জলের জায়গা রাখা ছিল, সেইটিই আমাদের 'সিস্‌মোগ্রাফ'—কলকাতায় বাসুকীর দোলা এগুলিই মনে বেশ রেখাপাত করেছিল।

হোম পূজার সঙ্গে মেঘ বাদলের কিছু সম্পর্ক আছে—গীতার একথা খুবই সত্যি। সেবার 'ভ্রমরকোল' বলে বীরভূমের একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যায়। সেখানে বহুবৎসর বৃষ্টি হয়নি হোম তো করা হল, হোমের ফলও হল খুব বৃষ্টি যে যেদিকে পারলো ঢুকে পড়লো,—কয়েকটা ছেলেমেয়ে হাবুডুবু কাতলা মাছের মত। কোন রকমে তাদের তোলা হল। হোমের আহুতির শেষে অন্ততঃ দুচার ফোঁটাও বৃষ্টি হয়েছে—জ্যৈষ্ঠ মাসে সার্বজনীন হোমে এটা আমরা বারবার দেখেছি।

খেলার মাঠে সোঁদা সোঁদা গন্ধ—মনটা আজও কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। খুব ছোটবেলায় সুকিয়া স্ট্রীটের খেলার মাঠের কথা মনে পড়ে। ঘরের লাগাও খেলার মাঠ কিন্তু প্রথম থেকেই ঘটলো বিপদ। মাঠটা অন্য ছেলেদের দখলে, তারা দিতে চায় না খেলতে। গোলমাল, ঝগড়া, ইটপাটকেল, কাঁচের বোতল ভেঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া—সবই হয়েছিল। খেলতে ভালোই লাগতো, খেলার পর মাঠে বসে গল্প আর তার সঙ্গে কিছু চিনেবাদাম বা কাবলী মটর এসব আনুষঙ্গিক—পড়ার কথাও ভুলিয়ে দিত। ছেলেদের নানারকম ডিটেকটিভের গল্প বলা হত। আমার এটা একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। পড়ার টেবিলে ফিরতে দেরী হয়ে যেতো সেজন্য গুরুজনদের কাছে সময় সময় বকুনি খেতেই হত। খেলার সময় যে পড়ার ক্ষতি হয় সেটা বরাবরই দেখেছি, খেলার পর যে একটা ক্লান্তি আসে আর পড়ার ঘরে তার প্রকাশ সহজেই ঘটে। শ্যামপার্কে খেলতে গেছি সেবার, ক্রিকেট খেলায় আমাকে সহজে কেউ out করতো না। তখন অন্য উপায় সব নিয়েছে। কানে গেলো আশেপাশের ছেলেরা বলাবলি করছে যে—এবার মার খাবে। খানিক পরেই উইকেটে বল না দিয়ে হাতে আমার বল দিয়ে আঘাত করে। ভয়ে ভয়ে ইচ্ছে করেই out হয়ে যাই। শ্যামপার্কটায় যখন খেলেছি আমরা তখন জায়গাটা এত বাড়ী ঘর ভর্তি ছিল না। আজকের শ্যামপার্ক দেখলে চিনতে পারা যায় না। Badminton খেলায় আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বড় বড় ছেলেরা আমার সঙ্গে পারতো না। ডানডাস হোস্টেলের ছেলেরা এসেছে খেলতে, আমি এমন একটা placing করেছি যে একজন চিৎপাত হয়ে পড়ে গেছে। তবে সাহেবদের ছেলেদের ক্রিকেট খেলার কাছে আমরা হার মেনেছি আর স্টাইলটা আজও মনে আছে, লম্বা লম্বা চুল, বল দেবার সময় সেগুলো উড়ছে—একটা ছাপ রেখে গেছে তারা মনে আজও। গিয়ারপার্কে আমরা খেলে এসেছি। মারধোরও খেয়েছি।

কলকাতার রাস্তাগুলো তখন সব নতুন নাম নেয় নি। যেমন—হ্যারিসন রোড—মহাত্মা গান্ধী রোড, মানিকতলা—বিবেকানন্দ রোড, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট—বিধান সরণী, চৌরঙ্গীর খানিকটা জহরলাল নেহেরু স্ট্রীট—অভেদানন্দ সরণী—বিডন্ স্ট্রীট এসব রাস্তা দিয়ে ভিজে ভিজে সাইকেল চালিয়ে মনের আনন্দে গেছি। হয়তো মনে মনে গুঞ্জন উঠেছে—ই ভরা বাদর মাহ বাদর শূন্য পকেট মোর—। ঝোড়ো কাকের মত বাসায় ফিরেছি সন্ধ্যায়।

তখন মধ্য কলকাতায় থাকি, এখনকার মতন ঝাঁক ঝাঁক গাড়ী তখন ছিল না। আমাদের একটা খেলা ছিল বাড়ীর বারান্দা থেকে গাড়ীর নম্বর দেখা—এখনকার দিন হলে হয়তো সম্ভব হতো না। মধ্য কলকাতার সেই ঘরটা একটু পুরানো আমলের ঘর—সাপটাপও বেরোতো। মায়ের খুব সাহস ছিল। মা একাই একটা বিষধর সাপকে লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। যুদ্ধের সময়, রায়টের সময় দেখেছি মাকে, বঁটি নিয়ে শুয়ে থাকতেন। মায়ের সাহসের আর একটা নিদর্শন আমরা পেয়েছি, গ্রামের মেয়ে এঁরা, চলে আসছেন আর সেই পথ দিয়ে বাঘ চলে গেছে—কিন্তু মা খুব ভয় পাননি। বর্ণনা দিয়েছেন, বাঘটা চলছে আর যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে—ম্যাকমোক—ম্যাকমোক।

জোড়াবাগানের কথা আমার বেশ মনে আছে। যেখানে পড়তুম সেখানে বেশ বড় বড় খাঁচায় পাখী থাকতো। একটা কুকুর ছিল। পাখীগুলোকে খাওয়াবার লোকও ছিল। কিন্তু পাখীগুলো বাঁচেনাতো বেশীদিন। একদিন দরজা জানালা খোলা ছিল, পাখীগুলোর ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছিল, বেশ কয়েকটি মরে গেলো! জোড়াবাগানের বাড়ীতে একটা জাপানী পুতুল ছিল। দেখতে ভারী স্থন্দর। একদিন সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেলো, আমি তাকে জলটল দিয়ে বাঁচাই, এরপর থেকে কুকুরটার আমার প্রতি একটা প্রীতি এসে গিয়েছিল, এমন কি মরবার সময় আমার পায়ের তলায় এসে মরছিলো। আর একটা কুকুর ছিল, 'বুসী' তার নাম—ছবির মত দেখতে। রাস্তায় বেরুলে গঙ্গাস্নান করতে যাবার সময় লোকে ওকেই দেখতো।

এর আগের কথা, কলকাতায় তখন যাত্রার এতো চল হয়নি। মথুরসার যাত্রার দল—থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি—বাড়ীতে এসে যাত্রা করে গেছে অনেকবার বিয়ে-পৈতেতে বিনা পারিশ্রমিকে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন যাত্রা দলের জগাই মাধাইএর পার্ট কি জানি আমাদের খুব রঙ্গেরই মনে হত।

দাদার সাইকেল কেনার রহস্য আজও মনে আছে। পিতা খুব রাশভারী ছিলেন। তাঁকে বলে কিছু করা যায় না। একটা ছোট্ট চকচকে সাইকেল

কিনে আনা হল, আর সেটিকে লেপচাপা দিয়ে ওপরে ঘুম পাড়ানো হল। ছুটির দিনে ছাতে গিয়ে সেটিকে নিয়ে সাইকেল চাপার মহড়া দেওয়া হত। দাদা চাপতো আর আমাকে ধরতে হত। যেদিন দাদা পড়ে যেতো সেদিন আমার কপালে প্রহারও জুটতো। দিনের বেলা সাইকেলটি লেপচাপানোই থাকতো—তারপর যেদিন ধরা পড়লাম সেদিনের কথা না বলাই ভালো। এই সাইকেলে আমিও চড়তে শিখি, কলকাতার রাস্তায় চলতে গিয়ে লোকচাপাও দিয়েছি। এই স্মরণীয় সাইকেলের স্বপ্ন আজও দেখি। সাইকেলচড়া অব্দি আমার গতি ছিল—মটর চালানো শিখতে কোনদিন যাইনি। মটর চালাতে গিয়ে আমার ভাইদের যে দুর্দশা ঘটেছে—যদিও সেদিনের রাস্তা আর আজকের রাস্তার তুলনা করাই চলে না। সাইকেলে চাপা দেওয়া, আর চাপা পড়া এ দুইই উপভোগের জিনিস। লোকের দুই পায়ের ফাঁকে চালিয়ে দিয়েছি সাইকেল, তখন প্রথম প্রথম সাইকেল চড়তে শিখেছি। সে তো পিতার কাছে নালিশ জানায়, তারপর যেটা ঘটে সেটা অনুমান করাই ভালো। তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে ছুটে যাচ্ছি, সঙ্গে সেজ ভাই, ছোট ভাই ছিল। একটা ওয়েলার জুড়ী গাড়ী যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ি। সহিস তো তাড়াতাড়ি ঘোড়াটিকে টেনে নিলে; ঘোড়াটা সামনের পা তুলে দাঁড়ায়, কোনরকমে উঠে আসি—এবার নিজের সাইকেলে নিজেই জখম হই। চিৎপুর রোড দিয়ে আসছি, রাত্রিবেলা,—গুরুদেবের কাছ থেকে ফিরছি। একটা মোটর গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে কি ভাবে যে বেঁচে গেছি, সেটা আজও বুঝতে পারি না—হঠাৎ কে যেন হাতটা ধরে হ্যাণ্ডেলটা বেঁকিয়ে দিলে। আর একবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে আসছি, বিরাট জনপদ, কলেজ থেকে ফিরছি, দুপুর বেলা। হঠাৎ একটা ভুনাওয়ালার মেয়ে এসে আমাকেই ধাক্কা দিল। আমার একটা স্বভাব ছিল একটু আনমনে রাস্তা চলা। সেবারেও আমাকে থানাতে ধ্বস্তাধ্বস্তি সহ্য করতে হয়। আর একবার মেছোবাজারে একটা মুসলমানের ছেলেকে চাপা দিয়ে সেবার পালিয়ে গিয়ে নিজেকে কোন রকমে বাঁচাই, তা না হলে তারা সবাই দলবেঁধে আমাকে মেরেই শেষ করে দিত। একথা তারাই বলেছে। এই সঙ্গে মনে পড়ছে গ্রামের রাস্তায় সাইকেল চালানো আর কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চালানো একই নয়। আমি গ্রামে keep to the left করতে গিয়েছি। গ্রামের পথ সুবিধে নয়। কাজেই keep to the left করতে গিয়ে খুব আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। গ্রামের রাস্তায় সাইকেল চালাতে গেলে মাঝখান দিয়ে চালাতে হয়।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Old wine is better than new. পুরানো দিনের কথায় একটা লুকানো মাধুর্য আছে সেটা ভোলা যায় না। এমনি বর্ষার দিনে তখনও কলকাতার রাস্তায় জল জমতো, আর ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সেই জল ভেঙ্গে ঘরে ফিরে আসা আজও মনে আছে। কিন্তু তখন ইংরেজ আমলে একটা শৃঙ্খলা ছিল কাজের। Man-hole খুলে দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকতো পাছে কেউ পড়ে যায়। "গগনে বাদল নয়নে বাদল—বাদলে ভুবন ছাইয়া"—তখনও ছিল, তবে আমরা ছোট ছেলের দল চাতকিনীর মত তাকিয়ে থাকতে পারতুম না; কতক্ষণে বাড়ী ফিরবো তার চেষ্টা থাকতো। আর বাদলের দিনে বাড়ীতে খিচুড়ী খাওয়ার একটা মহোৎসব লেগে যেতো। অবশ্য খেলার মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খেলা দেখা অথবা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ফুটবল খেলা, এর একটা মদিরতা ছিল। সময় সময় কাদায় পড়ে গেছি, কেটে গেছে তবুও আমাদের এতে প্রচুর আনন্দ ছিল। আর এর সঙ্গে একটা কবিকল্পনাও থাকতো যে, এইরকম বৃষ্টির মত যদি একমাঠ "Force*** ব্যাট" বৃষ্টি হত অথবা বল বৃষ্টি হত—তাহলে কি মজাটাই না হত। অবশ্য কল্পনা কল্পনাই থেকে যায়। আষাঢ়ের মেঘে ব্যাট বৃষ্টি কোন দিনই হয়নি।

ঝির ঝির ক'রে জল ঝরছে এডোয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে তখন পড়ি, নিচু ক্লাসে পড়ি—কখন বাড়ী থেকে নিতে আসবে সে ভাবনাও ভাবছি, এখানে অবশ্য চাতকিনীর মত মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা উল্টো রকমের হত। বর্ষার এমনি একটা রাতের কথা মনে আছে। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, বাড়ীতে ছোট ভাই না বলে অজানার দিকে চলে গেছে। ঘরটা একটু পুরানো, বৃষ্টিটা কয়দিন ধরে চলছে, ফোঁটা ফোঁটা করে জল ছাদ চুঁইয়ে ভেতরেও পড়ছে। যত পড়ে আমিও তত আমার মাদুরটি সরিয়ে সরিয়ে নি। মনটা মেঘে ছেয়ে গেছে, তবে বৈরাগী মন সেদিনেও মনে হয়েছিল, পড়ুক যত বৃষ্টি পারে—আমাকেও হয়তো এমনি বৃষ্টিতে ঘর ছাড়া হয়ে বেরুতে হবে। কে জানে কল্পনাও সময় সময় সত্যি হয়। জোড়াবাগানের বর্ষণ মুখর সে রাত্রির কথা আজও মনে আছে। সাধু হয়ে বেরিয়েও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে যদিও হয়নি তবু কল্পনাকে কোনদিন বন্ধ করতে পারি নি। মনে হয়েছে,—"নিরাশ্রয় মাম্ জগদীশ রক্ষঃ" —বলতে হবে।

বর্ষাতে স্কুলে বা কলেজে টেবিল চাপড়ে গান গাওয়া, এটা যেন বহুদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত। আমরা বিবেক স্বামীর এমনি টেবিল চাপড়ে গানের কথা

পড়েছি ; সাহেব প্রফেসর ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে সেই কমকণ্ঠের গান শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আমরাও টেবিল চাপড়ে গান করেছি,—যদি ছেলেরা ঠাট্টা করেছে তো বলেছি,—ভাবস্থ ঢেউ, না মানে কেউ। হাসির রোল উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"—এসব কথা তখন ভাববার অবসর ছিল না। তখন খেলার মাঠে এসে কাদায় জলে ছুটোছুটি করার কথাই বড় ছিল। এই ফুটবল খেলায় নিজেদের ভেতর একটা যেন হুটোপাটি, মারামারি লাগতো, তেমনি আবার বল যখন বস্তির বাড়ীতে গিয়ে পড়তো আর ছাদের খোলা সব ভেঙ্গে যেতো তখন এক অকথার বিপত্তি হয়ে উঠতো। বাগবাজারে তখন থাকি, খেলতে গিয়ে ডোমপাড়ার বস্তিতে বাড়ীর চালে বল পড়ে, খোলার চাল ভেঙ্গে গেছে তারা গালাগালি দিতে সুরু করেছে, বল দেবে না—সব মিলে একটা রোমান্স সৃষ্টি হত, সেটি আর আজকে বোঝাতে পারবো না। আর বল না পেলে সরকারী ইট বৃষ্টি করতে আমরাও ছাড়তুম না। সুকিয়া স্ট্রীটে, এখন সেটি পুলিশের কোয়ার্টার্স হয়ে গেছে—তখন সেটা আমাদের খেলার মাঠ ছিল, সেখানে খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি কতবার, তবু খেলা চাই, তার সঙ্গে বল ছিঁড়ে গেছে, সে বল সেলাই করা সেও হোতো। কত চিন্তা, কত চেষ্টা তখন ছিল,—Our sweets songs are those that tell of saddest thought.

আরও বেশী বিপত্তি ছিল ছোট ভাইএর হাতের সোনার ইষ্ট কবচ হারিয়ে গেছে, বাড়ীতেও বকুনি খাওয়া গেছে, আর মনটাও সাময়িকভাবে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। এসব খুলে পড়ার সময়ের কথা।

কলেজে পড়ার সময় তখন খেলাধূলায় আর তত মন দিইনি। ফার্স্ট ক্লাসে উঠে থেকেই আমি পড়ায় মন দিয়েছি। তখন বর্ষার মেঘাডম্বর গঙ্গার ধারে বসে দেখতুম। কয়েকজনে বিচুলিঘাটে বসে থাকতুম—নৌকো দোল খেয়ে যেতো,—আমার তখন মনে হত বড় বড় সব কথা,—প্রজ্ঞার কথা। ফুটবল খেলার কথা তখন বহুদূরে ফেলে এসেছি। জীবনের চলার পথ নবছন্দ জাগিয়ে যায় বলেই জীবনটা এত মধুর।

বর্ষার দিনে আর একটা আনন্দ ছিল শিলাবৃষ্টির শিল কুড়িয়ে খাওয়া। মনে ভয় ডর নেই—কতক্ষণে শিল তুলে এনে খাওয়া হবে—ছুটিতে আমাদের এটা একটা মজার জিনিসই ছিল। এদিকে শিলাবৃষ্টিতে হয়তো জানালার কাঁচটাঁচ ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই, ভাঙা কাঁচের ওপরেও শিলা পড়ছে তাই কুড়ুচ্ছি—কে কতগুলো কুড়তে পারে সেই হল তখন পরম চেষ্টা।

বর্ষার মাঠে খেলার কথা বলতে গিয়ে আজকে দু'একজনার কথা মনে পড়ছে। সে ছিল আমাদের ক্রাউন ক্লাবের 'এ' টিমের ক্যাপটেন। আমরা তখন 'বি' টিমে খেলি। এদিকে তার একটা ব্যবসা ছিল একটা লটকনের দোকান। চলে যায় সংসার—আর এদিকে খেলাধূলাও করে। দোকানের উপর যাদের রাগ হত তারা বোলতার পাখা ধরে ছুঁড়ে দিত দোকানে। হঠাৎ তার কি হল Clenched hand নামে ডিটেকটিভ বায়স্কোপ দেখে—তার মতিগতি গেল বিগড়ে। সে একটা ছেলেকে হাত কোরে তাদের বাড়ী থেকে গয়নাটয়না সব চুরির ব্যবস্থা করে একেবারে মেসোপোটেমিয়ায় চাকরী নিয়ে চলে গেল। মিলিটারীর চাকরী—পুলিশদের আর করণীয় কিছু রইল না, তাকে ধরতেও পারলো না—অনেক দিন পর সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন সে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। চা খেয়েছে, দাম চাইলে পরে বুটের লাথি দিয়ে তার দোকান ভেঙে চুর করে দিয়েছে, সেই সব গর্বের সঙ্গে গল্প করে বোলতো। কিন্তু অলক্ষ্যে আর একজন বুঝি হেসেছিলেন। কিছুদিন বাদে তার হল টি. বি.। আর তাতেই সে মারা গেলো। এমনি করে প্রকৃতির প্রতিশোধ আমরা দেখেছি।

খেলাধূলার মাঠে আবার খুব ভাল ছেলেদের সঙ্গও করেছি। হেমেন রায়চৌধুরীর কথা আগেও বলেছি। এরা খেলাধূলাও করেছে আবার পড়াশুনা করে ইউনিভার্সিটির প্রথম স্থান অধিকার করেছে। Essayর Suggestion পেলে বহু পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়ে সেটার সেরা রচনা করে নিত। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষকরা তাদের পত্রগুলি প্রথম দিকে দেখতো না পাছে অন্য ছেলেদের খাতায় নম্বর না ওঠে। এরাও খেলাধূলা খুব করতো। খেলাধূলার সঙ্গে পড়াশুনা চলে, তবে চালাতে জানা চাই।

আরো দেখেছি কোথাও কিছু না পেলে ছাতেই ন্যাকড়ার বল নিয়ে খেলতো আর অনেক সময় ছাদের পিল্‌পেগুলো নড়ে গেছে। আবার খেলার অন্তে চিনেবাদাম, ছোলাভাজা নিয়ে বেশ জমিয়ে বসতে পারতো, সব দিক দিয়েই বেশ যোগ্য ছিল। এই হেমেন চৌধুরীর সঙ্গী ছিল করুণা হাজরা—পরবর্তী-কালে আই. সি. এস. হয়েছিল। এদের সব কথাবার্তা, চালচলন সব উঁচু সুরে বাঁধা থাকতো। কখনও হীন আচরণ এদের দেখিনি। তবে এদের জীবনে কাউকে ভয় করবো না এমনি একটি ভাব ছিল ; যার জন্যে দীক্ষা নিতে তার মা গেছেন বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দমহারাজের কাছে, সে সরাসরি প্রশ্ন করে—ভগবান আছেন কিনা ? অবশ্য মহারাজ তার কথার কোন আমল দেননি। পড়াতে

এদের কি রকম নিষ্ঠা ছিল,—একবার করুণার জ্বর হয়েছে, হেমেন গা দেখে বললে,—নে একটা কুইনিন খেয়ে নে। পাছে পড়ার ক্ষতি হয়। হেমেন রায়চৌধুরী আজ আর বেঁচে নেই। এই সব ছেলেদের মধ্যে পড়াশুনার ব্যাপারে একটা জেদাজেদির ভাব ছিল—বলতো আমার নোট নিয়ে যাও—তবু আমি তোমাকে কুড়ি নম্বরে বিট্ করবো। ভাল ছেলে হোতে হলে এরকম জিদ না থাকলে চলবে না।

তবে গ্রামের পথে এই বর্ষার দিনে রঙ্গটা ছিল অন্যরকম। জাঙ্গুড়ি গ্রামে গেছি, হাতে একটা ঘড়ি আছে, আর পায়ে জুতোতো আছেই—আর রাস্তা হচ্ছে, দুদিকে সব চালাঘর, তার মাঝখানে বেলে মাটির পিছল রাস্তা। আর শহরের ছেলে কাঁচা পথে চলতে জানি না, হাতে জুতোটা নিলেই হত—তা না জুতো পায়ে চলতে গিয়ে, একেবারে চিৎপাত। জুতোতো খুলে গেছেই—হাতের ঘড়ির কাঁচটাও ভেঙ্গে চুরমার, সারা গায়ে কাদা মেখে কেমন দর্শনীয় বস্তু হয়েছিলাম। চিৎপাত হয়ে পড়ার পর হাতে জুতো নিয়ে চলেছি …'সইভ্য' হয়ে চলা সেদিন সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এও দেখেছি গ্রামের অনেক চাষা ভুষো তারা পায়ের জুতো হাতে না নিয়ে, কেমন সাবধানে চলাফেরা করছে গ্রামের সেই বেলে মাটির পিছল পথেই। তাদের দেখে আমার তখন অবাকই লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণী,—ওরে তোরা আজ, যাসনে ঘরের বাহিরে—গ্রামের মধ্যবিত্তদের এটা একটা প্রয়োজনীয় বাণী না হলেও চিৎপাত হয়ে পড়ে হাতের ঘড়ি ভেঙ্গে যারা ঘরে ফেরে তাদের এ বাণীটি প্রয়োজন হবে।

বর্ষার আলোছায়ার একটা রোমান্স আছে। ভূতের গল্প যেমন শুনলে ভয় লাগে আবার শুনতেও ইচ্ছে করে তেমনি বর্ষারও ভয় মেশানো আনন্দ একটা আছে। মনে পড়ে কত রাতে যখন মেঘ গুরু গুরু করেছে তখন উঠে বসেছি ভয়ে। এই সেদিন বছর কয়েক আগে যখন ইস্কুল বাড়ীর ওদিকটায় বাজ পড়লো, ইলেকট্রিক লাইন জ্বলে গিয়েছিল, আমরা তখন বসে। কাল-বৈশাখীর অনেক রাততো আমরা বসে কাটিয়েছি বজ্রপাতের ভয়ে।

গ্রামে আর গ্রাম ঘেঁষা শহরে আমাদের 'নয়নে বাদল' বেশ জোরই আসে। সেবার এমনি এক গ্রাম ঘেঁষা শহরে একলাই আছি, কয়েকদিন বৃষ্টি চলছে আর থামে না, রাত্রে উঠোন-টুঠোন সব পিছল হয়ে গেছে, রাত্রে বেড়িয়েছি, পড়ে গিয়ে হাতের লণ্ঠনটাও ভেঙ্গে গেছে। সেকি অন্ধকার! তখন মনে মনে বলেছি ভূতে ঠেলে দিয়েছে। জলখাবার উপায় নেই, কুয়ো

ভর্তি হয়ে গেছে চারিদিকের রাস্তার জলে। কোনরকম করে দিন কাটানো গেছে। তবু হয়তো কালবৈশাখীর সন্ধ্যেবেলায় ছাদে বসে ঝোড়ো মেঘের কজ্জল কান্তি দেখে ভালোই লেগেছিল। হাসি কান্না জীবনে মিশেই যায়।

কি জানি বাংলার বর্ষা যেন গানের বর্ষা—সেদিনের কলকাতায় জনবিরল সন্ধ্যায় জানালাটা খুলে বসে আছি, মনটা খুব ভার ভার হয়ে আছে। বর্ষা নেমেছে—দুকুল ভাঙ্গা বর্ষা। চোখে আকুল ব্যথা নিয়ে চেয়ে আছি একটা গান গুন গুন করে এসেছে—

বাদলে ছল ছল কেন এ আঁখি
নয়নে ঘনঘোর কে দিল আঁকি।

আবার বর্ষাতে বিরহী প্রাণ আর যেন এই জগতে থাকতে চায় না। ঠাকুরের চরণায়িত হবার জন্যে বুকটা তার আকুল হয়ে ওঠে। তার অন্তরের একটা সঙ্গীত :—

এমনি ক'রে জমবে গো মেঘ
জমবে থরে থরে ·········
এমনি সেদিন দিনের শেষে
দাঁড়াবে মোর পথে এসে
বিদায় বাঁশী বাজবে সাঁঝের
পূরবী স্বরে।

সাধারণতঃ বর্ষার সঙ্গীতগুলি প্রকৃতিকে বা ঠাকুরকে নিয়েই হয়। সেদিন বর্ষা কিন্তু আমার কাছে মায়ের রূপ ধরেই এসেছিল—তাই ভিতর থেকে একটা স্বর মূর্চ্ছনা জেগেছিল—

চমকে চপলা চোখে অলকে জলদ দোলে
আঁধার আঁচল খুলে কে আজি নামিয়া এলে
এসেছ যদি মা শ্যামা
যেওনা চরণে দ'লে।

বিরহের যমুনা চিরদিনই দুকূল প্লাবী। শ্রাবণের অশ্রুসাগর চিরদিনই দুস্তর—

আজি শাওন গগন ভোরে
কে এলো রে

বুঝি নয়নে তারি—
ঝরে বেদন বারি
হৃদয় নিঙাড়ি
হিয়া দিল কে ভ'রে ॥

শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে বর্ষা বেদনাতুর কাজরী গান বেদনছন্দ নিয়ে জেগে ওঠে—মেঘের অন্ধকারে যখন রিমঝিম বৃষ্টি ঝরে পড়ে—তখন কাজরী গান ছাড়া সে আর কি গাইবে—তাই—

আজি এই বাদল বীণায়
কাজরী হ'ল সুরু
ব্যথার থমক তাই
ঝরিছে ঝুরু ঝুরু।

মহাজন পদাবলীতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের—আমরা পেয়েছি শ্রীমতীর ব্যথাভরা যমুনাকে। রাত্রি, মেঘ আর বাদল—এরা যেন সখীমিথ। তিনজনে হাত ধরাধরি করে চলে। বাদলে বিরহ আবার বাদলেই মিলন। এমন বিরহ মিলন একসঙ্গে অন্য কোন ঋতুতে দেখা যায় না।

আজি বাদল সাঁঝের আঁচল ঘিরে
আমায় বুঝি নিলে ফিরে………
কাছে পেয়ে যাই বা ভুলে
তাই কি দূরে দিলে ঠেলে
অলখ হ'য়ে তাই কি আজি
বুকের কাছে এলে ভিড়ে॥

অঝোর ঝরণ শ্রাবণ যেন ভগবানের আশীর্বাদ। কলকাতায় কৃষকের নয়নে বাদল জাগে না—জাগে কবির মনে। ভগবানের মিলন আশায় সে গেয়ে ওঠে—

করুণা ঘন শ্রাবণে
এসো এসো হে
ব্যথা বাদ ঘন বরণে
বসো বসো হে ॥

কতদিন হেদোতে কলেজের সহপাঠিদের নিয়ে আমরা বসেছি—মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—আমরাও ঘন হয়ে বসেছি। কত গভীর প্রশ্ন সেদিন ছিল,—আবার গানও জেগেছে;—

মেঘের মত ঘনিয়ে এস
এস আমার নয়ন ভ'রে
দিনের আলোয় দিশেহারা
হারিয়ে যাওয়া পথের পরে।

বৃন্দাবন বা ঐ সব জায়গাতে দল বেঁধে ময়ূর-ময়ূরীরা যে ঘুরে বেড়ায় তা দেখিনি তবে কলকাতা শহরে ময়ূরের নাচ কিছু কিছু দেখেছি। ভরারূপেব গুমরে পেখম তুলে সে যখন ঘুরে ঘুরে নাচে—সত্যিই তা মনে ছাপ দিয়ে যাবার মত। আবার মেঘহীন আকাশে সহসা জাহাজের সাইরেনের মত ক্যাও করে মেঘকে ডাক দেয় তীব্রকণ্ঠে—তখন সত্যিই চমকে উঠতে হয়। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষারত কবির মত এই ডাক—শুনে চমকে উঠতে হয় আবার ভালও লাগে। যাই হোক এই ময়ূরীর নাচ নিয়ে লেখা কবিতা ইটপাটকেল ঘেরা কলকাতাতেই লেখা হয়েছে—

এস মেঘের মত ঘনায়ে
আমি নাচি গো ময়ূরী হয়ে
হেসো বিজলী নিমিল নয়নে
আসি কেতকীর নাতি ল'য়ে।

কলকাতায় আছড়ে পড়া শ্রাবণ না দেখলে ধারণা হয় না। গঙ্গার একূল ওকূল ভরে গেছে—মন চুপচাপ তাকিয়ে আছে জলবারা কুঞ্জের পাশে। এমনকি ময়ূরীরাও ভয়ে কণ্ঠরোধ করে চেয়ে আছে দূরের পানে। একটা গান—

আজ শ্রাবণ মেঘে
তোমার পূজার শঙ্খ বাজে
তাই ভীরু কণ্ঠ
এমন লাজে।

শ্রাবণের কান্না আমাদের অন্তরের কান্না। এই শ্রাবণে ঠাকুর চলে গেছেন। শ্রাবণ বুক নিঙড়ে কেঁদেছে সমস্ত বিশ্বের হয়ে—

যে দিন শ্রাবণ কাঁদনি রাতি—
উতলা বায়ুরা বাহিরে করিতে রত যে মাতামাতি
শ্রীমুখের বাণীকরে কানাকানি
নিবু নিবু করে নিবান বাতি।

যখন বাইরে অঝোর ধারায় বর্ষা নামে অন্তর আকুল হয়ে ওঠে ভগবানের জন্যে। তীব্র বেদনায় সে ডাকে—

হো মেরো শাঁওর সাথী
হৃদয় যমুনা বিরহ থরথর
নয়নক দুঁহু তাঁর কাজর ঢর ঢর
ঘনা ওয়ে শাঁওর রাতী ॥

মেঘ-মেদুর সন্ধ্যায় আকাশ চিরে যখন বিদ্যুৎ খেলে যায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তখন হঠাৎ জেগে ওঠে আরতির দিশা—মনে হয় প্রকৃতি নেচে নেচে আরতি করছে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে—

বিজরী ঝলকত আরতি আনন্দে
মেঘ মন্দিরা মনরানি বন্দে।

ভক্তের আকুতি কোন একটা আঘাত পেলেই ভগবৎমুখী হয়ে পড়ে—তার ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা তাই শ্রাবণের উচ্ছল জলধারা বেয়ে ঠাকুরকে প্রাণের আবেগ জানায়—

আমার গগনে ভুবনে এসো
আমার নয়নে নয়নে এসো
এসো অঝোরে ঝরণ শাওনে
এসো বিজুরী ঝলক বরণে।

শ্রাবণে শুধু বাইরেই মেঘ জমে না, মনেও মেঘ জমে। এর ভেতর দুঃখ আছে, আনন্দও আছে। তাই মন গেয়ে ওঠে—

এমনি মেঘ নেমেছে শাওনে
এমনি মেঘ জমেছে কাঁদনে।

স্বপ্ন দেখি শুধু কি সুখের স্বপ্ন? দুঃখের স্বপ্নও আছে—শ্রাবণ রাতির স্বপ্ন বেদনামলিন—

কালো মেঘের কানায় কানায়
শ্রাবণ রাতির কাঁদন ঘনায়
আলো ছায়ায়—
স্বপন উঠে মাতি।

ঠাকুরের কাছে এই শ্রাবণে একান্ত প্রার্থনা যে অফুট কলির পিপাসা পূর্ণ করে দাও—তুমি তো মাণিক রাজার বনের রাজা—

কলীকী প্যাস পুরাদো আজ
লাজ রাখো রাজবনকে রাজ
মহলকে মহলার বজ উঠা
সাঁঝকে সাজন জীকে সহায়।

শ্রাবণে প্রার্থনা এই যে সকল লাজ মান সব সুখ দুঃখ যেন ভুলে যেতে পারি—

আপন হারা আঁধার বুকে
মন বটের বাসী জাগিবে চুপে
সকল দুখে সকল সুখে
আমারে আমি যাবো যে ভুলে।

শ্রাবণের আর একটা দিক আছে—রাখী-পূর্ণিমার রাত্রি একদিকে ঝর ঝর শ্রাবণের জলধারা—আর একদিকে ঠাকুরকে পরানো হবে মিলন পূর্ণিমার রাখী—আবার কবে পরবে রাখী—

সুরের রঙে বোনা
আবার করবে সাথী
বুকের বাণী শোনা

ভগবানের সঙ্গে মিলন মঙ্গল এই শ্রাবণেই সার্থকতা—আমরা এই উচ্ছল জলমঞ্জীরে "ঠাকুরের চরণের নূপুর ধ্বনি শুনতে পাই—তার সঙ্গে মিলন মঙ্গল গীত গাই—

আজ মধু ঝুলন রাতি
সখীজন মঙ্গল গায়ন গাতি।
প্রেম পূর্ণিম চাঁদ
কনক আঁচর খোলে
তারা সখী মোতিম
আধো হাসে লোলে
ভাব রভসেভোরা গদাধর কাঁতি"

কলকাতায় আমাদের কয়েকটা মরসুম ছিল। জষ্ঠী আষাঢ় মাসে আমের মরসুম, শ্রাবণ ভাদ্রে ইলিশ মাছের মরসুম, শীতকালের কপিমটরসীমির মরসুম। আমাদের এই কটা মরশুম ছিল। অবশ্য কুলপিবরফ, আইসক্রীম, আলুকাবলী, হাঁসের ডিম এসবগুলোতো ছিলই; যখন ফেরীওয়ালা এসে বলতো,—মেজবাবু

আজকে মাল আছে, তখন খেলার মাঠে আনন্দের সীমা থাকতো না। আমাদের খাবার জিনিসে কোন বাধা বন্ধ ছিল না। এমনিই সব খোলা থাকতো। খাটের তলায় আম বিছানো থাকতো, বিলিতি মাছ থাকতো কৌটোয় ক'রে বাসি লুচি দিয়ে সেই মাছ খেতে কি অপূর্বই না হতো। ইস্কুল থেকে ফিরে সাধারণতঃ আলু বেগুনের তরকারী দিয়ে লুচি খেতুম, বিশেষ মরসুমে লুচি দিয়ে কপিমটরসীমি এটা মহোৎসবের ব্যাপার হ'য়ে উঠতো। ফিরিওয়ালারা হাঁক দিয়ে যেতো টেনে টেনে—সাড়ে বত্রিশ ভাজা—তখন হাতে যেন স্বর্গ পেতাম। আর ডিসেম্বর মাসে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময় কেকের মরসুম। সব বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ ক'রে বিলিয়ে কেক খাওয়া সেও এক পরমোৎসবের সন্ধ্যা হোতো। উপর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতাম, আর তারা থাকতো নীচে। গরম ইলিশ মাছ ভাজা মা যথেষ্ট পরিমাণে দিতেন, ইলিশ মাচের টক করে রাখা হোতো, দুদিন চলতো সেটি। সাধারণতঃ আমরা ইস্কুলে যেতাম কাঁচা মাছের টক আর আলু সিদ্ধ এই খেয়ে। আজকাল সে সব দিন চলে গেছে। এখন তো আবার শুনি ইলিশ মাছও তেমন পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালীদের খাওয়ার ব্যাপারে ভোজের ব্যাপার চিরকালই। সেইজন্য বাঙ্গালী ছেলে বিদেশে গিয়ে এই খাবার কথা ভুলতে পারে না। হয়তো একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আলুসিদ্ধ খেয়ে মনে করে, কি জানি বাবা কি-না জিনিস আজ খেলাম। বিদেশে গিয়ে বাংলার মায়ের হাতের রান্নার কথা ছেলেরা ভুলতে পারে না। সবে শুনলাম একটি ছেলে, তার নাম দী···সে বলছে,—নিজের হাত পুড়িয়ে একটু ভাত আর হলুদ দেওয়া আলুর তরকারী খেয়ে মাঝে মাঝে মার হাতের রান্না খাবার জন্য মনটা কেমন করে উঠতো। তখন টেলিফোন করি কোন এক প্রবাসী বাঙ্গালীর বাড়ী। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ছেলে, সে চালাকী করে বলছে,—দিদি সব ভালতো? দাদা কেমন আছেন, শুনলুম মাথা ধরেছে। ইচ্ছে দিদির হাতে একটু খেয়ে আসা। দিদি বলছেন,—না তোমার দাদাতো ভালোই আছেন—ও—আচ্ছা—আজ না হয় বিকেলে একবার যাবো, দেখা করে আসবো। জানছিই তো গেলে তো আর না খাইয়ে ছাড়বেন না, একটু ঝোল ভাত খাওয়া যাবে। স্বামিজীও বলছেন,—দুনিয়াটা ঘুরে এলুম, কিন্তু বাংলার মত খাওয়া কোথাও দেখলুম না। কলার আগুট পেতে খাওয়া এ দুনিয়ারং কোথাও দেখলুম না। অত যে গম্ভীর বিদ্যাসাগর মশায় তিনিও সংস্কৃতে লুচি, কচুরী, গজা, মতিচুরং ইত্যাদি রসালো

রঙ্গকবিতা লিখেছেন। স্বামীজী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—রাজবাড়ীর অতিথি হয়েছেন, বাঙ্গালীদের কোন ব্যবস্থা নেই, জলে বেঁটে ডাল দিয়েছে স্বামীজী তখন বলছেন,—বাবা তোমাকে গান শোনাবো তুমি আমাকে খানিকটা ডাল দিও, জলে বেঁটে দিও না, আমি চিবিয়ে খেয়ে বাঁচবো। তিনি ওদেশ থেকে আচার কাসুন্দি ইত্যাদি চেয়ে পাঠাতেন আর সে সব এখান থেকে গুরুভাইরা পাঠাতেন, সেগুলি আবার সারদানন্দের জিম্মায় থাকতো। একদিন হয়েছে কি পার্শেল গেছে সারদানন্দ সেগুলি কাবার্ডে রেখে দিয়েছেন। মিসেস অলি-বুল এঁরা ছিলেন, অলিবুলের মেজাজটা একটু উঁচুস্বরে বাঁধা থাকতো, তিনি এসে সেই কাবার্ড খুঁজতে লাগলেন, এই ভেবে যে সাধুদের খাবার কি আছে। আর আচার দেখে যেই একটু মুখে দিয়েছেন অমনি খুব ঝাল লেগেছে আর তিনি পিছন চাপড়ে খুব হৈচৈ সুরু করে দিলেন—আর স্বামীজীকে বিশেষ করে সারদানন্দজীকে গালাগালি দিচ্ছেন you cooky Swami, you blacky Swami—তুমি আমার জন্যে বিষ রেখেছো ইত্যাদি বলে। সারদানন্দ মহারাজের তো বেলে মাছের রক্ত—চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছেন।

গুডউইন ছিলেন স্বামীজীর দক্ষিণ-হস্ত ষ্টেনো। একদিন ভারতের পার্শেল এসেছে, স্বামীজী সেটী সারদানন্দকে রাখতে দিয়েছেন আর তিনি গুডউইন আসতে তাঁকে কাসুন্দি দিলেন। আর গুডউইনতো মুখে দিয়েই ফেলে দিয়েছেন। স্বামীজী বললেন, ফেলে দিলি কেন?—তোদের পচা পনীরের চেয়ে তো আমাদের এইসব আচার কাসুন্দি অনেক ভাল। দেশ-বিদেশ ঘুরে স্বামীজী বেড়িয়েছেন। বলতেন—আগেকার মত এখন আর নেই—এখন বাঙ্গালী ছেলেরা সেই ঢাঁই প্রমাণ মুড়ি ফেলে দিয়ে সইভ্য হচ্ছে। বাঙ্গালীদের খাওয়ার ঘটা সেকালেও ছিল। মহাপ্রভুর জন্য 'ঝালি' যেতো বৎসরে একবার ক'রে কিন্তু তাতে ভোগের তালিকা শেষ হতে হয় না। কারণ পুরীর আটান্ন পর্ব ভোগের পাশে রাঘবের এই ঝালি আজও আমাদের রসনা সরস করে তোলে।

আমাদের কাছে তখনকার কলকাতার আর একটা জিনিস ছিল রাস্তার ধারে ফালি ফালি করে শশা কেটে নুন লঙ্কা দিয়ে রাখতো—এও একটা কিনে খাবার। হেদোর ধারে খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে বসে সাঁতার দেখার সময় কাছে পিঠে কোন দোকান থেকে তেলে ভাজা কিনে খাওয়া বেশ একটা উপভোগের জিনিস ছিল। খেলার মাঠে চিনেবাদাম সেতো আজও আছে। ইস্কুলে টিফিনের ঘণ্টায় বা খেলার মাঠে আলুকাবলী কিনে কাঠি দিয়ে খাওয়া

আজও মনে আছে আর নারকেল কাঠিতে গাঁথা বৈঁচী সেও পাওয়া যেতো, ছেলেদের মুখরোচক। বৈশাখ মাসে কাঁচামিঠে বা কাঁচা আম কেটে নুন দিয়ে খাওয়ার স্বাদ বড়ো হয়ে আর ভালো লাগতো না, সেকথা কতকটা হারিয়েই গেছে স্কুলের টিফিনের সময় ঢাকাইপরোটা ভাবতেই যেন মুখে জল আসে।

আর একবারের কথা মনে আছে তখন খুব ছোট, ষ্টার থিয়েটারে পিতা নিয়ে গেছেন, শঙ্করাচার্য কি ঐ রকম কোন বই অভিনয় হবে—বোধহয় ঐগুলি আজকের জীবনের মাল মশলা হয়ে আছে, কিন্তু সেদিন ঘুম চোখে ক্ষিদে পেয়েছে বলায় পিতা চপ কিনে খাওয়ালেন, সে যেন ভুলেও ভোলা যায় না। ছুটীর দিন পাড়ার বয়স্যদের নিয়ে চড়ুইভাতি করা একটা খুব বড় আনন্দের ব্যাপার ছিল। ইটের উনুন করে তাতে কাঠ কুড়িয়ে এনে লুচি ভাজা—আর বাড়ীর থেকে আলু, হাঁসের ডিম নিয়ে গিয়ে ভাজা—সে কাঁচাই থাকুক আর যাই থাকুক, সে ছিল অত্যন্ত মিঠে আর তা ভাগের সময় টাকার অঙ্কের সমতা অনেক সময় থাকতো না।

হঠাৎ বৃষ্টি এসেছে, মাঝমাঠে লুচির কড়াইয়ে জল পড়ছে, ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে লুচি কাঁচাই খেয়ে নিতে হয়, ফেলে তো আর আসা যায় না। সে খাওয়ার যে কি আনন্দ—তা কি বলা যায়। আমড়া গাছে চেপে কচি কচি আমড়া পেড়ে নুন লঙ্কা দিয়ে খেয়েছি কতদিন, এইসব করায় আমাদের কারুর কিছু বলার ছিল না। মটরসীম, আদা এইসব দিয়ে মুড়ি মিশিয়ে খাওয়া এই সমস্ত আমাদের ইস্কুল জীবনে স্মরণীয় বস্তু। রসগোল্লা, চমচম এসব তো কলকাতার ছেলেদের আছেই, চমচম বাসি হলেও তাতে জল দিয়ে ধুয়ে খাওয়া হ'ত। আজকালকার দিনে এইসব চমচম পাওয়া যায় না। লালচে লালচে তিন ইঞ্চি ব্যাসের চমচম আজকাল পাওয়া যায় না। নতুন গুড়ের সন্দেশের একটি মরসুম ছিল, বাসি লুচি আর এই সন্দেশ আমাদের বিশেষ মুখরোচক খাবার ছিল, খেয়েও খুব তৃপ্তি হ'ত।

বড় বড় কাবলীমটর ভাজা এর ভোজ খেলার মাঠ না হলেও চলতো সঙ্গে থাকতো একটু নুন আর ঝাল সেও দোকানেই পাওয়া যেতো। আলুকাবলীর কথা যা বলেছি তার ভেতরে ঢোকান থাকতো একটা করে কাঁচা লঙ্কা, আর তার সঙ্গে দিত একটু করে তেঁতুলের ঝোল। গুলগাপ্পা বোধহয় আজকাল আর পাওয়া যায় না, একটা আলুর মুখটা কেটে তার ভিতর টক ঝাল এ সব দেওয়া এর নাম গুলগাপ্পা। আমাদের সময় ঝালমুড়ির রাস্তায় অতটা চল ছিল না। আজকাল ঝালমুড়ির চল যেমন হয়েছে, ঝালমুড়ি পাওয়া তেমনি

ব্যয় সাপেক্ষ। পাড়াগাঁয়ে পদ্মবীচির টাটি আমরা খেয়েছি কিন্তু সেগুলো কলকাতায় পাওয়া যেত না, কিন্তু কচি তালশাঁস পাওয়া যেতো যেটা আজও পাওয়া যায়, সেগুলি গরমের দিনে বেশ ভাল লাগতো কিন্তু নিজের হাতে পেড়ে পেয়ারা, জামরুল, কাঁচাআম, আতা এ সবের স্বাদই ছিল অন্যরকম।

তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ী, ফিটনগাড়ী ও ট্রামের চল ছিল। তখন বাস ওঠেনি বা মটরেরও এত চল হয়নি। আমাদের মনে আছে সেবার বাড়ীতে একটা ঘোড়ার গাড়ী এসেছে। আমরা ইস্কুলে যাবো ঘোড়ার গাড়ীতে করে, দাদা আমাকে শেখাচ্ছে, কি করে বসতে হয়, তা না হলে লোকে ভাববে পরের গাড়ী চড়েছি।

আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতাম। কোন বখেরা থাকতো না। সেবার বাইরে থেকে একটি মা এসেছেন, আর তাঁর ছেলে। কি জানি কি একটা কারণে অনেক ছেলে বাড়ীতে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল—সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি—হঠাৎ একটা ছেলে বলে উঠলো,—চাঁদের ভাতের মধ্যে মাছ আছে। আমরা তো তাকাই—সবাই বললো, ভাত একটু ভেঙ্গে দেখতে হবে—সত্যিই দেখা গেল মাছ আছে। সময় সময় এ রকমটা হতো কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে যেমন পারতুম খেতুম। এরা যে না খেতে পেয়ে এ রকমের হয়েছে তা নয়, এই চাঁদ বলে ছেলেটি একটি বিশিষ্ট বংশের ছেলে।

অনেক দিনের পুরোনো কথা, রক্তামাশয় একবার হয়েছিল, কিছুতেই ভাল হয় না শেষে কুকুরশুঁয়োর পাতা ছেঁচে বেশ খানিকটা ক'রে রস দিতে স্থরু করলেন বাড়ীর বুড়ো ঠাকুমা। এতেই সেবার সেরে যায় ভগবানের ইচ্ছায়।

কুকুর আমাদের অনেক ছিল—তবে বুলমাসটিভ কুকুরটার কথা বেশ মনে আছে, এরা দু'টিতে মিলে বাঘ শিকার করতে পারে। কিন্তু আমার সঙ্গে এর যে যুদ্ধ হ'ত সে যুদ্ধে কখনও আমাকে কামড়াতো না। কিন্তু এমনিতে ছাড়া পেলে কাউকে বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে দিত না।

গোপালের পুজোর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরদিনই আছে। বর্তমানের গোপালজী আসেন ঠিক আমার জন্মের আগে। একটি মেয়ে এসে কাতর হ'য়ে বলে—আমি আর বাঁচবোনা, তোমরা গোপালজীকে নাও, এরা আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছে। সত্যিই গোপালজীকে দিয়ে গিয়ে মেয়েটি মারা যায়। বামলিঙ্গ শিব তিনিও এসেছেন এমনি ক'রে একটি কাল সন্ন্যাসী এসে বলেন,—বাবুজী, এই শিব আপনি রাখুন, আমরা সাধু মানুষ আমরা রাখতে পারছি না।

আমাদের বাড়ীতে ভদ্রকালী শীলামূর্তি—এটিও গঙ্গা থেকে পাওয়া, বুড়ি ঠাকুমাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আর একটি শীলামূর্তি আছে নারায়ণ শিলা, এটিও কুড়িয়ে পাওয়া। দেখে একজন বলেছিলেন—এটি বামন মূর্তি এঁকে রোজ দই দেবে। সেই থেকে এঁর নাম দধিবামন। ছোটবেলা থেকে আমরা এমনি করে পূজা আরতি আর ভগবানের প্রতি আস্তিক্যবুদ্ধি পেয়েছি। বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা ছিল, সেজন্য আমাদের নামের সকলের আগে সত্য কথাটি আছে, কারণ আমরা ভগবানের দান। আরও ঠাকুরের যখন পূজা হোত, ছোট্ট আমরা, আমাদের ওপর ভার ছিল ধূপ দেওয়া। ধূপ দিতে গিয়ে যখন দেখতাম ধূপটা ঠিক ঠাকুরের দিকে চলে যাচ্ছে, তখন মনটা ভরে উঠতো যে আমার পূজা ঠাকুর নিচ্ছেন।

খুব ছোটবেলায় তখনও খুব ভাল করে জ্ঞান হয়নি, আমি ঠাকুমার পূজোয় একটু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে গিয়ে মালার বাড়ী খেয়েছি। বিঘ্ন সৃষ্টি করা এই যে, ফুলটুল নেওয়া, ঠাকুমার পিঠের ওপরে পড়া এইসব। আবার পরে এমনও হয়েছে ঠাকুরের ভোগ হবার আগেই হয়তো খেতে হবে—ভোগের লুচি থেকে ঠাকুমা আমাদের দিয়ে দিতেন, বলতেন,—ওদিকে দিলেই আমার ঠাকুরের পূজোই হবে। ঠাকুমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাবার একটা গঙ্গাবাঈ হয়ে গিয়েছিল, যেতে না পেলে শুয়ে শুয়ে কাঁদতুম, একথা আগেই বলা হয়েছে। ভোরের গঙ্গা চান করা পৈঠা ধরে জলে ঝাঁপাই কত লোকের বিরক্তির কারণ হয়েছে, আর তার সঙ্গে জুড়েছিল রাস্তায় যাহোক আসবার সময় আংটি, ঘড়ি, লাট্টু, কিছু কিনে আনা। সব মিলে একটা রম্যভোরের সৃষ্টিই হয়ে উঠতো একথা আগেই বলেছি।

শুনেছি সুন্দরবনে বর্ষাতেই বেশী বাঘের উৎপাত হয়। মানুষ বর্ষারাতে বাইরে কোন কিছু করতে বেরুলেই বাঘে ধরে নিয়ে যায়। যাই হোক কলকাতাতে সত্যিকার বাঘের উপদ্রব তো নেই। সেবার দু'টি ছোট ছেলে এসে খুব হম্বিতম্বি করছে, বাঘ মেরেছি বন্দুক দিয়ে—এই সব। কি করা যায়, আর একটা ছোট ছেলে ছিল, তাকে সবাই শিখিয়ে দিয়েছে হরিণের চামড়াটা জড়িয়ে ছুটে আয়। ছেলেটির বয়স গোটা পাঁচ ছয় হবে—খুব বাঘ শিকারের গল্প করছে মাসীর কাছে। হঠাৎ হরিণের চামড়া জড়িয়ে ছুটে আসতে দেখে ছুটে মাসীর কোলে চেপে বসেছে—আর ভয়ে চীৎকার করছে—বাঘ—ও মাসী বাঘ।

আর একবার আশ্রমে একটি বৃদ্ধা গভীর রাত্রে—'ওগো বাঘ গো' বলে

চীৎকার করে ওঠেন। সকলে বলে—মা এখানে ঘরের ভেতর বাঘ কোথায় পাবেন, দরজা বন্ধ, জানালায় শিক—তবু ও চেঁচানো বন্ধ হয় না—কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন।

আর একটী ছোট্ট ছেলে—পাঞ্জাবী—নাম রাকেশ, হাতে এয়ার গান আর খুব আস্ফালন—বাঘ মার দিয়া—ইত্যাদি, এমন সময় একটা সাজানো বাঘের দেখা পেয়ে বন্দুক ফেলে মাকে ধরে চীৎকার—এ মাম্মী বাঘ আ গিয়া।

আর মনে পড়ে, আমরা একবার রাসবনের জঙ্গলের আশ্রমে আছি। কি জানি কি অভিসন্ধি নিয়ে একটি ২৩।২৪ বছরের ছেলে এসে হাজির। আমরা তো বেশ ভয় পেয়েছি দিনকাল খারাপ, আমাদের সঙ্গে সে রকম লোকজন নেই—পাশে কয়েক ঘর সাঁওতাল। তাকে তাড়ানোই বা যায় কেমন করে। এক উপায় বার করা হোল। খুব একটা সোরগোল তোলা হল, কাল রাত্রে জঙ্গলে বাঘ বেরিয়েছিলো, নদীর ধারে পায়ের ছাপ রয়েছে—ফেউ ডাকছিল ইত্যাদি। সে তখন বলে তাইতো নদী পার হতেই তো রাত্রি হয়ে যাবে তার ওপর জঙ্গল, কি করি। তাকে বলা হল তুমি আজকের রাতটা সাঁওতালদের বাড়ীতে কাটাও। প্রাণভয়ে সে তাতেই রাজী, আর তাকে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে আমাদেরও স্বস্তি—আর দূরে বাঘের ডাকের নকলও করা হল তাইতেই ঘরের ভিতরেই বীরপুঙ্গবের অবস্থা কাহিল। এদিকে তাকে নিয়ে এই কাণ্ড আর নদীর এপার থেকে সিউড়ীর একটা ছেলে এলো—অবশ্য বেশ বড়োই ৩০।৩৫ হবে। তার মতলব ভালই। দরিদ্র নারায়ণ সেবা হচ্ছে—একজন রসুই এসেছিল, রসগোল্লা করেছে—বেশ জমে উঠেছে হঠাৎ কে 'বাঘের পাঁজ বাঘের পাঁজ' বলে চেঁচিয়ে উঠলো—আর সব্বাই যে যেমন পারলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে দৌড়ে পালালো—কিন্তু সে আগন্তুক বেচারিটি মহা মুস্কিলে পড়লো—সঙ্গে রয়েছে তার সাইকেল আর আমাদের ছেলেরা—তাকে ভাল মানুষ দেখে খুব পেয়ে বসেছে—বলছে কি মশাই এখন কি করবেন নিজে তো উঠবেন কোঠায় কিন্তু সেই সাইকেলটা —ওতে তো চামড়া রয়েছে ওটা নিয়েই তো বাঘ পালাবে আর কাল সকালে সিউড়ী যাবেনই বা কেমন করে আর তাছাড়া এই দিনকাল—এই বাজারে এতবড় একটা লোকসান। সে বেচারী তখন ভয়ে ভয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে কষ্টেস্হষ্টে সেই সাইকেলটা ঘাড়ে করে মাঠকোঠায় তুললো—আর ছেলেদের সে কি হাসি—।

এ রকম মজার ঘটনা অনেক মনে পড়ে যায়। সেবার আমরা সিউড়ী

আশ্রমে—মন্দিরের বারান্দায়, বারান্দার সামনে ইঁদারার পাড়ে অনেকেই বসে। একজন পুলিশ অফিসারও আছেন। আমাদের পুলিশদের তো চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—এবারও ঠিক তাই কতকটা হ'ল।—সকলে বসে নানা আলোচনা করছে হঠাৎ একটি বয়স্ক লোক ইঁদারার পার থেকে উঠে এসে সকলের মাঝখানে বেশ একটু নিরঙ্কুশ জায়গায় এসে বসলো। সবাই জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে—? উত্তর এল, কি যেন—না—কিছু না—ও একটা কিসের যেন গোলমাল। তাইতো কি বটে হে—ওদিকে কাছেই পানের বরুজে বাঘ বেরিয়েছে। প্রায়ই বাছুর, ছোট ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দিনেই—এ্যাঁ তাই নাকি সব্বোনাশ—সবাই বেশ জড়ো সড়ো হয়ে বসলো আর সেই পুলিশ অফিসারটি একটা লণ্ঠন নিয়ে বললেন, আপনারা সব এগিয়ে যান, আমি আছি ভয় নেই—আর এদিকে বাঘটি পুলিশ দেখেই হোক অথবা মার খাবার ভয়েই হোক মন্দিরের পাশে মায়েদের ঘরের ভিতর দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমুচ্ছিল তাদের পাশে গিয়ে বসেছে—আর তারাতো জেগে উঠে ভয়ে বিকট চীৎকার করে—সব মিলে একটা হৈ চৈ ব্যাপার—। ওদিকে পুলিশ অফিসারটি বলছেন ছেলেমেয়ে দু'টো যখন কাঁদছে তখন ঐখানেই নিশ্চয় বাঘ আছে। সব্বাই বলছে—তা মশাই আপনি এগিয়ে যান নয়তো লণ্ঠনটা দিন—এদিকে শ্রীকান্তের বাঘের মত আমাদের সাজা বাঘ তো নিজের প্রাণের ভয়ে সেই ঘরে একটা পিয়ানো ছিল সেখানে লুকিয়েছে।

কবি সত্যিই বলেছেন এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায় —সেবার রাসবনের আশ্রমে আছি। হঠাৎ ফেউ-এর ডাক। আমরা ঠিক করলাম কীর্তন ক'রে জেগে থাকতে হবে। রাত্রি প্রায় ২টা হয়ে গেছে এমন সময় বাইরে যাবার দরকার হয়েছে। তখনও ফেউ-এর ডাক। আমরা চারদিক বন্ধ করে হরি স্মরণ করছি। আলো টালো তো নেই। একটা পেট্রোম্যাক্স জলছিল বাইরে, তার অবস্থাও কাহিল, সেটা জলতে জলতে হঠাৎ এক সময় নিভে গেছে।

আর একটি ছেলের কথাও আমরা জানি—জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম, সেখানে একটা পাঁচীলের ওপর উঠে গ্রামোফনের চোঙ নিয়ে বাঘের মতো শব্দ করছে। সে সময় আর একটি ছেলে সে মাঠ পেরিয়ে আসছিল যেই না আওয়াজ শোনা অমনি কাপড়-চোপড় ফেলে ছুটে একজনদের বাড়ীতে ঢুকতে যাবে আর তারা তো বাড়ীতে খিল দিয়ে দিয়েছে, বামাক্ষ্যাপার রূপে তারা ঢুকতে দেবে না, বলছে, —তুমি কাপড় নিয়ে এসো। কাপড় আনবে কি সেটা তো মাঠে পড়ে আছে।

এ রকম বাঘের কাহিনী অনেক আছে। কবি মধুসূদন সেবার এক বিলিতি জজের কাছে একটা ছিঁচকী চোরের কেস করছেন—সেতো হাত জোড় ক'রে বলে আর শশা চুরী ক'রবো না, আমাকে বাঁচান। মধুসূদন বললেন,—আচ্ছা ঠিক আছে। সাহেবের হাতে কেস পড়েছে। তিনি সাহেবকে বললেন, সাহেব তুমি তো পড়েছো—বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী—কি করে এই রকম রাত্রে এ বেচারী চুরি করতে পারে? সাহেব বললেন,—All Right—বাস কেস ডিস্‌মিস্।

একবার জনৈক প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ভূতের মুখোমুখি কখনও হয়েছেন? কলকাতায় ভূতের উপদ্রব বেশী—না জঙ্গলে বেশী; এর মীমাংসা আজও করে উঠতে পারিনি। শুনেছি কলকাতায় বিশেষ বিশেষ জায়গা আছে সেগুলো প্রেতের আবির্ভাবের জায়গা। এসব জায়গায় একসিডেণ্ট প্রায়ই হয় আমরা তা জানি। কথামৃতেও পাই—শ্রীঠাকুর বলছেন—এই সব ভূতেরা সঙ্গী খোঁজে। সেবার সুকিয়া স্ট্রীটে পুরানো একটা বাড়ীতে আছি, রাত্রিবেলায় একটি প্রেত আমার মায়ের শোবার জায়গার চারদিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। গঙ্গার ধারের আশ্রমেও একজনের ছাদের উপরে চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ার কথা শুনেছি। প্রেতদের ঘোরাটা একটা স্বভাব কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। স্বামিজীর Life beyond death এ প্রেতদের বহু কীর্তির কথা লেখা আছে। তবে এ ঘোরাটা নেই। স্বামী অভেদপাদের কাছ থেকে জানি আমেরিকার ভূতেরা সিঙ্গে বাজায়, টাইপরাইটার চালায়, অয়েল পেণ্টিং করে, সেকহ্যাণ্ড করে—এমনি তাদের বহু কীর্তি। অবশ্য সুকিয়া স্ট্রীটের এই বাড়ীতে আমরা নিজেরাই অনেকবার ভূত সেজেছি। গলায় একটা বালিসের ওয়াড় দিয়ে কালি ছিটিয়ে—একথা তো আগেই বলেছি। সেবার কলকাতার একটা বাড়ীতে আছি, চারদিকে গাছপালা আছে—বস্তীও আছে। রাত্রিবেলা এই বাড়ীতে কলগুলো প্রায়ই খুলে যেতো আর জল পড়তো। যাইহোক আর একটা পুরানো বাড়ীতে সেবার আমরা আছি। ছোট ছোট ভাইবোনেরা ওপরের ঘরে শুয়ে আছে হঠাৎ কে যেন শিকল তুলে দেয়। তারা তো ভয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয় তখন শিকল খুলে যায়। এ বাড়ীটি লালবাজারের ওদিকের বাড়ী।

কলকাতার ভূতের কথা বলতে গিয়ে—অনেক ভূতের কাহিনী মনে পড়ছে। সেবার একলা আছি সিউড়ীতে, একটি নির্জন ঘরে সারারাত্রি হোম করছি। হঠাৎ সামনের জানালাটায় সাদা কাপড় পরে কে যেন উঁকিঝুঁকি

মারতে স্থরু করেছে। বলাবাহুল্য এই প্রেতটি সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করে। আর একবারও একলা আছি, সেবারেও হোম করছি, হোমের বিঘ্ন করতে একটি প্রেত এসে হাজির, তাকে পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারি। সেবার জঙ্গলে আছি রাসবনে, প্রায় আড়াইটার সময় উঠে জপ করছি, হঠাৎ দেখি একটি সাঁওতাল সাদা কাপড় প'রে সট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পরে জানলাম সে ঐখানেই দেহত্যাগ করে—ঐখানেতেই তাকে সমাধি দেওয়া হয়। আর একবার গভীর রাত্রে বসে আছি, একটি প্রেত (বৃদ্ধা) এসে আমায় বললে—আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জলে ডুবে মারা গেছি। তাকে দেখে আমি একটু নার্ভাস হয়ে ইংরেজিতে বলেছিলুম, কাল সকালে অমাবস্থার হোম আছে তখন এসো। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কয়েক পুরুষ আগে যার মৃত্যু হয়েছে তাকে দেখেছে—স্বামীজী এদের বলতেন সাইকিক।

আমার দাদা একবার দার্জিলিং মঠে একটি প্রেতকে দেখেন, স্বামীজী বলেছিলেন হ্যাঁ সত্যিই ওখানে প্রেত আনাগোনা করে। আমাদের আশ্রমের কেউ রাত্রিবেলা প্রায় ১১-১১টা হবে সাহস দেখাতে গিয়ে ভয় পেয়ে সারারাত্রি কেঁপেছিল। সে দেখেছিল কেউ তাকে ভয় দেখাচ্ছে। জঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলতে হয়। সেবারে আমরা কলকাতা ছাড়িয়ে ১৫০ মাইল দূরে একটি জঙ্গলে আছি সেখানে ইলেকট্রিক নাই, গাড়ী যাবার রাস্তা নাই, খাঁটি জঙ্গল যাকে বলে। সাপ আছে, বাঘও সময় সময় আসে। সেবার জঙ্গলে অন্ধকারে আমাদের একটি পঞ্চবটী তলা আছে তারি বাঁধান চত্বরে বসে আছি—হোম হচ্ছে। সেই হোমের সময় আমাদের সঙ্গে আমাদের ঠাকুর গোপাল, তিনিও গেছেন। সন্ধ্যেবেলা ৭টা হবে। বনজঙ্গলের সাতটা মানে একেবারে মাঝরাত্রি। অন্ধকারে কেবল হোমের আলোটা আছে—আর হোমের কাঠগুলোয় মাঝে মাঝে পট্ পট্ শব্দ হয়ে সেই গভীর জমাট নিস্তব্ধতাকে আরও স্তব্ধ করে দিচ্ছিল। সে সময় যে ভোগ দিচ্ছিল সে সরে এসে কাউকে বললে,—আমার দ্বারা হবে না, তুমি ভোগ দাও। কিন্তু সে ভক্তটিরও ভোগ দেওয়া হল না। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলছে না। যখন তারা আশ্রমে ফিরে এলো—মনে রাখতে হবে এখানে জঙ্গলের আশ্রম, মেটে ঘরে ভাঙ্গা ঘরে। সেই ভাঙ্গা ঘরে সবাই এসে বসেছে তখন জানা গেল ভোগের সময় একটি কঙ্কালের হাত এসে ভোগটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছিল। দু'জনেই একই দেখেছে। এইখানেই,

রাত্রি প্রায় ১২টা হবে, একজন চাকরের মত কেউ দরজা খুলে দিতে বলে আর ভিতরে একজন মা বলেন,—না এত রাত্রে কে না কে ডাকছে দরজা কেউ খুলো না। তারপর তখনই খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেখানে কোন চাকর আসেনি আর পরের দিন জানা গেল যে চাকরটির কথা মনে হয়েছিল, সে তখন অসুস্থ হয়ে ঘুমুচ্ছিল।

কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক সেখানে গিয়েছেন, তাঁদেরও ইচ্ছে এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে একটু জপধ্যান করবেন। তাঁদের চারদিকে গণ্ডী দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরও মনে হয়েছিল যেন কারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের পদশব্দও তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে কোন কিছু দেখেনওনি বা কিছু শোনেনওনি।

আমাদের আশ্রমে অখণ্ড হোম হয়, সেবারে ৭।৮ দিন অখণ্ড হোম হচ্ছে—রাত্রিবেলা ২।৩ জন বসে আছে সামনে হোমের আগুন ছাড়া আর কিছুই নাই। সহসা দেখা গেলো একটি ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসে হোমে প্রণাম জানিয়ে গেলো। দেখে মনে হল ভদ্রলোকটি অফিসার, কোটের বুকে একটি ঘড়ি রয়েছে—সঙ্গে তার সহধর্মিনী, কালাপাড় শাড়ী পরা। অবাক হয়ে দেখা ছাড়া গতি নাই। পরের দিন ভক্তদের সামনে একথা বলতে একজন ভক্ত চিনতে পেরেছিল যে তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বাইরে রাস্তায় বেরুনো একটু মুস্কিল হয়েছিল। এ ঘটনা সিউড়ী আশ্রমের ঘটনা।

ধর্ম ও নৈতিকতা

বর্তমানে নৈতিক জীবনের প্রতি আমাদের দেশে এক বিরুদ্ধ মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা শুভ কি অশুভ সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া দেখিলে আমাদের এ বিষয়ে অনেক কিছু ভাবিবার আছে।

প্রথমতঃ আমরা দেখি যে ক্রমবিবর্তন ফলে আজ আমরা মানুষ—মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়াছি, সেই ক্রমবিবর্তন বাদের মূল যে সূত্র সেটি হইতেছে যোগ্যতমের বাঁচিয়া যাওয়া (Survival of the fittest)।

এই যোগ্যতমতার মূল কথা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ। নৈতিকতার উদ্দেশ্য আমাদের শক্তিমান করা। যে শক্তি বৃথা অপচয় হয় সেই শক্তিকে সংহত করিয়া জীবনযুদ্ধে কাজে লাগানই সকল নৈতিকতার মূল রহস্য। বহু প্রাচীন অসভ্য সমাজে এই প্রয়োজনবোধেই নৈতিক নিয়ম সকল প্রবর্তিত হইয়াছিল।

সভ্যতার প্রথম উষায় আমরা দেখি যে, মানবসমাজে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহাদের প্রধান দেবতারা সকলে নৈতিকতার উৎস ও নৈতিক ধর্মের রক্ষক ছিলেন।

মনস্বী W. Schymidt বলেন যে—"The primitive supreme being is without exception and unalterably righteous (The origin and growth of religion p. 271)

তাঁর মতে ঐ সব দেবতা আমাদের নৈতিক জীবনের শুভাশুভের ফলদাতা। আর তিনি আরো বলেন যে এই শুভাশুভ ফল পরকালের জন্য রক্ষিত হইতে পারে কারণ পুরাকালের জাতিরা প্রায় সকলেই পরকালের কথা বিশ্বাস করে। শুভকর্মের ফলে মানবেরা উর্ধ্বে গমন করে ও ঐ সব দেবতার সাহায্যে অতিমৃত্যু জীবন লাভ করে। তখন রোগ বা দুঃখ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। কালিফোর্ণিয়ার মাইডু প্রভৃতি জাতিদের এই বিশ্বাস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতে আত্মাদের শুভাশুভ কর্মের বিচার হয় আর সেই পরম দেবতা তাহাদের বিচারের ভার নিজের হাতেই নেন। আন্দামানী অসভ্য জাতিদের মধ্যে এই বিশ্বাস দেখা যায়। টেঁরাডেলফিউগোর অসভ্য হালকউলুপদেরও এইরূপ বিশ্বাস। অন্যায়কারীদের অগ্নিদগ্ধ করিয়া কষ্টদায়ক সাজা দেওয়া প্রায়

প্রস্তি অতিপ্রাচীন অসভ্য জাতির বিশ্বাসে পাওয়া যায় অবশ্য এই প্রকার চিন্তার পিছনে সত্য সত্য স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব আমাদের ভাবিয়া দেখিবার কথা।

আমাদের বৈদিক যুগের ইতিহাসে দেখি ইন্দ্র দেবতা ঋতের রক্ষক। ঋষি বহুস্থানে উদাত্ত কণ্ঠে ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে ইন্দ্র আমাদের ঋতের পথে লইয়া চল—সত্যের পথে লইয়া চল। (১০, ১, ৩৩, ৬) মিত্রাবরুণ এই ঋতের রক্ষক। ঋতেন যাবৃতাবৃধা বৃতম্ (১।২৩।৬)।

বৈদিক ঋতের প্রথম অর্থ ছিল পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারাগণ, উষা ও সন্ধ্যা, দিবস ও রাত্রির চলার পথ। পরবর্তীকালে ইহা মানবের নৈতিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এই পথ দেবতাদেরও পরিক্রমার পথ।

উপনিষদের যুগে দেখি ব্রহ্মজ্ঞানের পথে সংযমের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তেন্দ্রিয় সকলকে অচলভাবে ধারণ করা রূপ যে অবস্থা তাহাকে যোগিগণ যোগ শব্দে অভিহিত করেন (৩।১০) যোগ-তত্ত্ববিদ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সংনিয়মিত করিবেন। (শেতঃ ২।৮)—উপনিষৎ মতে নৈতিকতার পথে চলার অর্থই হইতেছে আত্মোপলব্ধির পথে চলা। উপনিষদের মতে সবই ব্রহ্ম (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। কিন্তু সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত। সৎ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যই হইতেছে ঐ অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সেই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম তার মধ্যে একটি (তৈঃ উঃ—১।৯)।

জৈনধর্মে নৈতিক জীবনের পাঁচটি সূত্র দেখা যায়।—অহিংসা, দান ও সত্যকথন, অচৌর্য ও কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা, জাগতিক বিষয়ে ত্যাগব্রত। এইগুলিই জৈনধর্মের চরিত্র গঠনের উপাদান।—

বৌদ্ধধর্মে দুঃখের নিবৃত্তির অষ্টমার্গ বিহিত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে যথার্থবোধ, যথার্থবিচার, যথার্থ উক্তি, যথার্থ কার্য, যথার্থ জীবিকা, যথার্থ উদ্যম, যথার্থ চিন্তা ও যথার্থ দান। বুদ্ধদেবের ধর্ম—নৈতিক ধর্ম। তিনি বলিয়াছেন প্রাণীগণের কর্মসমূহ দশবিধ বস্তু দ্বারা অশুভে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে দেহের অশুভ ত্রিবিধ, জিহ্বার চতুর্বিধ ও মনের ত্রিবিধ। নরহত্যা, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য, দেহের এই ত্রিবিধ অশুভ ; মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, পরগ্লানি ও জল্পনা জিহ্বার অশুভ এবং লোভ, দ্বেষ আর ভ্রান্তি মনের অশুভ—এই দশবিধ অশুভ পরিত্যাগের উপদেশই তাঁর অনুগতদের তিনি দিয়াছেন।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখোচ্চারিত গীতায় প্রধানভাবে নৈতিকতাই খ্যাপিত হইয়াছে। সংযমের কথা বহুধা বলা হইয়াছে। যথা :—ষষ্ঠ অধ্যায়ে

বলিয়াছেন অসংযতাত্মার যোগ দুষ্প্রাপ্য। (৩৬) সংকল্প প্রভব কামনা সকল ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মনকে শান্ত করিতে হইবে। (২৪) মন সংযত করিয়া আমাতে চিত্তযুক্ত হও। (১৪) ইন্দ্রিয়ধর্মও মন সংযত করিয়া ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ হইতে যিনি মুক্ত তিনি যথার্থ মুক্ত। (৫।২৮) চতুর্থ অধ্যায়ে সংযম অগ্নিতে আহুতি দানের কথা রহিয়াছে। এই প্রকারে প্রায় সর্বত্রই গীতাতে সংযমের প্রশংসা আছে।

ন্যায় দর্শনে দুঃখ হইতে আত্যন্তিক বিমুক্তিই কল্যাণতম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কায়মন ও বাক্যের চেষ্টা সৎ ও অসৎ দুই প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়, উৎকট রাগের প্রেরণায় আমরা পাপকর্মে প্ররোচিত হই। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা—আমরা এই দেহ—ইন্দ্রিয় থেকে আত্মাকে বিবিক্ত মনে করিতে পারি।

ব্রাহ্মণাদি জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে যে সব কর্তব্য কর্ম বৈশেষিক শাস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন সেইগুলি শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ত্ব, সত্যনিষ্ঠা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ভাবশুদ্ধি, ক্রোধবর্জন, অভিষেচনা, শুচিদ্রব্য-সেবন, বিশিষ্ট দেবতা ভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ।

সাংখ্য মতে যখন ইন্দ্রিয়বর্গ নিস্পৃহিত হয় ও মন শান্ত হয় বুদ্ধি স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় তখনই কেবল মুক্তি করায়ত্ব হয়।

পূর্ব মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে যে বাসনাদিগ্ধ কাম্য কর্ম বন্ধনের কারণ, কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম না করিলে প্রত্যয়ের ভাগী হইতে হয়।

বেদান্ত মতে যাহা কিছু আমাদের মনকে ব্রহ্মাবগাহী করে—তাহাই সৎ। সৎকর্ম সত্যাশ্রিত—অসৎ কর্ম অসত্যাশ্রিত। মঙ্গলজনক ভবিষ্যৎ যাহা আনিয়া দেয় তাহাই সৎকর্ম। শমদমাদি ষট সম্পত্তি সম্পন্ন হইলে জীব গুরুমুখে শ্রুত, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে। শমদমাদির স্থান প্রাথমিক হইলেও বেদান্ত মতে একান্ত প্রয়োজন।

বৈদেশিক গ্রীক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখি যে সক্রেটিসের মতে মানুষ যা ভাল মনে করে (fair and good) তাই সে করিতে বাধ্য। যখনই কোন ব্যক্তি অজ্ঞের মত কাজ করে তখনই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত জ্ঞান সেখানে অবর্তমান। জ্ঞানের প্রকৃত অনুসন্ধানই আমাদের প্রকৃত নৈতিক ব্যবহারিক জীবন (Perfect conduct.) আনিয়া দিবে।

প্লেটোর মতে আত্মার তিনটি তত্ত্ব আছে। ইহারা Reason, Desire, এবং Spirit. Desire বা বাসনা বহুধা বিভক্ত। Spirit এর কাজ reason

এর বাণীগুলি গ্রহণ করিয়া সেই মতে বাসনাগুলিকে সংযত করা ও সৎভাবে চলা। প্লেটোর মতে সৎজীবন হইতেছে সেই জীবন যার মধ্যে আত্মার সত্তা (elements) গুলি সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল প্লেটোর মত reason এর পক্ষপাতী। তাঁর মতে বাসনাকে সংযত করিয়া চলাই ধার্মিক জীবনের লক্ষ্য।

প্লটিনাসের মতে আমাদের সর্বোত্তম অবস্থা হইতেছে আত্মার শুদ্ধ অবস্থা—দেহাতিরিক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা সর্বদোষ বা বিচ্যুতি হইতে মুক্ত হই। Reason এর প্রতি যখন আত্মার গতি হয় আর দেহাভিমান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় তখনি আমরা শুদ্ধতম অবস্থা লাভ করি। প্লটিনাসের মতে সর্বোচ্চ তত্ত্বে উঠিতে হইলে চিন্তার উর্দ্ধে উঠা প্রয়োজন। কারণ চিন্তা বলিতে দ্বৈতভাবই বুঝায়।

খ্রীষ্টীয় মতবাদে তিনটি প্রধান তত্ত্ব আছে। ইহারা বিশ্বাস (Faith), প্রেম (Love ও পবিত্রতা (Purity).

সাধক দার্শনিক একুইনাসের মতে আমাদের সবকার্যই ভাগবৎ মুখী। তবে সর্বোত্তম সুখলাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য শুদ্ধচিত্তের প্রয়োজন।

দার্শনিক হব্‌সের মতে রাষ্ট্র যাহা উচিত মনে করেন তাহাই ঠিক, তাহাই ন্যায়সঙ্গত।

মনস্বী কাম্বারল্যাণ্ডের মতে নৈতিকতার সর্বোত্তম সূত্র হইতেছে Common good of all বা সর্বসাধারণের কল্যাণ। এই কল্যাণের মধ্যেই রহিয়াছে পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি (perfection)। এই আত্মোপলব্ধির মধ্যেই রহিয়াছে পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মনীতি। চিন্তাশীল রিডের মতে আমাদের কর্তব্যকর্ম শিক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াই নৈতিকভাবে উচিত আর তাহা হইতে বিচ্যুত হবার যে প্রলোভন আসে সেখানেও আমাদের শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

মনস্বী গ্রীণএর মতে নৈতিকতা সর্ব মানবজাতির জীবনযাত্রার ক্রম-বিবর্তনের শেষ পৈঠা। গ্রীণের চিন্তাধারায় আমরা পাই যে, প্রকৃতিতে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে ইহা সার্বিক ও চিরন্তনী চৈতন্য সত্তা। মানুষের নৈতিক জীবন হইতেছে একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টাতে পশুপ্রবৃত্তির বাসনাসমূহ পরিবর্তিত হইয়া নৈয়তিক আত্মচেতনা এবং ধর্মজীবন প্রকাশিত হয়।

আবেষ্টনীর সহিত মানুষের সম্বন্ধ অতি গূঢ়। মনোবিজ্ঞানের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশজন মনোবৈজ্ঞানিকের মত এই

যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মানবজীবনে প্রধান। ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি সমাজের একটি চাহিদা থাকা প্রয়োজন। সমাজের যাঁহারা স্তম্ভ-স্বরূপ, যাঁহারা সমাজের কাছে সম্মানিত তাঁহাদের ধর্ম ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। বৌদ্ধযুগের প্রতি বর্তমানে একটি প্রবল প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গী আসিয়া পড়িয়াছে। এই যুগে প্রধান ব্যক্তি মহারাজ অশোক ধর্ম গোপ্তা ছিলেন, আর নৈতিকতার তিনি আদর্শ ছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। ৩।২১

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন ইতর সাধারণ তাহাই অনুবর্তন করে। শ্রীঠাকুর এই বিষয়ে তাঁহার স্বভাব সুলভ সাবলীলতায় একটি গল্প কথামৃতে দিয়াছেন। ইতর সাধারণ বসিয়াছে খাইতে—গ্রাম্য ভোজ। তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল আমড়ার অম্বল খাইবে কি-না? তাহারা উত্তর দিল, যে যদি বাবুরা খাইয়াছেন তবে অবশ্যই ভাল হইয়াছে—আর সেই হিসাবে তাহারা খাইতে সম্মত আছে। আবার সমাজ যখন নৈতিকতা ও ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয় তখনই সমাজে অধিক সংখ্যক নৈতিক ও ধার্মিক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। যে সমাজে নৈতিকতা ও ধর্মের প্রতি আদর আছে, সে সমাজে ধার্মিক ও নৈতিক ব্যক্তির আবির্ভাব অধিক হয়। এইভাবে প্রধান ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটা পারস্পরিকতা আছে। সমাজের প্রধান ব্যক্তি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে আর সমাজ আবার প্রধান ব্যক্তিদের আবির্ভাবের সহায়তা করে। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা দেখি যে বৈদিক যুগে বিরাট ধর্ম ও নৈতিক জীবনের অভ্যুদয় সহজ হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সময় বড় বড় ধর্ম-গোপ্তাদের আবির্ভাব জগতের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। বৌদ্ধ যুগেও ধর্মের জন্য বড় বড় ত্যাগীর আবির্ভাব আমরা দেখি। গ্রীক সভ্যতার সময় আমরা দেখি সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রভৃতিদের আবির্ভাব কত সহজ হইয়াছিল। আচার্য শঙ্করের সময় সুরেশ্বরাচার্য, চিৎমুকাচার্য, তোটকাচার্য প্রভৃতিদের কথায় ইতিহাস আজো উজ্জ্বল হইয়া আছে।

আমাদের সমাজ বর্তমানে যে ভাবের গতি লইয়াছে তাহাতে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি সম্মান দৃষ্ট হয় না। সংবাদপত্র অনেক সময় সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মুখপত্র, অনেক সময় সমাজপত্র সমাজের নিয়ন্তা। বর্তমানে সংবাদ-পত্রে সৎকথা ও সদাচারের প্রতি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না। সংবাদ-

পত্র পাঠকের নিকট সৎ সংবাদ সাধারণত পরিবেশিত হয়না, প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী অল্প। ধর্মপুস্তকের মধ্যে কয়টি জনসাধারণের আদৃত বা পুর্ণমুদ্রিত হইতেছে? অধুনা যে সব চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহাতে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয় না বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সঙ্গীত জগতে যাঁহারা সর্বত্র সমাদৃত তাহাদের জীবনাদর্শও অনুরূপ। চিত্রতারকাগণের কথা শিশুদেরও অজ্ঞাত নয়। অর্থ ও রাজনীতি বর্তমান যুগকে কর্ণধারণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং ধর্ম ও নৈতিকতাবাদীরা অপাংক্তেয়দের দলে পড়িয়াছে। ভারতের গৌরবময় যুগে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাধান্য ছিল। গ্রীক ও রোমের সভ্যতা ভারতের সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্লেটো প্রভৃতির এদেশে আসার কথাও ইতিহাসে আছে। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোগবাদের সভ্যতা বহুভাবে আমাদের প্রভাবিত করিতেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্ম ও নৈতিকতার স্থান নাই। বিজ্ঞান, প্রচারকার্য ও ছাত্রদের সেদেশে গতায়াতি এবিষয়ে সহায়তা করিতেছে। আর রাশিয়ার নাস্তিকতার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যদিও আশার কথা যে সে দেশেও ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাত্মাও আজ পথ হারা বলিয়া আপনাদের মনে করিতেছে। মনস্বী হাক্সলী প্রভৃতিদের বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-গঙ্গায় নূতন জীবনাদর্শ পাইতেছে।

তবে শ্রীভগবানকে যাহারা সর্বশক্তিমান মনে করেন এবং বিরাট ক্রমবর্ধমান জগতে (Expanding Universe) যাঁর সৃষ্টি তাঁর রাজ্য হইতে কেহ তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সাময়িক এই মোহ কাটিয়া যাইবে আশা করা যায়। মানবাত্মা বিবর্তন ক্রমে পশুত্বে দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম ও নৈতিকতা সেই পশুত্বের পরিপন্থী। দেবতার প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য। আর বিজ্ঞানের মতে বিবর্তন ক্রম অগ্রসরণশীল। ইহাতে মানুষ পুনরায় পশু স্তরে যাইতে পারে না। সেই হিসাবে মানব—দিব্য মানব হইবার পথেই চলিয়াছে। মনীষী আচার্য আলেকজান্দার প্রভৃতির Emergent Evolution মতবাদ এই ভাবেরই পরিপোষকতা করে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবেই তবে সাময়িকভাবে আমরা অন্যপথ লইয়াছি মাত্র। আর ধর্মের শক্তি যে আজও আছে তার প্রমাণ স্বরূপ এই সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীপাদ বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী—ওদেশে বার্ণাডশ' প্রভৃতিদের জীবনায়ন সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেই পরম আবেদন পাইয়াছে। শ্রীঠাকুরের এযুগ অন্য পথে বহিয়া যাইবে না এই আমাদের আশা, এই আমাদের প্রার্থনা।

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শ্রীঠাকুর

শ্রীঠাকুরের জীবন-বেদে আমরা দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের তথ্যই পাই। অনেকের প্রশ্ন থাকে, শ্রীঠাকুরের কথায় আবার এসব আনা কেন? সে হিসাবে বলা যায় ভগবান ঈশামসির মনোবিজ্ঞানের কথা সেদেশে আলোচিত হয়েছে। (জিসাস্ ক্রাইষ্ট, ইন্ দি লাইট অফ্ সাইকোলজি—জি, এস, হল) আর আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি ধর্মরাজ্যের মহাপুরুষদের দর্শনও আলোচিত হয় এদেশে ওদেশে।

প্রথমেই দেখি শ্রীঠাকুর জ্ঞানলাভের এক অভূতপূর্ব উপায় করেছেন আবিষ্কার। জ্ঞানের উৎসের কাছে চেয়েছেন জ্ঞান-পিপাসার শান্তি। না খেয়ে পড়েছিলেন, মা বেদে পুরাণে তোকে যে ভাবে জেনেছে আমায় জানিয়ে দে। সে প্রার্থনা মা শুনেছেন। কথামৃত আজ বিশ্বের ধর্মগ্রন্থ। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন জ্ঞানের তিনটি উপায় দিয়েছেন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আর প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান। এদের মধ্যে তাঁর মতে অন্য দু'টি জ্ঞান সত্যতত্ত্বকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। [আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অফ্ লাইফ] আমাদের দেশে আচার্য শঙ্কর, আর পাশ্চাত্ত্যে প্লেটো, দেকার্তে, স্পিনোজা প্রভৃতির কতকটা এই মত।

দর্শন বিষয়ে তিনটি বিশেষতত্ত্ব আলোচিত হয়—ঈশতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব। ঈশ্বর-জ্ঞানের সম্বন্ধে মনস্বী কাণ্ট বলেছেন,—তাঁকে সীমায়িত মনের দ্বারা জানা যায় না। 'ন্যুমেনা ও 'ফেনোমেনা' জগতের দু'টি ভাগ তিনি করেছেন। ফেনোমেনার রাজ্য এই জগৎ, আরপারের জগৎ ন্যুমেনা। ভগবান এই পারের জগতে আছেন। আর সে জগতের সংবাদ আমাদের এই ফেনোমেনার মন দিয়ে পাওয়া অসম্ভব। তবে শ্রীঠাকুর বলেছেন,—শুদ্ধ মন, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায়। বলেছেন তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু যে মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। আর ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হল। একটি ডেঁয়ো পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের উপমা দিয়েছেন এই বিষয়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি ইতি করতে বারণ করতেন। তাঁর ইতি করা যায় না—তিনি নিরাকার আবার সাকার; ভক্তের জন্যে তিনি সাকার। [কথামৃত ১৷৩৷৬৯] জ্ঞানসূর্য উঠলে তখন আর ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—এখানে তিনি সচ্চিদানন্দ

সমুদ্রের উপমা দিয়েছেন—কুলকিনারা নাই, ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়। জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায় [১।৩।৭০]। তবে তিনি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ বলেছেন। আবার তাঁর ব্রহ্ম জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির পারে। বিদ্যা অবিদ্যার পারে। সত্ত্ব, রজঃ, তমের পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ—তিন দেহের পার—প্রকৃতির পার—জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার। এসব বৈদান্তিক বিচার সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, আমি সবই লই। ব্রহ্ম জীবজগৎ বিশিষ্ট—এইটি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। তাঁর কাছে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। সচ্চিদানন্দ ভক্তি হিমে জমে যান—আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে গলে যায়। ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সৎ, তিনি বিভুরূপে সকলের ভিতর আছেন। তিনি মায়াকে বলেছেন যেন পানা, আর সচ্চিদানন্দ যেন জল। মায়ার যে দুটি শক্তি আছে, আবরণী আর বিক্ষেপণী—পানাতে এ দুটির বেশ প্রকাশ। জীব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, মায়াতে এই উপাধিসমূহ। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা আর পরমাত্মায় এক জ্ঞান—বেদান্তের সার তিনি এক কথায় বলেছেন,—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। শ্রীঠাকুরের মতে এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ—বিচার পথ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা বইতে থাকে অর্থাৎ জ্ঞান পথে চিত্ত নিরোধ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে জোয়ার ভাঁটা খেলে। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ। অভিমান থাকবে না—আর শান্ত স্বভাব। আবার বলেছেন জ্ঞানীর অনুরাগ থাকবে আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ হবে। জ্ঞানী স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করে। বিজ্ঞানী দেখে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। বিজ্ঞানী নিত্য হতে লীলায় আবার লীলা হতে নিত্যে যায়। জ্ঞানী তাঁকে জেনেছে, বিজ্ঞানী তাঁকে নিয়ে সম্ভোগ করেছে। আচার্য শঙ্কর বিজ্ঞানীকে বলেছেন যিনি উপলব্ধি করেছেন।

জগৎ যেন ঝাড়ের মত। জীব—ঝাড়ের দীপ—শ্রীঠাকুর এই কথাটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বলে বলেছেন। এখানে অর্থ এই যে দীপ না থাকলে ঝাড়কে দেখা যায় না, তেমনি জীব না থাকলে ঈশ্বরকে কে দেখাবে? জড়ে চৈতন্য লয়, আর চৈতন্যের সত্বা জড়ে লয়। বর্তমানে বিজ্ঞানে কুরী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা জড়ে ও শক্তিতে প্রভেদ দূর করেছেন, তবে শক্তিতে ও চৈতন্যে পার্থক্য তাঁরা দূর করতে সক্ষম হন নাই। আবার অন্যত্র শ্রীঠাকুর শরীরকে সরা বলেছেন। মন রূপ জল, তাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। এতে জড় চৈতন্যের একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়। সরার মাটিতে জল আছে। তবে দুটি এক নয়। দেহ মন চৈতন্যের আধার। দেহ মনের প্রয়োজন এই জন্যে। কিন্তু লাইবনিজ প্রভৃতির মতে দেহ ও মনের মধ্যে কোন বাইরের যোগ সম্বন্ধ

পাওয়া যায় না। এরা দেহ-মনে, ভগবানের দেওয়া সামঞ্জস্যবাদী [প্রি-এস্টাবলিস্‌ড হারমনি]। আবার ডেকার্টে প্রভৃতি মনস্বীরা দেহ মনের মধ্যে চির পার্থক্য স্বীকার করেন। স্কোলাষ্টিক দার্শনিকরা মনে করতেন, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শ্রীঠাকুর যে ভাবে তাঁর দেহ মনের সম্বন্ধটি দিলেন সেটি সকল মতের পরিপোষকও বটে আবার তাদের ছাড়িয়েও গেছে। এক চৈতন্য সর্বত্র থাকায় সবই মূলত এক আবার এই উদাহরণের মধ্যে সাংখ্যের চিচ্ছায়া আছে, বেদান্তের সচ্চিদানন্দ আছে।

শ্রীঠাকুর বলেন,—আম খেতে এসছো—আম খেয়ে যাও · কত ডালপালা অত হিসাবে কি হবে—বাবুর সঙ্গে যো সো করে আলাপ কর···বাবুর কখানা বাড়ী, কত ঐশ্বর্য এসবে কি হবে—পাশ্চাত্ত্য দর্শনে আমরা একটি তত্ত্ব পাই—এটি প্রাগমাটিজ্‌ম্। আচার্য উইলিয়াম জেম্‌স্ এর প্রবর্তক। তাঁর মতে ব্যবহারিক উপযোগিতাই জগতের সত্যকার রূপ। আর আমাদের জ্ঞানের নিরিখ হচ্ছে তার কার্যে প্রয়োজন। এই মতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন যায় বেড়ে। [প্রাগমাটিজ্‌ম্—ডব্লিউ জেম্‌স্] শ্রীঠাকুরও বলতেন, এগিয়ে পড়। কাঠুরের গল্পে বলেছেন এগিয়ে যেতে। কাঠের বন, তামার খনি, রূপার খনি, সোনার খনি। মনস্বী ডিউইর জগতও এমনি পরিবর্ধনশীল। শ্রীঠাকুর বলেছেন,—জগতটা যেন জ'রে রয়েছে, বর্ষায় যেমন জ'রে থাকে। হেনরি বার্গসঁর মতে, জগৎ চৈতন্যময় [ইলান ভাইট্যাল] তাঁর মতে জগৎকে জানতে হবে প্রজ্ঞার নেত্রে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। বার্গসঁ তুবড়ির উপমা দিয়েছেন তাঁর ম্যাটার ও মাইণ্ড এর পার্থক্য বুঝাতে। শ্রীঠাকুর তুবড়ির উপমা দিয়েছেন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর পার্থক্য বুঝাতে [বেসিক টিচিংস, ডাঃ ফ্রষ্ট—কথামৃত]।

বর্তমান দর্শন মানুষের অন্তরের পরিচয় বাদ দিতে পারে না। [হিউম্যান ভ্যালু]। আবার বিজ্ঞানকেও নিয়েছে আদর করে—জর্জ সান্তয়ানা প্রভৃতি এই দলের।

শ্রীঠাকুরের জীবনবেদে আমরা এদুটি দিকেরই পরিচয় পাই। বাজিয়ে নেওয়া, যাচিয়ে নেওয়া তিনি কোন দিনই দেন নি ছেড়ে [সায়েন্টিফিক মেথড]। আবার সত্য-শিব-সুন্দরের তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। [বেসিক টিচিংস অফ ফিলসফি, ডাঃ ফ্রষ্ট]।

নবগতিবাদের প্রবর্তক লয়েড মরগান। এঁর মতে দেশকাল থেকে ক্রমে দেবতাদের উদ্ভব হয়। এই গতির মাঝে একটা নূতনত্ব দেখা যায়। জড়

থেকে চেতনা, চেতনা থেকে মনের উদ্ভব নবগতিবাদের সূচনা করে। আলেকজাণ্ডার ও লয়েড মরগানের নব-গতিবাদের কথা [ইমার্জেণ্ট এভোলিউসন্] শ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা পাই। তিনি বলেন—মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না। এই বলা হল যে, বাজ উঁচু জায়গায় পড়ে কিন্তু দেখা গেছে বড় বাড়ীর পাশে চালা ঘরে এসে বাজ পড়ল। হাউই-এর তুবড়ি খানিকটা ফুল কেটে ভেঙ্গে যায়—অর্থাৎ দেহ পড়ে যায় আর বিজ্ঞানী নারদাদির তুবড়ি একবার ফুল কাটে আবার বন্ধ হয়, আবার ফুল কাটে—অর্থাৎ প্রেম বিলাস চলে। তিনি আরো বলেছেন মহাবায়ুর কথা। এই মহাবায়ুর গতি কুণ্ডলিনীর গতি—ইনি একে একে চক্র পার হয়ে সহস্রারে গেলে দেবমানব সৃষ্টি হয়। তবে কুণ্ডলিনী জড়বৎ থাকেন, দেশকালের মত এঁর থেকে চৈতন্য সৃষ্টি হয় না। কথামৃত-৪।২৩।২]

মন সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের বাণী—মনকে যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, ঈশ্বরচিন্তা, হরি-কথা এই সব হবে। মনটি যদি কুসঙ্গে রাখো সেইরকম কথাবার্তা চিন্তা হয়ে যাবে। মনটি দুধের মত। এই সব তত্ত্বে আমরা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের মিল পাই। 'মিল' প্রভৃতি দার্শনিকদের এসোসিয়েসনিষ্ট বলা হয়। এদের মতে মনে যা কিছু জ্ঞান সমস্তই বহির্বিষয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধেই গড়ে ওঠে। এদের মতে মন যন্ত্র-স্বরূপ। শ্রীঠাকুরও বলেছেন,—আমি যন্ত্র [ফ্লুগেল—হানড্রেড ইয়ার্স্ অফ্ সাইকোলজি]

শ্রীঠাকুর আবার বলেছেন,—মনের বাস আজ্ঞাচক্রে! পাশ্চাত্ত্য দেশে কোন মনীষীদের [ডেকার্টস্—দি প্যাসন্স্ অফ্ দি সোল ; ষ্টাউট—মানুয়াল অফ্ সাইকোলজি] এই মত যে মনের বা আত্মার বাস পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড-এ [penial gland]। এই গ্ল্যাণ্ডই যে দ্বিদল চক্র একথা বলা বাহুল্য মাত্র। উপনিষদেও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মার বাস উল্লিখিত আছে। [কেন. উপ.]

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়। এই কথাটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। উইল, [will] বিলিফের [belief] মধ্যে একটি পারস্পরিকতা আছে। [টু ফোল্ড রিলেশন্] আর আনন্দ হওয়াটাও মনোবৈজ্ঞানিকের ধারা সম্মত। আরো বলেছেন বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞান তত বাড়বে। এও মনোবিজ্ঞান সম্মত কথা, সমস্ত জ্ঞানের পিছনে একটা বিশ্বাস প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান বলতে বুঝায় কতকগুলি চিন্তাধারা, সত্য বস্তুর সঙ্গে, এদের সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীঠাকুর বলেন—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। অগ্নি বল্লেই

দাহিকা শক্তি বোঝা যায়। সাবস্ট্যান্স ও এট্রিবিউট এর অদ্বয়ত্ব শ্রীঠাকুর এই ভাবে প্রতিপাদিত করলেন। সাধারণতঃ এ দুটি তত্ত্বে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীঠাকুরের মতে এদের মধ্যে নিত্য অভেদতত্ত্ব রয়েছে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন—দেহ যেন সরা, মন যেন জল, সেই জলে চিৎ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে অর্থাৎ দেহমন যেন চৈতন্যের আধার—চৈতন্য প্রতিফলিত হবার জন্যই তাদের প্রয়োজন। দেহ ও মন সেই হিসাবে পৃথক হলেও যুক্ত ভাবে আছে।

পাশ্চাত্ত্য মতে এটি ইণ্টারএকসনিজ্‌ম্ [interactionism]। প্রফেসর বুসে (Prof. Busse's) এর মতবাদও এই প্রকার। এঁর মতে চৈতন্য আধারই দেহ ও মন। দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের পুষ্টির যোগ আছে। দেহ ও মন যুক্তসত্ত্বা। (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস পৃঃ ৭৭৮) পাশ্চাত্ত্যে বিভিন্ন মতের মধ্যে এই মতই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

বর্তমানে কর্মযোগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীঠাকুর এর কারণ দিলেন যে, মায়েরই খেলা। উপমা দিয়ে বলেছেন,—চোর চোর খেলা দেখ নাই—বুড়ির ইচ্ছা খেলাটা চলে—অর্থাৎ কর্ম চলুক—মহামায়ার এই বিরাট ইচ্ছা।

ওয়্যারদিমার কফকা প্রভৃতির মতে জ্ঞান সামগ্রিক (Gestalt)। শ্রীঠাকুরের ভিতরেও দেখি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কথায়,— কানার হাতি দেখা খণ্ড জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান নয়। আরো একটি গল্পে এটি বিষদ করে তুলেছেন —সে গল্পটি গিরগিটি দেখার গল্প। আরো কফকা প্রভৃতির মতে জ্ঞান প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা লভ্য। শ্রীঠাকুরের বাণীতে তারি পরিপোষক অর্থ পাই।

কথামৃতে আছে কতকগুলো কানা, হাতীর কাছে এসে পড়েছিল।···হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল। কেউ বললে জালার মত, কেউ বললে থামের মত ··মহা বিবাদ। বহুরূপীকে জানাও এমনি, বা যে গাছ তলায় থাকে সেই ঠিক জানে। Kohlir, Koffka প্রভৃতি জেস্টাল্ট্‌ বাদীদের মতে জ্ঞান অর্জনের পিছনে আছে একটি প্রজ্ঞা দৃষ্টি (Instinct)। আমরা সামগ্রিক ভাবে দেখে তবেই জ্ঞান অর্জন করি [It is total reaction to a total response—Basic teachings] আর এই জ্ঞানার্জন সহসাই এসে উপস্থিত হয়। Bergson প্রভৃতিও এইরূপ কেটে কেটে নিয়ে জানার পক্ষপাতী নন, বৌদ্ধিক দৃষ্টির পক্ষপাতী। প্রজ্ঞাদৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। হেগেলও সমগ্রকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। খণ্ড দৃষ্টি তাঁর কাছে ভ্রান্ত দৃষ্টি।

আচার্য জেম্স্ ল্যাঙ্গ প্রভৃতির মতে 'সেনসেসান্' বা সংবিত্তি হতেই ভয়, দুঃখ প্রভৃতি 'ইমোসান' জাগে। শ্রীঠাকুর কিন্তু বললেন—চোরেরা ক্ষেতে ফসল চুরি করতে আসে। তাই ভয় দেখাবার জন্যে মানুষের চেহারা করে খড়ের ছবি রেখে দিয়েছে। একজন দেখে এসে বললে ভয় নাই। তবু বুক দুড় দুড় করছে। অর্থ এই—ভয় জাগাতে যে "সেনসেসান" হয়েছিল সেটা না থাকতেও ভয় থেকে যাচ্ছে। আরো বলেছেন—স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক দুদ্দুড় করে অর্থাৎ সেনসেসান না থাকলেও ভয় হতে পারে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন—উদ্দীপন হয়…শ্রীমতীর সেইরূপ হ'ত। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো। শোলার আতা দেখলে আসল আতা মনে পড়ে। মাটির কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মাকালী মা আনন্দময়ীর উদয় হয়। বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের মতে এগুলি ল' অফ্ এসোসিয়েসন এর মধ্যে পড়ে। Law of association এর তিনটি রূপ আছে। তন্মধ্যে Law of similarity-র মধ্যে এগুলি পড়ে। শ্রীঠাকুর আরো বলেছেন—মেড়গাঁ দিয়ে চৈতন্যদেব যাচ্ছিলেন, শুনলেন এগাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়, অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন—হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে—এ গুলি ল' অফ্ এসোসিয়েসনের মধ্যে পড়ে এবং ল' অফ্ কনটিগুইটির [Law of contiguity] উদাহরণ। ল' অফ্ কনট্রাষ্ট এর উদাহরণও কথামৃতে আছে। দুই বন্ধুর গল্প—একজন সৎস্থানে গেছে কিন্তু তার অসৎ স্থানের চিন্তা মনে উঠছে।

ফিজিওগনমি (physiognomy) সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের জ্ঞান অদ্ভুত ছিল। বলেছেন—চলনেতে লক্ষণ ভালমন্দ টের পাওয়া যায়—উনপাঁজুরে, বিড়ালচক্ষু, টেপা নাক, অসরল হয়। ভারী হাত, হাড় পেকে, কনুয়ের গাঁট মোটা, ঠোঁট ডোমের মত হলে নীচবুদ্ধি হয়। ট্যারা ভারি খল ও দুষ্টু হয়—টেরা চোখ, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।

চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞানও শ্রীঠাকুরের কিছু ছিল। সময় না হলে কিন্তু হয় না, বলে বলেছেন,—যখন খুব জ্বর তখন কুইনাইন দিলে কি হবে—ফিবার মিক্সচার দিয়ে, বাহ্যে-টাহ্যে হয়ে একটু কম পড়লে তখন কুইনাইন দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন দিতে হয় না। দেহেতে রস অনেক রয়েছে, কুইনাইনে কি কাজ হবে। আবার বলেছেন,—বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয় তবে কোনটি কফের নাড়ী কোনটি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

শ্রীঠাকুরের চিত্রকলার জ্ঞানও ছিল। নিজেই বলেছেন,—দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম। দেওয়ালে যশোদার ছবি দেখে বলেছেন,—ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনী মাসী হয়েছে।

উপরে আমরা দর্শন নীতি শাস্ত্রের তত্ত্বের কথা উদ্ধৃত করলাম। কথামৃতের প্রতি ছত্রে এসব গ্রথিত আছে। শ্রীঠাকুরের বাণীর মধ্যে বীজাকারে যে সব বর্তমান যুগের প্রধান প্রধান দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব উপরে দেওয়া হ'ল এগুলি দেবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীঠাকুর বিশ্বের মন্দিরে পূজারী হয়েছেন। কাজেই তাঁর জীবনায়নে বিশ্বের ভাবধারার কিছু কিছু নির্দেশ আমরা পেতে পারি। তাঁকে বিশ্বদেব বলে মানলে, বিশ্বের বাণীবার্তাবহ ব'লে মানতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামানুজ ও প্লটিনাস

শ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আপন মন্দিরে আছেন। সমবেত ভক্তদের কাছে বেদান্ত বিচার চলেছে। বলেন, জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি—আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া। জীব-জগৎ, আমি সবই লই, সব না নিলে ওজনে কম প'ড়বে। ব্রহ্ম জীব-জগৎ, বিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করে জীব-জগৎ ছেড়ে দিতে হয়। অহং দৃষ্টি যতক্ষণ ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন—এই বোধ হয়। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন ক'রলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস বীচি খোলা নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা।

শ্রীরামানুজ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার করেন ব্রহ্মসূত্রের এক বিস্তীর্ণ ভাষ্যে। এই ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। আচার্য রামানুজের আবির্ভাব কাল ১০১৭ খৃষ্টাব্দ। কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করা তাঁর ভাষ্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মতে ব্রহ্ম সগুণ। জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের শরীর-শরীরী সম্বন্ধ। তিনি তাঁদের অন্তর্যামী ও নিত্য নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ

সর্বশক্তিমান কিন্তু নির্গুণ নহেন 'নিরস্ত নিখিল দোষ'। জীব ও জগৎ তল্লীন হলেও স্বরূপত এতদুভয় হ'তে ভিন্ন। জগৎ তাঁর শরীর। শ্রীঠাকুরও উপমায় বল্লেন,—বেলের খোলা।

ইংরাজী দর্শনে ontologyর absolute বা ব্রহ্ম, আর ধর্মতত্ত্বে ঈশতত্ত্ব, কিন্তু তাঁর কাছে অদ্বয়তত্ত্ব। সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব তাঁর কাছে পার্থক্য হারিয়ে ফেলে এক অখণ্ড তত্ত্বে পরিণত হ'য়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্লটিনাসের মতের সঙ্গে রামানুজের ও ঠাকুরের মতবাদের মিল আছে। ইনি ২৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও একজন মিষ্টিক বা দ্রষ্টা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সৃষ্টি প্লটিনাসের মতে নিত্য। রামানুজও জীবজগতকে নিত্য বলেছেন।

শ্রীরামানুজের মতে ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ সবেরই প্রভব। তিনি আধার, নিয়ন্তা ও শেষিন প্রলয়কারী—তিনেরই সমন্বয়। ব্রহ্মকে জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ বলা হ'য়েছে। ঠাকুরও তাই।

প্লটিনাস বলেন—ভগবান আর তাঁর চিন্তা এক। প্রথমেই ভগবান নিজ স্বরূপকে চিন্তাতে পরিণত ক'রলেন। এক মতে সৃষ্টি ভগবানের নিকট হতে সূর্যের কিরণের মত এসেছে কিন্তু এতে তাঁর স্বরূপের ক্ষয় হয়নি। শ্রীঠাকুরের এমনি এক দর্শন হয়েছিল। শ্রীদেবেন্দ্র ঠাকুরের কাছে গেছেন। বলেন,—আমায় ঈশ্বরের কথা কিছু শুনাও। তিনি বলেন,—'এই জগৎ এক-একটি ঝাড়ের মত। জীব হ'চ্ছে এক-একটি ঝাড়ের দীপ। ঈশ্বর মানুষ করেছেন মহিমা প্রকাশ করবার জন্যই। বিজ্ঞানেও বলে আমাদের সৃষ্টি সব সূর্যের কাছ থেকে এসেছে। ঝাড়ের বাতি আলোর সৃষ্টি। ঝাড়ের মধ্যে একটি বড আলো থাকে আর তার ধারে ছোট ছোট আলো থাকে। বড় আলো ঈশ্বর আর ক্ষুদ্র অংশ জীব, আর ঝাড়ের কাঁচগুলি যেন জড়জগৎ।' শ্রীঠাকুর কথামৃতে বলেছেন—যেমন অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ। ৩।৪

শ্রীঠাকুরের এটি একটি দর্শনের কথা। প্লটিনাসের থেকেও বেদের দর্শন আর শ্রীঠাকুরের দর্শনের মহনীয়তা আমরা বুঝতে পারি। গীতামতে জীব শ্রীভগবানেরই অংশ। 'মমৈবাংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন'। কিন্তু প্লটিনাস শুধু emanations বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। প্লটিনাস বলেন, জীব তার শক্তি দেখাতে পারেনা কাজ ক'রতে পারেনা, যদি না জগৎ থাকে। দীপ না থাকলে ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

রামানুজের মতে সব জ্ঞানই সত্য। আমরা দেখি ঠাকুরও বলেছেন, জ্ঞানীর মতে স্বপ্ন অবস্থাও যেমন সত্য জাগরণ অবস্থাও তেমনি সত্য। (কথামৃত

২।১৩)। প্লটিনাসও বলেন, ভগবানের কাছ হ'তে প্রথম আসে বোধি। কাজেই একেও আমরা সত্য বলে নেবো। (World Philo. vol. I)

রামানুজের দর্শনে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। সাক্ষাৎকারী প্রমাণ প্রতক্ষ্যম্ (বেঙ্কট)। আর শ্রীঠাকুর এটিকে ধর্মাচরণ পর্যায়ে আনলেন। ব'ললেন— পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ে কোন কিছু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল। শোনার চেয়ে দেখা ভাল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা ভাল।

রামানুজ পন্থীরা শব্দশক্তির অন্বিতাভিধানবাদেরই অনুসরণ করেন। এই মতে আমরা শৈশব হ'তে গরুটাকে আন, ঘোড়াটাকে আন প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ করি আর গরু বা ঘোড়া শব্দের সঙ্গে আন প্রভৃতি পদের অন্বিত ক'রে গরু বা ঘোড়া শব্দের জ্ঞান অর্জন করি। পদের সঙ্গে কোন এক যোগ্য ক্রিয়াপদের অন্বয় দেখে আমরা শব্দের অর্থ বোধ করি। এই মতে বাক্য মধ্যে দুটি শক্তি থাকে। এক স্মারক শক্তি জ্ঞানগোচর হয়ে পদার্থের স্মরণ করিয়ে দেয় ও দ্বিতীয় শক্তিটী শ্রোতার জ্ঞানগোচর না হয়ে পদ সমুদয়ের পরস্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন করে। এর নাম অনুভাবক শক্তি।

(আশুশাস্ত্রী—বেদান্ত দর্শন পৃঃ ২৬৮)

শব্দ প্রমাণে আমরা দুটি অর্থের পরিচয় পাই বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। যেখানে শব্দের শক্তি লভ্য অর্থ গ্রহণ করলে বাক্যাঙ্গগুলির পরস্পর অন্বয় এবং অন্বয় মূলে কোনরূপে অর্থ বোধ সম্ভবপর হয় না কিংবা বক্তার উক্তির তাৎপর্যই জানা যায় না সে সকল ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ বা মুল্যার্থকে পরিত্যাগ করে গৌণার্থ বা লক্ষ্যার্থকে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এইটিই লক্ষণা লভ্য অর্থ বলে। গঙ্গায়াং ঘোষ প্রতিবসতি—এখানে গঙ্গানদী মধ্যে ঘোষরা বাস করেন এ সম্ভবপর নয়, গঙ্গানদীর তীরেই ঘোষরা বাস করেন এইটিই লক্ষ্যার্থ, রামানুজ সম্প্রদায় মুখ্যার্থের অনুপপত্তি লক্ষ্যণার মূল বলে গ্রহণ করেছেন। ঠাকুর কথামৃতে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে বলেছেন,—ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণে তাঁকে বলা যায় যেমন গঙ্গার ওপর ঘোষ পল্লী। নৈয়ায়িক-দের মত রামানুজ এবং মীমাংসকদের মত হতে ভিন্ন। তারা অন্বিতাভিধান এই মতবাদ মানেন না। তাঁদের মতের নাম অভিহিতান্বয় বাদ। এই মতে কোন পদ শুনে ঐ পদার্থের স্মৃতি শ্রোতার মনের মধ্যে জাগরিত হয়, তারপর আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির জন্য—বাক্যান্তর্গত অপরাপর পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্বয় বোধ উৎপন্ন হয়ে একটি অর্থের প্রকাশ হয়।

শব্দ শক্তি আর প্রত্যক্ষ—এবিষয়ে শ্রীঠাকুরের একটি দিকদর্শিকা আছে। শ্রীঠাকুর একদিন একটি গল্প বলেন। একজন দেখে আসে একটি বাড়ী প'ড়ে গেছে। অন্য একজন তাই শুনে বলেন, দাঁড়াও খবরের কাগজ দেখি, যদি থাকে বিশ্বাস করবো। খবরের কাগজে না পাওয়ায় তার কথা বিশ্বাস করে নাই। প্রত্যক্ষ আর শব্দ প্রমাণের মধ্যে এখানে শ্রীঠাকুর প্রত্যক্ষের উপরই জোর দিয়েছেন।

শ্রীঠাকুর একবার সাধুকে প্রশ্ন করেন,—ব্রহ্ম কিরূপ সাধু উত্তর দেন, শব্দই ব্রহ্ম। শ্রীঠাকুর বলেন,—শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছেন। সাধু একথা মানেন নাই। (কথামৃত ৪।৯।৪) এক্ষেত্রে আমরা রামানুজী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের মতের মিল দেখি। ভর্তৃহরি প্রভৃতি স্ফোটবাদীদের মত এই যে, বাক্যসকল উচ্চারণ করা মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই উহাদের সমষ্টি অসম্ভব। এইজন্য বাক্য সমষ্টিকে কোনমতেই পদের বাচক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এইজন্য বর্ণ সকলের অন্তরালে স্ফোট নামে এক নিত্য পদার্থই অর্থকে প্রকাশ করে, ইহা ব্রহ্মস্বরূপ। প্রস্ফুটিত করে বলেই এই নিত্য পদার্থকে স্ফোট বলা হয়।

কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রশ্ন—এক-একটি বর্ণকে স্ফোট প্রকাশ করিবে, না সমষ্টিকে করিবে? স্ফোটকবাদীরা সমষ্টি মানেন না, কাজেই এক এক বর্ণেরই স্ফোট সম্ভব। কিন্তু গ, র, উ এই তিনটি একত্র না হলে গরুকে বুঝায় না। কাজেই স্ফোট শক্তি প্রকাশিত হয় না, সমষ্টিগত না হলে (আশুশাস্ত্রী—বেদান্ত দর্শন পৃঃ ২৭৬—৭)।

এইভাবে রামানুজ সম্প্রদায় স্ফোটবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীঠাকুর পণ্ডিতের কথা, বাচ্য ওহি হ্যায় বাচক ওহি হ্যায় এটি মেনে নেন নি। অর্থাৎ শব্দে বাচক স্ফোট নয়—ব্রহ্ম স্বয়ং।

প্লটিনাস জগতের সব কিছুই যার থেকে এসেছে তাঁকে বলেছেন এক। কিন্তু কেউ তাঁকে জানতে পারে না। এই এক কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের এক নয়। শ্রীঠাকুর বলেছেন, তিনি দুয়ের পারে—এক দুয়ের মধ্যে, আরও বলেছেন, কে তাকে জানবে বল।

শ্রীঠাকুরের বেলের উপমা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেন, বেলের খোলা বাদ দিলে ওজন কমে যাবে। এটিতে একটি বিশেষ তত্ত্ব রয়েছে। বর্তমান দর্শনে Ontology বা মূলতত্ত্ব বড় একটি প্রয়োজনীয় মতবাদ। এখন যদি খোলা ফেলে দেওয়া হয় তবে ওজন কমে যাবে। আর মূল্যও

তখন কমে যাবে। তেমনি যদি জগৎ বাদ দেওয়া যায় তবে জগতের মূল্য কমে যাবে। নৈতিক মূল্য কমে যাবে। অদ্বৈত বেদান্তের সাধকদের মনে এই নৈতিক মূল্য অনেক সময় কম বোধ হয়েই যায়। আর Aesthetic বা সৌন্দর্য তত্ত্বের দিক থেকেও মূল্য কমে যাবে কাজেই কেবল ব্রহ্মকে সুন্দর বলা যায় না—জীব ও জগতের প্রয়োজন যে এর মধ্যে রয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্লটিনাস ত্রিতত্ত্ব মানেন। তাঁর মতে ত্রিতত্ত্ব মধ্যে রয়েছে প্রথম এক অদ্বিতীয়। তারপর Spirit তারপর Soul, এই Spirit বা ন্যুস হচ্ছেন এক অদ্বিতীয় সত্তার ছায়া—এটি যেন সূর্যের রশ্মি। আমরা আমাদের মন থেকে যখন অসৎ জিনিসগুলি সরিয়ে দি, যথা ইন্দ্রিয়জ বাসনা কামনাদি, তখন আমাদের যেটি থাকে সেটি হচ্ছে এই ন্যুস। আমাদের জীবাত্মা (Soul) যখন ভগবানের আলোক পায় তখন তাঁরি কৃপাতে তাঁকে দর্শন করে। যেমন সূর্যের আলোতেই সূর্যকে দর্শন করা। কি ভাবে করা যায়—? না সব সরিয়ে ফেলে। ঠাকুরও সার্জনের আলোর উপমা দিয়েছেন। এই Soul এর দুটি ভাগ আছে, একটি বাইরের একটি ভিতরের।

যেটি ভিতরের সেটি ন্যুসের প্রতি অনুরাগী। যেটি বাইরের সেটি নিম্নমুখী, সে জগৎ সৃষ্টি করে। রামানুজ এবং ঠাকুর এঁরা ত্রিতত্ত্ববাদী; তবে রামানুজের মতে সৃষ্টির ক্ষমতা জীবের বা জগতের নেই। শ্রীভগবানই সৃষ্টিকর্তা, —মুক্তিতেও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের এই পার্থক্য।

অবতারের ক্রমবিবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতারের ক্রম-বিকাশ (Evolution) আছে। এতে যেন মনে না হয় অবতারের ছোট বড় ব'লে কিছু আছে। সর্বকালেই এক এক দিক দিয়ে দেখলে, যুগ পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য যুগে মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। আবার অবতারেরা মহাকাল সাগরে এক একটি ফুট মাত্র, শ্রীঠাকুর নিজেই একথা বলেছেন।

মৎস্য কূর্মাদি অবতারের মধ্যে ক্রমবিকাশের স্তর রয়েছে। আবার ক্রমবিকাশের স্তরে আসার অনেকটা এগিয়ে এসে আমরা পাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শ্রীঠাকুর নিজমুখে বলেছেন—"যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণ।" ক্রমপরিণতির আধুনিক স্তরে ঠাকুরের এই প্রকাশ।

ক্রমবিকাশের মতবাদে Survival of the fittest বলে একটি তত্ত্ব আছে। এর অর্থ প্রকৃতির সংঘাতে যে জয়যুক্ত হ'তে পারে সেই যোগ্যতম। তারই বেঁচে থাকার কথা। আমরা দেখব যে শ্রীঠাকুর সেই বিষয়ে কতদূর 'fittest'.

বর্তমানে বিজ্ঞানের একটি কথা expanding universe—ক্রমবর্ধমান ব্রহ্মাণ্ড। আর আমাদের সব ধারণাই বর্ধমান। জগতের ধর্মও বর্ধমান। এক্ষেত্রে সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আরো— দৃষ্টিভঙ্গী এখন শুধু ভারতে নিবদ্ধ থাকলে চ'লবে না। উইলকির ওয়ান ওয়ার্লড। কাজেই সব প্রধান ধর্মগুলিকে গ্রহণ করতেই হবে বর্তমান অবতারকে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগও বটে। সেক্ষেত্রে অবতারকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিতে হবে। ডেকার্টে বিজ্ঞানীও বটেন, দর্শনেও বর্তমান যুগের উদ্‌গাতাও বটেন। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি—প্রথমেই সংশয় cogito ergo sum—আমি চিন্তা করি—এটিই একমাত্র সত্য। শ্রীঠাকুর নিজে যতক্ষণ না সত্য বলে জানতেন ততক্ষণ অবিশ্বাস করা 'দেখিয়ে' গেছেন। যেমন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিষয়ে তাঁর প্রথমে সন্দেহবাদ ও পরে দর্শনে বিশ্বাস। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তাঁর প্রথম থেকেই ছিল—এটি এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

এযুগ Economic যুগও। সাধারণে অর্থ সর্বস্ব। সে হিসাবে লোকের চক্ষে অসাধারণ হ'তে হ'লে দৈন্য অবলম্বন ক'রতে হবে। ভোগায়তন ছেড়ে রিক্ততার আশ্রয় নিতে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই পথ নেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও

সেই পন্থী। শ্রীমান মথুর ও লছমী মাড়োয়ারীর অর্থদান বিষয়ে শ্রীঠাকুরের ব্যবহার ত্যাগীর রাজার আদর্শই বলতে হবে।

বর্তমান যুগ জ্ঞানময় যুগ। শ্রীঠাকুর শাস্ত্র বহু শুনেছেন আর বলেছেন 'বাংলায় পড়ে নিয়েছি।' আর শাস্ত্রের সারকথা শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে জেনে নিয়েছেন প্রায়োপবেশন ক'রে। 'হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম,—মা বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দে, এই ব'লে।' জ্ঞানস্বরূপিণী শ্রীভবতারিণীও তাই জানিয়ে দিয়েছিলেন বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের সার কথা। আরো—শ্রীকথামৃত গ্রন্থে আমরা বহুশ পাই শ্রীঠাকুর তৎকালীন বিদগ্ধজনদের সান্নিধ্য কত ভালবাসতেন। তৎকালীন পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁর সংলাপ কথামৃতের বহু পাতায় শোভিত। ব'লতেন,—'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' নূতন তত্ত্ব বিচারে তাই তাঁর এত আগ্রহ ছিল। স্বামীপাদ বিবেকানন্দের সঙ্গে করাচীর 'সিন্ধ টাইম্‌সের' সম্পাদকের বিচার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিবেকস্বামীপাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এতে বোঝায় বিদ্যাবত্তার বৌদ্ধিক কুশাগ্রতার। আজ রামকৃষ্ণ সাধু সমাজের বৌদ্ধিক কুশলতার এই হেতু। ঠাকুর যদি প্রহ্লাদ পন্থী হতেন তবে হয়ত এদিকটা স্তিমিত হ'য়ে যেত। আবার নিজের অহং এত ক্ষুদ্র করে নিয়েছেন যে মনস্বী মোক্ষমুলারও অভিভূত হয়ে সেকথা লিখেছেন তাঁর 'A real Mahatma—Rammohon to Ramakrishna' পুস্তকে।

বর্তমান দার্শনিক দৃষ্টিতে Personalisim বলে একটি মতবাদ এসেছে। শ্রীঠাকুরের এ বিষয়েও বিরাটত্ব দেখি। সে যুগে এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ধর্ম রাজ্যে বিরল। কথামৃতে শ্রীঠাকুরের ভাষা দেখলে আমরা বুঝতে পারি বড় বড় ধর্মতত্ত্বে কেমন সাবলীল কথাসাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে। গল্পের মাধ্যমে ধর্ম রহস্যগুলি কেমন মিষ্ট ও ক্ষুদ্র আকারে পরিবেশিত হ'য়েছে, সেকথা যে কেউ নিজে লিখতে গেলেই দেখতে পাবেন যে, তার পিছনে কত দক্ষ শিল্পীমনের পরিচয় রয়েছে ···কত নূতন ভাষা সৃষ্টি হ'য়েছে। যেমন, 'কুমড়ো কাটা বট ঠাকুর' 'আঁশ চুপড়ির গন্ধ', 'শুটকে সাধু' ইত্যাদি।

জার্মান দার্শনিক নিটসের Will to power. আজকের জার্মানীর তো কথাই নাই, জগতের মতবাদেও এর বিশেষ একটি স্থান আছে। তিনি চান মহামানবের সৃষ্টি। কিন্তু এটি চাইতে গিয়ে তিনি ভগবানকে করেছেন মৃত। 'Thus spake Jarathrustra' নামক পুস্তকে। শ্রীঠাকুর মহামানবতার সৃষ্টি ক'রে গেলেন তাঁর এক এক সন্তানের দ্বারা, কিন্তু কোন কিছু উচ্ছেদ না ক'রেই —ভগবানকে তো নয়ই। কোন অবতারকেই খণ্ডিত করেন নাই—এমন কি

তৎকালীন মহান পুরুষদেরও দিয়েছেন যথেষ্ট সম্মান। হিমালয় নগাধিরাজ স্পষ্ট হয়নি অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ক'রে, সবার মধ্যে মধ্যমণি হ'য়েই হ'য়ে র'য়েছে—দেবাত্মা হিমালয়।

লয়েড মরগান ও আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি Emergent evolution বাদীদের মতে বিবর্তনে দেশকালে সহসা যে নবতম পরিবর্তন আসে, যথা—প্রাণ, মন ইত্যাদি সেগুলির পরিণামে ভগবৎ স্বরূপ প্রকাশিত হয় Nisus to Deity. শ্রীরামকৃষ্ণ-দেশ-কালের এই নবতম অবদান।

সন্ধ্যার সুর

ঠাকুর যেন সন্ধ্যার সুর—উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধ্যা—যুগ সন্ধিক্ষণ—যুগের দিশারী দ্বাদশটি তারা পরে পরে উঠেছিল জেগে বাংলার আকাশে—ঈশামসীর দ্বাদশটি তারার মত, মহাপ্রভুর ছয় গোস্বামীর মত। এরাই দিয়েছিল ঠাকুরকে চিনিয়ে। অচিনে গাছ সেদিন পাগল পূজারীর বেশে দক্ষিণেশ্বরে—কেউ চেনে না, আপনার কাছে আপনি গোপন ঠাকুরকে! এরাই যেন ঠাকুরের এ্যাপস্‌ল (apostle)। মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের লগ্নে শুনি অদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কার—আর দেখি দিনের পর দিন গম্ভীরার লীলা, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। আর ঠাকুরের? ঠাকুর যেন অস্তরেখার চন্দ্র—কেউ দুই, কেউ চার, কেউ ছয় বছর—ঠাকুরের সঙ্গে এইমাত্র ছিল সময়। শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্র, রেখায় রেখায় কানায় কানায় হয়নি রসবন্ত—ভক্তদের দল পুষ্ট হবার আগে ঝরে গেছে—বিদায় নিয়েছে শেষ বসন্তে।

স্বামীজী বলেছিলেন আগামী আড়াই হাজার বছরের খোরাক দিয়ে গেলাম। ঠাকুর কি যে দিয়ে গেছেন—কি যে আমরা পেয়েছি, কত সহস্র যুগ পরিসারী সে অবদান আজও কেউ কি তা বুঝেছে। নেচে নেচে সুরধুনীর কূলে আপনি গেছেন বলে—বাউলের দল এল গেল কেউ চিনলে না—কত যে নন্দন নৃত্যে আকুল হয়ে উঠেছে দখিণাপুর—কত যে সাধনার অনুবর্তন সাধনে দীর্ঘ ত্রিযামারজনী আরও দীর্ঘতর হয়েছে—নিজেই কিছু কিছু তার নিরিখ

রেখে গেছেন কথামৃতে, আর রেখে গেছেন দ্বাদশ দিকপালের জীবন সমিধে। নিজেই বলেছেন, ছ'বছর চোখের পাতা পড়েনি—ঘুম কাকে বলে জানতুম না, যে সূর্য-ত্রাটক করে রমণ মহর্ষির চোখের অন্ধকার বিদ্যুৎ দীপ্তি পেলো, সে সাধনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঠাকুর করলেন গোপন। মৌন বিস্ময়ে আমরা দেখি হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ—সাধন সমুদ্রের সমস্ত তীর্থ-দাবদগ্ধ ব্রততীর মত জীবন, চৌষট্টি খানি তন্ত্রের আগমনী হয়ে গেল নিরাজন। কিন্তু নিরাজন কি হয়েছে? আজ দেখি পদ্মপত্রের মত ফুটে উঠেছে কত দেবারাম কত শিক্ষায়তন—গুণ্ঠিত মন্ত্রের মত ধরণীর তীর্থ পথে জেগে উঠেছে কার স্বাগত বাণী—ওরে আমি এসেছি, আমি হয়েছি।

দক্ষিণেশ্বরে ভাঙ্গা ঘরে ভাঙ্গা ঘাটের কূল ঘেসে হাসি কান্নায় কত যে দিন গেছে কেটে! কি তার মহিমা কে জানে—দেবতা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে এক দেহে, অসীম সাগর যেন এসে মিশে গেছে সীমার পল্বলে। দেখি ভোরের কমলে জেগেছে দখিণার সমীরণ, ঢল ঢল নৃত্যে মুখর হয়ে উঠেছে মার প্রাঙ্গণ—মন্দির-প্রাকার—কখন বিশ্বের সাধনে নিভৃত গুহায় ডুবে গেছেন বিশ্বের দেবতা রামকৃষ্ণ···অমৃত সরোবরে বৃন্তহীন একটি সে ফুল। সপ্তর্ষিমণ্ডলে লেগেছে ধুম। শিশুর বেশে, নারায়ণের চোখে সন্ধানীর দৃষ্টি, খুঁজে ফিরছেন নরেন্দ্রনাথকে—তাঁকে যে জাগাতে হবে, নামাতে হবে ধরণীর ধূলায়—নইলে ধূলার কান্না মুছাবে কে? 'জাগো ঋষি, আমি যাচ্ছি'—বলেন ঠাকুর, 'তুমি যাবে না!' ধ্যানময় নিশা যায় কেটে, অম্লান দুটি প্রভাতী তারার মত নেমে আসেন ঠাকুর আর নরেন্দ্রনাথ। সেদিনের সে আবির্ভাব লগ্ন রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে বর্ণনায় ছিল না। আবার যেদিন এ যুগের শিব শঙ্কর বেপথু পদে চেয়েছেন বিদায়, হয়তো দিকহারা তারার মত খসে যেতে চেয়েছেন, মিলিয়ে যেতে চেয়েছেন আপনার অসীমে—সেদিনও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন অভিমানী নরেন্দ্রনাথকে। বাইরে দেখি ঠাকুরের আর স্বামীজীর চোখে উথলে উঠেছে সপ্তসাগর গঙ্গা যমুনা—লোকে জিজ্ঞাসা করে, কি হল মশায়? ঠাকুর বলেন, ও আমাদের একটি হয়ে গেল। ফেরালেন ঠাকুর, ফিরে এলো অসি ও বরুণা—করুণার্তি নিয়ে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ ক্রন্দসী ধরার তীরে। পঞ্চবটীর মূলে ভুলিয়ে নিয়ে গেছেন পার্থ সারথীকে—বিশ্বের কল্যাণে নামাবেন। স্বামীপাদ রুদ্ধ বৈরাগ্যে উত্তর দেন, আমি ওসব পারবো না। ধ্যান নিরোধিত দুই নয়নে সেদিন ঘনিয়ে এসেছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের সেই সমাধি তৃষ্ণা—কে ফেরাবে অসীম তীর্থ পথের এই পথিককে, এ উত্তাল তরঙ্গ কে রোধ করবে।

দীপ্ত সন্ন্যাসীর পথ রোধ করতে নেমে এল শ্যামল সন্ধ্যায় ভাঙ্গা একটি মেঘ। দুঃখের অন্ধকারে ধরে দিলেন আরো দুঃখের একটি চিত্র—গ'লে গেলেন স্বামীজী। মর্তের মুক্তি পথে তাইতো শুনি দেব বন্দিত কণ্ঠে বলেন তিনি, দেশের একটি কুকুর যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে খাওয়ানো আমার একমাত্র ধর্ম। একি বিশ্বনাথের ছেলে নরেন্দ্রের কথা? না—বিশ্বজয়ী শুক শঙ্কর বুদ্ধের করুণা মৈত্রী মুদিতার অবদান! দ্বাদশবর্ষের—শুধু দ্বাদশ বর্ষ কেন সারা জীবনের, সমস্ত অবতারবর্গের পুঞ্জীভূত সাধনার অবদান দিতে চাইলেন স্বামীপাদকে মন্ত্রগুরু চেতনায়। কিন্তু হিমাচলে জাগে বেপথু ভঙ্গী—জানালেন আমি ওসব নিয়ে কি করবো? ঠাকুর বললেন, কালে ওসব তোর কাজে লাগবে। তবু হন না রাজী—অষ্টসিদ্ধি শতসিদ্ধি মহাবীরের কাছে অতি তুচ্ছ।

তবু তো দেখি রজনী হয়েছে ঘন। জগতে শ্রাবণ শর্বরী—দ্বিতীয়ার শীর্ণ চাঁদ সেদিন অস্তচূড়ায়—হাত জোড় ক'রে নরেন্দ্রনাথকে বলছেন—বাবা আজ তোকে সব দিয়ে ফকীর হলুম। কি দিলেন, আর কি পেলেন—তিমিরান্বিত আছে সে কথা। তবে আমরা দেখছি দিকের চক্ররেখায় জেগে উঠেছে সহস্র মধুচক্র, জগতে গৌরজনের সর্ব আধি-ব্যাধির নির্বাণ ভূমি।

"কথামৃতে" নরেন্দ্রনাথ

আজ বিশ্বের দৃষ্টি পড়েছে স্বামীপাদের ওপর। অবিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় আবৃত সুদূর রাশিয়াতেও আজ স্বামীজীকে গ্রহণ করেছে—যুগ প্রবর্তক বলে। সেদিন তখন ছোট্ট একটি মুকুলিত মন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন—আর একটি মাত্র দিশারীর দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ। আমরা শ্রীঠাকুরের সেই দৃষ্টি প্রসাদ এখানে তুলে দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি।

নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনে শ্রীঠাকুরের নিজের যা মনে হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গে' পাই, "পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলাম নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও

বেশভূষার কোনরূপ পরিপাটি নেই, সবই যেন তার আলগা এবং চেয়ে দেখেই মনে হ'ল তার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করে টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব।" "পরে সে চলে গেলে তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরটা যেন কে গামছা নেঙরানোর মত জোর করে নেংড়াচ্ছে·····সামলাতে না পেরে যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, গিয়ে, ওরে তুই আয়রে করে কাঁদতাম।"

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর কি করেছিলেন ও আর কি বলেছিলেন এ সম্বন্ধে স্বামীজী নিজে বলেন, 'হ্যাঁরে এতদিন পরে আসতে হয়?' পরক্ষণেই স্বামীজীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে দেবতার মত তার প্রতি সম্মান দেখান—বলেন, "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরার শরীর ধারণ করেছ ইত্যাদি।" প্রথম দর্শনে স্বামীপাদের শ্রীঠাকুরকে উন্মাদের মত মনে হলেও ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী বলে ধারণা হয়।

১৮৮২ খৃঃ—মার্চ (তৃতীয় দর্শন)

ঠাকুর বলেন, "সংসারী লোকেরা কত কি বলে। হাতী যখন চলে যায়··· কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে তুই কি মনে করবি?" স্বামীজী,—'আমি মনে করবো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) 'নারে অতদূর নয়—ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে কারো সঙ্গে মাথা-মাখি চলে আবার মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়।

১৮৮২ খৃঃ—২৮ অক্টোবর।

ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে "যাকে নিয়ে আনন্দ হয় তাকেই লোকে চায়; তার বাড়ী কোথায় ইত্যাদি, খবরে কাজ কী, নরেন্দ্রকে যখন দেখি তখন আমি সব ভুলে যাই।"

(এখানে ঠাকুর স্বামীপাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ লোকসংগ্রহের আনন্দ সত্তার ইঙ্গিত দিলেন।)

১৮৮২ খৃঃ—১৬ই অক্টোবর

কথামৃতের আর এক জায়গায় ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে ব'স, আমি দেখি।'

ঠাকুর (নরেন্দ্রর প্রতি) ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে।

নরেন্দ্র—'আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে।'

ঠাকুর—'ওসব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়······আমার মাতৃ ভাব, সন্তান ভাব বড় শুদ্ধ ভাব।'

নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ, নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল—দেখলুম দেহে বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। হুঁস হলে বলে উঠলো, 'ওগো তুমি আমার কি করলে?' আমার যে মা বাপ আছে। যদুমল্লিকের বাড়ীতেও ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো। প্রাণ আটু বাটু করতে লাগলো। তখন ভোলানাথকে বললুম, হ্যাঁগো আমার মন এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, এর মানে ভাবতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়। এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে কাঁদতুম।

হাজরা আবার শিক্ষা দেয়—তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো? মহাভাবনা হলো। বল্লুম, মা হাজরা বলে নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য—আমি অত ভাবি কেন। সে বলে ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এদের চিন্তা কর কেন?—এই কথা বলতে, বলতে একেবারে দেখালে যে তিনিই মানুষ হয়েছেন শুদ্ধ আধারে—স্পষ্ট প্রকাশ হন। [১৮৮৩—২৯শে মার্চ]

'নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এইসব ছোকরা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।···এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না।' [১৮৮৩ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট]

নরেন্দ্রের গান শুনে শ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ উঠে পূর্বদিকের বারান্দায় চলে যান। ঠাকুর চোখ মেলে শূন্য তানপুরা পড়ে থাকতে দেখে বলেন—'আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো, আর গেল।'

(মনে হয় এই যে আগুন জ্বেলে গেছে বললেন এখানে ঠাকুর ভবিষ্যতে স্বামীজী যে জ্ঞানের আগুন, ত্যাগের আগুন, পবিত্রতার আগুন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন সেই দ্যোতনা বা পূর্বাভাসই এখানে দিলেন।) [১৮৮৩ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট]

প্রবন্ধাবলী-

ঠাকুর—'নরেন্দ্র ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখনা নরেন্দ্র কাকেও কেয়ার করে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নেই; যেন কোন বন্ধন নেই খুব ভালো আধার। গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয় বলেছে বিয়ে করবো না। নরেন্দ্র বেশী আসে না সে ভালো, বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।'

(স্বামীপদের ব্যক্তিত্ব ঠাকুরই প্রথম এইভাবে ধরতে পারেন।)

[১৮৮৩ খৃঃ ৯ই জুন]

নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর।

নরেন্দ্র সম্মুখে বসে বয়স ২২।২৩, কথা বলতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়ল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন সমাধিস্থ হলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়িয়ে দিয়ে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য চক্ষু স্পন্দহীন।

(প্রথম শক্তি সঞ্চার।) [১৮৮৩ খৃঃ ১৫ই জুন]

সোহহং সোহহং বল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখ ঠেলা। [১৮৮৪ খৃঃ ৮ই মে]

ঠাকুর (নরেন্দ্রের প্রতি)—'তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ ওতেও আছ তুমি এখন সব খেতে পারবে।'

(নরেন্দ্রের অবস্থা লাভের ইঙ্গিত।) [১৮৮৪ খৃঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর]

নরেন্দ্র এসেছেন ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রইল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করছেন। কাছে মাষ্টার, ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা হ'তে উপুড় হ'য়ে মাদুরের উপর শুয়ে পড়লেন হঠাৎ তাঁকে দেখতে দেখতে ঠাকুরের সমাধি হল। তাঁহার পিঠের উপরে গিয়ে বসলেন। সমাধিস্থ।

(শ্রীমহাপ্রভুর মত শক্তি সঞ্চার।)

ঠাকুর (নরেন্দ্রের প্রতি) 'ভাল আছিস? তুই নাকি গিরীশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস?'

নরেন্দ্র—'আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।'

গিরীশ কেবল ঠাকুরের কথাই কন। গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকবেন না—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবেন।

ঠাকুর—'গিরীশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস?'

'কিন্তু রসুনের বাটী যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা

শুদ্ধ আধার। কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই।......নতুন হাঁড়ি আর দৈ পাতা হাঁড়ি। দৈ পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়।......ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে।'

'গিরীশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো?'

নরেন্দ্র—'আমি কিছু বলি নাই। তিনিই বলেন, তার অবতার বলে বিশ্বাস।—আমি আর কিছু বল্লুম না।'

ঠাকুর—'কিন্তু খুব বিশ্বাস। দেখেছিস?' ঠাকুর—'একটু চুপ করিয়া নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখছেন।'

(সঙ্গাৎ সঞ্জয়তে কাম, মনোবিজ্ঞানের এসোসিয়েসানইজম্-এর ধারায় সাবধান করে দেওয়া।) [১৮৮৪খৃঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর]

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের বিষয়ে ভক্তগণকে বলছেন, 'ছোকরাদের ভালবাসি কেন? ওদের ভিতর কামিনী কাঞ্চন এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্য সিদ্ধ দেখি। নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হলো ভিতরে কিছু আছে।...যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম—ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম।' [১৮৮৫ খৃঃ ১৩ই জুন]

ঠাকুর নিজের ঘরে পায়চারি করছেন ও আজ কলকাতা যাওয়া সম্বন্ধে মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের সঙ্গে এসে প্রণাম করলেন—নরেন্দ্রকে দেখেই ঠাকুরের স্নেহ উথলে পড়লো, মুখে হাত দিয়ে আদর করলেন ও স্নেহ বিগলিত স্বরে বললেন 'তুমি এসেছ', আর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'নরেন্দ্র এসেছে আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়! কি বল?'

১৮৮৩, ৪ঠা জানুয়ারী কাশীপুর বাগানে ঠাকুর বসে আছেন স্বামীজী এসে বললেন, ঠাকুর মণিকে বললেন, 'কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে এসছিল।'

নরেন্দ্রনাথ—'আজ যাবো মনে করছি।'

ঠাকুর—'কোথায়?

নরেন্দ্র—'দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় ওখানে রাত্রে ধূনি জ্বালাবো।'

ঠাকুর—'না ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষরা) দেবে না, পঞ্চবটী বেশ জায়গা—অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে। আবার নরেন্দ্রের প্রতি—পড়বি না?'

নরেন্দ্র—'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।'

ঠাকুরের পাশে আঙ্গুরের বাক্স ছিল প্রথমেই নরেন্দ্রনাথকে দিলেন পরে অন্য সকলকে।

(পঞ্চবটী স্থান মাহাত্ম্য, জপধ্যানের সঙ্গে স্থানের সম্বন্ধ।)

[১৮৮৫ খৃঃ দক্ষিণেশ্বর]

(শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশের প্রতি)—'নরেন্দ্র খুব ভালো,······বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।'

(রাজপথে ঈশ্বরাবেশে) হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি দিয়ে—একটা কথা,—এই একটি (দেহী ?) ও একটি (জগৎ)। (ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডেকে বসালেন ও কত আদর করলেন)। নরেন্দ্র—'কৈ কালীর ধ্যান তিন চার দিন করলুম, কিছুই তো হ'ল না।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয় যিনিই ব্রহ্ম তিনি কালী। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন কালী বলে কই। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই।' ১৮৮৫ খৃঃ ২৫ অক্টোবর দক্ষিণেশ্বর শ্রীযুত বিজয় (নরেন্দ্রের প্রতি) 'কে একজন আমার সঙ্গে সর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন কোথায় কি হচ্ছে।'

'নরেন্দ্র আমিও এঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) নিজে অনেকবার দেখেছি আমি কি করে বলব আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

(ভবিষ্যৎ স্বামীপাদের বার্তাবহ হবার ইঙ্গিত।) [১৮৮৫ খৃঃ ৯ই আগষ্ট]

শ্রীঠাকুর—'আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভেতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুণী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর একধারে টকটকে লাল জ্যোতির সুরকীর কাঁড়ির মত। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র। সমাধিস্থ।

ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম—ও নরেন্দ্র! একটু চোখ চাইলে—বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বল্লাম, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীর রূপ দেখে।

বলরাম বলছেন,—'নরেন্দ্রের বুকে পা দিয়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছিল, কই আমার তো তা হয় নাই।'

ঠাকুর—'কি জান, কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায়। নরেন্দ্রাদির মনতো জড়ানো নয়—ওদের ভিতর এখনো কামিনী কাঞ্চন ঢোকে নাই। নরেন্দ্রকে দেখছো না ? সব মনটা ওর আমারি উপর আসছে।'

(স্বামীপাদের উচ্চ অবস্থা, দ্বিতীয় শক্তি—সঞ্চার।) [১৮৮৫ খৃঃ]

শ্রীঠাকুর—(নরেন্দ্রকে) 'বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।' বলতে বলতে ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরলেন,—

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই,
মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভয় বুঝি নরেন্দ্র আর কারও হল, আমার বুঝি হল না। নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চেয়ে আছেন।—

নরেন্দ্র পিতৃ বিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর উপর অনেক তাল যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, 'তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস ?'
শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।'

ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। মাষ্টার মশায়কে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে বলছেন—বেশ সরল, তবে সংসারের অনেক তাল পড়েছে তাই একটু চাপা ও থাকবে না।

ঠাকুর—নরেন্দ্র—নরেন্দ্র করে পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখের পংক্তিতে অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে বসেছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর নিচ্ছেন। অর্ধেক খাওয়া হতে না হতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা নিয়ে উপস্থিত। বললেন—"নরেন্দ্র তুই এইটুকু খা।"

(প্রসাদ দান ও তৃতীয় শক্তি সঞ্চার।)

১৮৮৫ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী। 'শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে অনেক ভক্ত এসেছেন তাদের সঙ্গে শ্রীঠাকুর কথা বলছেন—

ঠাকুর (গিরীশের প্রতি) 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি ; আর আমি ওর অনুগত।'

ঠাকুর—(সহাস্যে)। 'ওর মদ্দের ভাব (পুরুষের ভাব) আর আমার মেদি ভাব (প্রকৃতি ভাব)। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।'

[১৮৮৫ খৃঃ ১৫ই জুলাই]

শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে শ্রীঠাকুর—'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর। নিরাকার ঘর। পুরুষের স্বত্বা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই। এক একবার বসে খতাই। তা দেখি অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শ দল, কারু শতদল কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্র দল। অন্যেরা কলসী, ঘটী এসব হতে পারে—নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী। যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই। খুব আধার অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওয়ালা বাঁশী। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়

সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা, পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়—মাদী পায়রা চুপ করে থাকে। নরেন্দ্র পুরুষ—গাড়ীতে তাই ডানদিকে বসে। নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।'

উদ্যানবাটী ১৮৮৬, ঠাকুর—মাষ্টারকে নরেন্দ্রকে ডেকে আনতে বল্লেন। নরেন্দ্র উপরে এলেন ও ঠাকুরের কাছে বসলেন।

ঠাকুর—(নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে) 'একটু দু'জনে কথা কও। কথা প্রসঙ্গে গানের শেষে হীরালাল বলছেন—আমি নয় তুমি এখন তুঁহু তুঁহু।'

নরেন্দ্র—'Give me one and I will give you a million. আমি যদি এক পাই তা হলে নিযুত কোটি এসব অনায়াসে কত্তে পারি। তুমি ও আমি, আমি ও তুমি। আমি বই আর কিছু নাই।'

ঠাকুর—(হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) 'যেন খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

নরেন্দ্র—'কি আশ্চর্য। এত বৎসর প'ড়ে তবু বিদ্যা হয় না। কি ক'রে লোকে বলে যে দু তিন দিন সাধন করেছি ভগবান লাভ হবে। ভগবান লাভ কি এত সোজা। (শরতের প্রতি) তোর শান্তি হয়েছে, মাষ্টার মশায়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।'

মাষ্টার—তাহলে তুমি বরং জাব দাও আমরা রাজবাড়ী যাই।

নরেন্দ্র—'ঐ গল্প উনি (পরমহংসদেব) শুনেছিলেন, আর শুনতে শুনতে হেসেছিলেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা।'

নরেন্দ্র—'আমার কিছু ভাল লাগছে না। প্রায়োপোবেশন করবো?'

মণি—তা বেশ! ভগবানের জন্য সবই তো করা যায়।

নরেন্দ্র—'ভগবান নাই বোধ হচ্ছে। যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাই নাই। কত দেবতা। মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল্ জ্বল্ করছে। কত কালরূপ, আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছে না।'

[১৮৮৬ খৃঃ ১১ই মার্চ]

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ করতে লাগলেন। আবার বলছেন। 'এসব (নরেন্দ্রের) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ। মুখ চেহারা শুকনো হয়।'

১৮৮৭, বরানগর মঠে নরেন্দ্র গুরুভাই ও মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন—'তিনি যা যা বলতেন প্রথম আমি অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বল্লেন, 'তবে আসিস্ কেন?' আমি বললুম, আমি আপনাকে

দেখতে আসি কথা শুনতে নয়। · তিনি খুশী হলেন।' ৯ই এপ্রিল ১৮৮৭ খৃঃ —মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বরানগর মঠে বললেন, দক্ষিণেশ্বরে স্তব করতে লাগলেন "তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ! বলেছিলাম, 'মা আমি কি যেতে পারি। গেলে কার সঙ্গে কথা কব। মা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো তুই রাত্রে এলি এসে আমায় বললি, আমি এসেছি,—'আমি কিন্তু কিছু জানি না কলকাতার বাড়ীতে তোফা ঘুম মারছি।'...কাশীপুরে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।'

(চতুর্থ শক্তি সঞ্চার —ভবিষ্যৎ নির্দেশ)

আমি বলেছিলাম, 'আমি ওসব পারবো না তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।' ঠাকুর যখন কাশীপুরে আছেন তখন একদিন পাগলেন মত বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি চাস?' আমি বললাম, 'আমি সমাধিস্থ হ'য়ে থাকবো।' তিনি বল্লেন, 'তুইত বড় হীনবুদ্ধি, সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা বলতেন, 'তার গান শুনলে (বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।'

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত, গ্রহ দলে বসে বলছেন ঠাকুর—'নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ নিরাকারে নিষ্ঠা।'

১৮৮৭ খৃঃ বরানগর মঠে মাষ্টার মশায়কে স্বামীজী ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলছেন প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একদিন ভাবে বললেন ··'তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস?' নরেন্দ্র 'আজ্ঞে হ্যাঁ ঘুমোবার আগে কপালের কাছে কি' যেন একটি জ্যোতি ঘুরতে থাকে, একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরীশবাবুকে আমার বিষয় বলেছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না।'

মাষ্টার—হ্যাঁ শুনেছি······কাশীপুরে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল না?

স্বামীজী—হ্যাঁ সেই অবস্থায় বোধ হল যে আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি।······আমি সেই অবস্থায় কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম আমার কি হল। বুড়ো গোপাল ওপরে গিয়ে ঠাকুরকে বলেন 'নরেন্দ্র কাঁদছে।' দেখা হলে ঠাকুর বল্লেন, 'এখন টের পেলি; চাবি আমার কাছে রইল।' আমি

বল্লাম 'আমার কি হ'ল।' তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বল্লেন, ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি।'

(নির্বিকল্প লাভ।) [১৮৮৭ খৃঃ ৯ই মে]

বরানগরে মঠে ভাইদের প্রতি নরেন্দ্রনাথ—'আমায় পরমহংস প্রেম দিয়েছেন।'

(পঞ্চম পুরুসার্থ লাভ।)

বীর সন্ন্যাসী

কবি গেয়েছেন,—

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী
ছুটেছে জগৎ ময়—"

এটা নিছক Dictator দের যুগ। দিকে দিকে সব দিক্‌পালরা দাঁড়িয়ে আছেন,—হিটলার, মুসোলিনী, স্ট্যালিন—জগতের ভাগ্যচক্র এখন এদের হাতে। আমাদের ঋষিদের বংশধরের ভেতর ওরকম কারও আশা দুরাশা। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে Dictator অনেক এসেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাদের মধ্যে যে একজন সে কথা বোধ হয় বেশী করে বোঝাতে হবে না। বীর সন্ন্যাসী চিরকালই fighting monk ছিলেন। বলেছেন,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ"—দেশশুদ্ধ লোক কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি; ভগবান কিন্তু শুনছেনই না। আর শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মনুষেই শোনে না তা ভগবান। 'ঐ যে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, মিনমিনে পিনপিনে ও হচ্ছে তমোগুণ মৃত্যুর চিহ্ন। দে দিকি দেশশুদ্ধ মহাবীরের পূজো চালিয়ে,—এইসব ছিল তাঁর বাণী।

দেশে দেশে যে সব নব জাগরণের কথা শুনা যাচ্ছে Fascism, Nazism এই সবের ভেতর একটি নূতন প্রবাহ, একটা নব সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এইটাই জীবনের চিহ্ন। স্বামীজীও তাই বলেছেন,—expantion is life. It is better to rush out than to wear out, তাই নূতন করে গড়নের কথা তাঁর বীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, আমরা নির্বাক বিস্ময়ে শুনেছি। কিন্তু

মহাপুরুষের বাণী ফল্‌তে সময় লাগে, তাই তাঁর সব কথা এখন আস্তে আস্তে সফল হচ্ছে। অবতার, সকল যুগেই সকল দেশেই আসেন, কিন্তু অবতারকেও দেশ-কাল-পাত্র বিচার কর্তে হয়। আমরা ভাল বা মন্দ হোক শ্রেয়কে চেয়েছি তাই ধর্মের রাজ্যে অসংখ্য অবতার পেয়েছি। অন্য দেশ প্রেয়কে শ্রেয় বলে নিয়েছে। তাই সেই সব দেশে ভগবানের শক্তি সেই ভাবেই স্ফুরিত হয়েছে। ঠাকুরের কথা,—"ওরে, মা যার পেটে যা সয় তাকে তাই খেতে দেন।"

ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। স্বামীজীর জীবনে এ দুটি মূর্ত হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন,—"ওরে দয়া নয়, দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীব সেবা।" শুনে অন্য সকলে চুপ করে আছেন। স্বামীজী বললেন, —"কিছু বুঝলি?—মাথা থাকলে তো বুঝবি? আজ,যা বুঝলুম ঠাকুর দিন দেন তো দেখাবো—বনের বেদান্তকে কি করে ঘরে আনা যায়।" এর আগে সাধু হওয়া মানে ছিল দীনাতিদীন। জগতের সঙ্গে তার কোন ধরা ছোঁওয়া নেই। কিন্তু স্বামীজী বললেন—ও সবের দিন নেই। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" আর তাই আজ অসংখ্য গৈরিক-মণ্ডিত শির হিমাচল হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কোথায় আর্ত, কোথায় পতিত, দরিদ্র নারায়ণ পড়ে আছে—তাদের সেবা কর্তে ছুটে যাচ্ছেন।

স্বামীজীর হৃদয় যে কত বড় ছিল তার টীকা করতে শ্রীধর স্বামীর প্রয়োজন নেই। Americaয় তাঁকে এক Nigro স্বজাতি মনে করে অভিনন্দিত করেছিল, তিনি তাঁর সেই ভুল না ভাঙ্গিয়ে সেই রকমই ব্যবহার করেছিলেন। আবার সেখানে এক মহিলা বিপদে পড়ে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছেন। তিনি পকেট খুঁজে check বার করে বিনা বিচারে দিয়ে দিয়েছেন। Americaয় যখন প্রথম যান তখন এক সুসজ্জিত ঘরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি ভারতের সহস্র সহস্র দরিদ্রের কথা ভেবে চোখের জলে মাটিতে পড়ে রাত কাটিয়েছিলেন। একবার হিমালয় ভ্রমণ করতে করতে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন,—"হরি ভাই, ধর্ম কর্ম কিছুই বুঝলুম না, তবে বুকটা বড় বেড়ে গেছে।" সাঁওতালদের খাওয়াতে গিয়ে বলেছেন "তোরা যে নারায়ণ,—আজ আমার নারায়ণের সেবা হ'ল।" একবার স্বামীজী বেদান্ত পড়াচ্ছেন, এমন সময় গিরীশ ঘোষ এলেন। স্বামীজী বললেন, G. C. তুমি তো কেষ্ট বিষ্টু নিয়ে রয়ে গেলে, এসব তো কিছু পড়লে না। গিরীশ বাবু "জয় বেদান্তরূপী রামকৃষ্ণের জয়" বলে প্রণাম করে বললেন—দেশের এই য দুঃখ কষ্ট এর নিবারণের উপায় কি তোমার বেদান্তে আছে—বলে দেশের

দুরবস্থার এক বিশদ চিত্র স্বামীজীর সামনে ধরলেন। স্বামীজীর আর বেদান্ত পড়ান হ'ল না, ভাবাবেগ রোধ করতে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। গিরীশ বাবু তাঁর শিষ্যকে লক্ষ্য করে বললেন,—"এই জন্যেই তোদের স্বামীজীকে মানি —তার পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়।"

স্বামীজীর জীবনের কথা বিস্তৃতভাবে বলার সাধ্য আমার নেই। তবে কি অদ্ভুত লীলাই না ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের নিয়ে করেছেন ও এখনও করছেন।

ঠাকুর স্পর্শ ক'রে লোকের চৈতন্য করতেন। আবার স্বামীজী বেলুড়ে বললেন,—ব্রহ্ম দেখতে পাচ্ছিস্ না—করামলকবৎ—এই—এই—। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সব কিছুক্ষণের জন্য ব্রহ্মলীন হয়ে গেল। আবার আমেরিকায় রাজযোগের বিভূতি বোঝাচ্ছেন, এমন সময় তারা প্রমাণ দেখতে চাইলে, চকিতে যোগীবর তাদের নিগূঢ় প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে লাগলেন, যার ফলে গুডউইনের নাস্তিকতা চিরতরে অন্তর্হিত হয় আর তিনি 'শিষ্যস্তেঽহং' বলে স্বামীজীর শরণ গ্রহণ করেন। একজন মার্কিনবাসী ধনী তাঁকে বলেন যে, তিনি ওসব রাজযোগ বিশ্বাস করেন না। আর তার প্রমাণ স্বরূপ জানতে চান তাঁর অতীত জীবনের সব কথা। স্বামীজী কিছু না বলে কেবল এক দৃষ্টে তার দিকে চান। একটু পরে সেই ভদ্রলোক ভয়ে ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠেন,—থামুন—থামুন—স্বামীজী! এরপর আর তাঁকে সেখানে আসতে দেখা যায় নি। মাঠের মাঝে বুনো মোষ একটি স্ত্রীলোকের জীবন বিপন্ন করে, স্বামীজী কেবলমাত্র তার দিকে তাকিয়ে তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। বেলুড়ে পূজো হচ্ছে এমন সময় স্বামীজী আব্‌দেরে ছেলের মত শ্রীমাকে বললেন—"মা আমায় জ্বর দাও। ছেলেরা এত খাটছে তবু যদি কিছু দোষ দেখি তো রেগে যাবো। তার চেয়ে পড়ে থাকি।" বলতে বলতে জ্বর এল। তারপর সব শেষ হলে শ্রীমা এসে বললেন,—বাবা এবার ওঠ। তিনিও 'এই উঠি' বলে উঠে বসলেন। জ্বর আর নেই। মনের শক্তির কি Miracleই না দেখিয়েছেন। Encyclopaedia হতে শিষ্য প্রশ্ন করছেন আর স্বামীজী তার ভাষা শুদ্ধ বলে যাচ্ছেন—এমন কি কত পাতায় আছে তাও!

আত্মভোলা শঙ্কর যেন নিজেকে ভুলতে ক্রমাগত কাজ করে গেছেন। সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিকে ঠাকুর ভুলিয়ে যে কয়দিন রাখতে পেরেছিলেন সে কয়দিন তিনি যেন দিশেহারা হয়েই বেড়িয়েছেন। আমাদের শক্তি ও আধার অল্প। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদরূপে যাঁরা এসেছেন তাঁদের বুঝবার ক্ষমতা

নেই। স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে একজন ঠিকই বলেছেন—তাঁর শক্তির অতি অল্পই প্রকাশ পেয়েছে। পার্থ সারথি যে আর্তের চোখের জলে যুগে যুগে তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে করে না এসে পারেন না—সে কথা বুঝেও বুঝি না, তবু যখন আসমুদ্রহিমাচল এই পুণ্যভূমিতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে নবজাগরণের বাণী শুনি তখন মনে হয় একদিন গৈরিক মণ্ডিত শির শীর্ষে তুলে যে বীর সন্ন্যাসী ভারত তথা বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—"উঠ, জাগ"—"ওয়াহি গুরুজীকী ফতে"—এ শুধু তারি প্রত্যুত্তর না হলেও আশাহীন নয়—Victory to the Lord.

শ্রীল নিত্যানন্দ-বিবেকানন্দের জীবনে হাস্য পরিহাস

শ্রীল নিত্যানন্দ আর শ্রীমদ্ বিবেকানন্দের জীবনের অনেক মিল আছে। মহাপুরুষ মাত্রের জীবনেই এমন সঙ্গম সৃষ্টি হ'য়েছে মুক্তিতীর্থে।

স্বামী বিবেকানন্দ হাসিখুসি নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। সেজন্যে আমেরিকার জনৈক মনস্বী বলেছিলেন,—স্বামীজী মহারাজ আপনার গম্ভীর হ'য়ে থাকা উচিত। তাতে স্বামীজী বলেছিলেন—We are children of light আমরা কেন প্যাঁচার মত মুখ ক'রে থাকবো—।

আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পাই মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনের পথ হ'তে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছেন শ্রীপাদ। গৌরহরি প্রেমবিবশে চলেছেন বৃন্দাবন লক্ষ্য ক'রে—যেন দিকহারা একটি প্রভাতী তারা। পথের দিশারী কখনও পথ হারাতে পারে না—বোধহয় লীলাঙ্গনেরি এও একটা দিক। নদীয়াকে আবার ধন্য ক'রবেন বলেই যেন পথ হারালেন। যাই হোক কৌশলী নিত্যানন্দ ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন অদ্বৈতগৃহে। ভক্তের হল জয় জয়কার। ভগবানের যেন পরাজয়। শ্রীঠাকুর বলতেন, ভগবান কখনও ছুঁচ হন ভক্ত হন চুম্বক। ভক্ত গৃহে পরমানন্দরাতি হ'ল সুরু। ঠাকুরের ভোজন পর্ব শেষ হ'লে অদ্বৈতপ্রভু আর শ্রীপাদ বসলেন প্রসাদ গ্রহণে। চৈতন্য চরিতামৃতে পাই :

নিত্যানন্দ কহে আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোমার অন্ন কিছু না খাইল ॥

এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লৈয়া।
উঝালি ফেলিল আগে ক্রুদ্ধ হৈয়া॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্যের অঙ্গে।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য নাচে বহু রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলে ভয় না করিলে॥
নিত্যানন্দ বলে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে কৈলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি ধর্ম॥

কথামৃতে পাই, বরানগর মঠের একটি ঘটনা। স্বামীপাদেরা জলবার মন্ত্র নিয়ে তখন সুরু করেছেন অগ্নি তপস্যা……নরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছু পরে আবার বলছেন,—প্রায়োপোবেশন ক'রবো…মাষ্টার মশায় ব'লছেন, —তা বেশ ভগবানের জন্য সবই তো করা যায়। যদি ক্ষিদে সামলাতে না পারি, বলেন স্বামীজী,…একজন শুয়ে শুয়ে রহস্যভরে ব'লছেন, যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হ'য়েছেন,—ওরে আমায় একখানা ছুরী এনে দে রে—আর কাজ নাই, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে) ঐখানে আছে হাত বাড়িয়ে নে।…

নিত্যানন্দ প্রভু তখন শিবানন্দকে অগ্রণী ক'রে চলেছেন মহাপ্রভুর কাছে রাঘবের ঝালি বহন ক'রে। চলেছে ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সারা বছরের ভোজ্য ঝালি নিয়ে। শিবানন্দ সেন ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পথের কাণ্ডারী। আবাস-গৃহ, খাদ্য, পানীয়ের ব্যবস্থা, ঘাটোয়ালদের ঘাঁটীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এ সমস্তই দিতেন। সেবার কার্যন্তরে একটু দূরে গেছেন। ঘাঁটীর ব্যবস্থা তখনও হয়নি। বৈষ্ণবেরা বৃক্ষতলে বসে আছেন। অক্রোধ পরমানন্দ

যেন "ভোকে ব্যাকুল হইয়া" শিবানন্দের তিন পুত্রের নাম ক'রে অভিশাপ দিতে লাগলেন। শিবানন্দ গৃহিণী গালি শুনে পুত্রদের অমঙ্গল হবে ভেবে কাঁদতে লাগলেন। শিবানন্দ সেন ফিরে এসে সব শুনে কোনরকম ক্রোধ করা তো দূরে থাকুক সহধর্মিণীকে বললেন,—

"তিহো কহে বাউলী কেন মরিস কান্দিয়া
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া।"

শিবানন্দ নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে নিত্যানন্দ পদাঘাত করেন কিন্তু শিবানন্দ তা শাস্তি ছলে কৃপা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। এর পর দুই মহাপুরুষ আলিঙ্গনবদ্ধ হন।

আমরা জানি শশীমহারাজ আর স্বামী বিবেকানন্দ একবার কথান্তরে পড়ে গিয়েছিলেন। অদ্বৈতাবদী স্বামীজী মহারাজ তখন পূজাদি তেমন ভালবাসতেন না। শশীমহারাজের কিন্তু পূজা অন্ত প্রাণ ছিল। সেদিন আলমবাজার মঠে একটা অঘটন সুরু হল। স্বামীজী মহারাজ যত পূজার অসারতা দেখিয়ে শশীমহারাজাকে পূজা ক'রতে নিরস্ত ক'রছেন, শশীমহারাজ ততই ক্রোধে আপনহারা হ'য়ে যাচ্ছেন। শেষে ক্রোধে স্বামীজীকে চুলের মুঠি ধ'রে মন্দির থেকে বের ক'রে দিয়েছেন। বিবেক স্বামীজী কিছু বলেন নি। এর পরে এর সমাপ্তি প্রেমালিঙ্গনে।

এই দুই মহাপুরুষের দেখি যত তপস্যার গভীরতা তত সারসিকতা। এঁরা মনকে নিয়ে সাতটি সুরের মত খেলা ক'রতেন। উঁচুতে ওঠান বা নামান এঁদের কাছে কত সহজসাধ্য ছিল। মহাপুরুষদের জীবনে এটি একটি রহস্য নিগূঢ় তত্ত্ব।

পূজোঃ

আজ মা এসেছেন। মায়ের কি মূর্তি!—ছোট গড়নটির ভেতর মূর্তি যেন প্রাণময়। শুনলুম রাস্তায় লোকে পূজো হ'তে না হতেই দাঁড় করিয়ে মাকে দর্শন করেছে। আমাদের মায়ের তো কোন আড়ম্বরই নেই—তবু যেন মা ঝলমল ক'রছে—আয় মা আমার—মহেশ্বরী সর্বাণী আয়—।

সারাদিন দালানেই প'ড়ে রইলুম, ভাবলুম—মা তুই এমন রূপ ধরে এলি তোকে কেমন ক'রে বিসর্জন দেবো! চোখে কেবলি সেই দশমীর দিনটি-

জেগে উঠতে লাগলো—কানে যেন বিসর্জনের বাজনা শুনতে পেলুম—আমি আরও কাছে ঘেঁসে বসে রইলুম। সেই রাত্রেও ঐখানে শুলুম—মায়ের কাছ ছাড়তে আর ইচ্ছে হচ্ছে না—কেবল মায়ের সেই আলো ঝলমল মুখটি দেখি আর বসে থাকি—রাতেও সেই কাণ্ড—এমনি ক'রে তো পঞ্চমী কাটলো।

ষষ্ঠীর দিন তো সকালে উঠে নেয়েটেয়ে বসলুম। খানিকটা স্তোত্র পাঠ ক'রে চুপচাপ মায়ের কাছে বসে রইলুম। সারাদিন একখানা কম্বলে পড়ে রইলুম।

সপ্তমীর দিন তো খুব ভোর থাকতে উঠে পড়লুম। তাড়াতাড়ি সব শেষ করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রধান ঘটটা আমাকেই আনতে হবে—যেয়ে কোন রকমে নেয়ে······জল নিয়ে এলুম—মায়ের ত······নেই সেই ঐশ্বর্যের বোধনের মধ্য নি······এলুম··এসে আর নেয়ে মার······ সাজানো···ফুলটুল ঠিক করতে লাগলুম। সেদিন পূজো সারা হলে তবে খেলুম—ঢাক বাজনা সব এসে পড়ল। যা হোক সেদিন গেল, রাত্রে ইচ্ছে হল মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসবো, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লুম।

অষ্টমীর দিন আবার তেমনি সকাল সকাল উঠে মায়ের কাজ কর্তে লাগলুম —সব পদ্মফুলগুলো ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে দেওয়া—মায়ের চারদিকে ফুল সাজিয়ে দেওয়া এসব হ'লে পর কিছুক্ষণ স্তোত্র পাঠ করলুম, তারপর কুমারী পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি—হৃদপদ্ম দিয়ে দেওয়া গেল। সন্ধ্যেতে কিছুক্ষণ বলি নিয়ে তর্কের পর তো প্রদীপ এসব যোগাড় করতে লাগলুম। বলি হবে চিনির। বলির সময় ভেতরটা যে দুর দুর কর্তে লাগল—যদি না কাটে! ঘড়ি ঠিক করে আমি তো চিনির বলি ঠিক করতে লাগলুম—মধু চিনি মেখে বলি ঠিক হ'ল। তারপর ভয় ও আনন্দের ভেতরে বলি হ'ল। সে সময় সেই ভীষণ বাজনার সঙ্গে আর সেই প্রদীপের সারির আলোয় মনটা যেন একাগ্র হয়ে কেবল বলির কথাই ভাবছিল—কখন যে কোপ পড়ল মনেই পড়ে না। তারপর আরত্রিক হয়ে গেল—আমি কেবল ভাবছিলুম—নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে—সেদিনকার মনের অবস্থা এখন আমার ধারণাই হয় না। ঠাকুরমা তো মাকে আঁচলের বাতাস দিতে লাগলেন—মা যেন ঘেমে উঠেছেন!

তারপর নবমী তো সাধারণভাবে কেটে গেলে রাত্রে মায়ের কাছে একলা বসেছিলুম।

আজও অষ্টমী—কেবলই করুণ আবেশ······সামান্য পূজা সব হয়ে গেলো খুব শীগ্গির······মায়ের ছবি তোলবার জোগাড় করলুম। ········· ··। সন্ধ্যার

গোধূলি আলোতে·········জ্বলে উঠল—কি সুন্দর যে শোভা। ঈষৎ রক্তিম শ্রান্ত মুখটি যেন সমস্ত বিশ্বের সাজে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো।······যাবার আগে একবার যুদ্ধের ক্লান্ত বেশে আমাদের দেখা দিয়ে গেল। তারপর মায়ের মুখ বেশ শান্ত হ'ল। বাতির আলোয় শ্বেতবর্ণা মা যেন হাসছেন। আমরা মায়ের মাথায় একটা ছোট বিদ্যুতের আলো জ্বেলে দিলুম—যেন শশাঙ্কের টিপ পরিয়ে দেওয়া হল। তখন মায়ের মুখটি যে কি সুন্দর হয়েছিল তা বলা যায় না। তারপর তো আমরা দেরী করতে লাগলুম—মায়ের সামনে বসে আছি—চেয়ে আছি—। মন আর যেন বিসর্জন দিতে চায় না। ভাবছি মায়ের এ মুখটি কেমন করে মনে রাখবো, তাই একাগ্র হয়ে চেয়ে রইলুম, যতক্ষণ পারি দেখি। তারপর তো একরকম জোর ক'রে উঠলুম। তখন কনকাঞ্জলি হচ্ছে—সমস্ত দৃশ্যটি একটা বিষাদময়—সকলেই কনকাঞ্জলি দিয়ে কেঁদে উঠলো—আমি তখন বাইরে ঘুরছি—কেবল ঘুরছি—মনের আবেগ আর থামে না। তারপর বার হওয়া গেল। পথে মায়ের সেই ভুবনমোহিনী মূর্তি দেখে কত লোক ছুটে এসে পায়ের ধূলো নিলে, কত লোক দাঁড় করিয়ে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। তারপর তো আস্তে আস্তে নৌকায় মাকে ওঠালুম—সেখানেও লোক দৌড়েছিল···

আস্তে আস্তে মাকে বিসর্জন দেওয়া হল, আমরাও সিক্তনেত্রে, মৌন নিস্তব্ধতায় ফিরে এলুম। কেবল চারদিনের স্মৃতি আমার জীবনকে সজল করে রাখবে এই আশা নিয়ে···········ফিরলুম। হয়তো এই শেষ দেখা—আবার দেখা হবে কিনা কে জানে। সব বুকে······একান্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইছিল। ······হয়ে যেন মায়ের মূর্তি গ্রহণ করতে নিঃশব্দে··· ···

শেষ বিদায়ের ক্ষণে
আজকে নয়ন ঝুরে।

* শ্রীঠাকুরের বাড়ীর প্রথম পূজার সময় লেখা। কিশোর ঠাকুরের পুরানো খাতায়। খাতার কোন কোন অংশ ছিন্ন হওয়ায় লেখার মাঝে মাঝে শূন্য থেকে গেছে।

আমাদের ঠাকুর তখন কিশোর। বাড়ীতে পূজায় মা'র প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী নিতাই পালের নির্মিত ছোট একটি প্রতিমা আনা হয়েছিল। প্রতিমাটি রূপে অনবদ্য। সেইটি সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের ডায়রী থেকে উদ্ধৃত।

(বর্তমান লেখাটিও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত। শ্রীঠাকুরের লেখা 'তুলসীলীলা' নামক নাটিকাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতা পূজনীয় সেজ-কাকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

রাসেলীয় নৈতিক বিচার

দার্শনিক রাসেল তার Religion and Science পুস্তকে অনেক তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক আলেকজাণ্ডারের মতকে করেছেন খণ্ডিত। তিনি বলেন তার Emergent evolution মতবাদে অনেক যুক্তিহীন কথা আছে যার জন্যে এ'মতকে unsatisfactory বা বেশ মনঃপুত মনে হয় না। Determinatic (সবকিছুই স্থিরিকৃত) মতবাদকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই মতবাদ। এই মতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এইমতে ভবিষ্যতে ভগবৎ-তত্ত্ব যে আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে এটি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। অধ্যাপক আলেকজাণ্ডারের মতে যে অনুভূতিতে আমরা এই ধারণাতে পৌছাই সেটি হচ্ছে এক রহস্যময় অনুভূতি যা আমাদের ভয় পাইয়ে দিতে পারে অথবা আমাদের অসহায় অবস্থায় সাহায্য করতেও পারে। এটি কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

ডাঃ রাসেলের মতে নৃতত্ত্ববিদেরা কিন্তু উল্টো কথাই বলেন। তিনি বলেন, এই অমানুষিক শক্তি তা সে যতই আমাদের সহায়ক বা বিরুদ্ধবাদী হোক না কেন অসভ্য মানবের জীবনেই বেশী কার্যকরী। তিনি বলেন, যদি ধর্মকে এইরূপ চিন্তার সঙ্গে এক ক'রে নেওয়া যায়, তবে মানুষের প্রতি অগ্রগতিতে ধর্মের খর্বতা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আমরা আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভগবৎতত্ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এটি মোটেই যুক্তিসিদ্ধ তা মনে হয় না।

ডাঃ রাসেল আরো মনে করেন যে বিবর্তন ক্রমেতে তিনটি ধাপ আমরা পাই—জড়, জীবন ও মন। এখানেই সব শেষ মনা করা চলবে না। আরো কত দূরে যে evolution বা বিবর্তন আমাদের নিয়ে যাবে তার ঠিক নাই ; কিন্তু অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বলেন যে এর পরই ভগবৎতত্ত্ব আসবে আর এতেই শেষ। জড়জগৎ ভাবতেই পারেনি যে জীবজগৎ এর পর আসবে আর জীব-জগৎ ও মানসতত্ত্বের সন্ধান পায়নি কিন্তু মানসতত্ত্ব ভগবৎতত্ত্বের আভাস পেয়েছে। হয়ত এই মন অসভ্য বুশ্‌ম্যান বা পাপুয়াদের মন হবে (?) আরো এক কথা এই যে আলেকজাণ্ডারীয় ভগবৎ তত্ত্বকে জগৎই তৈরী করেছে, জগৎকে ভগবান করেন নি, কাজেই পূজার পূজ্য তিনি নন।

আমরা আপাত যুক্তিসিদ্ধ ডাঃ রাসেলের এই কথাগুলি একটু আলোচনা

করে দেখবো। স্যার জেম্‌স্ জিন্স বিজ্ঞান রাজ্যে ডাঃ রাসেল অপেক্ষা বিদগ্ধ ব্যক্তি। তিনি বলেন, বিজ্ঞানে আমরা কুসংস্কার থেকে যুক্তিবাদে পৌঁছালেও যুক্তিবাদ থেকে আবার আমরণ রহস্যবাদে গিয়ে পড়েছি। তাঁদের মতে science বা বিজ্ঞানে-এর মতবাদগুলি probable truths but average truth অর্থাৎ এগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা সত্য। আরো, বিজ্ঞানের মত পালটে যাচ্ছে। Newton-এর মতবাদের পরে এসেছে Einstein-এর মত, আবার আমাদের ডাঃ নারলিকার সে মত খণ্ডন করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। Russell নিজেই বলেছেন—যতক্ষণ আমরা মন আর জড় বিষয়ে চলিত মতবাদ গ্রহণ করি আমরা প্রত্যক্ষ যাকে বলি সেটি একটি রহস্যময় ব্যাপার। কারণ একটি বাইরের বস্তু থেকে সুরু ক'রে কি ক'রে চিন্তাযুক্ত দর্শনে পরিণত—যা আমরা দেখি তা আমাদের মাথার মধ্যকার ব্যাপারমাত্র। (Sir. Jeans, Physics and philosophy. P. 198)

Dr. Eddington বলেন—And so it seems to me that the first step in a broader revelation to me must be the awakening of image building in connection with the higher faculties of his nature, so that these are no longer blind alleys, but open out into a spiritual world—a world partly of illusion no doubt, but in which he lives no less than in the world, also of illusion, revealed by the senses.

এরপর আসে যে জড়জীবন মনেতেই শেষ করা যায় না। কিন্তু ডাঃ রাসেল যদি বৈজ্ঞানিক কথা মনে রাখেন তবে Sitter এর সৃষ্টি যে linear movement সে কথা ছেড়ে দিতে হবে। D. Sitter বলেন যে জগৎটা—ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে (expand করতে করতে) একটা সীমায় এসে আবার ছোট হ'তে থাকবে। একে linear development বলে। কাজেই মন অবধি এসেই সব শেষ হবে এটাই বিজ্ঞান সম্মত মনে হয়।

তিনি যখন বলেন যে আলেকজাণ্ডারীয় তত্ত্বে জগৎ ভগবানকে তৈরী করেছে তখন তাঁর মনে রাখা উচিত যে evolution তত্ত্বে কেউ কাউকে তৈরী করছে না, এটি আপনা আপনি হচ্ছে। ভগবৎতত্ত্ব আপনা আপনি প্রকাশিত হচ্ছেন—স্বমহিমায়। তিনি স্বপ্রকাশ। কালচক্রে প্রয়োজন মত মানস সত্তায় তিনি প্রকাশিত হন।

তিনি এই বিরাট বিশ্বে কোথাও অন্য মনের অস্তিত্ব দেখতে পান না। কিন্তু

বর্তমান sputnicগুলি যে ভাবে পর্যবেক্ষণ সুরু করছে তাতে scientific জগতে অনেকের ধারণা যে আমাদের জগৎ ছাড়া আরো বহু জগতে জীবনের প্রকাশ আমরা মেনে নিতে পারি। সংবাদপত্রে এই প্রকার মতবাদ কিছুদিন আগেই কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করেছেন।—জগতে ভগবত ইচ্ছাকে নস্যাৎ করতে ডাঃ জিন্সের কথা রাসেল উদ্ধৃত করে বলেছেন যে জীবনের কোন চিহ্ন পৃথিবী ছাড়া কোথাও নাই। অর্থাৎ ভগবৎ প্রকাশ যেন শুধু পৃথিবীতেই আবদ্ধ। কিন্তু তিনি তাঁর Philosophy of physical scienceএর শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—In the age of reason faith yet reigns supreme, for reason is an article of faith. In particular, the realisation that physical knowledge is concerned only with structure, points the way by which the conception of man as an element in a moral and spiritual order, can be dovetailed into the conception of man as the plaything of the forces of the material world. এই faithই আমাদের ভগবৎ বিশ্বাস।

মানুষ কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করতে যদি বিচারহীন ভাবে করে, তবে তার দর্শন dogmatic দর্শন বলে নিন্দিত হয়। আমরা দেখি রাসেল ভগবৎ সত্ত্বাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে বলেছেন, ভগবান যদি সর্বশক্তিমান তবে আগেই মানুষ তৈরী করলেই পারতেন, অন্যপ্রাণী যথা ম্যামথ প্রভৃতি জানোয়ার এসব না করে। কিন্তু তিনি এর আগে evolution বা বিবর্তবাদ কি জন্য মানলেন। বিবর্তবাদ মানলে নানা প্রাণীও মানতে হয়, না হলে বিবর্তবাদ কাকে নিয়ে হবে। তিনি যুক্তিহীন ভাবে বলেছেন, ভগবান পাপ কেন করলেন? পুণ্য করলেই যে পাপ করতেই হবে, না হলে পুণ্য থাকে কেমন করে? অন্ধকার আছে বলেই আলো আছে। A B C of Relativityতে যিনি relative জগতের কথায় লিখেছেন তাঁর ভগবানের প্রতি এত বিদ্বেষ যে নিজের লেখা জিনিসও ভুলে গেছেন—এ জগৎ Absolute জগৎ নয় এটি Relative জগৎ যে তাঁরই লেখা

বর্তমান সভ্যতা ও আস্তিক্য বিশ্বাস

বর্তমান সভ্যতায় প্রধানতঃ তিনটি দার্শনিক অবদান ধর্মের বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়েছে। এরা যথাক্রমে মেট্রিরিয়ালিজম্, ফ্রয়েডিয়ানিজম্ আর পজেটিভিজম্। ফ্রয়েডিয়নিষ্টদের মত এই যে, ভগবানকে মানুষ সৃষ্টি করেছে, ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁর মতের একটা অংশ আমরা এখানে বিবৃত করছি। শৈশবে আমাদের পিতামাতা ভয় দেখিয়ে আমাদের পড়াশুনা বা সৎপথে নিয়োজিত করেন। আমরা পিতামাতাকে ভয়ের চক্ষে দেখি এবং সেইভাবে আমাদের নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। এইসব ছেলেমেয়েরা কালে যখন এই মানস প্রকল্প নিয়ে বড় হ'য়ে ওঠে তখন পিতামাতা ইহজগৎ হ'তে অন্তর্ধান করেছেন। এইসব ছেলেমেয়েরা তখন ভয়ের মানস সত্ত্বাকে ছাড়তে পারে না, কাজেই তখন তারা এক ভগবানের পরিকল্পনা মনে মনে করে। ইনিই হচ্ছেন Father image। ধর্ম ভয়ের ভিত্তি এইভাবে গড়ে ওঠে, আর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবন এরই ওপরে নির্ভর ক'রে চলতে থাকে। নৈতিক জীবনও এই ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে।

কথাটা আংশিক সত্য। আমরা জানি যে প্রথম সমাজ গ'ড়ে উঠেছে মাতৃতন্ত্রে বা Matriarchy নিয়ে। সেই সময় যাষাবর পুরুষদের একস্থানে স্থায়ী বসবাস গড়ে ওঠেনি; সভ্যতার সেই উষালগ্নে মা-ই ছিল সর্বময়ী কর্ত্রী ও সমাজ সংগঠক। কাজেই Father image না হয়ে Mother image হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের অধিকাংশ সহজাত বৃত্তিগুলি পশুপর্যায় হ'তে গৃহীত। সেক্ষেত্রে পশুদের ভিতর ভগবত চৈতন্য গড়ে ওঠে না। তারাও তো ভয় পায় এবং অতি শিশু অবস্থায় পিতার অনুগত থাকে। আর একটি কথা হচ্ছে প্রথম যে মানুষ সমাজ গড়ে উঠেছিল তাদের ভিতরে—এই ভয়ের কথা ভগবত চৈতন্যে কি করে পরিণত হয়? দ্বিতীয়তঃ অর্ধপশু-মানব স্তরে স্মৃতি খুবই অপুষ্ট থাকতো সেই হিসাবে বাল্যের স্মৃতি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাওয়ার কথা। আরও একটি কথা যে, পিতামাতা আর ভগবততত্ত্ব এই দুয়ের ভিতরে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সে ব্যবধান দূর হয়ে যায় কি করে? বাবা, মা যতই হোক তাদের ভিতর একটি সীমা থাকে, কিন্তু ভগবততত্ত্ব অসীম। আমাদের ভিতরে যদি একটি পরম পিতার ছোঁওয়া বা

নিউক্লিয়ার ফরমেশন না থাকে, তা'হলে আমরা এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান পার হই কি করে ?

এরপর আমরা আসি মেটিরিয়ালিজম্‌তত্ত্বে। এই মতের বিজ্ঞান অনুসারে আমরা দেখি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্টির আদিতে মন বা আত্মা কিছুই ছিল না। জড়ের সমষ্টি বা জড়ের খেলাই এই জগতের আদিতত্ত্ব। আমাদের অণুপরমাণুর বিভিন্ন সংযোজনে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কাজেই মন জড় হ'তে উদ্ভূত এবং সেটিও জড়। এদের মতে আত্মা বা পরমাত্মা ভগবান এসব তত্ত্ব সম্প্রদায় বিশেষের শোষণ নীতি হতে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ প্রলেটেরিয়েট বা শ্রমিক সম্প্রদায়কে সরল ও মূর্খ দেখে এদের মতে পরকাল, ধর্ম, নৈতিকতা, ধর্মীয় জীবনের দোহাই দিয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করেছে। আফিং-এর নেশায় যেমন লোকে নানা কল্পনা দেখে, ধর্ম এবং ঈশতত্ত্ব তেমনি কল্পনার বস্তু। কিন্তু বর্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা আমরা একটু ভেবে নেবো। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি যেসব পরমাণু পৃথিবীর আদিতত্ত্ব বলে বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে, সে সব শেষ পর্যন্ত দেশ কালের উপর নির্ভর করেছে—Time-space continuum। বৈজ্ঞানিকদের মতে Time-space হচ্ছে mental construct। এটি স্যার জেমস্ জিন্স্, আইনষ্টাইন প্রভৃতির মত। জেমস্ জিন্স ভগবানকে একজন Great Mathematician বলে আখ্যা দিয়েছেন তাঁর Mysterious Universe বইতে। বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল বলেন, জড় আর মনের ভিতরে যে সীমারেখা তা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। জড় মনের পর্যায়ে এসে পড়ছে, আর মন এসে পড়ছে জড়ের পর্যায়ে। তা ছাড়াও কোন কোন মনস্বীদের মত যে Dust Cloud—সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ বলে ধরা হয়েছে, যার থেকে বর্তমান গ্রহ-তারকার উদ্ভব ; সেই Dust Cloud এর ভিতরও জীবনের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। প্রায় পঞ্চাশটি বড় বড় বৈজ্ঞানিক ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেছেন। এই পুস্তকখানির নাম Evidence of God in the Expanding Universe. এটি J. C. Monsma'র সংগ্রহ।

এরপর আসে পজেটিভিজম্। এই মতবাদে কোন অজাগতিক কথা মানতে চায় না। তাঁদের মত হচ্ছে আমাদের সত্যবস্তু পাবার একমাত্র উপায় Logic এবং Science ; ভগবৎতত্ত্ব এর ভিতর পড়ে না। ভগবৎতত্ত্বের কথা তাঁরা উড়িয়ে দিলেও আমরা জানি যে Science এবং Logic ছাড়াও আমাদের সত্যবস্তু উপলব্ধি হয়। যেমন শ্রীতত্ত্ব বা Aesthetic তত্ত্ব। কোন

জিনিস, যেমন হিমালয়ের রূপময় দৃশ্য—কিন্তু science এর প্রমাণ দেয় না। মঙ্গলময়ী উষা কি সন্ধ্যার নম্র সৌন্দর্য আমাদের এত ভাল লাগে কেন তা যদি analysis করি বা বিজ্ঞান সম্মত কেটে ছেঁটে বিচার করি তাহলে ঠিক হবে না। Science স্বীকৃত সত্য ছাড়া জগতে আর কোন সত্য নাই একথা যে কত ভুল তার প্রমাণ science আজ যা বলছে কাল তা পাল্টে দিচ্ছে। নিউটনের মতবাদ আইনষ্টাইন খণ্ডন করছে। আবার, আইনষ্টাইনের মতবাদ আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক নারলিকার খণ্ডিত করছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের যে সব সত্য বেরিয়েছে সে সব সত্য সংখ্যায় এত অকিঞ্চিৎকর যে সমুদ্রের বালির সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে। মহামতি নিউটন এই কথাই বলেছেন।

এই বিশ্বপ্রকৃতি—Expanding Universe ক্রমাগত বৃহৎ হতে বৃহত্তর পথে চলেছে। তার তত্ত্ব মানুষের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির কাছে যে কত অসীম তা আমাদের অজ্ঞাত। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধিও পশুদের কাছে হীন একথা আমরা জানি। আলোর তরঙ্গ বা শব্দের তরঙ্গের পরিমাপে বিশেষ বিশেষ পশুদের মধ্যে অনেক উৎকর্ষতা দেখা যায়। কাজেই আমরা দেখছি এই যে তিনটি ধর্মের বিরোধী মতবাদ তারা কত অসার।

কথামৃতের কল্পলতা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে যে গল্পের কল্পলতা আছে ইংরাজীতে সেগুলিকে প্যারাবল বলা হয়। জগতের ঐতিহ্যে এই প্যারাবলগুলির বিশেষ স্থান আছে—ধর্মরাজ্যে বিশেষ করে। এই প্যারাবল বা নীতি কল্পলতাগুলির ধাতুগত অর্থ, একটিকে আর একটির পাশে রেখে তুলনা করা। এরিষ্টটল বলেছেন, অন্যকে স্বমতে আনার জন্যই এদের উদ্ভব। (রেব ২।২০)

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এই কল্পলতাগুলির ব্যবহার রয়েছে। আমরা সেগুলির আলোচনায় দেখি ভগবান ঈশামসি এই নীতি-গল্পগুলির প্রচুর ব্যবহার করেছেন আর পাশ্চাত্ত্যদের মতে তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে ভগবান ঈশার নীতি-গল্পগুলির মধ্যে কিছু কিছু অব্যবস্থা দেখা যায়।

জুলিচার (Julicher) বলেন, নির্দোষ নীতি-গল্পগুলি হওয়া চাই সহজ, তাতে থাকবে একটিমাত্র শিক্ষার কথা, আর এগুলি হবে ধর্মবিষয়ক কথা। কিন্তু ঈশামসির নীতি-কাহিনীগুলিতে অনেক সময় একাধিক তত্ত্ব কথার দ্যোতনা থাকত অথবা সেগুলির অর্থ একটু গভীরতায় থাকত ঢাকা। যেমন —'প্যারাবল অফ্ দি কিংডাম' এর গল্প বলতে গিয়ে বলেছেন—সাধু ইসাইয়াস (Esaias) বলছেন,—তোমরা শুনেও শুনতে পাবে না, দেখেও দেখতে পাবে না তাই তিনি 'প্যারাবল অফ্ দি কিংডাম'কে দুরূহ করে তুলে ধরেছেন। আর অনেক সময় তিনি এর মধ্যে একাধিক দ্যোতনা রাখতেন গূঢ় করে।

গল্প বলা আর গল্প শুনা, সব জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীন প্রথা। যেমন আমরা ওমাহা ইণ্ডিয়ানদের দেখি—গল্পের আসর এদের শীতের সন্ধ্যাকে করতো আনন্দ মন্থর। এই সময় গ্রাম্য-বৃদ্ধেরা তাদের স্মৃতি সঞ্চয় থেকে ভূত-প্রেতাদির গল্প করত পরিবেশন। এই গল্পগুলি সাগা (Saga) ও মারচেন (Marchen) নামে খ্যাত। এই সাগা ও মারচেনগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ সম্বলিতও হত। এইসব শিব-গল্পগাথা বর্তমানের অনেক লেখকদের অনার্যজুষ্ট লেখনীতে আর দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমানের লেখকদের সম্বন্ধে নিউইয়র্কের অধ্যাপক I. Du. Pont Coleman লিখেছেন—বর্তমানে অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকেরা এক বিপদের সৃষ্টি করেছেন। ভাল নভেল লেখায় যে অর্থ পাওয়া যায় তাতে দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকেরা তাদের শক্তির অপব্যবহার করেন। আর তাঁরা ঐ পুরস্কার লাভ করেন সাধারণ পাঠকদের অমার্জিত অথবা হীন রুচির খোরাক জুগিয়েই আর ভাল লেখকেরাও ঐ লোভ সংবরণ করতে পারেন নাই (Ency. Reli & Ethics P. 12 Vol. 6)। যে সাহিত্য সমাজ-দেহে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না সে সাহিত্য সমাজ-অঙ্গে দুষ্ট ব্রণই সৃষ্টি করে।

বৌদ্ধধর্মে ভগবান তথাগতের জীবনীতে জাতক কল্পলতাগুলি উচ্চ তত্ত্বের নীতিগল্পের সমষ্টি, কিন্তু বৌদ্ধ নীতিগল্পগুলির মালমশলা রাজা-মহারাজাদের কাহিনী, চাষীদের জীবনী, জীবজন্তুদের আর গাছপালার কথায় ভরপুর। আর কথামৃতের গল্পে রাজা-মহারাজের কথা নাই বল্লেই হয়। এতে আছে নানা প্রাণীর কথা—বহুরূপী, হাতী, মাছমুখে চিল, হোমাপাখী, ফোঁসছাড়া সাপ, নির্ভরশীল ব্যাঙ আর আছে সাধারণ মানুষের কথা, যেমন এগিয়ে পড়া, কাঠুরিয়া, খানদানী চাষী, ভক্ত সাজা স্বর্ণবণিক, সত্য বাজীকর, ভক্ত তাঁতী, দারবান, মেছুনী, জহরী আর বেগুনওয়ালা প্রভৃতি। সমস্ত মিলে প্রায়

শতাধিক গল্পের স্থান রয়েছে এই কথামৃতে। তাও ধর্মের, কনফুসিয় ধর্মের লেখকদের মধ্যেও এই রকম কথা শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র কোরাণেও নীতিগল্পগুলিকে ভগবানেরই সৃষ্টি বলে বর্ণনা আছে। একই গল্প বিভিন্ন ধর্মসাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন বাজিকরের গল্প রয়েছে কথামৃতে, বুদ্ধ নীতি-কথায়, আবার অন্ধের দর্শনের কথা —কথামৃতে ও বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে আছে। 'প্যারাবল অফ্ দি সাওয়ার' নামক বাইবেলের গল্পটি 'সংযুক্ত-নিকায়ে' আছে। এতে মনে হয় নীতিগল্পগুলির একটি বিশ্বজনীনতা আছে।

মনস্বী হেভেট (Havet) এর মতে ঈশামসির নীতি-গল্পগুলি ভারত থেকে নেওয়া এটাও দেখবেন। পণ্ডিত বেনফে (J. Benfey সমস্ত নীতি-গল্পগুলিকেই বৌদ্ধধর্মের কাছে ধার করে নেওয়া বলে মনে করেন। হয়ত ভারতের চিন্তা, ঋষিদের চিন্তা, ভূমায় পরিণত হয়েছিল। ছোট ছোট কথা দিয়ে ছোট ছোট গল্পের এক প্রাণধর্ম আছে। Short Wave কম্পনের শক্তি যেমন বহুদূর বিসারী, তেমনি সেই ছোট ছোট কথায় গাথা ছোট ছোট গল্পগুলির দ্যোতনা অমোঘ। যার জন্য বাইবেল এত আদৃত। কথামৃত আজ বিশ্বের বাইবেল বলে গণ্য হতে চলেছে। বিশেষ এতে প্রধান প্রধান সব জাতির, সব ধর্মের কথাই তো রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে আজ প্রায় সব প্রধান ভাষায় এর স্থান অবিসংবাদি।

আরো, কথামৃতের ভাষার অনবদ্যতা, এক নূতন কথা-সাহিত্যে সৃষ্টি করেছে। কত নূতন উপমা রয়েছে এর ভিতর। যেমন—'গম্ভীর জল', 'একঘেয়ে হব না', 'খাল জমিতে জল', 'আঁস চুপড়ীর গন্ধ', 'ছেলে মা যাব বলে', 'পৌগণ্ড অবস্থা', 'গলার মটর গিড় গিড় করে', 'শুটকে সাধু', 'বুকে বিল্লী আঁচড়াছে', 'ভস্ করে ওঠা তুবড়ী' এমনি কত মিষ্টি চলতি উপমা দেওয়া হয়েছে। সে যুগে তখনও দিব্য অথচ চলতি ভাষার ব্যবহার স্থরু হয়নি। হয় 'আলালী' 'হুতোমী' ভাষা, না হয় শুদ্ধ 'বঙ্কিমী' ভাষার যুগ সেটা। কথা শেষ করে আবার তার একটু খেই টেনে নেওয়া কথা সাহিত্যের একটি মধুর বিশেষত্ব। যেমন—এখনও ভগবতীর পূজা, মেলার সময় হয়—বারুণী দিনে; বাহিরের কর্ম কখনও কখনও সাধ কোরে করে—লোকশিক্ষার জন্য।

কথামৃতের ভাষা ভাববাহী আর জ্ঞানবাহী দুই-ই। যেমন "চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে", "জগতের সব গম্ভীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন" আবার সেটি ভাব-তান্ত্রিক, বস্তুতান্ত্রিক দুই-ই বটে। যেমন—যদু মল্লিকের ঐশ্বর্য দেখে সবাই, বাবুকে খোঁজে ক'জন। আবার মাঝে মাঝে লঘু পরিবেশের সৃষ্টিও করেছেন—

কৃষ্ণকিশোরকে বলছেন—তুমি তো 'খ'—তবে যদি টেক্ক (বাড়ীর) না থাকত। কিছু কিছু খেউরও কথা-সাহিত্যে প্রয়োজন। যেমন—আমড়া কেবল আঁঠি আর চামড়া—খেলে হয় অম্লশূল, যাত্রাওয়ালা প্রায় ঐ রকম হয়, গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। সর্বদা ভাবে থাকতেন অথচ কি গভীর দৃষ্টি—রস সাহিত্যিকের দৃষ্টি—এমনি কত আছে! বলতেন, আমি আঁস জলও দি। বিশেষ ঐ থাকের ভক্তও তো আসত। কথামৃত শুধু সাধুদের জন্যই তো নয়, সব নিয়ে কথামৃত একটি কাব্যবিশেষ। তিনি যে কবি যুগে যুগেই।

মানবতার এই বাইবেলে রয়েছে ধর্মের কত না গূঢ় তত্ত্ব, যেমন সাংখ্য দর্শনের পুরুষের নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসবধর্মী স্বভাবের সঙ্গে বিবাহ উৎসবে নিশ্চেষ্ট গৃহকর্তার আর গৃহকর্ত্রীর তুলনা। মার্থা মেরীর অনুরাগের কথা—মহামহিম আল্লার কথা, ভগবান বুদ্ধের কথা, কি যে নাই! আরো রয়েছে সমসাময়িক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের আলাপ-সংলাপ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি মাইকেল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আরো কত না জীবনাদর্শ ধরা এর পত্রে। ধার্মিক তাঁতীর রামের ইচ্ছায় জীবনায়ন, ফোঁস না করা সাপের চরিত্র। এমনি কত তত্ত্বমণিই যে ছড়ান রয়েছে কথামৃতের পাতায় পাতায়! আর আছে মিষ্ট কথায় নিজের লীলাঞ্চন, নানা ভক্তসঙ্গ, নানা পরিবেশে রঙ্গিন তার পর্ণপুট আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ছন্দিত হয়ে রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত; সমস্ত কথামৃত যেন এক সব পেয়েছির স্বর্গ—মর্ত্যের বুকে অমরার অবদান—নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য ভগনানের সঙ্গ।

অধ্যাপক ওয়ালটার রুবেন

অধ্যাপক ওয়ালটার রুবেন একজন বিখ্যাত Indologist। ১৯৬৪ সালে ইনি বার্লিনের ইউনিভার্সিটির প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। রুবেন একজন নামকরা ভারত প্রেমিক। ইনি ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল অধ্যাপক। আজও রুবেন তাঁর ছাত্রদের সংস্কৃত অধ্যয়নের কার্যে সহায়তা করেন। ১৯১৯ সালে তাঁর সংস্কৃত অধ্যয়নের কাজ স্বরু হয় বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক জ্যাকোবীর কাছে। ইনি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন ১৯২৪ সালে আর ১৯২৭ সালে, ইউনিভার্সিটির লেকচারার রূপে গৃহীত হন। এর আগে তিনি ন্যায়সূত্র এবং ভারতীয় Theory af Cognition সম্বন্ধে লেখেন, এগুলি তাঁর কুশাগ্রাধিক চিন্তার ও বুদ্ধির প্রমাণ।

অধ্যাপক রুবেন ইটালীয়। জার্মানীর ফ্যাসিষ্ট মুভমেণ্টের সময় দেশ ছেড়ে চলে যান এবং প্রথমে তুর্কীর আনকারায় ও পরে 'স্যানটিয়াগো ডি চিলি'তে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। যেখানেই গেছেন সেখানেই তিনি Indology সম্বন্ধে ছাত্রদের একটা ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। ১৯৫০ সালে তিনি জার্মানীতে ফিরে আসেন ও Humboldt বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু পূর্বেকার ইউনিভার্সিটি বিমানযুদ্ধে ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল আর সেই সঙ্গে তাঁর বিরাট পাঠাগারও ভস্মীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি নূতন উদ্যমে বর্তমান ভারত সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তিনি ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অনুশীলনের কাজ স্বরু করে দেন। এর পরে হিন্দী ভাষায় তাঁর অনুশীলন স্বরু হয়। ভারত থেকে তিনি একজন অধ্যাপককে নিয়ে যান visiting লেকচারার হিসাবে। তিনি ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে লেকচার দেন। এরপর তিনি প্রফেসর আসরাফকে নিয়ে যান। তিনি ভারতের Feudal period সম্বন্ধে লেকচার দেন। প্রফেসর আসরাফ তৎকালীন ঐ বিষয়ে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে এ বিষয়ে আর বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

ইতিমধ্যে রামমোহন রায়, প্রেমচাঁদ, কৃষাণচন্দর, জাসপাল এঁদের সম্বন্ধে

লেখা হিন্দী ভাষায় মাতৃজাতির স্থান, ডক্টর রাধাকৃষ্ণান্ সম্বন্ধেও আরও কয়েকটি বিষয়ে লেখা এই ইন্‌ষ্টিটিউটে দেওয়া হয়েছিল।

প্রফেসর রুবেন কতকগুলি সংস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন যথা 'জার্মান সাউথ ইষ্ট এসিয়ান সোসাইটি', 'রেডিও বার্লিন ইনটারন্যাশনাল', 'ওরিয়্যানট্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ দি জার্মান এ্যাকাডেমী অফ্ সায়েন্সেস্ ইন্ বার্লিন' ও 'ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইনডোলজি'। এখানে ছাত্রেরা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান, ইতিহাস, বাংলা, হিন্দী ও তামিল ভাষা, ভারতীয় দর্শন ফাইলোলজী পড়ে। রুবেন ১৯৫৯ সালে জার্মানীর ন্যাশনাল প্রাইজ পান। ইনি যেসব লেকচার বের ক'রেছেন তার মধ্যে র'য়েছে আর্যজাতির আগে যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের সাহিত্য, কালিদাস সম্বন্ধে লিখেছেন, পঞ্চতন্ত্রের নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন, ভারতীয় জড়বাদ, সাংখ্যের Cognition তত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধেও ইনি লিখেছেন। পঞ্চাশটি রচনা এইভাবে তিনি লিখেছেন ভারত সম্বন্ধে। তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ওদেশে খুব প্রচলিত। এগুলি ভারত এবং জার্মানীর ভেতর একটা সৌহার্দ সৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা বলেই গণ্য হ'ত। তিনি জার্মান এস. ই. এসিয়ান সোসাইটীর ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। রুবেন বহুবার ভারতে এসেছিলেন এবং ডক্টর রাধাকৃষ্ণান্ ও জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন।

অধ্যাপক রুবেন জার্মান একাডমি অফ্ সায়েন্সের মেম্বার ছিলেন এবং ওরিয়্যাণ্ট্যাল ইনষ্টিটিউট-এর ছিলেন ডিরেক্টর। তিনি ফ্যাকালটি-অফ্-ফিলোজফির ডিন আর শেষে বার্লিন ইউনিভার্সিটির ইউনিয়নের-চেয়ারম্যান ছিলেন।

রুবেন এখন সাক্ষাংভাবে কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ছাত্রদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন ভারতীয় গবেষণার জন্য।

আমরা প্রফেসর রুবেনের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করছি কারণ বীরভূমের দুবরাজপুরে আমাদের 'ইনষ্টিটিউট্ অফ্ ইনডোলজি' র'য়েছে। এটি ১৯৬৭ সালে নভেম্বর মাসে বারাণসী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। এখান থেকে ছেলে-মেয়েরা গবেষণার কার্য ক'রতে পারবে। মফঃস্বলে এইরূপ সুযোগ পাওয়া এই প্রথম। সুখের বিষয় আমাদের এই ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী 'এসেটিসিজম্ অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সুপরিসর গবেষণা মূলক রচনা দিয়েছেন। এটি তাঁর ডক্টরেট উপাধির জন্য বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হবে।

মায়ের একটি কথা

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী,—"সব এক সময়ে সৃষ্টি হ'য়েছে। যা হ'য়েছে সব এক-কালে হ'য়েছে, একটি একটি করে হয়নি।"

উপনিষদে আমরা পাই, "অহং বহু স্যাম"—আমি বহু হবো। 'একং সৎ ব্রহ্ম-কামনা দেশ-কাল-পাত্র কিছুই মানেন না। তিনি যে মুহূর্তে চিন্তা ক'রলেন, সেই মুহূর্তেই সমস্ত সৃষ্টি বিলসিত হ'লো। আমাদের কাছে হয়তো এদের প্রকাশ সময় সাপেক্ষ evolution process-এ আমাদের কাছে সব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ'চ্ছে, কিন্তু তাঁর কাছে মাত্র একক্ষণে প্রকাশ।

Royce-এর Eternal moment—ভূত, ভবিষ্যৎ, 'বর্তমান—মহাকালের কাছে এক মুহূর্তে প্রকাশ। বুদ্ধিশালী মানুষের তৈরী এ্যাপোলো', স্পুটনিক ঘড়ির কাঁটা ধ'রে গেছে, আবার ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ফিরে এসেছে। এবং এইটি যাঁরা সৃষ্টি ক'রেছেন সেই বৈজ্ঞানিকদের কাছে এইটি সৃষ্টি করবার আগেই এর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবকিছু তাঁদের মানসরাজ্যে ধরা ছিল।

Bergson-র Elan vital ও Duree দুটিই আছে। চিরচলমান এই Elan vital (ইলাভিতা) নিত্য নিত্য নব নব প্রকাশনায় ইনি লীলাময়।

এককালেই সব সৃষ্টি ক'রেছেন,—মানে এই নয় যে তাঁর লীলা থেমে গেছে, তাঁর 'লীলাও নিত্য' শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লেছেন।

আমাদের কাছে সেটি বিপরীত মনে হয়, contradictory মনে হয় কিন্তু তাঁর কাছে লীলা সত্য—নিত্য ও সত্য,—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে এটি অচিন্ত্য। লীলা আজও থেমে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও চলবে অথচ সেই লীলা তাঁর কাছে নিত্য বিরাজিত এই তত্ত্ব আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবো না। এটি বুদ্ধির পারের রাজ্য।

কেবলাদ্বৈত বেদান্ত অবশ্য সৃষ্টি মানে না। 'এদের মতে—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এখানে বহুর স্থান নেই, এখানে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আছেন।

ঠাকুর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কথামৃতে। এতে অবশ্য ঈশ্বর মানা হ'য়েছে এবং তাঁর শক্তি লক্ষ্মীকেও মানা হ'য়েছে। তাঁর মতে সৃষ্টি যেমন এ জগতেও সত্য পারমার্থিকেও তেমনি সত্য।

ওদেশের সৃষ্টিতত্ত্বে প্লেটোর আদিতে Ideas আছে তা আমরা পেয়েছি।

এই Idea থেকে কতকগুলি অপুষ্ট ধারণা নিয়ে আমাদের এই বিশ্বজগতের প্রকাশ। তাঁর এই Ideal world-এ ঈশ্বরের স্থান আমরা নির্দিষ্ট ক'রে পাইনা, তবে The Good বলে তিনি যেটি বলেছেন সেটি world of Ideas-এর প্রধান তত্ত্ব ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

কোন কোন গ্রীক দার্শনিকের মতে প্রথম চারিটি Element সৃষ্টি। এর থেকে এই বিরাট সৃষ্টি। আবার কেউ কেউ দুটি তত্ত্ব love and hate, বলেছেন এবং এর থেকেই বহুর প্রকাশ।

Alexander তাঁর Time space Diety থেকে সৃষ্টির উদ্ভব বলেছেন। কিন্তু এই Time space-continuum ধীরে ধীরে জড় থেকে চেতনে পৌছেছে। এবং এই তত্ত্বে বলা হ'য়েছে Nesus of diety—দেবতা এখনও দেখা দেননি।

আইনস্টাইনের Time space continuum কে ভিত্তি ক'রে এঁরা সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ে যাচ্ছেন ঈশতত্ত্বতে।

Russell প্রমুখ Neutral particulars কে সৃষ্টির আদি ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এদের মতে একটা বিরাট চৈতন্যময়ের যে ইচ্ছা খেলা ক'রছে তা অনেক সময় আমাদের ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। Science-এর সৃষ্টি Prof. Gamo-র মতে প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বিরাট আকাশ ছিল, সেটা ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন তার ভেতরকার balance নষ্ট হওয়ায় ধীরে নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হ'ল ও পরে সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি। কিন্তু এই গ্যাস হঠাৎ ঘুরতে আরম্ভ ক'রলো সেটা কার ইচ্ছায়—? Science সেখানে নীরব। এখানে অবশ্য একক্ষণেই সৃষ্টি হ'য়ে গেছে কিন্তু এখানে চৈতন্যের খেলা নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমা-ই কেবল ব'ললেন,—তিনিই একক্ষণে সব ক'রেছেন। বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিরক্ষর মাতৃজননীর এই কথার গভীরতা যেটুকু মাত্র বুঝতে পারি সেইটুকুই আমরা এখানে বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছি।

দর্শনের প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে পাওয়া সত্য coherence, correspondence pragmatic সত্যের চেয়েও বেশী নির্ভরযোগ্য; একথা ধ্যানদৃষ্টির কথা —আমাদের দেশের ঋষিরা এই নিয়ে দার্শনিক হ'য়েছিলেন।

ওদেশেও বার্গশঁ প্রভৃতি এই প্রজ্ঞা-সত্যকে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন কিন্তু তাঁর মতে এই প্রজ্ঞা হবে স্বার্থ গন্ধহীন, সংস্কার বিহীন প্রাণের বিরাট প্রকাশ।

বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীপাদের কথায় আপনাকে হারিয়ে ফেলতেন। নানাভাবে তাঁকে কখনও বলতেন, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি সেখান থেকে নামিয়ে এনেছি। কখনও বলতেন রাঙা চোখো রুই। কখনও সহস্রদল পদ্ম—কখনও বড় ফোকড়-ওয়ালা বাঁশী—কখনও বুদ্ধ। এইসঙ্গে মনে পড়ে পাঠদ্দশায় স্বামীজী বুদ্ধদেবকে দর্শন ক'রেছিলেন—বুদ্ধ তাঁকে মৌন সমাহিত হ'য়ে দর্শন দিয়েছিলেন। এক এক সময় সূর্যের তেজস্ক্রিয়তা বেড়ে যায় একথা বিজ্ঞানের সকলেই জানে। মনে হয় সগুণ ব্রহ্মেরও এক এক সময় তেজস্ক্রিয়তা বেড়ে যায়। তখনই তিনি বহু স্যাম হন, তখন তাঁর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দের মত জ্যোতির তরঙ্গ ভেসে আসে আমাদের কাছে।

স্বামীজী প্রমুখ দেবপুরুষরা কেন এত দুঃখ বরণ করেন, ক্রুসিফিক্সান হয়—এর উত্তর ঠিক বলা যায় না; তবে চুম্বক যেমন কালো লোহাকে টেনে নেয়, তেমনি এঁরা জগতের যত দুঃখকে বরণ করেন—তাই এঁদের এত কষ্ট, এই ক্রুসিফিক্সান।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ—কাজেই একটা কথা মনে হয়,—Curvature of Space—দিক দেশ ভগবত ইচ্ছায় বক্রতা প্রাপ্ত হ'য়েছে, এই বক্রতার কারণ হচ্ছে Matter বা বস্তু। ব্রহ্ম মনে এই বস্তু সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা জাগলো,—"স অকাময়ত" তাই জগতে এত দুঃখ। জগতে যে সব মহাপুরুষ আসেন তাঁরা দুঃখ বরণ না ক'রে পারেন না। ব্রহ্মের এই সিসৃক্ষার মধ্যে এত দুঃখ কেন? এই প্রশ্নে মনে হয় মহর্ষি বাদরায়ণের কথা, 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'—মানুষের মত কান্নাহাসি দুঃখ বরণ করতে মাঝে মাঝে তিনি নেমে আসেন, তাই জগতে প্রতি জীব, প্রতি মানুষ, অণু-পরমাণু সবারই মধ্যে দুঃখ—এ তাঁর খেলা।

এইসঙ্গে মনে পড়ে আলোয়ারের মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার। মহারাজের সেক্রেটারীর গৃহে স্বামীজী রাজ অতিথি, আলোয়ার মহারাজ তখন সাহেবদের সঙ্গে শিকারে ছিলেন। দেখা হ'লে মহারাজ প্রশ্ন করেন, স্বামীজী শুনলাম আপনি ইংরাজীতে বড় পণ্ডিত, আপনি কেন ভিক্ষা করেন? স্বামীজী উল্টে এক প্রশ্ন করেন,—মহারাজ আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনি রাজকার্য ছেড়ে কেন সাহেবদের সঙ্গে ফিরেন। মহারাজ বলেন,—ভাল লাগে তাই। স্বামীজী বল্লেন, আমিও তাই ভিক্ষুকের বেশে ফিরি। এইসঙ্গে মনে

পড়ে Croisus ও Persia মহারাজ Cyrus-এর কথা। Croisus-এর সঙ্গে ঋষি Solon-এর দেখা। তিনি Solon কে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, সবচেয়ে সুখী কে? অর্থাৎ মহারাজ মনে করেছিলেন, solon নিশ্চয় তাঁকেই সবচেয়ে সুখী বলবে। রাজা বললেন, আমার এত বিত্ত আমি সুখী নই?—সাধু Solon বললেন, বিত্তে সুখ পাওয়া যায় না মহারাজ! এরপর···Persiaর রাজা Cyrus-এর সঙ্গে যুদ্ধে যান, সেখানে হেরে গেলেন। তখন তাঁকে জীবন্তে দগ্ধ করবার রাজ আজ্ঞা হয়। যখন জীবন্ত দগ্ধ হবেন—কাঠে আগুন দিচ্ছে— তখন তিনি একবার চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন,—Solon! Solon! তোমার কথাই সত্য। Cyrus তাই শুনে আগুন দেওয়া বন্ধ করে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আপনি ওকথা কেন ব'ললেন, Solon কে? তখন রাজা বললেন, —আমি মরতে ভয় পাই না তবে ঋষি Solon বলেছিলেন,—এই রাজ ঐশ্বর্য, টাকা, বিত্ত, কিছুই সত্য নয়, কেউ শান্তি দিতে পারে না, আজ সেকথা বুঝতে পারছি। মহাপুরুষের কথায় Cyrus-এর মনও পাল্টে যায়, তিনি Croisus কেও ছেড়ে দেন।

আমার মনে হয় আলোয়ার মহারাজকে স্বামীজী যে কথা বলেছিলেন, তিনি হয়তো জীবনের ক্ষান্ত বেলায় সেকথা একবার স্মরণ ক'রে বলেছিলেন— স্বামীজী আপনার কথাই সত্য!

ট্রেনের স্মৃতি

জীবনের গতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই ট্রেনের গতি—এক পা ছাড়া বেশীদূর যাইনি—সিউড়ী আর কলকাতা, কিন্তু এরি মধ্যে প্রায় সত্তর বছরের অনেক স্মৃতি জমা হ'য়ে আছে। ছোটবেলা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে মধ্যে মধ্যে 'কাঁচা তেঁতুল, পাকা' তেঁতুল' করেছি, মাইলপোষ্টগুলো হয়তো গুণতে গুণতে গেছি। বালকের কৌতুহল দৃষ্টি নিয়ে পিতার মুখে নানা গল্প শুনতে শুনতে গেছি। তিনি দেখিয়েছেন লাইনের ধারে কোথায় কোথায় ছিলেন কর্মব্যাপদেশে। ছায়া ছায়া ছোট ছোট ঘরগুলো সব ষ্টেশনের ধারে দেখে ভাল লাগতো। মনে পড়ে সিউড়ী যাচ্ছি—সঙ্গে ওঁর বন্দুক দেখে কেউ জিজ্ঞেস ক'রেছে,—মশায় কোথায় কোথায় শিকার হ'ল?—

এরকম নানা গল্প হ'য়েছে স্মরণ নেই সে সব কথা। ইলেকট্রিক আলো তখন কলকাতাতেও ছিল না। হাওড়া ষ্টেশনে যখন ইলেকট্রিক দেখতাম তখন মনটা নেচে উঠতো। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা তখন বেশ আনন্দের ছিল—আর তখন তা এত ভেজালও হয়নি। বাড়ী থেকে আনা খাবার নিয়ে ষ্টেশনে দেরী দেখে ট্রেন থেকে নেমে খেয়েছি আনন্দ ক'রে। কলেজে পড়ি, আসছি ট্রেনে—কাবুলীওয়ালারা ঢুকে পড়েছে একদল। সব্বাই সন্ত্রস্ত ; —এরা তো আমার কোলের উপর রুটি মাংস কাবাব রেখেছে, আমার সঙ্গে একজন আরদালী ছিল।—কাবুলীওয়ালারা বলেছিলো তাদের 'খানা' দেখিয়ে——খাওগে ?

এরপর আসে রিক্ত জীবন। সেবার মনে পড়ে নিরম্বু উপবাস ক'রে মধুপুরে জল না খেয়েই কাটিয়েছি, ফিরে আসছি, সেটা চৈত্র মাস। থার্ডক্লাসে আসবো—compartment-এ আধখানা ঢুকেছি, লোকেরা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে—আমার জামাটা আটকে আছে আধখানা, ঝুলছি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, মৌন—কথা বলতে পারছি না। সেবার আমার ছোট ভাই সঙ্গে ছিল—পুলিস অফিসার সে, কাজেই বেশ জোর ক'রে আমায় টেনে বার ক'রে নিয়ে এল। এর পরের কথা, এই নিরম্বু উপবাস করার জন্য ট্রেনে অনেক সময় গ্যাষ্ট্রিকের জন্য ওষুধ খেতে খেতেও আসতে হ'য়েছে।

আরেকবার আসছি, পুলিসের সিপাই জুতো তুলে দিয়েছে মুখের ওপর তাও পরমানন্দে চলে এসেছি।—আর একবারের কথা সিউড়ী থেকে ট্রেন ধরবো—সাঁইথিয়া এসে দেখি ট্রেন চলে এসেছে,—আমার সঙ্গে জিনিসপত্র একটি একটি ক'রে পড়ে যাচ্ছে আর আশপাশের দোকানদাররা হাসছে, অপ্রস্তুতে পড়ে গেছি। আর একবারের কথা, রেলের কুলিরা ভুল ক'রে সেকেণ্ড ক্লাসে তুলে দিয়েছে। আমি থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা রেখে বাকীটা গরীবদের দিয়ে দিয়েছি, কি করা যায় টিকিট কলেক্টারকে বললুম, তখন আমাকে একটা Servant class এ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেখানে সব চাকর, তারা বললে—আ বেচারী কো আনেদো, হেসেছি ঠাকুরকে স্মরণ ক'রে জীবনের বৈচিত্র্য নিয়েই জীবন, আর এতো ঠাকুরেরই দান।—

বেরোতাম যখন জলটল না খেয়েই বেরোতাম, ট্রেনেও কিছু খাওয়া হত না। একদল জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি করেন ? বললুম, বাবুদের ছেলেদের মাষ্টারী করি। ভাইদের ও ক্লাসের ছেলেদেরও পড়াশুনা একটু দেখে দিতাম, কাজেই মিথ্যে বলা হয় নি।

জীবনে কণ্টকও পেয়েছি ফুলও পেয়েছি,—পাগলের সঙ্গে এক গাড়ীতে এসেছি, সে এক মুস্কিলের ব্যাপার। থার্ডক্লাসে আসতে হ'লে ইতর সাধারণের সঙ্গেও বড্ড আসতে হ'য়েছে,—মন তুলে নিয়ে আপন মনে গান ক'রতে ক'রতে সে সব দিনে এসেছি। সেজন্য তাদের কথা কানে আসে নি। শেয়ারের গাড়ীতে ষ্টেশন থেকে আসবার সময় আমাকে দেখে সব সরে পড়তো, এতে আমার দেরী হ'য়ে যেতো। কিছু না খেয়ে জল না খেয়ে আসা—কষ্টও পেয়েছি।

এরপর আসে আশ্রম জীবন। এখন ষ্টেশনে মোটরে এসেছি। বলাবাহুল্য কলকাতা থেকে আসবার সময় সেজভাই গাড়ী ক'রে নিয়ে আসতো। যাই হোক কামরাটা রিজার্ভ করা থাকতো, আর আমাদের ব্রহ্মচারী, সাধুরা সঙ্গে আসতো. এসময় আমরা ধর্মপুস্তক সব পড়তে পড়তে এসেছি। ধীরে ধীরে যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আশ্রম জীবন গ্রহণ ক'রলো, তখন তারা নৃত্য গীতে ভরিয়ে তুলতো রেলের কামরা, জপ ধ্যান সঙ্গে সঙ্গে চলতো। পূজা, আরতি, হোম এসবও আমরা রেলের কামরায় করে এসেছি। গোপালের ভোগও হ'ত। এসব আমাদের নির্দিষ্ট কামরা। গান লিখতাম, সে গান গাওয়াও হ'ত। সন্ধ্যার সময়, 'দিন ফুরালো সন্ধ্যা হ'ল' সবাই মিলে গাইতে গাইতে কলকাতায় ফিরেছি। আজও সিউড়ী থেকে আসবার সময় ট্রেনের কামরা, ইঞ্জিন প্রায়ই সাজানো থাকে। কলকাতা থেকে কোন কোন সময় বিশেষ ক'রে আমার ভগ্নীপতি থাকার সময় সারা গাড়ী ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিত। তবে বরাবরই থার্ডক্লাসে যাওয়া আসা করি।

কোন বারই ট্রেন ফেল করিনি, তবে গতবার আমাদের ছাত্রেরা কষ্ট ক'রে সব সাজিয়ে ষ্টেশন পরিষ্কার ক'রে আমাদের নিয়ে যায় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরার দিকে। মিলিটারীরা জোর ক'রে কামরাটি দখল করে থাকায় তাদের নামাতে গিয়ে একটা ছোট খাটো হাঙ্গামা বেধে গেল। একজন অধ্যাপক আহত হলে ছাত্রেরা তখন পাল্টা আঘাত হানে—রক্তপাতও হ'য়ে গেল। আমাদের ছেলেরাও কম নয় ওদের নামাবেই—শেষ পর্যন্ত তারা নামতে শুরুও ক'রল, তবে অবস্থা দেখে আমি আশ্রমে ফিরে আসি। এদিকে ছেলেদের মাঝে রটনা হয় যে আমি কলেজে গেছি, কাজেই তখন তারা আনন্দে ছুটে কলেজে ফিরে যায়, তা না'হলে তারা ঠিকই ক'রেছিল ওদের সমুচিত শিক্ষা দেবে,—আর খালি কামরায় আমাদের চড়াবে, না হ'লে গাড়ী ছাড়বে না, যা ক'রেই হোক—আমাদের সঙ্গে আরও অনেক ছাত্র ও ভক্তেরা ছিল—

সহানুভূতি সম্পন্ন জনসাধারণ ট্রেনের যাত্রীরাও এগিয়ে আসে—সেজন্য হাঙ্গামাটি বেশীদূর গড়াতে পারেনি। তবে মিলিটারীরা তাদের ভুল বুঝেছিল এবং কামরা থেকে নামতেও শুরু ক'রেছিল।

এবার ফিরছি কলকাতায়। এবারও তারা জোর জবরদস্তী ক'রে ঢুকতে চেয়েছিল—যাত্রার শুরুতেই—কিন্তু তাদের কলেজের ছেলেদের কথা ব'ললে, তারা আগেই সরে গিয়েছিল।

এর অনেক আগে আমার দিল্লী যাওয়ার কথাটা বলা হয়নি। এই দেড় হাজার মাইল যাওয়া-আসায়, খাওয়া-দাওয়া, স্নান আমার বিশেষ কিছু হয়নি, এত দূর পাল্লায় যাত্রাও আমার আর কখনও ঘটেনি। দাদা অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন—সেখানে তিনি তখন I. A. S. Officer, থাকেন কেরলবাগে। একদিন মাত্র থেকে ফিরে আসি—দাদা চোখের জলে বিদায় দিলেন। যমুনার উপর দিয়ে যখন আসি তখন রাত্রির যমুনা বড় সুন্দর লেগেছিল, মনটি বেদনায় ভরা থাকলেও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম কজ্জলিত যমুনা আজও আমার মনে আছে।

স্বামীজিদের জীবনে ভগবান বুদ্ধদেব

অবতারদের জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন অবতারের সাঙ্গ-পাঙ্গদের ভিতর একটা মৈত্রী দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ। কলেজের একনিষ্ঠ ছাত্র। তাঁর পড়ার ঘরের নাম ছিল 'টঙ'। ঘরটি তাঁর দিদিমার ঘর। রাত্রে পড়ছেন। সহসা দেখেন এক অপূর্ব মূর্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। করুণা মুদিতায় পূর্ণচন্দ্রের সে মুখ—সহজেই বোঝা যায় দেব-মানবের মুখ। ধীর ললিত ছন্দে এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। কিন্তু স্বামীজি সহসা যেন ভয় পেয়ে গেলেন। ত্বরিত-পদে গৃহ পরিত্যাগ করেন। পরে বলেছেন,—ভগবান বুদ্ধের যেন কিছু বলার ছিল···আমাদের মনে হয় শ্রীঠাকুরের দেব অঙ্গে যেমন ঈশামসি ও আর সব অবতারেরা মিশে গেছেন, কাশীতে বিশ্বনাথ মিশে গেছেন, তেমনি বোধ হয় তথাগত স্বামীজির শরীরে মিশে তাঁর কার্য সাধন করে গেছেন। একটি মেষ শাবকের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাপুরুষ প্রস্তুত ছিলেন তাঁর পক্ষে স্বামীপাদের মত এমন আধার আর কোথায় পাওয়া যাবে। সেদিন স্বামী নারায়ণ চলে এসে অনুশোচনা করেছিলেন এটা বোধ হয় মৌখিক।

এরপর দেখি সাধন জীবনে বিবেকস্বামী, মহাপুরুষ মহারাজ, অভেদ

মহারাজ এঁরা বরানগর মঠে তপস্যারত, ভগবান তথাগতের ললিত বিস্তর এ সব পাঠও চলছে। সহসা ১৮৮৬ সালের এপ্রিলে সকলে স্থির করেন গয়ায় বোধিমূলে গিয়ে ধ্যান করতে হবে। শ্রীঠাকুরের তখন জ্বরতপ্ত তনু। তাঁকেও কিছু না জানিয়ে সকলে যাত্রা করলেন, বোধিমূলে—যদি কিছু লাভ করা যায়। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী—এঁরা বহু আয়াসে পৌছালেন বোধিদ্রুম মূলে। সিংহ-প্রতিম নরেন্দ্রনাথ সেখানে পৌছে বসলেন বুদ্ধদেবের সিদ্ধপীঠে, বজ্রাসনে—তারক মহারাজ তার নীচে বসেন, আর আমাদের স্বামীপাদ বসেন ধারে। এখানে নিরাহারে ধ্যান হল শুরু। ত্রিযামা রজনী কোথা দিয়ে গেল, হুঁস কারো নাই। সহসা স্বামীজি দেখেন একটি জ্যোতিবলয় বুদ্ধমূর্তি থেকে তারক মহারাজের দিকে বেড়িয়ে গেল। এরপর থেকেই তারক মহারাজের নাম মহাপুরুষ। এখানে এঁরা তিন রাত্রি কাটান।

পরবর্তী জীবনে আমরা অভেদপাদের লেখনী থেকে পাই তথাগতের প্রশস্তি—বুদ্ধ ও তাঁর বাণী। (Comp. works Vol. V, Chap. V) এ তিনি লিখছেন—It is a religion whose followers now out-number those of any other religion of the world, and the doctrines of which have brought peace and happiness to the souls of millions of suffering people in India, China, Tibet, Burma, Siam, Ceylon, Java, Sumatra and other countries. No other religious reformer has ever attained to such a height of spiritual glory during his life time. No other Saviour has converted and guided so many soul in the path of righteousness, nor has left so many earnest followers and sincere disciples after him, as did the world-renowned Saviour and Redeemer, known as Buddha. (P. 93.)

স্বামীপাদ বুদ্ধদেবের জীবনী আর বাণী দিয়ে এই প্রবন্ধের ছেদ টেনে বলেন যে, বুদ্ধদেব যে চারটি আর্য সত্য আবিষ্কার করেন, এগুলি প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে সাংখ্যকার দিয়ে গেছেন। কাজেই বুদ্ধদেবের ধর্ম সাংখ্য থেকে গৃহীত। তবু তথাগতকে স্বাধীন মতবাদের অগ্রদূত বলা যায়। কিন্তু তাঁর নির্বাণের অর্থ তাঁর অবর্তমানে মানুষের মন থেকে মুছে যায় আর বৌদ্ধমত ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়। বেদান্তের যুক্তিবাদ তার স্থান গ্রহণ করে ভারতবর্ষে। এটি ঘটে সপ্তম শতাব্দীতে।

স্বামীজি ক্রীশ্চান কলেজে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তার মূল কথায় তাঁর তথাগতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথাই আমরা পাই। তিনি বলেন, বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপর মাথা তু'লে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সম্বন্ধে কি শত্রু, কি মিত্র কেউ একথা বলতে পারে না, যে তিনি সকলের হিতছাড়া একটি নিঃশ্বাসও নিয়েছেন বা এক টুকরা রুটি খেয়েছেন। তাঁর মতে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই। নিজের কোন দাবী রাখেন নাই। নিজের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে এই ছিল তাঁর মতবাদ। মৃত্যুপথের পথিক হয়েও তিনি বলেন, কাহারও উপর নির্ভর করো না, নিজের মুক্তি নিজের হাতে। মানুষে মানুষে, মানুষে ইতর প্রাণীতে সাম্যবাদ তিনি ঘোষণা করেন। তথাগতই প্রথম ধর্ম প্রচারকত্বের উদ্ভাবক। লক্ষ লক্ষ পদ-দলিতদের মুক্তির জন্য তাঁর আবির্ভাব। স্বামীজি বলেন, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি, ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভুত। (রচনা ও বাণী, দশম খণ্ড পৃঃ ৬৯)

স্বামীজি যে তথাগতের মতবাদ থেকে ঈশামসীর মতবাদ উদ্ভূত হয়েছে বলছেন, সে সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখেন ক্রীট দ্বীপের কাছে যাবার সময়। জনৈক বৃদ্ধ এসে তাঁকে যেন বলেন যে এইখানে এসেনী সম্প্রদায় ছিল, যার থেকে ঈশাহী বা ক্রীশ্চান ধর্ম উদ্ভূত হয়েছিল। যাই হোক আমরা দেখি যে ঈশামসীর parable আর তথাগতের parableগুলির সাদৃশ্য রয়েছে, parable of the lost son-এর একটি উদাহরণ।

আমাদের মনে হয় সমাজের দান এই অবতার। অখণ্ড সমাজ ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান। যখনই সমাজদেহে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয় তখনই জীবন্ত সমাজ সেটি দূর করবার চেষ্টা করে। সতীদাহ প্রথা যখন দুষ্ট ব্রণের মত সমাজদেহে প্রকাশিত হ'ল, তখনই সমাজের কর্ণধাররূপে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীরা অগ্রসর হলেন। অধর্মের গ্লানি সমাজদেহকে দুষ্ট করলে অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়। ভগবান বুদ্ধ যখন আবির্ভাব হয়েছেন তখন পশুহত্যা চরমে উঠেছিলে। আবার নৈরাত্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ যখন চরমে উঠেছিল তখন ভগবান শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হলেন। রোমক শাসকদের অত্যাচার যখন চরমে উঠেছিল তখন ঈশামসীর আবির্ভাব—ইতিহাস এর সাক্ষী।

সারদানন্দের কথা

কল্পবৃক্ষের তলায় ভীড় করেছে ভক্তের নানা প্রার্থনা। ঠাকুর জিজ্ঞেস করেন—কিরে তুই যে কিছু চাইলি না। শরৎ মহারাজ বলেন—কি আর চাইবো, আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি এই করে দিন। শ্রীঠাকুর বলেন—তা তোর হয়ে যাবে! আমরা দেখেছি এই সাধনায় সিদ্ধ হতেই তিনি তান্ত্রিক পূর্ণাভিষিক্ত হন।

কাশীপুরে সেবক সঙ্ঘে শরৎ দিয়েছিলেন যোগ। কিন্তু শ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর মন দিতে হয় পড়াশুনায়। কিন্তু নরেন স্বামীর প্রেরণায় এঁর মঠে যাওয়া-আসা সুরু হয়। পিতা পেলেন ভয়, বাড়ীতে চাবি বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। শেষে ছোট ভাই গোপনে চাবি খুলে দেন, আর তিনিও সুযোগ বুঝে পিঞ্জরাহত পাখীর মত দক্ষিণেশ্বরে ছুটে চলে গেলেন! এঁর পিতা বৃথা চেষ্টা ছেড়ে তাঁর অঙ্কুশহীন যাত্রা পথই কামনা করেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সুরু হল অগ্নি তপস্যা। তারপর সুরু হল দুর্গম তৈর্থিকের জীবন। সময়ে সময়ে গিরিশৃঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিশ্চল ধ্যানে ডুবে গেছেন এমনও দেখা গেছে।

এমনও হয়েছে যে নিজের একান্ত সম্বল পাহাড়িয়া লাঠিটি অন্যকে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন আবার শ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করাও চলছে এরি মধ্যে। নিঃসঙ্গ পথে মনে মনে ভাবছেন এই সময় যদি গরম হালুয়া লুচি পাই তবেই জানবো শ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গী হয়েই আছেন। অঘটনের ঠাকুর তেমনি সবই জুটিয়ে দেন সেই উপলারণ্যে।

প্রব্রজ্যার পর বিবেকস্বামীর আহ্বান আসে, তিনিও লণ্ডন যাত্রা করেন। এটি ১৮৯৬ সালের এপ্রিলের ঘটনা। এরপর জুন মাসে তিনি মার্কিনের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮-এর জানুয়ারীতে তিনি ভারতে ফিরে আসেন স্বামীজির নির্দেশে। এই ফিরে আসার পথে সেণ্ট্ পিটারের গীর্জায় তিনি সমাধিনিষন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীঠাকুর বলতেন, তুই ঋষিকৃষ্ণের দলে। এই হঠাৎ সমাধি সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি। পরবর্তী জীবনে স্বামীজি প্রদত্ত মঠ মিশনের কর্মসচীবের পদে থেকে কাজ করে গেছেন। লীলাপ্রসঙ্গ, গীতাতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এইসব বইও এই সময়ে লিখে ফেলেন।

তাঁর ধীর স্থির নিবাত নিষ্কম্প জীবন তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়। শ্রীনগরের পথে একবার ঘোড়ার গাড়ী খাদে গড়িয়ে পড়তে থাকে, তিনি

কিন্তু অচঞ্চল মনেই বসেছিলেন। পরে সুবিধামত লাফিয়ে পড়েন। আর একবার ভূমধ্যসাগরে ঝড়ে পড়ে যায় তাঁদের জাহাজ। তিনি নিথরিত চিত্তে বসেছিলেন। আরও একবার গঙ্গার বুকে তাঁদের নৌকা ঝড়ে পড়ে। তিনি তখন সাক্ষীস্বরূপ বসে একটি গড়াগড়া টানছিলেন। সহযাত্রী এরূপ নিস্পৃহতা সহ্য না করতে পেরে তামাকের কল্কেটি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীপাদ বলেছিলেন, তামাক খাব না তো গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? এরপর শ্রীমার সমস্ত ভার, কলকাতায় তাঁর আবাসবাটী, জয়রামবাটীর মন্দির এ সব নির্মাণের কাজ নিয়ে নিজেকে মার 'দ্বারী' করে নিয়েছিলেন। ৬ই আগষ্ট ১২২৭ অব্দে এই মহাদীপ শিখা রামকৃষ্ণ লোকে মিশে যায়।

লাটু মহারাজ

কাশীপুরের সেবাসত্রে সেবক লাটুর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। শ্রীঠাকুরকে একদিন বলেছিলেন,—হাম্‌নে তো আপনার মেস্তর আছে। ভক্তবীর গিরীশ এসেছেন, শ্রীঠাকুরের আদেশ হ'ল তামাক সেজে খাওয়া, ফাগুর দোকানের কচুরী নিয়ে আয়।

আর একদিনের কথা লাটু মহারাজের দিব্য আর সূক্ষ্মবোধের কথা আমরা পাই। কাশীপুরের থেকে স্বামীজিরা গেছেন বুদ্ধগয়ায়। মনে হবে কি নিষ্ঠুরই না ছিলেন তাঁরা; ঠাকুরকে এমনি অবস্থায় ফেলে সব চলে গেছেন। লাটু মহারাজ কিন্তু বলেন, তোমরা বুঝবে তাঁর ভারি কষ্ট হোত— তোমারা দেহকে বোঝ, বাকী তিনি তো বুঝতেন না। তা না হ'লে যাঁরা তাঁকে এত ভালবাসতো তাঁরা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতো?

দূর ছাপরার ছেলে দীন সেবক হিসাবে এসে হ'য়ে দাঁড়ালেন ব্রহ্মবিৎ— শ্রীঠাকুরের একজন দিক্‌পাল। প্রথম জীবনে রামদত্তের বাড়ী নেন চাকরী। পরে শ্রীঠাকুরের কাছে কিছু কিছু ভোগের রসদ আনতে আনতে তিনি শ্রীঠাকুরের কাছেই র'য়ে গেলেন। শ্যামপুকুরে একদিন তাঁর গভীর ভাবাবেশ হয়। ভাবে গায়ের জামা ছিঁড়তে থাকেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি দেন জামাটি খুলে আর—বুকভ'রে শ্রীহস্ত স্পর্শে দেন জুড়িয়ে। চরিতামৃতে আমরা পাই ভক্ত পুণ্ডরীকের কথা—শ্রীভাগবত-সঙ্গীত গদাধর মুকুন্দের মুখে শুনে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়ে ফেলে ধূলায় দিয়েছিলেন গড়াগড়ি।

আর একদিনের কথা—হিসেব জমা নিয়ে গৃহীভক্তদের মধ্যে একটা কথা ওঠে। শ্রীনরেনের মনে তখন কৌপীনবস্তের বৈরাগ্য কাজেই একটু মেঘ ঘনিয়ে আছে দুই তীরেই। মীমাংসা ক'রে দিলেন লাটু মহারাজই—বলেন—হিসাব রাখা ভাল। বলেন,—হামার কথা রাখাল ভাই মেনে নিলো।

শ্যামপুকুরেও লাটু ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গী। বলেন, সেখানে হামাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট হোত না। ভক্তরা চাংড়া চাংড়া খাবার আনতো সঙ্গে ক'রে। লাটু সে সবের বেশীর ভাগই গরীবদের বিলিয়ে দিতেন। গরীবের ছেলের এই উদারতা দেখবার মত। তাঁর মন্ত্র ছিল,—আসলি উপাসনা সেবায়।

এই দক্ষিণেশ্বরেই তাঁর একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সেদিন ঠাকুর লাটুকে মাথায় হাত বুলাতে বললেন। কিছু পরেই তাঁর গভীর সমাধি। গাত্র স্পর্শেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রীঠাকুর বলেন—ওকে আর বিরক্ত করিস্‌নি, ওর মন কি এ জগতে আছে!—

ঠাকুর একদিন শশীভাইকে বড় আদর ক'রলেন, বললেন—দ্যাখ! তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস; তোরা যদি বলিস্‌ তাহ'লে একবার সেখানকে দেখে আসি। একথা শ্রীশ্রীমার কানে গেলো। তিনি যোগীনভাইকে দিয়ে হামাদের বলে পাঠালেন—আজ বাহিরের কাউকে যেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। এটি ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, এটি আমরা লাটু মহারাজের কাছেই পাই।

বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে কালীতপস্বীকে নানাকথা বলায় লাটু মহারাজ বলেন—যাকে যেমন তিনি বুঝিয়েছেন, সে তেমনি তো বলবে। কালীভাইকে তিনি যেমন বুঝিয়েছেন, কালীভাই তেমনি বলেছে। সে কি দোষ করেছে যে আপনারা তাকে হাম্‌বড়িয়া বলছেন।

জ্ঞানসিদ্ধ ঠাকুরের কাছে লাটু মহারাজের বুদ্ধি যে কত কুশাগ্র হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর একটি কথায়—জনৈক ভক্ত যখন বলেছেন—ঈশ্বর ন্যায়াধীশ। তখন শ্রীযুত লাটু মহারাজ উত্তর দিয়েছেন—বাবা তিনি রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী জারকেও চালাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে তাঁর সারসিক বাংলা শেখার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে যেমন—মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোর ভাই।—বলা বাহুল্য এটি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-এর বিহারী রূপান্তর। এই নিরক্ষর বিহারী বালকটির রহস্যময় জীবন বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে শ্রীধর স্বামীর সার্থকবাণী—মূকং করোতি বাচালম্‌ পঙ্গুং লংঘয়তে গিরীম্‌ যৎকৃপা তমোহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌।

শিক্ষার দু'একটি কথা

শিক্ষার বর্তমান যুগ সংকটে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা ক'রবো এদেশে ওদেশের শিক্ষার প্রকৃতি লক্ষ্য করা আজকের দিনে একান্ত প্রয়োজন মনে হয়। প্রথমেই আমরা এদেশের শিক্ষার বিষয় অনুধাবন ক'রবো।

বৈদিক যুগের শিক্ষা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। ঋষিগণ ভারতের প্রাচীন শিক্ষক। এঁরা আদর্শ চরিত্রবান, জ্ঞানী, তপস্বী—আর সত্যদ্রষ্টা। ছাত্রদেরও শ্রেণী-বিভাগ করা হ'ত—উত্তম প্রজ্ঞা, পরবর্তী স্তর, মধ্যম প্রজ্ঞা—সর্ব নিম্নস্তর অল্প প্রজ্ঞা—এদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো।

বৈদিক শিক্ষায় প্রথমে আবৃত্তির উপর সমধিক জোর দেওয়া হ'ত। কারণ প্রথমেই অর্থবোধ সহজ নয়। এই সময় ছন্দের উপরেও জোর দেওয়া হ'ত। শ্রবণ পর্যন্ত সমষ্টিগত চেষ্টা দেখি, এরপর ব্যক্তিগতভাবে মনন প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষার বিষয় অধিগত করার ব্যবস্থা ছিল।

গৃহস্থাশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ হ'ত বলেই মনে হয়। উপনিষদের উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ত্যাগপন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

বিদ্যারম্ভ উপনয়নের পর হ'তেই হ'ত দেখা যায়। এই উপনয়ন পাঁচ থেকে আট বৎসরের মধ্যে হ'ত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই সময়ই পাঠারম্ভের বয়স নির্দিষ্ট হ'য়েছে। ব্রহ্মচর্য জীবন—শৃঙ্খলার জীবন। প্রথমে শ্রুতি ও উচ্চারণের উপর শিক্ষার জোর দেওয়া হ'ত।

পাঠের সোপান মনোবিজ্ঞান সমর্থিত বলেই মনে হয়। উপক্রম অর্থাৎ পূর্ব জ্ঞানের পরীক্ষা পূর্বক পাঠ সুরু। প্রথমে শ্রবণ অর্থাৎ গুরুর নিকট শ্রবণ, দ্বিতীয় অভ্যাস বা আবৃত্তি। অর্থবাদ বা মর্মার্থ গ্রহণ। উপপত্তি বা বৃত্তিদ্বারা উপলব্ধি। আর শেষে মনন ও নিদিধ্যাসনে দ্রষ্টার প্রতিষ্ঠা। গুরুর আশ্রমই ছাত্রাবাস। এস্থানে গুরুর নিকট আহার ও বাসস্থান দুই হওয়ায় গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচারী গুরুস্থানে ছত্রিশ বৎসর বাস করবেন। প্রথমেই তাঁর দীক্ষা হওয়া উচিত। ইনি বারো বৎসর বেদ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকবেন। শিক্ষাক্রমে গুরুগত বিদ্যা অধিগত হয়। গুরুর আসন সর্বদা শিষ্য অপেক্ষা উঁচু হবে। গুরুর সহিত ব্যবহার বিষয়ে মনুর নির্দেশ খুব দৃঢ় ও

নিখুঁত। শিষ্যের নিজস্ব ব্যবহার বিষয়ে খুব সংযত থাকবেন, যথা দিবানিদ্রা বর্জন ইত্যাদি। ছাত্রদের গুরুর প্রতি ব্যবহার, তার দৈনন্দিন জীবন দৃঢ়, নিগড়ে আবদ্ধ থাকে। তার জীবনে যথেচ্ছ ব্যবহারের স্থান ছিল না।

গ্রীক যুগে মানসিক কৃষ্টি, বেশীরভাগ কণ্ঠসঙ্গীত আর বীণাযন্ত্র সঙ্গীতের দ্বারা অর্জিত হ'ত। দৈহিক শিক্ষা, নৃত্য, কুস্তি, সন্তরণ আর দৌড় দক্ষতার দ্বারা অর্জিত হ'ত। এগুলি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই শিক্ষা করা হ'ত। পিতার নিকট পুত্রেরা নৈতিকচর্চা, ধর্মচর্চা শিক্ষা ক'রতো আর মাতার নিকট কন্যারা গৃহকর্ম ও মহৎ জীবনের আদর্শ পেত। (Ency, Rels, & Eth Vol. V 186) স্পার্টা ও এথেন্সের শিক্ষার মূল কথা ছিল তাদের রণক্ষেত্রের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা আর তার জন্যে শিক্ষাজীবন ছিল কঠোর।

রোমক যুগে দেখি একটা ক্রমবিবর্তন ক্রমে শিক্ষার প্রগতি ছিল। পুত্রদের পিতা বা কন্যাদের পক্ষে মাতার শিক্ষাধীন থাকতে হ'ত। অক্ষর পরিচয়, হস্তাক্ষর ও সামান্য গণিত এই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়; এরপর পত্র-সংকলন থেকে লিখন, ব্যাকরণ, ঈসপের নীতিকথা আবৃত্তি। শিক্ষার শেষ পর্যায়ে ছাত্রকে public life বা রাষ্ট্রের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা হ'ত। উচ্চশ্রেণীর কন্যাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। গ্রাকী ও পম্পীর মায়েরা বেশ বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁরা দর্শন, অঙ্ক আর সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

Plato তাঁর Republic গ্রন্থে একটি আদর্শ জগতের কথা বলেছেন (Ideal World)। শিক্ষার প্রধান উপায় হচ্ছে dialectic method অর্থাৎ কথোপ-কথন ছলে ছাত্রদের বুদ্ধিকে এই পরিবর্তনশীল জগতের পারের সত্য জগতে নিয়ে যাওয়া। জ্ঞান আমাদের জন্মগত। কাজেই শিক্ষা হ'চ্ছে মনে পড়া (Remini-scnece)।

এরপর আমরা পাই রুশোর Emile, এতে ইনি শিক্ষাকে তৎকালীন সমাজের অশুভ সংস্কার থেকে মুক্ত ক'রতে বললেন, প্রকৃতিই আমাদের প্রকৃত শিক্ষাদাত্রী যা ভগবানের হাতের দান। মানুষের হাতেই এটির অধঃপতন ঘটে। এরজন্যে প্রকৃতির সাহচর্যই ছেলেদের প্রয়োজন।

এরপরই Spencer-এর কথা আসে। তাঁর apperception theory অর্থাৎ নূতন শিক্ষা হবে পুরাতনের মাধ্যমেই। তিনি শিক্ষার বিষয়বস্তু (curriculum), culture epoch theory অনুসারে সাজালেন অর্থাৎ মানব-জাতি যে পথে বর্তমান সভ্যতায় পৌঁছেচে যেমন অসভ্যযুগ, যাযাবর যুগ, চাষ-আবাদের যুগ প্রভৃতি যুগের অনুসরণ ক'রতে হবে।

মনস্বী Dewey নিলেন অন্যপথ। তিনি ছাত্রের কতকগুলি difficult problem নিয়ে স্বরু ক'রলেন। এগুলি তাঁর সমাজের দিক থেকেই গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক। ছাত্র তার অস্থবিধা জেনে সেগুলি নিরসন করবার পথ ঠিক ক'রে নেবে। এরপর, সেগুলিকে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে তাতে তাদের অস্থবিধাগুলি দূর হয় কিনা। এতে ছাত্রের activity বা কর্মকুশলতা দেখান প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে Dewey, pragmatism মতবাদের পোষকতা করেন।

স্বামীজি শিক্ষাপ্রকল্পে একটি বড় কথা বলেছেন—Education is the manifestation of perfection already is man—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আগে হ'তেই বর্তমান তার প্রকাশই শিক্ষার মূলকথা। আরো বলেছেন, যে সব আবরণ মানুষের অন্তরের জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হ'য়ে র'য়েছে তাদের দূর করবার বিশিষ্ট উপায়গুলিই শিক্ষালাভের যোগ্য বিষয়। তিনি আরো ব'লেছেন, শিক্ষা মজ্জাগত হ'য়ে সংস্কারে পরিণত হওয়ায় প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ এই হ'ল শিক্ষার পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব শিক্ষা হইলে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে (শিক্ষার হেরফের)।

শিক্ষার জন্য আমাদের বনের প্রয়োজন আছে, গুরুগৃহও চাই। বন—সজীব বাসস্থান; আর গুরু—সহৃদয় শিক্ষক (শিক্ষা সমস্যা—৪৬ পৃঃ)। বিশ্রামকালে তাহারা বাগান করিবে—গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে—এইরূপে তাহাদের প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে হইবে (শিক্ষা সমস্যা পৃঃ ৪৭)

রবীন্দ্রনাথ বলেন, সংযমের কথা। সংসারে সমস্ত প্রবৃত্তির মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে মানুষ হওয়া কঠিন। তিনি বলেন,—আমাদের প্রাণ থেকে প্রাণ, শিখা থেকে শিখা যেমন আহরণ করা হয়, তেমনি শিক্ষা থেকে শিক্ষা আহৃত হয়। জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, তেমনি মানুষ থেকেই শিখতে পারা যায়।

তপোবনের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে এক বিশিষ্টতা দান ক'রেছে। অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি। বরঞ্চ তাকে একটি শক্তিদান ক'রেছিল। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙ্গালী বিদ্যার্থীর পক্ষে সেটা একটা তীর্থস্নান হইবে। আমরা একথা সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া মানি।

Whitehead-এর মতবাদে পাই, The students are alive and the purpose of education is to stimulate and guide their self-development and teachers should be alive with living thoughts.

Whitehead Innert idea না রাখার উপর খুব জোর দেন। তিনি বলেন, এগুলি হ'চ্ছে সেইসব চিন্তা যেগুলি আমরা মনে গেঁথে নি কিন্তু কাজে লাগান হয় না, অথবা পরীক্ষিত হয় না, অথবা বিভিন্ন অবস্থায় ফেলে দেখা হয় না।

এ জন্যে তিনি বলেন, দু'টি কর্তব্য আমাদের আছে, একটি হ'চ্ছে শিক্ষার বিষয়গুলি অত্যধিক যেন না হয় আর সে সব যেন ভালভাবেই শিখান হয়। তিনি বলেন, শিক্ষা যেন কাজে লাগান যায়। এই হচ্ছে শিক্ষার অর্থ। তাঁর মতে Education is the art of utilisation of knowledge. অর্থাৎ শিক্ষা সব অধিগত বিদ্যাকে কাজে লাগায়।

তিনি তাঁর 'Aims of Education' পুস্তকে লিখেছেন—The essence of education is that it be religious—a religion which inculcates duty and reverence.

আমাদের মনে হয় নৈতিকতাও কিছুটা ধর্মজীবন হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি।

বিবেক স্বামীও শ্রদ্ধার উপর জোর দিয়েছেন তাঁর শিক্ষাপ্রকল্পে। আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্যন্ত সেই শক্তি সকলের মধ্যেই বর্তমান, এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। (Complete Works—Vol. IV p. 484)

রাসেল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে দু'একটি মূল্যবান কথা ব'লেছেন। তিনি বলেন, ছেলেরা যখন তারা যা পছন্দ তাই করে, তখন বাইরে থেকে তাদের নিয়মানুবর্তিতা শিখাবার দরকার নেই (On Education p. 39)। তিনি আরো বলেন, সহজ বুঝিতে আমরা দেখি যে, মনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে যাতে স্বভাবতঃই উচিত দিকে আমাদের মন যায়। ডঃ Arnold-এর মত বেত মারার পক্ষপাতী তিনি নন। তাঁর মতে ছেলেরা স্বভাবতঃ ভাল বা মন্দ দুটোই হয়। তারা, Reflex ব'লে যাকে মনোবিজ্ঞান বলে সেগুলি নিয়ে জন্মায় আর তার সঙ্গে থাকে কয়েকটি instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি।

সাধারণ ছেলেদের জানবার একটা সহজ ইচ্ছা থাকে, চ'লতে শিখতে তারা চায়, কথা ব'লতে তারা নিজেরাই চায়। শিক্ষার এইটিই হ'চ্ছে নিয়ামক নীতি। তাঁর মতে অশুভ বৃত্তিগুলি জোর ক'রে দমন সময়ে সময়ে প্রয়োজন হ'লেও ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষার পদ্ধতি বলে সব সময় মানা যায় না। তবে চরিত্র

গঠন শিক্ষা জীবনের প্রথম উষার সঙ্গেই শুরু ক'রতে হবে (পৃঃ ৩৬)। ছাত্রদের ভিতর বৌদ্ধিক অগ্রগতি বা সচেষ্টতা রাখা প্রয়োজন। এও তাঁর মত (পৃঃ ৪০৬)।

প্রথম বয়সে ছেলেদের ভালবেসে পড়াতে হবে আর পরে পড়াশুনার প্রতি শিক্ষকের ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। তবে সর্বোপরি ভালবাসাটাকে সব সময়ই বড় ক'রে রাখতে হবে। পারিপার্শ্বিকের উপরেও আমাদের জোর দিতে হবে। বুদ্ধি-বৃত্তিকে নূতন নূতন পথে নিয়ে যেতে হবে এই তাঁর মত। ছাত্রদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে এমনভাবে শিক্ষিত ক'রতে হবে যেন তাদের চরিত্র সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে, গঠনমূলক হবে, প্রীতি হবে তাদের জীবন বেদ, তারা হবে বীরহৃদয়, সরল আর বুদ্ধিমান। এই হোল রাসেলীয় শিক্ষাব্যবস্থা। (Education p. 246)

বিংশ শতকে কতকগুলি নূতন মতবাদের স্থান হ'য়েছে যথা—Froeble tanley Hall-এর মত এরা রুশো ও হারবার্ট-এর মত গ্রহণ করেন। আর একদলের মত হ'ল যে, শিক্ষা বাড়িয়ে যেতে হবে। এই progressive movement-এর দলের মত ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতে হবে।

এই progressive দলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে—traditionalism-এর দল। এদের শিক্ষার মত হচ্ছে—Plato অনুগ। এক অচঞ্চল সত্য জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখে এদের শিক্ষা পদ্ধতি। Aristotle পন্থী আর একদল দুই-ই মানেন। তাদের মতে cycle of development আছে সেটি হচ্ছে প্রত্যেক জীবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৃদ্ধি আছে। এবং তার বৃদ্ধি কিন্তু তার অপরিবর্তনীয় জীবনের মধ্যেই ঘটবে। শিক্ষা বিষয়েও এমনি অপরিবর্তনীয়ের মধ্যে পরিবর্তন থাকবে। আরো একদল ধর্মানুগ শিক্ষা পদ্ধতির স্বপক্ষে আছেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, কতকগুলি ভাব, ধারণা ও উপদেশ একত্র মিশিয়ে নিয়ে কথার ভিতর বিপর্যয় আনয়ন করাটাই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নয়। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার নাম, পরিপূর্তির নামই প্রকৃত শিক্ষা। প্রত্যেক মানবই ঐ সুপ্ত ঐশ্রী শক্তির, স্বীয় জ্ঞানের আকর। এটি আমাদের অন্তরের জিনিস আর সেখান থেকেই এর বাইরে বিকাশ হয়। এইটির উপর শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত। (শিক্ষার আদর্শ—পৃঃ ৯)। পাঠ্যপুস্তকে আমরা কতকগুলি ভাবের ধ্যান ও ধ্যারণার ইঙ্গিত পাইমাত্র।

প্রকৃত শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে আমাদের মন গ্রন্থকারের মনের অনুরূপ স্পন্দিত হ'লে বেতারবার্তার মত গ্রন্থকারের জ্ঞান আমাদের মনে স্বতঃই

সংক্রমিত হয়। আদর্শ শিক্ষককে পবিত্র চরিত্র আর নিখুঁত আদর্শের হ'তে হবে। মৌখিক উপদেশের থেকে এই জীবন্ত আদর্শের মূল্য বেশী (শিক্ষার আদর্শ পৃঃ ২—১১)। স্বামীপাদের মতে যাহা কিছু মহান ও বিরাট আদর্শ তাহারই কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করা—সেইটাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মিক শিক্ষার স্থান রাখা প্রয়োজন। সমগ্র নীতিবিজ্ঞান ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মার উন্নতি সাধনই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার আরো উদ্দেশ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

শিক্ষার প্রধান কথা হ'ল নিজস্ব চিন্তায় দান থাকবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় নূতন করে ভাববার দিন এসেছে। আমাদের দেশে ও বিদেশের পূর্বাপর শিক্ষাপদ্ধতি যা আমাদের মাটিতে উপযুক্ত হবে সেগুলি কোন Master mind বা শক্তিমান মনস্বীর দ্বারা ব্যবহারের প্রয়োজন। এ বিষয়ে কতকগুলি experiment হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীদের এক সম্মিলনে ক্যালিফোরনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডেভিড ক্রেচ একটি experiment বা পরীক্ষা করেছেন। যাতে নির্বোধ ছাত্রদের ভিতর কোন শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

যাই হোক আমাদের মতে সত্যিকার শিক্ষকের শরীর থেকে একটা কম্পন বেরোয় এবং ছাত্রেরা যদি সেই শিক্ষকের সঙ্গ করে, তাহলে শিক্ষার একটা উন্নতি বোধ ক'রতে পারবে। এই কম্পনের কথা বহুদিন আগে ডাঃ Brunlar বলেছিলেন। মনের কম্পন ও দেহের কম্পন দুই-ই আমাদের দেহে ও মনে অনুস্যূত হ'য়ে পড়ে।

আর একটি তত্ত্ব হ'চ্ছে, যে কোন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের মনের যে কম্পন, আত্মার যে কম্পন, সে কম্পন বাইরের কোন বৈদ্যুতিক কম্পনের সঙ্গে couple ক'রে মস্তিষ্কের কেন্দ্রসমূহে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সে সব কেন্দ্রগুলি ঐ ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। আমরা কয়েক ক্ষেত্রে এর উপকার পেয়েছি। অল্পবুদ্ধি বা dull studentরা এর দ্বারা উপকৃত হ'চ্ছে।

সিষ্টার নিবেদিতা তাঁর Hints on National Education বইতে সর্বোত্তম শিক্ষার তিনটি নীতি দিয়েছেন। মানুষের কাছে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল পেতে হ'লে তাকে প্রথমে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে নিতে হবে—আর এটা যেন গভীরভাবে তৈরী হয়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক যুগে কতকগুলি বিশেষ চিন্তা বা ভাবধারা আছে যেগুলি যে কোন সমাজের সাধন সম্পত্তি আর সেগুলি প্রত্যেক মানুষকেই শিখতে হবে যদি সে বড় হয়ে নিজের যোগ্যতার

পরিচয় দিতে চায়। তৃতীয়টি হচ্ছে, আমাদের গুরুর প্রয়োজন যার কাছে শিক্ষার জন্যে আমরা নিজেদের প্রসন্ন করতে পারি।

Froeble ছিলেন সত্যকার ধর্মনিষ্ঠ মানুষ। তিনি এক অখণ্ড সত্বায় বিশ্বাসী ছিলেন। এরই জন্য তাঁর নাম হয়েছিল Nature mystic। তাঁর শিক্ষার অবদান হচ্ছে Self-activity. শিক্ষার স্বক্রিয়তা আর শিশুদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। খেলার গল্প ও গানের এই সবের বিশেষ স্থান ছিল। বর্তমানের Playway শিক্ষাপদ্ধতিতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে জানা দরকার।

Thorndyke-এর মতে Trial ও Error বা চেষ্টা ও ভুলের মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার পথে অগ্রসর হই। ভ্রান্তি ও ব্যর্থতায় বিরক্তি, সফল চেষ্টায় তৃপ্তি এতেই stimulus ও response-এর মধ্যে Bond formation হয়। এই Bond স্নায়ুপথ সৃষ্টির Bond ; এইভাবে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হয়।

Behaviorist বা আচরণবাদীরা বলেন, পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার নূতনত্বই হবে শিক্ষার মূল কথা।

Thomson বলেন—association of pleaserable sensation এইটিই শিক্ষার মূল। শিক্ষার বিষয়কে মিষ্টবোধ, পুনঃপুনঃ চেষ্টা আর প্রস্তুতি এইগুলি হচ্ছে প্রধান কারণ।

Pavlov conditioned reflex বা কৃত্রিম প্রক্রিয়াকে শিক্ষার মূল উপায় বলেছেন।

Gestalt মতবাদে সমস্ত শিক্ষা একটা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু অর্থাৎ শিক্ষা বিষয়ে sensationগুলি পরস্পর মিলে এক এক নূতন অখণ্ড সত্বার সৃষ্টি হয়। এদের মতে অন্তর্দৃষ্টি বা insight শিক্ষার আর একটি মূলকথা, এটি হচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন সংস্থানের সমাধান, বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বা pattern আবিষ্কার করাই অন্তর্দৃষ্টির কাজ।

Skinner বলেন, পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতিতেই শিক্ষার মূল নিহিত রয়েছে। A. I. Gates বলেন,—শিক্ষা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া—We learn by reaction.

শিক্ষাকে সফল করতে হলে আমাদের এমনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

ঢেউ দিয়ে সে যায়নি চলে

'ঢেউ দিয়ে সে যায়নি চলে'······কুঁড়ির গায়ে যে দখিনার শিহরণ, সে তো শুধু শিহরণই নয়—তাতে জাগায় ফুলের গান—মনের মধু। ছোটবেলায় যে সব কবিতা মনে আজও গেঁথে আছে, বিস্মৃতির তীর হ'তে তুলে আনা ছোট ছোট ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেখতে আজ ভালই লাগে।

মনে পড়ে—একটি ছেলে জিজ্ঞেস ক'রছে তার মাকে—ভগবান কোথায় থাকেন?—They say God lives on high···জিজ্ঞেস করছে—মা ঠাকুর উঁচুতে থাকেন শুনি। মা বলেন—না বাছা তাত' নয়—Not there not there my child. ছেলে বলে—তবে কি তিনি ঐ উঁচু পাহাড় পর্বতের ওপরে থাকেন? মা বলেন—না বাছা তাত' নয়···Not there not there my child. শেষে মা উত্তর দেন—Eyes hath not seen a world so fair. তিনি যেখানে থাকেন সে সুন্দর রাজ্য কেউ দেখেনি,······

আবার মনে পড়ে একটি কবিতা some body's mother. বরফের মধ্যে পড়ে গেছে একটি বৃদ্ধা অন্য ছেলেরা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কিন্তু একটি ছেলে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠে,—তোমরা হাসবে না। এ'ও কারো মা'ইতো Some body's mother—তোমাদেরও মা আছেন। তেম্নি এর-ও ছেলে এর জন্যে বসে আছে, একে সাহায্য কর।

আর একটি কবিতার কথা মনে পড়ে—কবিতাটি একটি ছেলের মনস্তত্ত্ব নিয়ে। ছেলেটি পরের বাগানে বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়ে কিছু ফল তুলে আনবে সে সম্বন্ধে ভাবছে। হঠাৎ তার ভেতর থেকে বিবেকের বাণী উঠছে। সেই বিবেকের দু'টি লাইন আজও অনুরণিত হয়ে ওঠে মনে। ছেলেটি বলছে—Over the fence there is a garden fair, How would I like to be a master there? ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে—Sin and sorrow over the fence ইত্যাদি ········এমনি করে বারবার প্রলোভনের সঙ্গে সংঘাতে বিবেকেরই হয় জয়।

ছোট বয়সে রবীন্দ্র কবিতার রসগ্রাহী আমাদের মাষ্টার মহাশয়েরা ছিলেন না। কাজেই আমাদের কবিতাগুলি তখন ডি. এল. রায়, নবীন সেন, মধুসূদন এঁদের কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান"। কত মিষ্টিই না লাগত সাগর

স্বপ্নের মত। কৃষ্ণদয়ালের "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি"...জীবনের যেন পূর্বাশার কথাই এনে দিত। "বাজাইয়া পাঞ্চজন্য করি শঙ্খধ্বনি" ইত্যাদি ; নবীন সেনের কবিতা,—"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ" – "মেবার পাহাড় হইতে তাহার —নেমে গেছে এক গরিমা হায়—ইত্যাদি ডি. এল. রায়ের গান, গিরীশ প্রতিভার অবদানে পেয়েছি, শঙ্করাচার্যের—"বেল পাতা নেয় মাথা পেতে"— আজও যেন চোখের সামনে অষ্টসখী ও মহামায়া প্রকাশিত হন।

শ্রীকান্তের দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আজও মনের কোণে উঁকি দেয়—মগ্ন চৈতন্যের কোণ থেকে।

এডভেঞ্চারের কাহিনী প'ড়ে ছেলেদের কাছে নতুন নতুন গল্প বলা খেলার মাঠে, একটা স্মরণীয় হয়ে আছে। ব্লেকের কথা, শার্লক হোমসের কথা। হয়তো এসব রহস্য কাহিনী প'ড়ে অনেক কিছু ক্ষতিই হয়েছে তবে এতে কল্পনা প্রিয়তা খুবই প্রকাশ হয়েছে। খেলার মাঠে খেলার শেষে বয়স্যদের সঙ্গে বসে, কিছু চিনেবাদাম থাকত—বর্তমান যুগের হেলিকপ্টারের পরিকল্পনা মনে এসে গেছে। হেলিকপ্টার তখন বৈজ্ঞানিকদের অবচেতনে বাস ক'রছে। নির্মল শিশু মনগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরতে একটু দেরীই হ'য়েছে। আজ যেমন উপনিষদ, গীতা নিয়ে আলোচনা চলে সেদিনও তেমনি নৌকার উপর ব'সে কতদিন দোল খেয়েছি। চৈত্রসন্ধ্যায় ঝড়ে আশ্রয়বিহীন হ'য়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো মগ্ন দিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মনে পড়ে ক্লাসে ফার্ষ্ট হওয়ার নির্মল আনন্দ, পরীক্ষার ফল বার হওয়ার পর সবাই হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়েছি সঙ্গের ছেলেরা খাইয়েছে প্যাটি। আবার রেজাল্ট একটু খারাপ হওয়ায় সেদিনের দুঃখেতে লুকিয়ে বাড়ী চলে এসেছি—হাসি কান্নার আলোছায়ার জগৎ—

আজ মনে পড়ে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ব্রহ্মানন্দের সংকলিত পুস্তিকাখানি না বুঝলেও সঙ্গে রাখতে যেন বেশ ভাল লাগত। বইখানি পেয়েছিলুম ক্লাসে ফার্ষ্ট হ'য়ে। এমনি ক'রে কত স্রোত যে এসে মিলেছে জীবন জাহ্নবীতে একমাত্র সর্বান্তর্যামী শ্রীঠাকুরই তার সাক্ষী।

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি

একটি ভক্তবাড়ীর ছেলে—কলেজে পড়ে। রোজই তার কাছে থাকে মা'র রক্ষাকবচ মূর্তি। সেদিন তাড়াতাড়ি তার বাবা পাঠান তাদের জামাইবাবুকে দেখতে বাড়ী থেকে কিছু দূরে। বাসের আগের দিকে কোন রকমে দাঁড়িয়ে সে যাচ্ছে হঠাৎ ভিতর থেকে ঠেলা খেয়ে প'ড়ে যায় চাকার সামনে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে। আরো দুঃখের কথা—সে বোধ হয় মৃত্যুর আগে তার রক্ষা কবচের কথা চিন্তা ক'রেছিল, কারণ পরে তার ভাই স্বপ্ন দেখে যে সে তার কাছে সেই কবচটি প্রার্থনা ক'রছে।

বর্ধমানের আর একটি ঘটনা—ইউনিভার্সিটির জনৈক কর্মকর্তার ছেলে অধ্যাপকের কাজ করে—একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। সঙ্গে তার দিব্যসঙ্গী ত্রিনয়নী মূর্তি কবচের মত—ট্রেনে জনৈক সাধুকে উঠিয়ে দিতে এসেছে বর্ধমান ষ্টেশনে। হাতে তার শ্রীদুর্গার শান্তিজল, নির্মাল্য এইসব। ট্রেন তখন চ'লছে, বিদ্যুৎবাহী ট্রেণ। ছেলেটি চলন্ত গাড়ীতে সাধুকে তুলে দিচ্ছিল, হঠাৎ ছিটকে পড়ে চাকার তলায়—ষ্টেশনের সকলেই হাহাকার ক'রে ওঠে কিন্তু দৈবশক্তিতে তার মাথাটা ছিটকে পড়ে ট্রেনের তলা থেকে আর সে অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে পড়ে—বুদ্ধি এখানে দিশা পায় না।

আর একটি ঘটনা। কলকাতার মধ্যে এই ঘটনা। ১৩৭৫ সালের কার্তিকের তিন তারিখের ঘটনা। গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে। তিনজনে গাড়ী ক'রে চলেছে এরা—রাত্রি তখন একটা। সহসা একটি পুলিশের গাড়ী এসে পড়ে। একটা বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সহসা পুলিশের গাড়ীটা কেমন যেন স'রে গিয়ে assembly building-এর ফুটপাথে গিয়ে লাগে আর এরাও বেঁচে যায়। বলা বাহুল্য এই গাড়ীতে তিনজনই নাম করা বৈজ্ঞানিক ও উচ্চপদস্থ। একজনের সঙ্গে মা'র মূর্তি সর্বদাই থাকে।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর একটি অঘটনের ঘটনা। ভক্ত একটি ছেলে স্কুটারে ক'রে চ'লেছে জরুরী কাজে। হঠাৎ তার গাড়ীর সঙ্গে ট্যাক্সির ধাক্কা লাগে। গাড়ী থেকে ছিটকে সে গড়াতে গড়াতে ৩০ ফুট আন্দাজ চ'লে যায়। এই সময় ভগবৎ কৃপায় ভীড় তেমন ছিল না যাতে অন্যদিক থেকে গাড়ী এসে পড়ে। ভিড়ের মুখে ট্রাফিক—এবং ট্রাফিক পুলিশ অবাক হ'য়ে বলে এমন কখন দেখিনি। এই জায়গায় ভীড় খুব বেশী থাকে সাধারণতঃ। বলা বাহুল্য ছেলেটির বিশেষ কিছুই হয়নি—তখন যে তার সঙ্গে একটি ত্রিনয়নী মার মূর্তি ছিল—সর্বভয়ের তিনিই তো অভয়া।

যে যে অংশে জন্মায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মন্ত্রময়ী বাণী। যে যে অংশে জন্মায় সে সেই সত্তা পায়। আমরা ঠাকুরের সন্তানদের জীবনে এই দু'টি কথা যে কতদূর সত্য তার একটু অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো।

শ্রীঠাকুর স্বামীজিকে 'শিবাবতার' বলেছেন। আমরা দেখি অতি শৈশবেই বীরেশ্বর খুব দুষ্টুপনা করছেন, মা 'শিব শিব' বলে মাথায় জল দিয়ে বলছেন—দুষ্টুমি করো না, শিব কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না। অমনি বীরেশ্বর কেমন যেন নিঝুম শান্ত হয়ে পড়ত। আবার দেখি ছোটবেলাতেই স্বামীজি শিবের মূর্তি কিনে এনে পূজা করছেন। গঙ্গাপূজা করতে যাচ্ছেন সহপাঠীদের নিয়ে গঙ্গাস্তোত্র সুর ক'রে বলতে বলতে। কিন্তু রামসীতার মূর্তি দিয়েছেন ফেলে।

'পরিব্রাজকে' গঙ্গার শোভা কি মনোজ্ঞ বর্ণনাই না করেছেন, মনে রাখতে হবে গঙ্গাপ্রীতি তাঁর আবাল্যের হৃদয়ের বস্তু। হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গঙ্গাবারীর বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, হিমাচলবাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি উত্তর কাশী, গঙ্গোত্রী—তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছো, কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোত-বক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার, কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের একি সম্বন্ধ! কুসংস্কার কি? হবে! গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর-দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে। পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়। হিন্দু বিদেশে যায় রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিন্দুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলাম—কি জানি। বাগ পেলেই এক আধ-বিন্দু

পান করতাম। পান করলেই সে পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চার মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জলস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র অমরাবতী সম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর হর হর' দেখতাম —সেই হিমালয় ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুর তরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর হর হর।'

বর্তমান বাংলা ভাষায় চলিত কথার সঙ্গে সংস্কৃত কথার যে সহমিশ্রণ দেখা যায় স্বামীজির লেখায় তারি অপূর্ব পূর্বপ্রকাশ—আর সঙ্গে আছে শক্তিপ্রভাব। এই সঙ্গে আবার বিশ্বকবির গঙ্গাতীর্থ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি। দুই মনীষীর লেখায় পাঠক হবেন তৃপ্ত—"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে, আনন্দে অনির্বচনীয় বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি।·····আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্র যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম, পুরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম-তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে-স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক ঝিক করিতেছে।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বামীজি আর কবিগুরু মাত্র দুই বছরের ছোট-বড়।

আবার দেখি স্বামীজি অমরনাথ গিয়েছেন তীব্র শীতে বরফগলা জলে স্নান করে শিবকে দর্শন করে আপ্তকাম হয়েছেন। 'স্বামীশিষ্য' প্রণেতা শরৎচন্দ্র বেলুড়ে এসে দেখেন স্বামীজির চোখের কোণে রক্তজমাট হয়ে আছে। স্বামীজি

চুপ করে বসে আছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। শিষ্য ভয়ে ভয়ে কাছে বসে প্রশ্ন করেন যে,—অমরনাথে তাঁর কি অনুভূতি হয়েছিল। স্বামীজি বলেছেন,—শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন। বেরুতে চাচ্ছেন না।

বিবেকস্বামী লিখিত নীচের কবিতাগুলিতে এমন একটি আবেদন আছে যার কথাও ভোলা যায় না—শিব-স্তোত্রম্, অম্বা স্তোত্রম্,—'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—'Kali the mother'.

শিবস্তোত্রে দেখি লিখছেন, 'মম ভবতু ভবেহস্মিন্ ভাস্বরো ভাববন্ধঃ।' এই ভবে মহাদেবে আমার প্রেমবন্ধন দৃঢ় ও উজ্জ্বল হউক। আর বলছেন,—'অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য—যাঁর অশিথিল আলিঙ্গন······

শিবসঙ্গীতগুলিতেও তাঁর শিবপ্রীতির রেখা পাই। আমরা দেখি—তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা—হর হর হর ভুতনাথ।

চূর্ণ হোক মুণ্ডমালা—তোমার ভয়ে ফিরে চায় নাম যে দয়াময়ী—কি সুন্দর বিশ্লেষণ। রুদ্রমুখে সবাই ডরায় কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী—জনমনের নিখুঁত চিত্র ···

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর বলতেন যে কৃষ্ণের অংশে জন্ম। শেষের দিকেও দেখি অর্ধজ্ঞানে অর্ধচেতনে বলছেন,—দে, দে আমায় নূপুর পরিয়ে দে। বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেছি। আমি কৃষ্ণের হাত ধরে ঝুম ঝুম করে নাচবো।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনে দেখি পুণ্যময়ী মাতা নয়নতারা কালীঘাটের মা-কালীর কাছে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা করে তাঁকে পান। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যখনই স্থানে স্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন তখনই মার পূজাদি দিয়েছেন শরীরের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে।

আমেরিকা, ইংলণ্ডে যে জগন্মাতৃপ্রীতি ছিল গোপন, ভারতে এসে তার প্রথম উৎস খুলে গেল তিনি তাঁর মার সঙ্গে গেছেন কালীঘাটে পূজা দিতে। আর রত্নবেদী স্পর্শ ক'রে মা জগজ্জননীকে করেছেন ভূলুণ্ঠিত প্রণাম। এটি ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালের ঘটনা।

আবার দেখি ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গিয়ে করেছেন ঢাকেশ্বরীর বন্দনা। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নানা কর্মচক্র। এরপর দেখি কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে গেছেন সেখানে মার ষোড়শপোচারে অর্চনা করলেন। সৌভাগ্যকুণ্ডে ভক্তিভরে স্নান করলেন। আর অঞ্জলিপূর্ণ করে সে জল পান করলেন। আর মন্ত্র উচ্চারণ করে ভক্তি নম্রশিরে মন্দির করলেন প্রদক্ষিণ। দশমহাবিদ্যার গুহান্বিত পীঠস্থানগুলিতে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েও সেখানে করলেন অর্চনা। মনে রাখতে

হবে ২৫ বছর মার্কিনের ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও তার মাতৃপ্রীতি ছিল অক্ষুণ্ণ। অভেদস্বামী অমরনাথ গিয়েছেন, ক্ষীর ভবানীও গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এসব স্থানে কোন অনুভূতি অথবা পূজা-অর্চনার কথা আমরা পাইনি—তাঁর কাশ্মীর ও তিব্বত পুস্তকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী যে কত গভীর ছিল এগুলি তারই প্রমাণ।

রামকৃষ্ণার্পণম্।

দেবতার ঠাকুরালি

অমাবস্যায় রবিবার শ্যামাপূজার পরের দিন হোম হয়েছে শুরু—লেকের ধারে বাড়ী। ভক্তজননী কল্যাণ দীপ জেলে বসেছেন হোম করতে। সবে এক মুঠো আলো এসে পড়েছে ভোরের মুখে—উদয়-উষায়।

তেতলার ছাদে গৃহকল্যাণীর এই উদ্যোগ। সহসা একি দেবতার রোষ। ঝির ঝিরে বৃষ্টি এল নেমে—মন হ'য়ে ওঠে বিরূপ—ভেতরটা নিঙড়ে ওঠে—। 'বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন রাখো গো রাখো—এ দিনের এই হোমটি যেন শেষ হয়।' হাতের ওপর শুধু মাথার কাছে একটু টিনের ছাওনি—হোমের কুণ্ডটি রয়েছে ফাঁকা ছাদে। দেবতার আসন যায় টলে—অন্তরের ডাক শুনেছেন তিনি। চারদিকে হোমের জোগাড় ভিজে যায় কিন্তু হোমশিখা থাকে জলতে—প্রদীপও তারি সঙ্গে দেয় সায়। চোখের কোণে জমে ওঠে দু'টি ফোঁটা শিশির জল—হায় প্রভু আমরা ত' তোমায় আকুল হয়ে ডাকতেই জানি না—তবু তোমার এত দয়া—

কত অঘটন ঘটাও হে হরি
কত মধু দাও ভরি।
আমরা শুধুই ভুলে থাকি আর
তোমাকেই নিতি বিস্মরি।

দেবতার অপহরণ ও তার ফল

আমাদের দেশ ধর্মের দেশ। এখানে মস্ত বড় দুঃখের বিষয় এবং সমস্যার বিষয়ও হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—একদল চোর সাধারণ লোকদের বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে দেবতার সম্পত্তি এমন কি দেবতাকে পর্যন্ত চুরি ক'রতেও পিছপা হয় না।

সম্প্রতি কান্দির দেলুড়ে জাগ্রত কালীমূর্তি ভগ্ন ক'রে তাঁর সম্পত্তি সব হরণ ক'রেছে এইসব পাষণ্ডের দল। প্রাচীন তীর্থের বহু পূজিত মূর্তিও এমনি ক'রে অপহৃত হচ্ছে, ভগবানের কি ইচ্ছা আমরা বুঝতে পারি না। মনে হয় আমাদের ব্যক্তিগত আবার জাতিগত অবিশ্বাসের দরুণ এই মহাপাতক ঘটছে।

কিন্তু কিছুদিন আগেও দেবতার সম্পত্তি অপহরণ ক'রতে গেলে দুর্বৃত্তেরা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিফল পেয়েছে। আমরা নীচে তার দু'একটি ঘটনা উল্লেখ ক'রছি।

বৃন্দাবনের সরোজিনী মা একজন নামকরা সাধিকা। ইনি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ ও কন্যা ছিলেন। তাঁর কন্যা মুক্তাগাছার রাণী। এ'র প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ সেবায় খুব নিষ্ঠা দেখা যেত এবং ইনি রাত্রিকালে মূর্তির কাছেই শয়ন করতেন। একদিন রাত্রে দেখেন চোর এসেছে রাধারমণের গহনা ইত্যাদি চুরি করতে। অনেকেই জানেন না, বৃন্দাবনে চোরের খুব আধিক্য। এমন কি পাণ্ডারাও একাজে পিছপা হন না। পুরুষোত্তম এমনি এক পাণ্ডা ছিলেন। প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মত। সরোজিনী মা সেই অবস্থায় কিছু একটা করেন যার ফলে চোর অন্ধ হ'য়ে সারারাত ঐখানে বসে থাকে এবং সকালবেলায় মার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং চলে যায়। এ ঘটনাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

আর একবার—বৃন্দাবনে নলগোবিন্দ মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্তিটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একটি গৃহের ভাড়া থেকে ভক্তটি মহাপ্রভুর সেবাদি করতেন। তাঁর আপন বলতে কেউ ছিল না। মৃত্যুর সময় গুরুকে জানালো এই মূর্তিটি বৃন্দাবনে নিয়ে সেবাপূজার ব্যবস্থা যেন হয়। গুরুদেব সারা ট্রেন নাম-কীর্তন সাহায্যে মূর্তিটি নিয়ে আসেন ও একটি ভগ্নমন্দিরে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন। জায়গাটির নাম নলগোবিন্দ। বৃন্দাবনের এক শেঠনী, তার পুত্রাদি ছিল না ; স্বপ্নে একদিন ঠাকুরের দর্শন পান এবং ঠাকুর বলেন যে সমস্ত অলঙ্কারাদি দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে দিতে হবে। শেঠনী

আনন্দে অপ্লুত হ'য়ে জহরতের নানা অলঙ্কারে শ্রীমূর্তি দেন সাজিয়ে। ভাঙ্গা মন্দির দেখে বৃন্দাবনের এই অন্ধকারের দলগুলির জাগে কিছু দুরাশা; সেদিন রাত্রি ঘন হয়ে এসেছে এমন সময় পুরুষোত্তম এই অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টায় মন্দিরে প্রবেশ করেন। সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত তার গালে এসে পড়ে। ভয়ে নিজের গৃহে পালিয়ে যান এবং তিন দিন বাইরে বেরুতে পারেন নি; কারণ গালটি বিশেষ ফুলে ওঠে ও তাতে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ স্পষ্টই ছিল। এরপর চুপে চুপে সে স্বীকার করে এই কাহিনী। বারান্তরে সে আর ওপথে পা বাড়ায় নি। এ ঘটনাটি প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে ঘটে।

দুবরাজপুরে পাহাড়েশ্বরী দেবী খুব জাগ্রতা। নির্জন স্থানে মার বিশাল মূর্তি। একবার জনৈক অসাধু ব্যক্তির মনে জাগে যে মার অলঙ্কারাদি চুরি ক'রতে হবে। চুরির পর মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে পরম ভক্তিভরে একটু কুমড়ো গড়াগড়ি দেবার ইচ্ছায় যেমন নত হ'য়েছে, অমনি তার দু'টি চোখের দৃষ্টি সম্পুর্ণ লোপ পায়। এরপর সকালে সে ধরা পড়ে।

প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর আগে সিউড়ী শহরের নুরুই নামে একটি ছোটগ্রামে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত—নাম কালাচাঁদ। এঁর সেবাইতদের ঠাকুর বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই ঠাকুরের নামে কিছু জমি ও পুকুর আছে। পুকুরগুলির নাম বৃন্দাবনের নাম অনুযায়ী রাধাকুণ্ড—শ্যামকুণ্ড। এই জমিগুলিও মন্দির সংলগ্ন। একদিন সকালবেলা হঠাৎ একজনকে দেখা গেল হাতে একটি পুঁটুলি এবং সে অন্ধের মত ধানের জমিতে ঘুরছে। এ দিকে দেখা গেল মন্দিরে ঠাকুরের গহনাদি অপহৃত এবং জানা গেল যে ঐ লোকটিই অসাধু উদ্দেশ্যে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের গহনা নিয়ে যেতে গিয়ে অন্ধ হয়ে যায়।

বছর দুই-তিন আগে কাটোয়ার লাইনে গোমাই বলে একটি ক্ষুদ্রগ্রাম এবং সেখানে বহুদিনের পূজিত রাধারমণের মূর্তি আছে। একদিন অলঙ্কারসহ মূর্তি অপহৃত হয়। কিছুদিন পরের কথা মূর্তিটি চোরেরা বাসনের দোকানে বিক্রী ক'রতে গিয়ে ধরা পড়ে। মূর্তির উদ্ধার সাধনও ঘটে। চোরটির কারাবাস হয় এবং শোনা যায় সেখানেই কুষ্ঠব্যাধি হ'য়ে মারা যায়।

হেতমপুরের হংসবাহিনীর কাহিনী এও এক অদ্ভুত ঘটনা। এটি শীলামূর্তি, এঁর মাথায় রাজারা সোনার মুকুট গড়িয়ে দেন। এঁরা সাত বোন হেতমপুরেরই কাছাকাছি সাতটি গ্রামে থাকেন। এঁদের একটি আশ্চর্য লীলার কথা আছে। বৎসরের নির্দিষ্ট একটি দিনে সাত বোনকে সেবাইতরা একটি পুকুর—'বুড়ীর'

(পার্বতীর) পুকুর যার নাম সেই পুকুরের মাঝখানে রেখে যান। তাঁরা সারাদিন খেলা করেন ও সন্ধ্যায় জাল ফেললে উঠে আসেন; কিন্তু কি আশ্চর্য তার আগে জাল ফেললে সাত বোনের কেউ-ই ওঠেন না। আর একটি ঘটনা এই 'বুড়ি'ও থাকেন জলের তলায় সারা বৎসর ও বৈশাখী পূর্ণিমায় ধরমপূজার দিন সকালে জাল ফেলতেই উঠে আসেন ও মন্দিরে যান ও 'বুড়ো'র (মহাদেবের) কাছে তাঁর মন্দিরের ভোগরাগাদি এবং ঢাক পাঠিয়ে দেন। বুড়োর মন্দির থেকেও তাঁর কাছে ভোগরাগাদি এবং ঢাক আসে। তখন দুই মন্দিরে পূজা হয়। পূজান্তে পরদিন 'বুড়ি' আবার পুকুরেই অবস্থান করেন কোন রকমেই তাঁকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না বা তোলা যায় না—একবার এক মুসলমান ভক্ত এই পুকুরের পাড় দিয়ে যাবার সময় হংসবাহিনীর দর্শন পান। সেই অপূর্ব দর্শনের পর ইনি আর সাংসারিক কাজে লিপ্ত হন নি। একদিন জনৈক চোরের অসাধু ইচ্ছা জাগে এবং মায়ের মুকুটটি অপহরণ করে। চোরটি সম্বৎসরের মধ্যেই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে।

বীরভূমে কামারহাটি বলে আর একটি গ্রাম আছে। সেখানে কালু রাজপুত বলে একজন গৃহস্থ আছে। এ ঘটনাটিও মাত্র চার পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কালিকাপুরের রাস্তা দিয়ে কোন কাজ উপলক্ষে সে যাচ্ছিল। রাস্তায় পড়ে কালীতলা। খুব জাগ্রত মূর্তি। কোন মন্দির তিনি রাখতে দেন না। বেদী আছে—রত্নবেদী তার নাম। গ্রামের সকলেই জানে এর মাহাত্ম্য···কিন্তু কালু রাজপুত—সে এসব কথা জানত না। মায়ের সেই সীমানার মধ্য দিয়ে জুতো পরে চলার বা গাড়ী চেপে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। এবং মা'র মাথার ওপরে শ্যাওড়া ও কুল গাছের জটলা। কালু রাজপুত সেখান দিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে যায় এবং কয়েকটি ডালও কেটে নিয়ে যায় জ্বালানির জন্য—কিছুদিনের মধ্যে তার মুখটি অসম্ভব রকম বেঁকে যায়। গ্রামের ডাক্তার ও বাইরের ডাক্তারও দেখান হয়—কিন্তু কোন মতেই সারে না। ভক্তিমতী সহধর্মিনী একদিন স্বপ্ন দেখেন মা কালীর পূজা দিলে ভাল হয়ে যাবে। পূজা দেওয়ার ফলে চার মাস পরে তার মুখ কিছুটা ঠিক হ'য়ে যায়।

আর এক সত্য ঘটনা মাত্র মাস ছয় আগে ঘটেছে, এটি আমরা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। এটি হয়েছে একটি উন্মত্ত যুবক মা'র এই শিলামূর্তি তুলে মন্দিরের কাছেই একটি কাঁদরে ফেলে দেয়। সকলে খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়ে। এতদিনের পূজিত মূর্তি কোথায় গেল? স্থানীয় একটি ভক্ত মা, নাম তার থামু, তার এই মন্দিরে মার কাছে পূজা দিতে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তার একদিন

স্বপ্ন হয় স্থানীয় কাঁদরে একটি জায়গায় একটি ত্রিপত্র বেলপত্র ঘুরছে সেখানে আমি আছি—তুলে আনাবি। পুরোহিত প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে ভয়ে-ডরে সকলকে ডেকে নিয়ে যায়, গিয়ে দেখে সত্যিই একটি জায়গায় একটি বেলপাতা ঘুরছে। ভয়ে কেউ নামতে পারছে না। শেষে হাঁটু গেড়ে কোন রকমে নেমে মাকে তুলে এনে বিধিবৎ মঙ্গলাচারের সঙ্গে মার প্রতিষ্ঠা করে।

দেবতার ঠাকুরালী

যুগের ঠাকুর বলেছেন,—মূর্তি জাগ্রত হ'য়ে উঠতে হ'লে তিনটি দরকার। প্রথমে পূজকের ভক্তি, দ্বিতীয় গৃহকর্তার ভক্তি, তৃতীয় মূর্তির রমণীয়তা। এই দেববাণী যে কত সত্য তার নিরিখ আমরা পাই কয়েকটি ঘটনায়।

বৈশাখের প্রথম দিকে। মন্দিরে আছে শ্রীমতী রাধা রাসেশ্বরীর বিগ্রহ। বিগ্রহের প্রকট হওয়ার সে এক বিচিত্র কাহিনী। বছর দশ আগেকার কথা— এক সন্ধ্যা ঘন ক্ষণে এক ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন এই বিগ্রহ। এসেই বলেন,— বর্ধমানের শ্যাম সায়রে পাওয়া এই বিগ্রহ আশ্রমে রেখে যেতে চাই। আমরা পূজায় অক্ষম। রেখে দেওয়া হল সেই বিগ্রহ। কতকটা যেন দায়ে পড়ে। কিন্তু কিছু পরেই দেখা গেল দেবী ধ্যানলোকে আবির্ভূতা হয়ে জানাচ্ছেন তাঁর ক্ষুধার্তি। সেই থেকে তাঁর পূজার ব্যবস্থা হল। তবু কোন কোন বৈষ্ণব বা কোন কোন আশ্রম থেকে ঐ অকৈতব মূর্তির জন্যে আকিঞ্চন জাগে। কিন্তু দেবী অন্যত্র যেতে অনিচ্ছুক। আশ্রমেই স্থির সুখাসন অব্যাহতই থাকে।

এর পরের কথা। মুকুলিত বৈশাখের একদিন—সুদৃশ্য এক গিরিধারী মূর্তি কিছুদিনের জন্য আশ্রমে আসেন। তাঁর নিজস্ব অলঙ্কার চুরী যাওয়ায় শ্রীমতীর কিছু অলঙ্কার দিয়ে তাঁকে সজ্জিত করা হয়। আরো এই কয়দিন তার বিশেষ সজ্জাও করা হয়।—দিন সাত পরে শ্রীমূর্তি ফিরে যান। শ্রীমতী একাই বিরাজ করেন আশ্রমে। সহসা সংবাদ আসে শ্রীমতী গিরিধারীজির কাছে গিয়ে জানান,—গিরিধারী হমরা, চোরী করকে লে জায়েগা। এসব গহনা হমারা হায়। বলা বাহুল্য, যাঁকে এই কথা জানান হয় তিনি গহনা যে দেওয়া হয়েছে শ্রীমতীর অঙ্গ থেকে সে কথা জানতেন না। এরপর থেকেই গিরিধারীর শ্রীমূর্তি কিছুদিন করে আশ্রমে এসে থাকছেন। দেবতার লীলা আজও সত্য।

আর একটি ঘটনা। অতি কমনীয় একটি মূর্তি। কিন্তু মন যেন তেমন বসে না পূজায়, তবু পূজা চলে। পূজা কালে শ্রীঅঙ্গের একটু মার্জনা প্রয়োজন হয়। সহসা দেখা যায় শ্রীঅঙ্গ ঘর্ষণে রক্তিম হয়ে উঠেছে। এরপর স্নিগ্ধ সুবাসিত জলে শ্রীঅঙ্গের সন্তর্পণ করা হয়। ধীরে ধীরে বর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌর রায়
কোন কোন ভক্তিমানে দেখিবারে পায়।

গৌরীমা

ব্যথার বারাণসী কাশীপুর। গৌরীমা হয়তো কোন দিনই এখানে আসেন নি। সে দৃশ্য ভক্তের যে অসহ্য। তবু সারদা-রামকৃষ্ণ লীলার অধ্যায়ে গৌরীমার অবদান সামান্য নয়। ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে লীলায় বলেন—বল্‌তো গৌরীদাসী তুই কাকে বড় বলিস্। —মা ছিলেন পাশেই, রঙ্গছলে দেহে ছন্দ জাগিয়ে গৌরীমা বলেন—

রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী
লোকের বিপদ হ'লে ডাকে মধুসূদন ব'লে
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাই কিশোরী॥

শ্রীমা লজ্জায় সারা, হাত চেপে ধরেন গৌরীমার—শ্রীঠাকুরও ভক্তের কাছে হার মেনে যান চলে—শিবানীর দরজায়, শিব যে চিরদিনের ভিক্ষুক।

দক্ষিণেশ্বরের আর একটি মুক্তাঝরা দিন—মা নেমেছেন স্নান পুণ্যোদক গঙ্গায়, উপরের সিঁড়িতে গৌরীমা। সহসা ত্রস্তে মা আসেন ছুটে—গৌরীমাকে ধরেন জড়িয়ে। মার যেন বড় ভয়। বলেন,—কুমীর গো—গৌরীমার রহস্য যেন মুখে জড়িয়েই থাকে বলেন,—কুমীর নয়, মকরবাহিনীকে দেখতে মকর এসেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের মন নিত্যি থাকে উঁচু সুরে বাঁধা। তবু যেন ধূলার ধরণীকে পারেন না ছাড়তে। একদিন জগজ্জননীর প্রকাশ মেয়েদের দুঃখে আকুল হ'য়ে বলেন গৌরীমাকে,—ছাখ্ গৌরী, আমি জল ঢালি তুই কাদা চট্‌কা—সাধারণ কাজের লোকদের নিয়ে এই উপমা—গৌরীমায়ের সব তাতেই রহস্য। তিনি

বলেন,—এখানে কাদা কোথায় যে চট্‌কাবো—শ্রীঠাকুর তখন সত্যিই জল ঢালছিলেন। বলেন—আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি। এ দেশের মায়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ ক'রতে হবে।

তখন গৌরীমা বলেন,—সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, হিমালয়ে তাদের মানুষ ক'রে আনি।

শ্রীঠাকুর বলেন—না গো না—এই টাউনে বসেই তোকে কাজ ক'রতে হবে।

কলকাতায় মেয়েদের আশ্রমের এর থেকেই সূচনা।

গৌরীমা প্রথম জীবনে ছিলেন মৃড়ানী—ভবানীপুর এঁদের আদিবাস। কালিঘাটের পূজায় এঁর বংশগত অধিকার ছিল বলেই বিবাহের অগ্রসূচীতেই ইনি গৃহত্যাগ করেন। শ্রীঠাকুরের দর্শন আর কৃপা অতি শৈশবেই পান। পরে গোমুখ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রব্রজ্যা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কক্ষাচ্যুত তারার মত শিখাময়ী গৌরা মেয়ে।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ে অগ্নিতুল্যা তেজস্বিনী গৌরীমা নানা দিব্যদর্শনে ধন্য হ'য়েছেন। রাজস্থানে একবার কোন মন্দিরে দেখেন, মন্দিরের মধ্যেই একটি সুঠামতনু কিশোর ভোজনরত। ভাবলেন হয়তো পূজারীদেরই কোন বালক। পরে দেখেন তিনিই আবার সিংহাসনে আসীন। মুহূর্তে দৃষ্টি হ'য়ে যায় স্বচ্ছ। বুঝতে পারেন কে ইনি!

আবার যখন কেদার-বদরীর পথে, তখন সহসা জনৈকা মহিমময়ী মাতৃমূর্তির প্রকাশ। বলেন, তিনি অতি আদরেই—এ লালী তুম্ কিধার যাওগী—উত্তর শুনে অল্পসময়েই এক নিভৃত পথ ধ'রে তাঁকে মন্দির দ্বারে পৌছে দেন। স্থানীয় পাহাড়ী ছেলেরা শুনে হয় অবাক, এপথ দিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব ব'লেই তারা জানে।

এরপর আসে কর্মময় জীবন। শ্রীঠাকুরের বাণী বহন ক'রে প্রথমে বারাকপুরে পরে কলকাতা, নবদ্বীপ আর গিরিডির শাখা এর পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধীরে ছায়া নেমে আসে—মহাযাত্রার দিন ছোট ছোট ছেলেরা জিজ্ঞেস করে দিদিমা কোথায় যাবে—সহজ উত্তর আসে, রামকৃষ্ণলোক—ধূপের মত পূতকল্প জীবনের শেষে শ্রীঠাকুরের চরণ · রম্যজীবনই এদের চরম পরিণতি।

দেবতার ঠাকুরালী

আগষ্ট ৩৩ সালের কথা—কটকের একটি ঘটনা। খুরদা রোডের রাইস-মিলের স্বত্তাধিকারীর গৃহ-কল্যাণী নদীতে যাচ্ছেন স্নান করতে। নদীর নাম কাটজুরী। মাড়োয়ারী মায়েরা সহজেই ধর্মপ্রাণা—তীর্থাদিতে দান ধ্যান এঁদের ব্রত। কল্যাণী অপুত্রক—সেজন্য নানা তীর্থে ও দেবমন্দিরে পূজা ভেট দেওয়া তাঁর স্বভাব ছিল। হঠাৎ সেদিন স্নানের ঘাটে মনে হ'ল গোপালজীর আরতি যেখানে হয় সেখানে মানসিক করলে পুত্র সম্ভব হবে।

রামবসুর বাড়ীতে গোপাল বিগ্রহ আছেন। সেখানে আরতি হচ্ছিল। এটি এক সন্ন্যাসীর দেওয়া। এঁর পূজাও অদ্ভুত। কায়স্থর পূজা নিষিদ্ধ কিন্তু যিনি গৃহকর্ত্রী তিনি বলতেন, আমি নিজে না খাওয়ালে গোপালের খাওয়া হয় না। এক বাটী তেল নিয়ে বসতেন গোপালকে মাখাতে। বেশী না বললেও বলতে হবে যে গোপালজীও বেশ বড়-সড়। এঁর আবার এক স্বভাব ছিল বাড়ীতে ওষুধ ঢুকতে দিতেন না। গোপালের চরণামৃত, তুলসী খেয়ে যে বাঁচবে সে বাঁচবে—নয়তো মরবে।

যাই হোক বছরখানেক পরের কথা সেই আগরওয়ালা গৃহিণীর পুত্র হ'য়েছে। এখন মানসিক কি দেবেন? বসুগৃহিণী বলেন, গোপাল মাখন ভালবাসেন মাখন দেবে। এরপর থেকে বসুপরিবারের সঙ্গে আগরওয়ালা পরিবারের বেশ সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আগরওয়ালা পরিবারে—পূজা পার্বণ, উৎসবাদি যা ঘটতো সবতাতেই আগে গোপালজীর লাড্ডু মিঠাই এ সবের ব্যবস্থা হত।

আর একটি ঘটনা সেই ছেলেটির অসুখ-বিসুখ হবার আগে বসুগৃহিণী জানতে পারতেন এবং তাঁর নাতিকে দিয়ে হিন্দীতে লিখিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। সেই নাতি বর্তমানে ডক্টর সৌনক, বিশেষ ব্যবসায়ী। এঁকে দিয়ে লিখে পাঠাতেন সাবধান হবার জন্য।

আর একটি ঘটনা দেখা গেছে যারা এ বাড়ীতে বিরুদ্ধাচারণ করেছে তারাই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোপালকে নিয়ে এই যে বসুগৃহিণীর সেবা পূজা তাতে কোন আড়ম্বর ছিল না। না ছিল কোন সিংহাসন বা কোন মন্ত্র কিছু সহজ প্রাণের সহজ পূজা নিয়ে তিনি জীবন গেছেন কাটিয়ে। ভক্ত ভগবানের লীলা বৈচিত্র্য।

শিব শিষ্যা মনসাদেবী

সত্যঘটনা

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ ঋষির তপোবলে ইনি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে-সৃষ্ট হন—তাই এর নাম মনসা। কুমারী অবস্থায় শিব-বরে সিদ্ধা হন। মহাভারতেও এঁর কথা আছে। এঁর অন্য নাম জগৎগৌরী শৈবী, সিদ্ধ যোগিনী ও বিষহরী।

বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥
জগৎকারু প্রিয়াস্তিক মাতা—বিষহরেতি চ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা॥

পুরাণ মতে ইনি শিবশিষ্যা জরৎকারু পত্নী আস্তিক মুনির মাতা। এই মহাপূজার লগ্নে আমরা মাতা মনসা সম্পর্কে একটি পুরাতন সত্য ঘটনা বিবৃত করছি।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার এ কথা। বীরভূমের রূপগ্রাম—গ্রামে বর্ধিষ্ণু লোকের বসবাস। লর্ডসিংহ পরিবারেরা পাশের গ্রামে থাকতেন, তার নাম রায়পুর। সেদিন গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা মনসা মন্দিরের কাছে গিয়ে হাজির। শিকলটি লাগান নীচের দিকে আস্তে দ্বার খুলে ফেলেছে আর মা মনসাকে বার করে নিয়ে এসেছে রাস্তার মাঝে সব পূজা করবে। বড়দের দেখাদেখি ছোট শিশু নারায়ণদের জেগেছে পূজার উচ্ছ্বাস। সহসা বয়স্করা এসে পড়ে। তারা তো ভয়ে ডরে এসে পুরোহিতকে ডেকে মাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার করে ব্যবস্থা। ক্ষমা প্রার্থনা, পূজা মানসিক ঐসব বিধিবৎ হ'ল। বলাবাহুল্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই অবোধ শিশুদের। আরো এই মনসা ঘরের কাছে ছিল দু'টি বিরাট গাছ। অশ্বত্থ আর বকুল। তাদের কোটরে থাকতো এক বিরাট অজগর সাপ, কারো অনিষ্ট সে করেনি কোনদিন বরং এইসব ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে খোঁচাখুচি করতো বালসুলভ চাপল্যে। মনসা ঘরে যারা সকালে 'ছড়মাড়ুলী' দিতে যেতেন তারা দেখতেন সামনে পড়ে আছে এই সর্পরাজ। হাতে তুড়ি দিলেই পথ দিত করে।

যাই হোক একটি চাঁদা আদায় নিয়ে ঘটল বিভ্রাট। গ্রামের তরুণদের মধ্যে কারো কারো মতি-ভ্রংশতায় চাঁদা দিতে হলো বিরত। এমন কি ঠিক করলো মা মনসার ঘট দেব সরিয়ে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রক্তের

জোরে অনেক কাজই হয়ে যায়। যাই হোক যেমনি তারা এই ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করতে অগ্রসর হয়ে মার ঘটে হাত দিয়েছে অমনি কোথা হতে এক বিষধর এসে দংশন করে ও অন্যায়কারীর হয় অপমৃত্যু। আমরা দেখি অবোধ শিশুদের এক বিচার আর যারা ধর্ম বিরোধী তাদের আর এক প্রায়শ্চিত্ত।

আরো কয়েকটি সত্য ঘটনা। বীরভূমে সিউড়ী গ্রামে একটি ভক্তগৃহে সাপের বিশেষ উপদ্রব হয়। মাটীর পুরানো ঘর। যত মারা হয় ততই আরো দেখা দেয়। শেষে মা মনসার পূজা দেওয়া হল। এরপর আর সে বাড়ীতে সাপের উপদ্রব হয়নি। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছিল। রেল লাইনের ধারে জনৈক ব্যক্তি মাথা দিয়ে আছে পড়ে। ট্রেন প্রায় এসে গেছে। সহসা কি যেন তাকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে। চেয়ে দেখে এক বৃহৎ সর্পরাজ। সে যাত্রা লোকটির আর আত্মহত্যা করা হল না। আর একটি ঘটনা। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে বিরাট এক সর্প একদিন দেখা দেয়। সকলে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত। সংবাদ পেয়ে কুলদানন্দজী ছুটে আসেন। জোড় হাতে স্তব করেন। দেখতে দেখতে সর্পবর স্বস্থানে চলে যায়। এমনি বহু ঘটনা ছড়ান রয়েছে বহু গ্রামের ইতি কথায়।

আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত অনেক কিছুই আছে যা আমরা বুঝি না। দুর্গাপূজার এই মহালগ্নে মাতা মনসাদেবীকেও আমরা প্রণাম জানাই—

আস্তিকস্য মুনির্মাতা
ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী
মনসাদেবী নমোঽস্তুতে।

দেশ-বিদেশের উপাসনা

ধর্মপ্রশ্নে মীমাংসাকার জৈমিনী বলেছেন,—যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। যা দিয়ে ইহপরকালের উন্নতি ও মোক্ষ লাভ হয়—তাঁর মতে তাই ধর্ম। ধর্মের ধাতুগত অর্থ এই, যেটি আমাদের ধরে রাখে তাই ধর্ম। পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম-উদ্ভবের বহু কারণ দেখান আছে। গ্রীক দার্শনিক পেট্রোনিয়াস ও লুক্রিটাস ভীতিকে ধর্মের উদ্ভবভূমি বলেছেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের পর ধর্মের উদ্ভব—ভগবৎ প্রকাশে বলে নির্দেশিত। ইরসের মতে ধর্মের প্রকাশ হয়—পরলোক-বাসীদের প্রতি ভীতি। ভীতিজনক দ্রব্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ, সহসাগত ঘটনাকে ভাবী ফলসূচক ঘটনা বলে অবধারণের ফলে। মনস্বী ক্যাণ্ট ধর্মের ভিত্তি পেলেন নৈতিকতাতে। Schleiermarcher ধর্মকে বলেছেন শরণাগতি। Taylor বলেছেন সমস্ত প্রকৃতি পরলোকগত আত্মাদ্বারা আবিষ্ট এই ধারণা হতেই ধর্মের আরম্ভ। আরো পরে Spencer বললেন—পরলোকগতদের পূজাতেই ধর্মের বীজ রয়েছে নিহিত। কবি দার্শনিক Lange মনে করেন, ধর্ম মানব প্রকৃতির অংশমাত্র। এটি তার জানবার ইচ্ছা, তার নৈতিক বৃত্তি ও তার অনুভূতি সকলের পরিপোষক মাত্র। Durkheim মনে করেন, Totemism অর্থাৎ কোন একটি জন্তুকে বংশের আদিপুরুষ জ্ঞানে পূজা করাই ছিল মানুষের প্রথম ধর্ম পদ্ধতি। Waterhouse এর আধুনিক মত এই, ধর্ম এসেছে মানুষের অসহায় মনের অবস্থা আর চারদিকে যে ভয় ও আশ্চর্যজনক প্রকৃতি তার থেকে উদ্ধারের চেষ্টা থেকেই। পাশ্চাত্ত্য বাইরের দৃষ্টি দিয়ে ধর্ম ভিত্তি বুঝাতে চেয়েছেন, যথা Spencer প্রভৃতি। আবার কেউ কেউ মনোবিজ্ঞানের মতে বুঝতে চেয়েছেন, যেমন ভীতি, অসহায়তা, এইসব মতের পণ্ডিতরা। এদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে ধাতুগত যে অর্থ—যা আমাদের ধরে রাখে তাই ধর্ম, এটি কি বস্তুতন্ত্র ভাবে, কি মনের দিকে সব দিকেই সার্থক। যাইহোক, ধর্ম যে কত দেশে কত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখন সেই আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য।

বৈদিকযুগে উপাসনার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদমন্ত্রের দ্বারা অগ্নি, মঘবন প্রভৃতি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। এই প্রার্থনা, যজ্ঞের বিশিষ্ট বিধিনিয়ম অনুযায়ী না হলে বিপত্তি আনয়ন করে—এইরূপ নির্দেশিত আছে।

এ ছাড়া ব্রহ্মের ধ্যান ও প্রার্থনা বেদে আছে। বেদের কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি ইহলৌকিক ফল প্রদান করে, আর জ্ঞানকাণ্ড চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তির অধিকারী করে।

উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপার রূপ শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা আছে। ইহাতে উপাসক উপাস্য ও নিরন্তর ভাবনা এই তিনটির প্রয়োজন। এই উপাস্য সগুণব্রহ্ম বা শাস্ত্রীয় দেবতাদিও হতে পারেন।

উপাসনা অভ্যুদয়ের জন্যে হ'তে পারে। আবার সগুণব্রহ্ম বিষয়ে ক্রমমুক্তিপ্রদ হতে পারে। উপাসনার বহুপ্রকার ভেদ আছে ; যথা—ব্রহ্মোপাসনা, ইহা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। অহং গ্রাহ উপাসনা ; ইহা ব্রহ্মকে জীবরূপে ও জীবকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা ; প্রতীকোপাসনা—প্রণব বা প্রতিমাদিতে ব্রহ্মভাবে উপাসনাই প্রতীকোপাসনা।

গীতায় পুরুষোত্তমের উপাসনাই শেষকথা রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্মে পঞ্চদেবতার উপাসনা রয়েছে। এই পঞ্চদেবতা যথাক্রমে সূর্য, শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও ভগবতী। বর্তমানে হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে মা মনসা, ইতুলক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীদের আমরা পূজ্যরূপে দেখতে পাই।

চৈনিক ধর্মে উপাসনার সমতুল্য একটি কথা পাই, সেটি হচ্ছে 'চি'। এর অর্থ হচ্ছে উপাসনার সঙ্গে যুক্ত আছে বলিপ্রদান, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা দেবতার সঙ্গে ভক্তের সংযোগ ঘটে। প্রাচ্য শাস্ত্র-বিশারদ মরিসন সাহেবের এই মত। চৈনিক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে। এদের মধ্যে কনফুসীয় ধর্ম প্রধান। 'লি চি' নামক কর্মকাণ্ডের পুস্তকে আছে—যে কোন ধর্ম অঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা যার উপর এঁরা জোর দেন সেটি হচ্ছে মন মুখ এক করে উপাসনা করা। সকল প্রার্থনা ও নিবেদনের পিছনে এসবের একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন। তৃতীয়তঃ যা আমরা দেবতাকে নিবেদন করতে চাই আর তাঁর চরণে আমাদের প্রার্থনা যেন সহজ প্রাণের প্রার্থনা হয় আর তার পিছনে থাকে শুদ্ধচিত্তের গরিমা। মহাচীনের ধর্মে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে···যা কিছু মানব-সাধরেণের কল্যাণকর তাই ভগবানের প্রিয়।

'তাও' ধর্মের উপাসনা পদ্ধতি কন্‌ফুসীয় মত ও বৌদ্ধ মতের নিকট বহুশ ঋণী। এরা লাওটজে বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন ও আরো বহু দেবতাকে স্থান দিয়েছে তাদের পবিত্র মন্দিরে। বৌদ্ধধর্ম ও মহাচীনের ধর্মবিশেষ ; এর মতের পরিপোষকেরা বুদ্ধ, অমিতাভ ও বোধিসত্ত্বদের পূজা করে গভীর শ্রদ্ধায়।

ব্যাবিলনের পূজার প্রথা সুমার জাতির কাছে ধার করা। অসুরবংশের পূজার প্রথা সুমার জাতির নিকট গৃহীত। সুমের জাতির উপাসনার যে সব মিল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে পূজক দাঁড়িয়ে তার এক হাত কোমরের সমান্তরালে রাখে আর সেই হাত ওষ্ঠ স্পর্শ করে আর অন্য হাতটি কোমর বেষ্টন করে থাকে অথবা সে কোমরের কাছে তার হাত দুটি যুক্ত করে রাখে। পরবর্তীকালে চুম্বনরত হস্ত যুক্ত মূর্তি দেখা যায়, অসুর বংশীয়দের দুই হাত উর্দ্ধদিকে তুলে হাতের পাতা ভিতর দিয়ে রেখে প্রার্থনারত দেখা যায়।

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রার্থনার ভঙ্গীতে পাই আরো কতকগুলি ব্যবস্থা। এগুলি হচ্ছে অঙ্গ চিত্রিত করা, উপবাস প্রভৃতি কঠোরতা, জলাদি সিঞ্চনে দীক্ষা দান, ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা, মৃতদের সহিত সম্পর্ক, কৃতকর্মের কথা কোন পবিত্র আত্মার কাছে বলা, উপবাস, ভগবানের নামে ভোজনাদি অনুষ্ঠান ; ভজনাদি করা, শপথ গ্রহণ, তীর্থ গমন, দেবতার সম্মুখে নৃত্য, বন্দনাগীত, প্রার্থনা, ভগবৎ শোভাযাত্রা, জাতীয় প্রতীক কোন জন্তুকে গ্রহণ করা (Totem) কতকগুলি বিষয়ে বর্জন অনুষ্ঠান, যেমন দেবতাকে ফলদান বা কোন বিশেষ পশুহত্যা পরিহার এইসব অতি প্রাচীন উপাসনার অঙ্গীভূত ছিল।

(Schemidt origin and growth of religion)

ইজিপ্টের মন্দিরগুলি পূর্ব-মুখে হ'ত, যাতে নবোদিত সূর্যের আলোয় মন্দির আলোকিত হতে পারে।

ইজিপ্টের পূজা-পদ্ধতিতে রাজারাই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই রাজাদের নাম ছিল ফারাও। পূজার আগে নিজেদের দেহশুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে পবিত্র পুষ্করিণীতে অবগাহন করতে হ'ত তারপর তাঁরা মন্ত্রপাঠ করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করতেন। প্রথম তাঁরা একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করতেন। এরপর ধূপদানীতে সেই অগ্নি থেকে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা নিয়ে তাতে ধূপ নিক্ষেপ করা হ'ত। এই ধূপ হাতে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতেন।

এরপর মন্দিরের বিগ্রহের প্রতি ষাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম জানাতেন। সেটি শেষ হলে একটি বাহু উর্দ্ধ করে স্তোত্র নিবেদন করা হ'ত। এরপর আরো একটি স্তোত্র পঠিত হ'ত। এরপরই সুরভিত মধু দেবীকে নিবেদন করা হ'ত। এই দেবী সমস্ত দেবতার মাতা। তারপর আরো ধূপ দেওয়া হ'ত। শেষে মন্দির প্রাঙ্গন বস্ত্র দ্বারা মার্জনা করা হয়। এরপর বিগ্রহের অঙ্গ থেকে আবরণ, আভরণাদি উন্মোচিত করা হয়। তাঁর কপালে যে সুগন্ধযুক্ত ঘৃত

দেওয়া ছিল সে সব মুছে ফেলা হয়। তারপর বিগ্রহের স্নানপর্ব হয় সুরু। কিছু বালি ধূপ-সুবাসিত করা হয় এরমধ্যে বিগ্রহকে স্থাপিত করা হয়। তারপর আটটি কলস হ'তে জল নিষেক করা হয়। তারপর মূর্তিকে ধূপ সুরভিত করার পালা। শেষে সুগন্ধি জলদ্বারা মুখ পরিষ্কার করা হ'ত। স্নানপর্ব এইখানেই হয় শেষ। তদন্তর সুরু হয় শৃঙ্গার পর্ব। বিগ্রহের মস্তকে দেওয়া হয় শ্বেতবস্ত্র, অঙ্গ শ্বেত, সবুজ, লাল, ঘনলাল কাপড়ে একে একে সজ্জিত করা হয়। অলঙ্কারে সজ্জিত করার পর একপ্রকার অঙ্গলেপের দ্রব্য দেওয়া হয় বিগ্রহকে। রাজচিহ্ন সকল এরপরই দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে আছে রাজমুকুট, রাজদণ্ড ও বেত্র এইসব। শেষে আর একবার ধূপার্ঘ্য নিবেদন করা হ'লে কৃত্যগুলি শেষ হয়। ভোগ নিবেদন করা হ'ত খাদ্যের থালা উপরে তুলে ধ'রে আর তার সঙ্গে বলা হ'ত মন্ত্র। নৃত্যকারিণী ও সঙ্গীত-কারিণীরা মন্দিরেই থাকতেন। পুরুষ গায়ক ও নৃত্যকারীরাও থাকতেন।

প্রাচীন গ্রীকদেশে উপাসনা বিষয়ে দুইটি ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে দেখা যায় আদিযুগের পূজোর মধ্যে রয়েছে পবিত্র তীর্থসমূহ যথা আর্কেডিয়ার পর্বত, জিয়স্ দেবের জন্মস্থান বলে পবিত্র মনে করা হত। এমনি কতকগুলি প্রাণীদেরও পূজ্য বলে গণ্য করা হ'ত। এথেন্সের উলুক এমনি পবিত্র বলে মনে করা হ'ত। আবার কতকগুলি বৃক্ষকেও পবিত্র বলা হ'ত যেমন তাল বৃক্ষ। কতকগুলি প্রস্তরের সঙ্গে পুরাণ কথা জড়ান থাকায় সেগুলিও পবিত্র বিবেচিত হ'ত। পরবর্তী যুগে মৃত বীরদের পূজা প্রবর্তিত হয়। গ্রীসের পুবাকথায় কতকগুলি বংশের বিবৃতি আছে এরা বর্তমান মানব বংশ অপেক্ষা শক্তিমান ছিল। বর্তমান বংশধরগণের এঁরা পূর্বপুরুষ।

এরপর পাই দেবতার পূজার কথা—যেমন পাতালের দেবতা হেড্স্ (Hades) এঁরা কিছু নিম্নশ্রেণীর দেবতা, এঁর উপরের শ্রেণীর দেবতা হচ্ছেন আলম্পিয়ান দেবগণ। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যার দেবতা মিনারভা প্রভৃতি এই সব দেবতাদের মূর্তি আমাদেরই মত। এঁদের জন্য মন্দির সিংহাসন আর এঁদের পূজার জন্য পুরোহিত সম্প্রদায় ছিলেন। এঁদের পূজার দুটি অঙ্গ ছিল ; প্রার্থনা ও বলি প্রদান।

হিব্রুজাতীয় উপাসনা :

হিব্রুদের উপাসনার অর্থ ভগবানের সেবা। ইহা কতকগুলি বিধিবৎ নিয়মে প্রবর্তিত হ'ত। ভগবানকে ধন্যবাদ জানান, তাঁর প্রশস্তি পাঠ পূজার বিশেষ অঙ্গ ছিল।

রাজা যোশিয়ার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে ছড়ান মন্দিরগুলি একস্থ করা হয়। তাঁর চেষ্টায় অনেক ব্যাপক কুশলতা সাধিত হয়। স্থানে স্থানে যে পুরোহিতরা থাকতেন এই সংস্কার পর্যায়ে তাঁদের স্থান ছিল না। সমস্ত ধর্ম ব্যাপার অখণ্ড জাতীয় ব্যাপারে পর্যবসিত করা হয়েছিল। পবিত্র জেরুজালেমে সমস্ত উপাসনা কেন্দ্রীভূত হবার আগে বিভিন্ন স্থানীয় মন্দিরে উপাসনা অনুষ্ঠিত হ'ত। এদের সংখ্যাও অনেক ছিল, আর সারা দেশে এগুলি ছড়ানো ছিল।

পরবর্তীকালে উপাসনা পদ্ধতিতে দেখা যায় ভক্তদের গাছের প্রথম ফলটি দেবতাকে নিবেদন করা। প্রথম মন্দিরের দ্বার খোলামাত্রই বধ্য পশুর বলির ব্যবস্থা হ'ত, তার রক্ত বেদীর ওপর ছড়ানো হ'ত আর তার ছাল ছাড়ানোর কাজও শেষ হ'ত; তারপর ছয়জন বিশেষ নির্দিষ্ট পুরোহিত সেই বলির পশুকে ছয় টুকরো করে বেদিতে নিয়ে যেতেন আর একজন নিবেদনের ফুল নিয়ে যেতেন; অষ্টমজন কিছু তৈরী ভোগের জিনিস নিয়ে যেতেন, নবম পুরোহিতের কাজ ছিল পানীয় নিবেদনের মদ্য নিয়ে যাওয়া, এগুলি মন্দিরের সোপানের উপর রাখা হ'ত। তারপর এগুলিতে লবণ সংযোগ করা হ'ত।

এরপর সমবেত পুরোহিতগণ প্রার্থনা করতেন; তাদের মধ্যে একটি জয়পত্র দ্বারা স্থির করা হ'ত কে ধূপ নিবেদন করবে আর কেবা বলিদত্ত পশুকে বেদীস্থ করবে। এরপর মন্দিরে ধূপ নিবেদন ও বলিদত্ত পশুকে বেদীতে দেওয়া হ'ত, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা মন্ত্রও উচ্চারিত হ'ত। ধূপ নিবেদনের পর জনসাধারণ মন্দিরের ভেতর থেকে বাইরে চলে যেত আর তারা সাষ্টাঙ্গ হয়ে হাত দুটি প্রসারিত করে নতি জানাত। এরপর মৌন প্রার্থনা সুরু হওয়ার পালা।

পাঁচজন পুরোহিত যাঁরা ধূপ দিতে সহায়তা করতেন তাঁরা মন্দিরে সোপানের সামনে দাঁড়াতেন আর প্রধান পুরোহিত সমবেত জনতাকে হাত তুলে আশীষ জানাতেন। এরপর চলত অগ্নিতে বলি প্রদান আর এর সঙ্গে প্রদান করা হ'ত অন্য ভোজ্য ও পানীয়। মন্দির সংলগ্ন সঙ্গীত সম্প্রদায় এই সঙ্গে সেই দিনের ভজন সুরু করতেন। এইগুলি ছিল মন্দিরের প্রভাত-কৃত্য। এরপর বৈকালিককৃত্য হ'ত তিনটের সময়। সেটি প্রভাতেরই পুনরাবৃত্তি।

রবিবাসরীয় বা অন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেও এই ধারা ছিল তবে তাতে বলির সংখ্যা বেশী হ'ত আর তাতে কৃত্য আরো বেশী থাকত।

বৌদ্ধদর্শন ও হিরাক্লিটাস

পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা শতশত নিত্য-নূতন দর্শন, সাহিত্য কৃষ্টির নানারকম আবির্ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু কোন কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে চাই তাহার একটি ভিত্তি। সব দর্শন সাহিত্য এমন কি আদর্শেরও এক-একটি ভিত্তি আছে। একটি মতবাদ আজ নূতন বলিয়া পরিগণিত হইল কিন্তু দেখা গেল তাহার ভিত্তিস্বরূপ রহিয়াছে তাহার পূর্বগামী আর একটি মতবাদ। একটি দর্শন তাহার পূর্ববর্তী দর্শনের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিতেছে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাইতেছে, সেই দর্শনের ভিতরেও পূর্ববর্তী দর্শনের বীজ নিহিত রহিয়া গিয়াছে। এবং সেইটাই হইয়াছে তাহার নূতনত্বের ভিত্তিস্বরূপ। এমনিভাবে প্রত্যেকটি নূতনের পিছনে আছে পুরাতনের ভিত্তি। এমন কি একদেশের দর্শনের ভিতর রহিয়া গিয়াছে আবার অপর দেশের দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ বিশেষ করিয়া ধর্মভূমি ভারতের দর্শন, ভারতের ধর্ম, ভারতের আদর্শ, ভারতের সভ্যতা বহু দেশের, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদির উপর আলোকপাত করিয়াছে এবং পরিপুষ্ট করিয়াছে। পাশ্চাত্যের দর্শনের প্রকাশ আছে গ্রীসে। প্রচলিত আছে এই গ্রীকদেশ নাকি ভারতীয় দর্শনের অনেক কিছু লইয়াছে এবং তাহা হইতেই রচিত হইয়াছে। গ্রীকদর্শন লইয়া আলোচনা করিলে ইহা বেশ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে। গ্রীকদার্শনিক হিরাক্লিটাসের মতবাদে ও ভারতের বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগ স্থানেই এইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেখিয়া বোধ হয় হিরাক্লিটাস বৌদ্ধদর্শনের আলোকে নিজের মতবাদটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখা যায় বৌদ্ধদর্শনটি এই নাস্তিকতামূলক। এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদের মতবাদ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা এমনকি কোন কোন স্থানে এমনও উল্লেখ আছে যে স্বয়ং বুদ্ধও মায়াব্যতীত আর কিছুই নহে। হিরাক্লিটাসের দর্শনও নাস্তিকতামূলক।

বৌদ্ধ দর্শনের একটি নাম নৈরাত্মদর্শন। তাহার কারণ এই দর্শনে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব মানা হয় না। তাহাদের একটি মতে এইরূপ আছে যে, আত্মা বলিয়া কোন স্থায়ী বস্তু নাই। উহা রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংখ্যাস্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। স্কন্ধ বলিতে কতকগুলি বস্তুর সম্মিলনকে বোঝায়। স্কন্ধ পাঁচটি চতুর্ভূত যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, শরীর ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইত্যাদির সম্মিলনে 'রূপস্কন্ধ'—সুখ-দুঃখ অনুভূতির সম্মিলনে 'বেদনাস্কন্ধ'—বস্তুকে জাতিরূপে বুঝিবার প্রণালীকে 'সংজ্ঞাস্কন্ধ' মানসিক বৃত্তিগুলির পরস্পর বিশেষ বিশেষ ভাবে মিলন বিচ্ছেদকে 'সংখ্যাস্কন্ধ' এবং বোধের প্রকাশকে 'বিজ্ঞানস্কন্ধ' বলে।

আমাদের বোধের বিক্রমে আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে এবং প্রত্যেকটি স্কন্ধ প্রতিক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং তৎস্থানে নবনব পঞ্চস্কন্ধের উদ্ভব হইতেছে। কাজেই প্রতিক্ষণেই ধ্বংস ও সৃষ্টির ক্রমে নবনব আত্মার ধারা চলিয়া আসিতেছে। এবং ইহা চলিতেছে সমস্ত জীবন-ব্যাপীয়া এবং মৃত্যুতে এই ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস এবং উদয়ের ধারা আর একটি নূতন শরীরে নূতনভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

হিরাক্লিটাসের মতেও জীবের স্থায়ী অস্তিত্বের অস্বীকৃতি আমরা পাই। জীবের আবির্ভাব-তিরোভাব আপনিই ঘটিতেছে। তাঁর মতে কোন কিছুর বিরাম, স্থিতি, সমস্তই ভ্রম। এমন কি সত্তা (being) পর্যন্ত ইন্দ্রিয় উপজাত ভ্রম বলিয়াই তিনি মনে করেন। আত্মা বলিতে তিনি বলেন স্বর্গীয় জ্যোতি হইতে তাহার উৎপত্তি। পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবে যে অগ্নিতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে উহা যখন তরল হইয়া বাষ্প আকারে পরিণত হয় তখন তাহা হইতে আত্মার সৃষ্টি হয়। হিরাক্লিটাস যে আত্মাকে অগ্নি উৎপাদিত বলিলেন তাহার কারণ হিবাক্লিটাসের মতে অগ্নিতত্ত্ব বিশ্বের আদিতত্ত্ব এবং মূলতত্ত্ব। তাই আত্মাও ইহা হইতে বাদ যায় না। অবশ্য আমরা স্থূলচক্ষে যে স্থূল অগ্নির রূপ দেখি ইহা সে অগ্নি নহে। উহা সূক্ষ্মতর তেজঃ। উহা এত সূক্ষ্ম যে অতি সূক্ষ্ম বায়ু হইতেও উহার সূক্ষ্মতা অধিক। এই অগ্নির বিকৃত অবস্থাই বিশ্বজগৎ-রূপে ও তাহার নানাদ্রব্যরূপে আমাদের নয়নগোচর হয়।

সৃষ্টির আদি হইতে অন্তে এই অগ্নিতত্ত্ব ওতপ্রোত। এবং যেরূপ ক্রমস্থূল হইয়া অগ্নি নানারূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তেমনি একদিন ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া সমস্তই আবার অগ্নিরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এবং আত্মারও শেষ পরিণাম ইহাই। কাজেই আত্মার অমরত্ব হিরাক্লিটাসের মতে অস্বীকৃত হইল।

তবে বৌদ্ধমতবাদ হিরাক্লিটাসের মতবাদ হইতে আরও অধিক সূক্ষ্মতর হইয়া গিয়াছে। কেন না হিরাক্লিটাসের অগ্নিতত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন তথাপি তাহার একটা সূক্ষ্মরূপ আমরা পাই। কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদে সেটুকুও পাইবার উপায় নাই। কারণ বৌদ্ধমতে আমাদের সমস্তই কতকগুলি প্রতীতির কম্পনমাত্র। সমস্তই প্রতীত্য সমুৎপাদ অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য

প্রতীতির বিনাশ ভ্রমের বিনাশমাত্র। ইহার মূলে কিছুই নাই। অবশ্য প্রতীত্য সমুৎপাদের আর একটি অর্থ বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়। সেখানে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলিতে কার্যকারণ বাদের কথাই আসে। অবশ্য ন্যায়দর্শনের কার্য-কারণ বাদ হইতে ইহা ভিন্ন। জীবের সংসার যাত্রার কারণ স্বরূপ কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পথে শ্রীগৌতমের মনে যাহা উদিত হইয়াছিল—প্রথম দুঃখের কারণ কি ? তাহা হইতে আসিল জন্ম, সংস্কার, উপাদান, তৃষ্ণা ইত্যাদি দুঃখের কারণ। ইহারা প্রত্যেকেই একটি অপরটির কারণস্বরূপ ও একটি অপরটির কার্যস্বরূপ। এবং ইহারা পরস্পর কারণ-কার্যরূপে সম্মানিত হইয়া একটি চক্রের সৃষ্টি করিতেছে তাহাই ভবচক্র। এই একটি ঘটনা ঘটিল তাহাতে আর একটি ধারণার উৎপত্তি হইল —ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং ইহাই হইতেছে দুঃখবাদের কারণ।

ইহার পূর্ববর্তী মতবাদটি মাধ্যমিক শূন্যবাদের মতবাদ। ইহার প্রতিষ্ঠা করেন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন। অবশ্য এই দুইটি মতবাদ একটু ভিন্ন ধরণের হইলেও মূলে উভয়ই এক। আত্যন্তিক দুঃখবাদের মূলে রহিয়াছে প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ।

হিরাক্লিটাসের মতেও জগৎ চির দুঃখময়, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল। তাহার প্রত্যেকটি দ্রব্যই কি সজীব কি নির্জীব উভয়ই নিত্যচঞ্চল। নদীর এক স্রোতের জলে দুইবার স্নান হয় না। তেমনি সৃষ্টির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি ও প্রলয়ের খেলা চলিতেছে। দুইটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি অবস্থা থাকিতে পারে না। সেইজন্যই জগতের কোনরূপ সুখ বা আদর্শ নাই। সৃষ্টির এই অবিরাম চলমানতাকে তিনি নদীর জলস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

তবে উহা অবাধগতিতে প্রবাহিত হয় না। দুইটি প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে এই সৃষ্টি প্রতিকূল স্রোতদ্বয়ের একটি উর্ধ্বগামী এবং অপরটি নিম্নগামী। নিম্নগামী গতি স্বর্গীয় অনলকে পরিণত করে জগতের দ্রব্যে। এবং উর্ধ্বগামী গতি আবার ফিরাইয়া লইয়া যায় তার শুদ্ধ অগ্নি-স্বরূপে। অবশ্য হিরাক্লিটাসের এই দ্বন্দ্ববাদ বৌদ্ধদর্শনের নহে। ইহা তাহার নিজস্ব। এবং ইহাই হেগেলীয় দর্শনের দ্বন্দ্ববাদের জীবস্বরূপ। কিন্তু হিরাক্লিটাসের "দুই মুহূর্তে একই অবস্থা থাকিতে পারে না।" এই ভাবের উক্তির সহিত বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতে বস্তুর ক্ষণিকের অস্তিত্ব মানা হয়। প্রত্যেক বস্তুই যে মুহূর্তটিতে কার্যকরী হইবে, তাহার অস্তিত্ব সেই মুহূর্তটিতেই। একটি বস্তু দুইক্ষণে কার্যকরী হয়

না। আবার হিরাক্লিটাসের মতে যে বিশ্বসংসার নিত্যচঞ্চল ইহাও বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায় না। কারণ বৌদ্ধদর্শনে সমস্তই একটি প্রতীতির জ্ঞানমাত্র।

উভয় দর্শনের ভিতরে বহু সাদৃশ্য ও ঐক্য থাকিলেও এবং উভয় দর্শনের মূলভিত্তি নাস্তিকতা হইলেও হিরাক্লিটাসের দর্শন জড়বাদ। যদিও তিনি 'জড়' শব্দের উল্লেখ কোনস্থানেই করেন নাই, তথাপি অগ্নিতত্ত্বকে তিনি অদ্বৈত বা চৈতন্য সত্তাকে যে স্থান দেওয়া হয় সে স্থান দিয়া যান নাই। কাজেই তাঁহার অগ্নিতত্ত্ব সূক্ষ্ম জড়বস্তু ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু বৌদ্ধদর্শন নাস্তিকতামূলক শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহাদের চৈতন্যের কিছু আভাস আছে যাহার ফলে পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভিতর কাহারও কাহারও মতে উপনিষদের কথা আসিয়া পড়িয়াছে এবং বসুবন্ধু প্রভৃতি দুই একজন দার্শনিক তাঁহাদের শূন্যতত্ত্ব তথ্যতার উপর সচ্চিদানন্দতত্ত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন। এবং স্বয়ং গৌতমের "ইহা যাহা তাহাই" এইরূপ উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহা বাক্য মনের অতীত চৈতন্যসত্তার কথা ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ধর্মে Law of Diminishing Return

অর্থনীতি শাস্ত্রে একটা মত আছে। Law of Diminishing Return-এই মতে "প্রত্যেক জিনিসের অভাব পূরণ করবার ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যায়।" যেমন জমিতে চাষ দেওয়ার পর প্রথম প্রথম হয়তো বেশ ফসল পাওয়া যেতে লাগলো; কিন্তু পরে আস্তে আস্তে কমতে সুরু করলো; Law of diminishing return-এর নিয়মই তাই, এটা ধর্ম রাজ্যেও দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সীমা আছে। ধর্মপথেও এক একজনের এক একটা ছেদ পড়ে যায়। প্রথম যে আকুলতা নিয়ে এগিয়েছিল সে আকুলতা কমতে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রথম ধর্মপথে এসে, সদগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে—হয়তো বেশ জপ-ধ্যান ইত্যাদি হ'তে লাগল, বেশ সুফল পেতে লাগল কিন্তু পরে হয়তো কমতে সুরু করলো এবং কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে পৌছলো যে ধর্মপথে তার থাকলেও চলে, ন থাকলেও চলে। এরা

ঠাকুরের "খানদানী" চাষা নয়। এই প্রান্তিক (marginal) অবস্থায় খুব সতর্ক হওয়া দরকার। এই প্রান্তের একটু এদিকে ওদিকে গেলেই পতন হয়। তাই নব নব উপায়ে চাহিদা বাড়িয়ে যেতে হবে, ব্যাকুলতা বাড়িয়ে যেতে হবে,—তপস্যা বাড়িয়ে যেতে হবে। যেমন ভোগের রাজ্যে সন্দেশ খেতে খেতে যখন আর ভাল লাগে না তখন তাকে নূতন কোন খাবার দিলে কিংবা হঠাৎ তার কোন অবস্থার পরিবর্তন হলে তার পিপাসাও যায় বেড়ে। আবার কোন একটা দোকান আছে তার লাভ লোকসান সমানভাবে চলতে চলতে একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ কোনরকমে খরচ পুষিয়ে যাচ্ছে। এগুলিকে Marginal Firm বলে। একটুকু গোলমাল হলেই পড়ে যায়। ধর্মরাজ্যে, সাধুসমাজে এইরকম প্রান্তিক সাধু প্রায়ই দেখা যায়—তাদের ধর্মে উন্নতি বা অবনতি কিছুই নাই, কোনরকমে একভাবে চলছে। এরা এটুকুতেই গোলমালে পড়ে যায়। আমাদের দেশে বেশীর ভাগই এইরকম সাধু।

তবে এইসব 'প্রান্তিক সাধু' একেবারে পড়ে না। পাঁচবার টলমল করতে করতে একবার হঠাৎ পড়ে যায়। যেমন কোন ব্যাঙ্ক হয়তো পড়বার আগে বার বার পডতে পড়তে বেঁচে গিয়ে তারপর একবার হঠাৎ পড়ে যায়। প্রান্তিক সাধুদের এই সময় খুব সাবধান হ'তে হবে, মনের উপর খুব নজর রাখতে হবে। একেবারে হঠাৎ কিছু হয় না। আগে থেকে তার মন পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মনে মনে সে পাঁচবার গর্তে পা দিয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল সে পড়ে গেল। এই সময় গুরুর কাছে থাকা খুব ভাল। কারণ অর্থনীতির ব্যাপারে গোলমাল হলে তার বেঁচে যাওয়া নির্ভর করে সমাজের ওপর এবং নিজের শক্তির ওপর। কিন্তু এই পথে ধর্মনীতির ব্যাপারে আমাদের মস্ত বড় সাহস এবং সহায় গুরু এবং ইষ্টের কৃপা। এ কৃপা হলে তো আর কিছুরই ভাবনা নাই এবং কৃপার ওপরেও আর কিছু নাই।

অন্যদিকে আমরা যত একটা জিনিস ভোগ করি তত আমাদের কাছে সেই জিনিসের মার্জিন্যাল ইউটিলিটি কমে যায়। ধর্ম ব্যাপারেও যত ধর্ম ফল ভোগ করি তত একটা ধর্মের আনন্দ কমে আসতে পারে। ধর্ম সম্বন্ধে আমরা সেই রকম মূল্য দিই যে অনুসারে আমাদের কাছে ধর্মের মার্জিন্যাল ইউটিলিটি অর্থাৎ ধর্মের মূল্য আমরা যতটুকু দেব তার সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের চাহিদা। সেইজন্য এই মার্জিন থেকে আমাদের সরে থাকতে হলে আমাদের চাহিদা বাড়িয়ে যেতে হবে। তাই ঠাকুর বলতেন "চাই ব্যাকুলতা।"

মনের প্রথম কথা শুনতে হয়

মনের প্রথম কথা শুনতে হয়। নামের একটা দ্যোতনা আছে। নাম আর নামী অভেদ, শ্রীঠাকুর বলতেন। নাম নিয়ে আমাদের দেশে অনেক তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে, স্ফোটবাদ, শাব্দিকবাদ—এইসব মতবাদের উদ্ভব এই নাম রহস্য হ'তে।

শাব্দিকদের মতে বস্তু ও নাম অভেদ। এই মতে সমস্ত চিন্তাই ভাষার মাধ্যমে হয়। কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতিই সম্ভব নয় যাতে নামের কথা নাই। যাই হোক শ্রীশ্রীসারদামা'র নামের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধির অদ্ভুত সম্বন্ধ দেখা যায়। শ্রীঠাকুর বলতেন "ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" সারা জীবন তাঁর আচরণ ও ব্যবহার বুদ্ধির প্রোজ্জ্বল আলোয় ভাস্বর। শ্রীঠাকুর যখন অসুস্থতা নিয়ে কলকাতায় আসেন চ'লে, তখন শ্রীমা নহবতে গুহায়িত হয়ে কাটাচ্ছেন দিন। একদিনও বলেননি নিজের ব্যথাহত চিত্তের কথা। আবার এর আগে শ্রীঠাকুর যখন পানিহাটী উৎসবে যাবার কথায় বলেন, "ওর ইচ্ছে হয়ত চলুক" শ্রীমা এককথায় ঠিক করে ফেলেন তাঁর ইতিকর্তব্যতা। বলেন, "বুঝলুম যে ওঁর মত নাই।" শ্রীমার কথা "যখন যেমন তখন তেমন, যা'র সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন।" দেখা যেত অতি দুষ্ট ডাকাত-প্রকৃতি আমজাদকে খেতে দিচ্ছেন। কি তাঁর দরদ। সেই দরদেই ডাকাতের হয়ে যায় রূপান্তর। জনৈক ইউরোপীয় মহিলা এসেছেন দেখা করতে মা তাকে আদর ক'রে সেক্‌হ্যাণ্ড করবার ভঙ্গিতে নেন টেনে। দাক্ষিণাত্যে যখন দীক্ষা দিচ্ছেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, ওরা অন্য ভাষা ব্যবহার করে, আপনি কি ক'রে বুঝতে পারেন? মা বলেন "বুঝতে বেশ পারি।" রামনাদের রাজবাড়ীতে খুলে দেওয়া হয়েছে রত্ন ভাণ্ডার। ভক্ত রাজার আকুতি পরমগুরু কিছু তুলে নেবেন তা'র থেকে, ভক্তের রত্ন সংগ্রহ হবে সার্থক। মাত' নিজে নিলেনই না বরং পাছে রাধু কিছু নেয় তাই শ্রীঠাকুরের কাছে করেন প্রার্থনা। "দেখো ঠাকুর রাধু যেন কিছু না নেয়।" মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় রাধু শুধু একটি পেন্‌সিল নিলেন চেয়ে, রাজরত্নপুরীতে গিয়ে। অগ্নিযুগের অগ্নিলীলায় তখন ছেলেরা জীবনকে সমিধ করতে প্রস্তুত। মা দেন তাদের কয়েকজনকে আশ্রয়। আর সেই সূত্রে·পুলিশের বড় কর্তাদের মা যে কত আর্তি জানাতেন সে কথা আজ অনেকের স্মৃতি হ'তে গেছে মুছে।* দক্ষিণেশ্বর লীলায় শ্রীমা একটু বেশী ঘন ক'রে দুধ দিতেন শ্রীঠাকুরকে। সের চার পাঁচ দুধ নিত্য সেই অবুঝ শিশুকে

খাওয়াতেন, কত দিচ্ছেন, দিতেন না জানতে। গোলাপমা একথা বলে দেওয়ায় শ্রীঠাকুর পান ভয়, এত দুধ হজম হবেনা। যেমন ভাব তেমনি লাভ—দুধ আর হজম হয় না। তখন গোলাপমা অনুতপ্ত হন। শ্রীমা বুঝিয়ে দেন রাগানুরগাভক্তিতে বিচার থাকে না। কাজেই এখানে মিথ্যাসত্যের মাপকাঠি যায় পাল্‌টে। সত্যের মাপকাঠি হচ্ছে সত্যস্বরূপ ভগবান স্বয়ং—সত্যই ব্রহ্ম। আর তাঁর যেটিতে পরিতুষ্টি হয় সেইটেই সত্য। শ্রীমা সত্যের এই মাপকাঠি রেখেছিলেন ধ'রে।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর মা তাঁর শ্রী হস্তের বলয় দুটি যখন ফেলে দিতে যান তখন শ্রীঠাকুর দর্শন দিয়ে বারণ করেন—বলেন, "আমি কি মরেছি যে বালা খুল্‌বে ?" কিন্তু লোক পোকের দংশন তো যাবার নয়।

জ্ঞানস্বরূপিনী তাই দুই দিক রাখলেন—নিজের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সরু দিকটা রাখলেন আর শ্রীহস্তে রইল বালা দুইটি। এই বালা শ্রীঠাকুরই পড়িয়ে দিয়েছিলেন, অমৃতপাকের বালা। সীতার হাতে এই বালাই শ্রীঠাকুর দেখেছিলেন।

একটি বাণীর কথা আমরা আজ ধারণার চেষ্টা করব—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। মা বলেছেন, "মনের প্রথম কথা শুনতে হয়।" এই মনের কথা গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্‌ মানতেন। তিনি তাঁর দেহত্যাগের আগে বলে গেছেন, "আমি ভগবানের বাণী শুনে জীবন নিরূপিত করেছি, মানুষের বাণীতে তাঁর বিপরীত আচরণ করতে পারি না।" বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী য়ুঙ্‌এর সঙ্গে ফ্রয়েডের মতভেদের কারণ য়ুঙের ভগবত্‌ প্রীতি। তিনি বলেন প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসুর উচিত হচ্ছে জগৎকে সেই কথা বলা যে কথা তার আত্মার বাণী স্বরূপে তিনি পান।...ফ্রয়েড তাঁর অন্তরের কথা ঠিকভাবেই বলতে চেয়েছেন যেটি হচ্ছে মানুষের পশুত্ব, (animality) আর দুর্দ্ধর্ষতা (Violence) তেমনি তার নিজের ও তাঁর কাছে যারা চিকিৎসার জন্যে আসে তাদের অন্তরের আস্পৃহা (aspiration) ও অসীম ভাগবৎ তৃষ্ণার কথা ভাগবতের কাছে বলার দায়িত্বও তাঁর আছে।—(Historical introduction to modern psychology P-336) এই intuition বা মনের কথা যে আমাদের সহজাত তা তিনি বলেছেন—মনের কর্মপদ্ধতির (operations) চারটি বিভাগ আছে—sensing, feeling, thinking, intuiting. তিনি বলেন আমাদের মনের যে প্রাণশক্তি (libido) আছে সেটি উক্ত চারিটি কর্মপদ্ধতিতে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে।

(Ibid. P. 335) কাজেই মনের প্রথম কথা আমাদের কোন বিশেষ বা রহস্য কথা কিছু নয়। এটি স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয় ; তাই মা বলেছেন, "মনের প্রথম কথা শুনতে হয়"। তার কারণ এই কথা প্রজ্ঞার কথা বা intuition এর কথা। রুসোঁ এই আন্তর প্রেরণাকে সত্যের স্থান দিয়েছে, আর বার্নস্ একে সাধারণ বুদ্ধির উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।— Intuitionistদের মতবাদ সত্য স্বপ্রকাশ। ডেকার্টে, রিড্, স্পিনোজা প্রভৃতির এই মত। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই (instincts) গৌণ ও মুখ্যভাবে মানুষের সব কাজের প্রেরণা যোগায় (Introduction to social psychology—P. 105) এই সহজাত প্রবৃত্তিই মনের প্রথম কথা বলে ধরে নিতে পারলেই আমাদের প্রেরণার মূল উৎসকে আমরা ধরতে পারব ও শ্রীমার কথার মূল্যও দিতে পারব।

প্রাচ্যদর্শনে যৌগিক প্রত্যক্ষের কথা আছে—প্রশস্তপাদ তাঁহার ভাষ্যে এ বিষয়ে বিশদ বিচার করেছেন। তবে তিনি বলেন, প্রতিভা জ্ঞান সাধারণ মানবের জীবনে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। জয়ন্ত ভট্ট তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী'তে এই মত বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে এই প্রকার জ্ঞান সত্য। ইহা মন ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে ও ইহা কার্যকারণ নিয়ম সাপেক্ষ। ইহা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নহে বা অনুমান সাপেক্ষ নহে।

সাংখ্যের মতে সমস্ত বস্তুই বর্তমানে অবস্থিত। ত্রিবিধ বিরোধাপত্তেশ্চ সাংখ্য-সূত্র ১-১১৩) আর নাশ অর্থে কারণে লয় (নাশঃকারণ লয়—১-১২১ সাঃ সূত্র)। যে বস্তুর যেরূপ শক্তি আছে সেই বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। কার্যকারণ থেকে পৃথক। তাহা প্রত্যক্ষও হয় একথা সাংখ্যে রয়েছে (সাঃ সূত্র—১-২২৫)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুও বলেন যে, যোগী সমাধি প্রাপ্ত শক্তি সহায়ে দূরবস্তু ও গুপ্তবস্তু দর্শনে সমর্থ হন। বেদান্তের জ্ঞানও স্বতঃপ্রামাণ্য। যেহেতু ব্রহ্ম নিজে স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। মিমাংসাদর্শনেও এই কথাই পাই। তাহাদের জ্ঞান স্বয়ং দৃঢ়। প্রভাকর কুমারিল এদের সকলেরই এই মত। জৈনদেরও একমতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ ; মনোরাজ্যের সূক্ষ্ম জ্ঞানও প্রত্যক্ষ। (সমন্বয়ী দর্শন পৃঃ ৭-৯, পৃঃ ১৮-১৯)। ন্যায় মতেও প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বপ্রকাশ জ্ঞানলক্ষণ জ্ঞানও ঐরূপ।

বিভিন্ন দর্শনের নিরিখে আমরা দেখতে পাই শ্রীমার এই কথার কত গভীরতা। শ্রীঠাকুর তাই বলতেন।৮ "ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" শ্রীমা পরাজ্ঞান দিয়ে আমাদের সব দুষ্কৃতি দূর করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

অর্থনীতি ও সাধুজীবন

কোন জিনিসের মূল্য বুঝতে হলে আমাদের Demand Supply দেখতে হবে। বর্তমান যুগের সাধুদের মূল্যায়ন এই Demand Supply এর উপর নির্ভর করে। যদি সমাজে সাধুদের চাহিদা বেশী থাকে আর তদুপোযুক্ত যোগান বা Supply না থাকে তাহ'লে সাধুদের মূল্য বেড়েই যাবে। আবার Demand যদি না থাকে তবে Supply বেশী থাকলে মূল্য কমে যাবে। বর্তমান যুগে সমাজে সাধুদের চাহিদা একরকম নেই বললেই হয় কাজেই সাধুদের মূল্য কমে গেছে। সমাজে সাধুদের চাহিদা বাড়াতে হলে তাঁদের সমাজের কল্যাণকল্পে যোগ দিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এইভাবে সমাজের কল্যাণকল্পে নিজেদের ও গুরু ভাইদের নিয়োজিত করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব সমাজ কল্যাণ কল্পে শ্রমণদের নিয়োজিত করেছিলেন। পশুশালা, চিকিৎসালয়, নালন্দা প্রভৃতি মহাবিদ্যালয় সৃষ্টি করে সমাজের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় চাহিদা বা Demand বাড়লে যোগান বাড়ে। বুদ্ধদেবের সময় দলে দলে সাধু সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির জীবনাদর্শে অনেক সাধু গড়ে উঠেছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য। মনুষ্য সমাজে জাগতিক উন্নতির চাহিদা ছাড়াও উর্ধ্বলোকের চাহিদা, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ এও প্রয়োজন। কলা. কৃষ্টি, কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রয়োজনও সমাজে আছে। সাধুদের সেইদিকে জীবনায়ণ তৈরী হলে তাতে সমাজের চাহিদা বাড়ান হয়। খৃষ্টান জগতে সুরম্য চার্চ-হর্ম্য প্রভৃতি সাধুদের এই বিষয়ে নিদর্শন।

রামপ্রসাদী সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সঙ্গীত এই বিষয়ে নির্দেশক। সাধুদের তপস্যাপুত জীবন যে কোন ভাবেই হোক সমাজের কল্যাণ এনে দেবেই। তাদের জীবনে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রকাশে সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সমাজে হয়। যত বেশী সাধু স্বভাবের ব্যক্তি সমাজ জীবনে দেখা দেবে তত সমাজের নৈতিক মান উন্নততর হবে। এমনি করে সাধুজীবন সমাজের চাহিদা বাড়াতে পারে আবার নিজেদের মূল্যায়নও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

আর একটি কথা সমাজের চাহিদা, সমাজ জীবনে মানের উপর অনেক সময় নির্ভর করে। একদিকে সমাজ জীবনের মান সাধু স্বভাব লোকেরা উন্নততর করতে পারে—আবার তেমনি উন্নততর সমাজ সাধুজীবনের চাহিদা

বাড়িয়ে তোলে। এদের ভিতর একটা পারস্পরিকতা বা Interaction আছে। আবার অনেক সময় সমুদ্রের নিম্নচাপ ঝড়ের সৃষ্টি করে। ভারসাম্য রাখবার চেষ্টা করে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মে যখনই অসাধুদের অভ্যুদয় বেশী হয়, তখন অন্যদিকে সাধুজীবনের প্রাকৃতিক চাহিদা ধীরে ধীরে এসে পড়ে।

অবতারের অভ্যুদয়ও এইজন্যে হয়। বর্তমান সমাজ জীবনের সাধুতার নিম্নচাপ সৃষ্টি আশা করি 'প্রাকৃতিক নিয়মে' ভারসাম্য সৃষ্টি হবে।

আমরা জানি Each action has an equal and opposite reaction —মহামনীষী Newton-এর এই নিয়ম সর্ববাদিসম্মত।

ছাত্রদের চঞ্চলতা

ছাত্র সমাজের বিক্ষোভ চঞ্চলতা কোনো নূতন কথা নয়। এর পুনরাবৃত্তিতে ইতিহাসেরই পাতা পুষ্ট হয়েছে বরাবর। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি ছাত্রদের বয়ঃসন্ধিকালে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব স্বভাবতই এসে পড়ে। অপরাধ প্রবণতার কারণ খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় তাদের জীবনে অনুভূতির একটা সমতা হারিয়ে গেছে। হয় তারা শরীরের দিকে অক্ষম না হয় মনের দৈন্যে দুষ্ট। আরো অসৎসঙ্গ আর শাসনের অভাবেও ছেলেরা অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে। গৃহের অপরিচ্ছন্ন উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে ছেলেরা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করে, হিংসা বা ক্রোধ যুক্ত হয়ে পড়ে এদের দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে পড়ার আশঙ্কাই বেশী। দেশের অর্থনৈতিক ও অসংযত আবহাওয়াও এর অন্যতম কারণ। আরো মনে হয় সমাজের সঙ্গে ছাত্রদের, বিশেষ করে শিক্ষকদের ও শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছাত্রদের প্রীতিযুক্ত সম্বন্ধে গ'ড়ে না উঠলে সংঘর্ষ বেড়েই ওঠে আর তার ফলে নানারূপ ক্রোধ-মূলক ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে যায়। বয়স্কদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র ছাত্র মনে অযথা নানাপ্রকার অসংযত প্রেরণা যোগায়। অপরাধমূলক পুস্তকও ছাত্র সমাজের মনে অবৈধ প্রেরণা যোগায়। এইসব জড়িয়ে ছাত্রদের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদের রাজনৈতিক কাজে নিযুক্ত করে তাদের সংযতজীবনের গণ্ডী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক নিম্নমানও ছাত্রদের মনের বিক্ষোভের কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার চঞ্চল প্রকৃতিও ছাত্রদের চঞ্চলতার কতকটা কারণ।

আমাদের ছাত্রদের অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের কর্ণধারদের ছাত্রদের সম্বন্ধে এই সব বিষয়ে বিশেষ অবহিত হলে ভাল হয়। ভবিষ্যৎ ছাত্রদের উপর সমাজের অনেক কিছু নির্ভর করে। এই বোধ নিয়েই আমরা যেন ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হই।

যুগাচার্য স্বামীপাদের মত জোর করে Positive ভাব নিয়েই বলতে হবে —Tell him that he is God.

শ্রীরামকৃষ্ণভাব

শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীপাদগণ ও রামকৃষ্ণ ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে রামকৃষ্ণ ভাবলোক। শুধু Hydrozen বা শুধু Oxygen-এর মধ্যে পাওয়া যাবে না জলের প্রকৃত প্রকৃতি। তেমনি শুধুমাত্র ঠাকুর বা শুধু স্বামীপাদের মধ্যেই পাওয়া যাবে না রামকৃষ্ণ তত্ত্ব। Evolution-এর Emergence বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। তেমনি মানসরাজ্যে বা ধর্মরাজ্যে emergence বা কৃপা। আর ভক্ত ভগবান ও ভগবৎ মিলেই হবে নূতন emergence বা সত্ত্বাপ্রকাশ আর আর ভক্তদেরও যোগ্যতম হ'তে হবে এই রামকৃষ্ণ ভাব নূতন পথে emerge বা চালনা করতে।

মনস্বী য়ুঙ্গের Anima and Persona মনোবিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব। Anima আমাদের ব্যক্তিত্বের অবচেতন সত্ত্বা আর Persona হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিত্বের সচেতন সত্ত্বা। দুটি মিলে আমাদের ব্যক্তিত্ব। সজ্ঞানে যেটি শক্তিশালী অবচেতনে সেটি অপটু সাধারণতঃ এই আমাদের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু য়ুঙ্গের এই কথা মহাপুরুষদের বেলায় সত্য নয়। এঁদের Persona ও Anima এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই।

এঁদের অবচেতনে আর সচেতনে বিশেষ বিভেদ নাই। এদুটি অখণ্ড মানস সত্ত্বায় পরিণত হয়। য়ুঙ্গের মতে গোষ্ঠীগত অবচেতন মনে Race Instinct থাকে। Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি ও Archtype বা চিন্তার আদিরূপ এইগুলিই আমাদের কর্মপদ্ধতির নিয়ামক। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ও

অবতারকল্প পুরুষদের গোষ্ঠী হচ্ছে বিরাটের গোষ্ঠী। বিরাটের মনের ধারা এঁরা বংশানুক্রমে লাভ করেন। তাই এঁদের Archtype ও Instinct ও বিরাট ও সত্য-শিব-সুন্দরের মনের গঠনানুসারে এই Instinct ও Archtype প্রকাশিত হয় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে; তাই মহাপুরুষদের স্বপ্ন ভূমার স্বপ্ন—দিব্য স্বপ্ন অতিমানবীয় স্বপ্ন।

য়ুঙ্গ প্রভৃতি মনীষীগণ মানবের বিরাট জৈব অস্তিত্বের সংস্কারের কথা বলেন নাই। এই অস্তিত্ব পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রায় অর্দ্ধেক কালব্যাপী ১২০০ লক্ষ বৎসর ব'লে নির্দিষ্ট হ'য়েছে। এইসব সংস্কারও আমাদের Archtype ও Instinct সৃষ্টি করে।

এই চেতন অবচেতন ও গোষ্ঠীমনের প্রভাব এড়ানো মানবের সাধ্যাতীত কেবল বিরাট মনের শক্তির সহায়তায় সম্ভব। য়ুঙ্গের মতে মনের ভাবসাম্য বজায় রাখতে দেবতা, পুরাণ কাহিনী আলোচনা, এইসব প্রয়োজন মনে হয়। দেবস্বরূপ পুরুষ ও তাদের জীবনবেদ আলোচনারও প্রয়োজন। মানতে হয় কারণ মহাপুরুষদের Leadership ও যুগে যুগে প্রেরণা স্বরূপ হয়েছে।

বিরাট মনের Anima-তে বিরাট বিশ্বের প্রয়োজনে স্পন্দিত হয়, যেমন আমাদের ক্ষুদ্র Anima স্পন্দিত হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রয়োজনে, আর এই বিরাটের Anima-র Archtype-গুলি যুগের দিশারীদের বংশগত সম্পদ। তাই লোকোত্তর পুরুষদের মনে বিশ্বের কল্যাণ চেষ্টা স্বতঃই দেখা দেয়। বাইরে এঁরা নিরক্ষর অক্ষম দেখা গেলেও বিরাট শক্তির ভাণ্ডার যে অবচেতনে থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ অবতারকল্প পুরুষেরা যাঁকে এতবড় ক'রে গেছেন, মহাকালী ব'লে গেছেন সেই দিব্য অবচেতনের বলে এঁরা জগদ্ধিতায় কর্ম ক'রে যান আর সে কর্মে সত্যকার জগদ্ধিত হয় কারণ বিরাট Persona ও Anima সঙ্গে তাঁদের থাকে যোগযুক্ততা।

দক্ষিণেশ্বর লীলায় শ্রীঠাকুরও একেই ভাব ও অভাবমুখ চৈতন্য, চিৎ ও অচিৎ বলে স্বীকার করেছেন। এই কি Conscious unconseious তত্ত্ব।

ন্যায় মতে মনকে অচেতন বলা হয়েছে। এরই ক্ষণপ্রকাশ চৈতন্যময় সত্ত্বা।

গীতা মতে অক্ষর বা অপ্রকাশ যিনি তিনিই ব্রহ্ম আর প্রকাশিত জগৎ ক্ষরভাব অধিভূত। এও মনে হয় সেই অবচেতন ও চেতনের শ্রেণী বিভাগ অবশ্য বিরাটের দিক থেকে যোগমায়া সমাবৃত হয়ে, লোকের কাছে ইনি অপ্রকাশ। তবে ক্ষর বা প্রকাশিত জগৎ অক্ষর বা অপ্রকাশিত জগতের পারেও এক সত্ত্বা আছেন একথা গীতায় পাই। এই দৃষ্টিতে চেতন অবচেতনের

চেয়ে গীতার প্রকাশ অপ্রকাশ তত্ত্ব আরো অর্থপূর্ণ মনে হয়। পুরুষোত্তম তত্ত্ব, Russel, Neutral staff ব'লে এর দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন কিনা চিন্তার বিষয়। শ্রীঠাকুরও বলেন, 'যিনি সৎ তিনিই অসৎ আবার আরো কত কি'—বিজ্ঞানের বর্তমান indeterminacy তত্ত্বটা কত আগেই ঠাকুর বলে গেছেন।

আমাদের কথা

বছরের প্রথম দিনটিকে অভিনন্দন করা আজকের কথা নয়। বৈদিক উষায় প্রথম দিনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আমরা পাই অথর্ব বেদের নবম মণ্ডলের চতুর্দশমন্ত্রে। আজো মানুষের যা কামনা সেই কামনা নিয়েই ঋষিরা যুক্তপানি হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেবতার দ্বারে। দীর্ঘ জীবন, সম্পত্তি সম্প্রসারণ, আশার পরিপূর্ণতা, দেবতার কৃপা, এমনি সব প্রার্থনা জেগেছে সেই আদিম উষায়। শান্তি ও স্বস্তির প্রার্থনা জেগেছে মানুষের সেই প্রথম আশায়।

যুগে যুগে সর্বকালে মানুষের এই আশার প্রার্থনা, শান্তির প্রার্থনা আমরা পাই বিভিন্ন সভ্যতার স্তরে। আজ জগতে সকলের যা একান্ত কাম্য সে এই শান্তির বাণী। যুগ যুগ মথিত করে দেবাসুর সকলেই চেয়েছে এই শান্তির অমৃত পাত্র। জগতের ইতিহাসেও দেখি শান্তির প্রার্থনা যুগে যুগেই উঠেছে মানবের বুক ভেঙ্গে। যুগে যুগেই মানবাত্মা এই শান্তির আকুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভগবানের দুয়ারে।

বৌদ্ধ গ্রন্থ "ধর্মপদমে" বলা হয়েছে শান্তির থেকে বড় কোনও সুখ নাই। যার মধ্যে ধ্যান ও জ্ঞান একত্রিত হয়েছে তার কাছ থেকে শান্তি দূরাপহত নয়। (৩৭২) নির্বাণ যেটি বৌদ্ধমতে চরম শান্তি, সেটির থেকে বড় কথা বৌদ্ধধর্মে আর নাই। (২০৪)

খৃষ্টধর্মের বেদ যে বাইবেল তাতে রয়েছে—তিনি আমাদের শান্তি। (এ. পি—২১৪) হিব্রু ধর্মগ্রন্থ তালমুদে পাই—ভগবানের আশীর্বাদ কেবল শান্তির আধারে বিধৃত হতে পারে। কাশ্মার প্রবচনে পাই নির্ভরতার বীজ বপন করলেই শান্তির ফসল পাওয়া যায়।

কনফুসীয় ধর্মে রয়েছে ভগবানই মানুষকে শান্তির নিরাপদ ভূমিতে নিয়ে যায়। চৈনিক প্রবচনে আছে শান্তি বিশ্রান্তির মূল্য হাজার স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও বেশী।

চৈনিক ধর্মগ্রন্থ "তাওতে চিন" কে গীতার সঙ্গে তুলিত করা যায়। এর একটি বাণীতে আছে বাসনা নিরস্ত হলেই শান্তি।

আজ পৃথিবী যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে—তাতে আমাদের সমবেত ভাবে প্রার্থনা দরকার শান্তির জন্যে, কল্যাণের জন্যে—তাই আজ সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে প্রার্থনা শান্তির উৎসের কাছে—

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বে দেবাঃ শান্তি ব্রহ্মশান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ (অথর্ব বেদ ১৯।৯।১৪)

শুভ বৈশাখী

সে একদিন—মহতো মহাদিন—শ্রীঠাকুর লুটিয়ে পড়েছেন পঞ্চবটের ধূলায় ……একদিকে চিরগতি ভঙ্গের পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা—আর একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন ভবতারিণী; রহস্য নিথর তাঁর শ্রীমুখ। ভাবে রাঙ্গা মুখ আরো রাঙা হয়ে উঠেছে অস্ত রবির রঙে—বলছেন ঠাকুর—মা, আরো একটা দিন যে গেল —দেখা দিলি কই? বছরের আরো যে একটা চলে গেল—আমাদের বুকে কি কোনদিন জাগে; মা আরো একটা বছর গেল—তোর দিকে এগিয়ে গেলাম কই। সৃজন কমলের দল—হাসি কান্নায় রাঙ্গা তার পর্ণপুট—এমনি এক একটি দল খ'সে পড়ে মহাকালের স্রোতে—হারিয়ে সে যায় সপ্তপর্ণের রামধনুর মত—তবু এরা রেখে যায় যে সংস্কার তারি পঞ্জরেই গড়ে উঠে সভ্যতার প্রবাল দ্বীপ—ব্রহ্মাবগাহী জগৎ।

মহাকালের নটরাজের এক হাতে বরাভয় আর হাতে বজ্রাগ্নি। গীতায় শ্রীভগবানের এক রূপ দ্রষ্টা-সাক্ষী-সারথি আর এক রূপ—মহাকাল। নিজেই বলেছেন, কালোহস্মিলোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো। (১১।৩২) (আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল একরূপে)।

শ্রীভগবানের এই রূপই আজ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তবে কালের আগে অকাল আছে—একথা বেদে আছে। ঋষিরা বলেছেন,—আদিত্যের আগে যে কাল তার নামই অকাল। (অর্থব বেদ ৫৩।৫৪)। গ্রীস দেশের ঋষি প্লেটোর চিন্তাতেও কাল স্বর্গের সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছিল। এই কালের

পারে যে পুরুষোত্তম চক্রধারী ঠাকুর তাঁর চরণে পার্থের মত প্রপত্তি নিয়ে আমরা যেন বলি, "শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" আমরা তোমার শিষ্য, আমাদের রক্ষা কর। আর এ যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেন অন্তর মথিত করে তোলে, যেন বলতে পারি,—মা, আমি শরণাগত—শরণাগত—শরণাগত। এই শরণাগতের রক্ষা যে তাঁর যুগে যুগের দায়। রামকৃষ্ণার্পণম্

ভাবমুখের কথা

শ্রীঠাকুর নববর্ষে নব কল্যাণের বাণী দান করুন এই আর্ত ও ত্রস্ত ধরণীকে—এই প্রার্থনা আমরা আজ নতশিরে তাঁর শ্রীচরণে জানাই।

"ভাবমুখে থাক" এই আদেশ জগজ্জননী ক'রেছেন তিন তিনবার তাঁর সন্তানকে—তাঁর স্বরূপকে—কেন যে ক'রেছেন তার নিরিখ ঠিকমত আমরা দিতে অক্ষম, তবে কিছু বুঝাবার চেষ্টামাত্র ক'রতে পারি।

উনবিংশ শতাব্দীর জগতে মা'র এই মহাবাণীর প্রয়োজন কি ছিল সেইটাই আমাদের অনুধাবন ক'রতে হবে।

রাসেলের মতে (History of western philosophy. P. 753) পাশ্চাত্যের ভাবধারায় দেখি—উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার জগৎ তার পূর্ববর্তী কালের চেয়ে বেশী জটিল, এই সময় চিন্তাজগতের পরিধি গিয়েছিল বেড়ে। মার্কিন ও রুশদেশের দার্শনিক চিন্তা এই চিন্তারাজ্যে এক প্রয়োজনীয় ইন্ধন জুগিয়েছিল। ইউরোপ আগের চেয়ে বেশী অবহিত হ'য়েছিল প্রাচ্যের দর্শনে। বিজ্ঞানের জয়রথ নবপথ নিয়েছিল বেছে। যন্ত্রের ব্যবহারে যে প্রচুর উৎপাদনতা বেড়ে গিয়েছিল তার ফলে সামাজিক পরিস্থিতি গিয়েছিল বদলে, আর মানুষের মনে তার পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কে বিশেষ শক্তির সচেতনতা এনে দিয়েছিল; আরো দার্শনিক ও রাষ্ট্রীয় বিশেষ বিশেষ বিদ্রোহ উপস্থিত হ'য়েছিল মানুষের চিরকাল পোষিত বিশ্বাসে আর তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে যে সব পুরাণো বিশ্বাস যেমন সত্য আর ভাগবৎ তত্ত্ব, মানুষের শক্তিকে সীমার মধ্যে রাখতে চাইত, এখন মানুষ তার থেকে মুক্ত হ'তে চেষ্টা সুরু করল। এগুলি ধর্মের গ্লানি হিসাবে গণ্য করা যায়।

বৃটিশ রাজ্যে এই যুগ গৌরবময় যুগ—কলাশিল্প ও বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠা

এই যুগেই হয়। রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির অপূর্ব সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধিত হয় এই যুগেই। অষ্টাদশ শতকে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে ওঠে আর তাইতে ধর্মরাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহও ওঠে প্রবল হ'য়ে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর রক্তপাত সংঘটিত হয় এই শতকে। এও ঐহিকতার কথা, অসমন্বয়ের কথা।

আঠারো শতকে একদিকে লক ও হিউমের মতবাদে ছিল বস্তু তান্ত্রিকতা অন্যদিকে বার্কলের, কান্ট-এর ভাববাদ এনে দিয়েছিল দু'টি বিভিন্ন স্রোতের গতিভঙ্গী।

আঠারো শতকের শেষ থেকে রোমান্টিক গতিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল দর্শন, রাজনীতি, শিল্পকলা ও সাহিত্য—এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ভাবের অনুপ্রেরণা—এই গতিভঙ্গীই উনবিংশ শতকে কবি বাইরণ, সোপেনহর, মুসোলিনী, হিটলারের ভাবধারায় পরিণত হয়।

"Rationalism"-এর বিদ্রোহের সুর মার্কিন ও সোভিয়েট রাশিয়ার বলশেভিক মতবাদে পরিণত হয়। অবশ্য হেগেলীয় ভাববাদের এটি একটি অদ্ভুত পরিণতি। ভগবৎ বিরোধী শক্তির অঙ্কুর এইভাবে দেখা দেয়। মেটিরিয়ালিষ্টিক বা জড়বাদী দর্শনের অভ্যুদয় এযুগের বিশেষত্ব।

অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা ভারতে প্রবেশ করে আর তার ফলে পঞ্চম শতকের Rationalism-এর ভাববন্যা পুনরায় দেখা দেয়। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও থিয়োসফী মতবাদের আবির্ভাব এই কারণে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যুদ্ধ-বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রচুর থাকায় রাষ্ট্রীয় অশান্তিও যথেষ্ট ছিল।

আবার এই উনবিংশ শতকে অর্থনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত হয়। কলকারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মসংখ্যাও বেড়ে যায়। ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেসের সুরু হ'য়ে রাষ্ট্রচেতনার সূত্রপাতও এই সময়ে হয়।

ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের ভারতের ঐহিক উন্নতির সূত্রপাত কতক পরিমাণে প্রতীচ্যের দান। প্রতীচ্যের তরঙ্গ প্রাচ্যে আসিতে সময় লাগে; তাই দেখি ওদেশের "Industrial Revolution" এদেশে তরঙ্গাভিঘাত করে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পর—১৮৮৫ সালে। (বিনয় সরকারের কালচারাল হেরিটজ অব ইণ্ডিয়া; প্রথম অঙ্ক) এদেশের সামাজিক পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে। কলকারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত হয়। কৃষির উন্নতিও এই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। ইংলণ্ডের মতই প্রথমে লোকসংখ্যার

উন্নতি হয়। সাহিত্যে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল প্রভৃতির লেখায় Romanticism Rationalism ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ দেখি। রাষ্ট্রে ইয়োরোপের স্বাধীন চিন্তার ধারা আনলেন ভিয়োজিও, সুরেন বাঁড়ুয্যে, তিলক, লজপত প্রভৃতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জামসেদজী টাটা, শিক্ষায় নূতন অবদান আনলেন বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ, হেয়ার, ধর্মে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির নূতনত্ব এক বিচিত্র উন্মাদনা সৃষ্টি করে। রেভা কালীচরণ ও খৃষ্টান ধর্ম মিশনারীদের বিরুদ্ধ চেষ্টা রাজশক্তি সহায়ে হিন্দুধর্মের ক্ষতি ক'রছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ চৈতন্য দাস, সিদ্ধ ভগবান দাস, চরণ দাস প্রভৃতি ও ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতিদের দানে সনাতন ধর্মের কিছু কুশলতা ছিল। ভারতে তখন নানাদিকে শক্তির প্রকাশ এইভাবে দেখা যাচ্ছিল। শ্রীভবতারিণীর শক্তিমন্ত্রে তখন দিকে দিকে নবযুগের আভাষ যাচ্ছিল পাওয়া। এরও প্রয়োজন ছিল। শ্রীঠাকুরের বিরাট দানকে ধারণ করবার মত আধার এইভাবে হ'চ্ছিল তৈরি। ধর্ম ছাড়া অন্য বিষয়ে তখন ভারতের নব জাগরণের সূত্রপাত হ'য়েছে। আর ধর্মে মহাপুরুষদের অভাব না থাকলেও এমন কোন মহাপুরুষ ছিলেন না যিনি শাক্ত, বৈষ্ণব, কৃশ্চান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাচরণকারীদের মধ্যে এক বিরাট সমন্বয় সাধন ক'রতে পারেন। বিশেষ তন্ত্রের বামাচার ও বৈষ্ণবধর্মে সহজিয়া বাউল প্রভৃতি মতবাদের ক্ষুণ্নতা, সমাজে দুষ্ট ব্রণের মত জেগে উঠেছিল। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় শ্রীঠাকুর যে সমন্বয় ও শান্তির বাণী এনেছিলেন আজ তার ফল সমগ্র জগতে এক নূতনযুগ সৃষ্টি ক'রেছে। শ্রীঠাকুরের আগমনের আগে ধর্মে সমন্বয় ও সহজ কথা কিছু পরিমাণে আনেন দাদু, তুকারাম, মুলুকদাস ও রামমোহন। কিন্তু তাতে বিরাট বিশ্বের ক্ষুধা মেটান সম্ভব হয় নাই।

শ্রীঠাকুরের আগমনের পর থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। "Idealistic" মতবাদের প্রাধান্য ও পরমত সহনশীলতায় প্রাচ্যে দেখি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, ডামেল, ভগবানদাস, ডাঃ হীরালাল হালদার, ওয়াডিয়া, ডাঃ ধীরেন্দ্র দত্ত ও ডাঃ অবিনাশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখনীতে "ভাবমুখের" বা Idealism-এর বাণীই রয়েছে। (Contemp. Ind. Phil. P. 15)

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের দিকপাল হেগেল, সোপেনহর, বার্গসঁ, উইলিয়ম জেমস্, হোয়াইট হেড, আল্ডাস হাক্সলে, আরবান, ক্রোচে, ম্যাকট্যাগার্ট প্রভৃতিরা Idealism-এর প্রতিষ্ঠাই ক'রেছেন। আবার অতি আধুনিক দার্শনিক Deweyর Instrumentalism মতবাদের পথও ঠাকুর

দেখিয়েছেন। ডিউই বলেন, বিশ্বাসটি ভাল তখনই ব'লব যখন যার ভেতর বিশ্বাস জাগে তার ভেতরে যে ক্রিয়াটি জাগায় সেটি যদি তার সন্তুষ্টির কারণ হয় তবে সেটি ঠিক বিশ্বাস—শ্রীঠাকুরও অবতারত্ব বিশ্বাসে এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন। মহাপ্রভুকে অবতার ব'লে বিশ্বাস না ক'রে মহাপ্রভুর দর্শনে তৃপ্ত হ'য়ে তবে সে বিশ্বাস দৃঢ় করেন।

এই যুগে ধর্মের গ্লানি অর্থে আমরা দেখি সমাজের জটিলতা। একদিকে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে মানুষের চিন্তার প্রসারতা, বিচিত্রতা ও বহুমুখীনতা, অন্যদিকে দেখি তাদের চিন্তার বলিষ্ঠতা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্টতা। ভগবৎ বিরোধী ভোগৈবসর্বস্ব চিন্তার স্রোতও এইভাবে বিশিষ্টতা লাভ ক'রেছে। কার্লমার্কস, এঙ্গেল প্রভৃতিদের চিন্তায় এক বিরুদ্ধ স্রোত দেখতে পাই। অন্যদিকে ভাববাদ ভাগবৎ চিন্তা বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে দার্শনিক ও চিন্তাশীলদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্বই প্রয়োজন —এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে ভাগবতীশক্তির জয়ই প্রকৃত জয়। আধুনিক একজন দার্শনিক সম্প্রতি বলেছেন, So many looking to the East So many are disappointed and are going East in Search of spirituality—Dr. Liventhal—Address to philosophers Sree Ramakrishna Centinary). এই যুগে শ্রীঠাকুরের আগমনের প্রয়োজন ও তার ফলও আমরা দেখি সার্থকতায় পরিপূর্ণ। যদিও মনে হয় চারদিকে ভোগের ঈশ্বর বিমুখীনতার স্রোত বেড়ে যাচ্ছে তবুও এ বিষয়ে চিন্তা ক'রলে দেখা যায় যে কোটী কোটী পশুদের ছাড়িয়ে সামান্য কতকগুলি চিন্তাশীল মানুষ আজ জগতের অধিপতি হওয়াই যেমন ক্রমবিবর্তনের (evolution) পরিণতি তেমনি সহস্র সহস্র মানুষের ভোগৈকসর্বস্বতার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি মহামানব যেমন স্বামীজি, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণ, রেঁমারেঁলা, হাক্সলী, আইনস্টাইন, জেম্‌স্ জিন্‌স্, এডিংটন, হোয়াইট হেড প্রমুখ ভগবৎ বিশ্বাসী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষদের উদ্ভব ক্রমবিবর্তনেরি সার্থকময় ফল।

When we speak of evolution do we study the stagnant forms...we choose the rare individuals who have contributed some thing to universal progress···the truth is we repeat, progress depends on a very small number of individuals. (Humm destiny—L. Nony.P. 126.)

প্রাণীবিদ্যার জগদ্বিখ্যাত এই মনীষীর বাণীর সারার্থ এই যে, ক্রমবিবর্তনের

প্রগতি বুঝতে হ'লে যেসব প্রাণীরা জগৎ থেকে মুছে গেছে তাদের ধরা চলবে না······আমরা সেইসব অল্প সংখ্যক প্রাণীদের ধরি যারা জগতের উন্নতির মূলে কিছু দান রেখে গেছে···জগতের সত্য উন্নতি অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজনের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত মনীষী ওয়েলসের মতে দেখি বর্তমানে সমস্ত মানবজাতীর ভ্রাতৃত্ববোধ মানবাত্মাতে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা ক'রছে। বর্তমানে U. N. O. ও তাহার বিভিন্ন শাখার, নানাবিধ বিশ্বপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থার যে আধিক্য তাও শ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের ফল মনে হয়। ধর্মই যে মূল প্রেরণা একথা আইনস্টাইন প্রভৃতিদেরও মত। শ্রীঠাকুর ধর্মসমন্বয়ে বিশ্বের সমন্বয়ের ভিত্তিই স্থাপন করে গেছেন।

শ্রীভবতারিণী তথা শ্রীঠাকুরের ভাবমুখের বাণী জয়যুক্ত যুগে যুগেই হয়েছে ও হবে এ বিশ্বাস আমাদের চিরন্তনী হোক—রামকৃষ্ণশুভম্।

আমাদের কথা

বৎসরের শেষ দিন আর প্রথম দিন। শেষ দিনে মনে স্বতঃই হিসাব এসে পড়ে কি করেছি না করেছি। উপনিষদের ঋষিদের প্রার্থনা—

বায়ুবলি খম মতে মথেদং ভস্মান্তং শরীরম্,

ক্রতো স্মর কৃতঃস্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর।

হে অগ্নি—কৃতকর্ম স্মরণ করুন।

এই হিসাবের কথা ব্যবসার ক্ষেত্রেও আছে। এই হিসাব-নিকাশের খাতা রাষ্ট্রের Budget পেশ করা। মানুষের নৈতিক জীবনেও এই হিসাব-নিকাশের কথা থাকে। অন্যায় যখনই করি যখনই আমাদের নৈতিকতায় আঘাত লাগে, তখনই ভিতরে যিনি আছেন তাঁকে ঠাকুর বলি আর সমাজসৃষ্ট বহুদিন-পুষ্ট সমাজ সংরক্ষিনী বুদ্ধিই বলি, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। হিসাব নিকাশের কথাও এসে পড়ে। পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে Retributive Theory হচ্ছে বড় কথা। সাজা দিয়ে পাপীকে ঠিক করা, আবার সাজা দিলে অন্য লোকেরা সমাজের দুর্নীতির সৃষ্টি করবে না, বা সাজা দিলে যারা অন্যায় সহ্য করে তাদের শান্তির জন্যও সাজা দেওয়া হয় আর সাজা দিয়ে ন্যায় বিচারে মর্যাদা রক্ষা করা উচিত; এগুলির মধ্যে শেষের মতবাদই

বড়। আমাদের মনে হয় এ সমস্ত মতবাদই সাজা দেওয়ার পিছনে থাকে, সত্য হয়েই থাকে।

সামাজিক সাজার পিছনে যেমন এইসব মতবাদ আছে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজ্যেও এমনি সাজা পাওয়ার পিছনে কিছু মতবাদের ধারণা করতে পারি। পরলোকের সংবাদ আমরা যদি জাগতিক ধারণা দিয়ে বুঝতে চাই তবে এও সম্ভব যে পরকালের সাজার পিছনে থাকবে আত্মার বিশুদ্ধি, অত্যাচারিত আত্মার শান্তি, পাপের প্রসার বন্ধ করা, আর সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর সবের পিছনে থাকে তাঁর করুণাঘন রূপ অর্থাৎ মা যেমন ছেলেকে সাজা দিতে গিয়ে করুণারই পরিচয় দেন, তেমনি শ্রীঠাকুরও আমাদের বিচার করতে গিয়ে বিচারকের মত নিস্পৃহভাবে থাকেন না। আমাদের সারা জীবনে পাপের কতকটা সাজা হওয়া দরকার। তবে সাজা দেহের হয়, মনের হয়, আত্মার হয়। ইহকালের সাজায় দেহের দিকে লক্ষ্য প্রধান কিন্তু পরকালের সাজায় আত্মাই প্রধান লক্ষ্য। আত্মার বিশুদ্ধি। প্রায়শ্চিত্তের তাপে আত্মার ক্ষুদ্রতা দূর হয়, স্বার্থদৃষ্টি রুদ্ধ হয়।

বৎসরের প্রথম দিনে আমাদের এই প্রার্থনা—যিনি সব ভাল মন্দের বিধাতা তিনি যেন করুণাঘন দৃষ্টিতে আমাদের অন্যায়ের ক্ষমা বা সাজা যা প্রয়োজন মনে করেন তাই দিয়ে আমাদের আত্মার অগ্রগতি অব্যাহত রাখেন। মহাবীর অর্জুনের মত আমাদের একান্ত প্রার্থনা……

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

(শ্রীগীতা)

প্রথম দিনে

জীবনের প্রথম পাতা আর শেষ পাতা—দু'টির লেখাই রহস্য মেদুর। —বৎসরের প্রথম দিন অনাগত দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কত আঁধারই না ঘনিয়ে আছে সেখানে, নিরাশাবাদী ভাবে। আবার আশাবাদীর মনেও জাগে নূতন দিনের আলো। জীবনের প্রথম দিনেও সকলে ভাবে শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ। আশা নিরাশার দোলা এখানেও মানুষের মনকে দেয় দুলিয়ে, জন্মকুণ্ডলী হয় প্রস্তুত—বিধাতা পুরুষের লিখন জেনে নিতে। কেউ কেউ আবার এসব চিন্তার কথা মনেই করে না। ভাবে যেমন দিন আসে তেমনি আসবে। ভাবনা চিন্তার কোন প্রয়জনীয়তা আছে তা তারা বোধ করে না। এদের কাছে কবি গ্রের ভাষায়ঃ

> 'Where ignorance is bliss
> It is folly to be wise.'

সেক্সপীয়ার এক জায়গায় বলেছেনঃ

'To fear the worst oft' cures the worst.'

তাই প্রথম দিনেই আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি একটা সমীহ দৃষ্টি রাখা ভালই মনে হয়। দুঃখ দুর্দিনের জন্য আগে থেকে তৈরি হ'য়ে থাকলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ হয়। শ্রীঠাকুরও বলেছেন, প্রথম অবস্থায় অনেক কষ্ট ক'রতে হয়, অন্যদিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বাসুদেব অর্জুনকে উপদেশ দিলেনঃ

> "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
> অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।"

পশু মানুষের মধ্যে পার্থক্যের একটি প্রধান কথা হচ্ছে যে, পশুরা বর্তমানের মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মানুষের প্রগতি তার দূরদর্শিতা। অনাগত দিনের জন্য প্রস্তুতি তার জীবনবেদ। এতেই গড়ে উঠেছে বিরাট এই সভ্যতা। আমরা শুধু বর্তমান নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারি না। তাই ভবিষ্যতের জন্য insured হওয়া প্রয়োজন। এই ভবিষ্যৎ চিন্তা ধীরে জীবনের পরপার পর্যন্ত ছেয়ে যেতে বসেছে—ওদেশেও। •

আশার সোনার প্রদীপ নিয়ে আমাদের চলতে হবে। বর্তমানই আমাদের

কাছে প্রধান। ভবিষ্যতের ভয়ে মুহ্যমান হ'লে চলবে না। আবার ভবিষ্যতের কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও হবে না। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ ক'রে আমাদের যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গীতার ভগবানের বাণী মূর্ত করতে হবে,—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

তার সঙ্গে মহাবীর অর্জুনের মতও বলি—"প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।"

প্রথম বৈশাখে

বৈশাখ মাস অতি পবিত্র মাস। চৈত্র আর বৈশাখ হ'তেই বৈদিক যুগে সাম্বৎসরিক যজ্ঞ সুরু হ'ত। যদিও বৈদিক বৎসর শীতকাল হ'তে আরম্ভ হ'ত তবুও পরে বৈদিক বৎসর চৈত্র, বৈশাখ হ'তেই সুরু হয়। কারণ শীতকালে যজ্ঞের স্নানাদি কষ্টকর। বসন্ত থেকে বৎসর সুরু একথা তৈত্তিরীয় (৫.১.৫.১.) ও ঐতেরীয় সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রয়েছে (১.১.২৬.) সেই প্রথম আলোর যুগ থেকে বৈশাখ মাস শুভ মাস। বৈদিকযুগে এই মাসের নাম ছিল মধু ও মাধব। (কালচারাল হেরিটেজ তৃতীয় খণ্ড ; পৃঃ—৩৪৫-৭)।

১৮৮৩ সালের বৈশাখী প্রভাতে শ্রীঠাকুরকে ভক্তবীর রামচন্দ্র এনেছেন তাঁর ভদ্রাসনে। এইদিনই প্রভুর প্রথম আসা। শ্রীমদ্ ভাগবৎপাঠের ব্যবস্থাও হয়েছে।

প্রভু আসিবামাত্র ভক্তবীর প্রণাম নিবেদন করে শ্রীঠাকুরকে বসালেন অগ্ররচিত এক আসনে। এইদিন প্রেমাভক্তির কথায় গোপীদের নিষ্ঠার কথায় সাঙ্গ হয় ভক্তও ভগবানের মিলন মাঙ্গলিক (কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

আবার দুই বৎসর পরে বৈশাখের প্রথম দিনেই শ্রীঠাকুর বলরাম মন্দিরে করেন শুভাগমন। বেলা তিনটা স্কুল শেষে মাষ্টার এসে দেখেন চিদাকাশে পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হয়েছে চারদিকে ভক্ত-গ্রহদল ঝলমল ক'রছে। ঐদিন শ্রীঠাকুর তাঁর নিজের সাধনলীলার কথায় সুরধুনীর ধারা দেন বইয়ে। "আমি তিন রকম

সাধন করেছি। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; সাত্ত্বিকে তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে বা শুদ্ধ নাম নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিকে নানারকম প্রক্রিয়া—এত পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ ক'রতে হবে, পঞ্চতপা ক'রতে হবে, এত ষোড়শোপচারে পূজা ক'রতে হবে। তামসিক সাধন তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালি-কি তুই দেখা দিবি নি। এই গলায় ছুরি দেব—যদি দেখা না দিস। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই। যেমন তন্ত্রের সাধন। এইদিন মার দর্শনের কথায় ব'লেছেন—মা দেখা দিলেন সেই ভুবনমোহন রূপ! মনে প'ড়ছে মহাভাবের অবস্থা কথায় ব'লছেন—এ অবস্থায় আনন্দও যেমন যন্ত্রণাও তেমনি—মহাভাব ঈশ্বরের ভাব সব দেহ মনকে তোলপাড় ক'রে দেয়—হয়ত ভেঙ্গে চুরে যায়। আমিই এই অবস্থায় তিনদিন অসাড় হ'য়ে পড়েছিলাম। হুঁস হ'লে বামনী আমায় স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁয়ার যো ছিল না, গা মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল—পুড়ে গিয়েছিল···। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর—বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর—কি আর তোমরা ক'রবে—তাতে প্রেমভক্তি করে দিন কাটান।" (কথামৃত তৃতীয় ভাগ ৪র্থ খণ্ড)

এই পুণ্যদিনে এমনি পুণ্য কথায় শ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে যেন আমাদের জীবন ধন্য হ'তে পারে। এমনি পুণ্য আলোয় আমরা যেন সারা বৎসর, সারা জীবনকে উচ্ছল ক'রে নিতে পারি। এই প্রথম প্রভাত যেন আমাদের সারা বৎসর আলোয় আলো ক'রে রাখে। বৎসরের প্রথম দিনে এই স্বস্তি বচন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুভ হোক, কল্যাণময় হোক—এই প্রার্থনা শ্রীঠাকুরের চরণে—

"শুভ হোক পূর্ণ হোক, হোক অভীময়
জীবনের প্রতি পদে হোক তব জয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শুভম্।

বৈশাখের প্রথম দিনে

মানুষ আর ইতর জীবের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদ এই যে, মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে পারে। সেই প্রথম উষার যুগ থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে তার ভূত আর ভবিষ্যৎ। গুহায়িত জীবনে সে রেখে যেতে চেয়েছে অতীতের যত কাহিনী। "কথা কও হে অনাদি অতীত" এ তার জীবনের শাশ্বত বাণী। সে আবার ভবিষ্যতের অন্ধকারে দেখতে চেয়েছে তার জীবনায়ন, যাত্রাপথের অস্ফুট রাগিনী। গত দিনের কথা আর কাহিনী নিয়ে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে ভবিষ্যতের স্বর্ণসৌধ।

সভ্যতার এই চরৈবেতি মন্ত্র নিয়েই আজ সে তার বিরাট শ্বাপদ সঙ্কুল জীবনযুদ্ধে হ'য়েছে জয়যুক্ত—আজ সে ম্যামথ, টেরোডাকটাইলের সব বিরাট বিরাট বাধাকে পর্য্যুদস্ত ক'রে স্থাপন ক'রেছে তার একচ্ছত্রাধিপত্য।

এই যে ভবিষ্যৎ ও ভূত চিন্তা—এর পিছনে তার আছে প্রজ্ঞার ইঙ্গিত। এই প্রজ্ঞাই আজ তাকে জয়যুক্ত ক'রেছে গুহায়িত জীবনের অন্ধকার থেকে। এরই ইঙ্গিত পাই ডারউইনের Survival of the fittest, এরই ফলে সে পেয়েছে struggle for existence এর জয়বৃত্ত।

আজ আমাদের দেখতে হবে আমরা প্রজ্ঞার দিশায় আলোর পথে চলেছি কি না। সারা দেশময় যেন অপ্রজ্ঞার অন্ধকার ছেয়ে আসছে। মানুষ আজ sentiment-এর দিশায় ক্ষণিকের সুখপন্থী। পশুত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গী তাকে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে নিয়ে চ'লেছে। 'অন্ধংতম প্রবিশন্তি'—বলেছেন উপনিষদ। এই sentiment গুলি নিম্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ।

আজ আমাদের emotional জীবনটাই যেন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক চাপে emotional জীবন কমে যায়। এটা মনোবিজ্ঞানেরই কথা। (Psychology, Woodworth. p. 364)। কিন্তু সমাজ যদি emotional জীবনকে বড় ক'রে দেখে তবে আমাদের জীবন পশুত্বের কাছাকাছি স্তরেই এসে যায়। মস্তিষ্কের বৃদ্ধি আর গঠনের ইতিহাস দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধমস্তিষ্কের cerebral cortex এর বিবৃদ্ধি। দেখা গেছে যখনই আমরা আসবমত্ত হই তখনই এই cerebral cortex কতকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে আমাদের উর্দ্ধ মস্তিষ্ক নিম্নতরদের

উপর আধিপত্য রাখতে পারে না, আর আমরা তখন অন্ধপ্রবৃত্তির পথে impulsive জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হই। সমাজ আজ প্রায় সমস্ত মানুষকে পশু প্রবৃত্তির পথে নিয়ে চলেছে—সাহিত্য, মঞ্চ, পট ও জাতির গতি দেখলেই এটি বেশ বোঝা যায়।

আজ বৎসরের প্রথম দিনে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে মহাবীর অর্জুনের মত ভগবানের কাছে,—'স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা' স্থিত প্রজ্ঞার বাণী আমাদের জানাও ঠাকুর! আমাদের প্রজ্ঞা লাভের পথে নিয়ে চলো। —আর স্বামীজির কথার প্রতিধ্বনি করতে হবে—"আর বল দিন রাত, হে শঙ্কর হে গৌরীনাথ আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমায় মানুষ কর।"

চৈত্র বৈশাখ ঃ প্রলয় ও সৃষ্টি

ঝরা পাতার চৈত্র যেন মহাকালের মন্ত্র প্রলয়ান্তে জটাজালে বিসর্জনের সুর—তবে এর পিছনে আসে নব-বৈশাখের বাণী—নতুন কুঁড়িতে আসা নূতন জীবন; আনন্দ বেদনার ধন এই চৈত্র এনেছে কত জীবনের কত বাণী—নদীর মত কোথাও ভেঙ্গেছে কূল, কোথাও গড়েছে নূতন চর। নূতন পুরানো দিনের হিসাব হয় শেষ—নূতনের আশায়।

জীবনের একটি পাতা খ'সে মিলিয়ে গেলো মহাকালের স্রোতে—আজ আমাদের হিসাবের পালা—কি করেছি কত দূর এগিয়ে পড়েছি না স্রোতাবর্তে ঘুরেছি এই পুরাতন বর্ষে···নূতন খাতায় জমা পড়বে না বকেয়া বাকীর জের টানা হবে। জীবনটা দেউলের পথে চলেছে এই একটা বর্ষে না নব-জীবনে অগ্রসর হ'তে পেরেছি। এইসব বিচার আমাদের ক'রতে হবে। ভাল মন্দের জাবদায় হিসাব রাখতে হবে নির্ভুল, আর ধরে দিতে হবে শ্রীগুরুরূপ হিসাব-পরীক্ষকের হাতে। যদি তাঁর দৃষ্টিতে ভাল চলা হয় তবেই ভাল বলা চলে।

ভাল মন্দের হিসাব-রক্ষক ঠাকুর স্বয়ং। সব হিসাব তাঁর হাতে। এই হিসাব-রক্ষকের কথা উপনিষদ বলেছেন এঁরই হাতে মৃত্যু আর জন্ম, সংহার ও সৃষ্টি হচ্ছে চৈত্র ও বৈশাখ। উপনিষদ বলেছেন—"যথোর্ণ নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ" উর্ণনাভির মত যিনি সৃষ্টি ও লয় করেছেন। জলন্ত অগ্নি হ'তে স্ফুলিঙ্গের তুলনা দেওয়া হয়েছে।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥

তিনি সংহার মোক্ষ স্থিতি বন্ধন হেতু। উপনিষদে তাঁকে অদ্বিতীয় মায়া বলে বর্ণনা করেছেন,—"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ।" প্রত্যেক জনের হৃদয়েই তিনি থাকেন আর অন্তকালে কোপ প্রকাশ পূর্বক সংহার করেন।

প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥

যিনি দেবতাদিগের উদ্ভব প্রভবের স্থান, যিনি বিশ্বের অধীপ সর্বজ্ঞরুদ্র—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন—শুভ বৈশাখের হোক সূচনা—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—জাবদা খাতায় ভালমন্দর হিসাব ধরে দিতে হবে তাঁর চরণে।

বৈশাখে

নেমিচক্রের আবর্তনে আর একটি সুর মিলিয়ে গেল দূর অনন্তে—কোথায় এর সুরু, কোথায় এর শেষ কে বলবে···কালোহস্মি লোকক্ষয় কৃৎ প্রবিদ্ধো··· বলেছেন মহাকাল নিজে। আমরা শুধু কান্নাহাসির মালা গেঁথে দি তাঁর চরণে। মালা ঝরে যায়, সুবাস যায় হারিয়ে অসীমের পথে।

মনে পড়ে প্রথম দিনে প্রথম প্রভাতে সমিদ্ধ হোমাগ্নির সম্মুখে সমবেত কল্যাণ প্রার্থনা অগ্নি তিলকে—হোতা নির্বেদস্বামী। ১১ই বৈশাখে 'কচ-দেবযানী' আবৃত্তি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও নিবেদিতার আবৃত্তির আয়োজন ও তাকে টেপ রেকর্ডে রাখা। বৈশাখে রণ দেবতার উন্মত্ত অভিযানে বুকচিরে রক্ত দিয়ে কাতর প্রার্থনা শান্তির জন্যে। সুরু হ'ল বিশ্বের কল্যাণ হোম ১৬ই জ্যৈষ্ঠ নির্বেদস্বামীর হোতৃত্বে। ২১শে জ্যৈষ্ঠ শেষ আহুতির সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল বিপুল বর্ষণ। কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের হোম দর্শন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের জন্য হোম আর প্রার্থনা। নূতন টেলিফোন পেয়েছে তারা আর সেই সুযোগেই জানায় শুভ সংবাদ।

বর্ষণ মুখর হয়ে আসে ১৫ই আষাঢ়, একটানা ধৈর্যহারা বৃষ্টি—জগন্নাথের রথযাত্রা স্থগিত থাকে। আমাদের শ্রীগোপালজীর কাছে প্রার্থনা, শ্রীপ্রভুর রথ যেন চির অবাধ গতি পায়। শুভ সংকল্প ব্যর্থ হয় না। মুহূর্তে সামান্যমাত্র ক্ষান্তি, উৎসব সমাপ্ত হয়।

২০শে আষাঢ় রৌদ্র ঝলমল দিনে শরতের গান লেখা হয় সুরু। পরের দিন অপরেশ লাহিড়ী ও তাঁর পুত্র, কলত্র নেতাজী বাণীচিত্রের স্বামীজির গান গেয়ে গেলেন অপরূপ কণ্ঠে—"এক অরূপ নাম।" তারি সঙ্গে জীবনের নানা কথা, কত দুর্গম শৈল সানুতে সুর সংগ্রহের চেষ্টা আর স্বামীপাদের সঙ্গীতটির মর্ম সুরে স্পর্শ করতে পেরেছে কিনা। কথায় কথায় রাত গিয়েছিল বেড়ে।

মনে পড়ে ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট। স্বাধীনতার দিনে শ্রীগোপালজীর সামনে পতাকা তোলা—"জয় ভারত জয় দেবমাতা" গানের সঙ্গে...ফুড ডিরেক্টর জেনারেল মিত্র ও তাঁর ভক্ত সহধর্মিণী বলে গেলেন তাঁদের গৃহদেবতা গোপালের নানাকথা পরম আনন্দেই। জন্মাষ্টমী শুভলগ্ন এসে পড়ল ২রা ভাদ্র এসেছে, নূতন হীরের মুকুট। একটি গানের সঙ্গে স্নানোৎসব,—অনেকেই যোগ দেন ..নিবিড় আনন্দে দিন যায় কেটে।

স্বামীজির জন্মতিথি সমাগত, সাধুসন্ত ভক্ত আর দরিদ্রনারায়ণদের প্রসাদ দেওয়া বন্ধ—বুক নিঙড়ে ওঠে এও কি সম্ভব—শ্রীঠাকুরের মহতী ইচ্ছায় কিছু বাধে না।

১৭ই ভাদ্র রাধাষ্টমীতে লগ্ন যায় ব'য়ে যতই তাড়াতাড়ি করা হয় শ্রীগোপালের ততই দেরী করা—আগে তার ভোগ পরে অন্য প্রয়োজন।

১৮ই ভাদ্র লড়াই ঘোরাল হয়ে উঠেছে, বুকচিরে প্রার্থনা, কয়েকদিনই... যাতে শান্তি হয়।

২রা আশ্বিন, রবিবার নিষ্প্রদীপ রাত্রি—স্বামীপাদের জন্মতিথি উৎসবের দিনে ভক্ত সমাগম বেশই হয়, পূজাদি যথামতই হয়। সমবেতদের প্রসাদ বিতরণাদিও বাদ যায় না। কিন্তু রাত্রে আতঙ্ক—ছত্রী সৈন্যের ভয়। ব্যারাকপুরে আর অন্যত্রও বোমা পড়ে—অমলানন্দের প্রায় মাথার উপরেই। দিনের বর্ষণসিক্ত হ'য়ে এল নিখিল আর রাত্রে ভগ্নদূতের মত এসেছিল অংশুমান। সে একটি সঙ্গী করে হেঁটেই বাড়ী ফেরে—যানবাহন বন্ধ।

পূজা সুরু কিন্তু আড়ম্বর নেই, ছুটী নেই। সকলের মনে যুদ্ধের বিভীষিকা—রাত্রে আশ্রমে 'রাজা রামকৃষ্ণ' অভিনয়—প্রসূন, জ্ঞানঘোষ, বিমানবাবু এঁরা পূজায় এসেছেন। আশ্বিনের ১৫ই শ্রীগোপালজীর নূতন অলঙ্কার নীলার

তৈরি সকলের পরম আনন্দ। দুপুরে পূজার শেষে সাধিকা আনন্দময়ী মা আনন্দ করে যান। চলচ্চিত্র তোলা হয়।

রাত্রে অপরেশ লাহিড়ী এঁরা সব মার সামনে সঙ্গীত করে গেলেন। প্রতিদিন দুপুরে জমাট কালীকীর্তন, আশ্রমের ভক্ত আর সাধুদের নিয়ে। নবমীতে মানসমন্দির শিল্পীদের কালীকীর্তন বিকেলেই হয়। দশমীর দিন পূর্বমত খেলার পালা। আর সেদিন দুপুরে নূতন মন্দিরের মাথার উপরের লোহার তৈরি কাঠামো তোলা হয়। ২৯শে কোজাগরী পূজা, জাগরণে যায় বিভাবরী। ৬ই কার্তিক, অমাতিথিতে মার পূজা, রাত্রি জাগরণ—ভক্তদের।

বুকচিরে মাকে আহুতি প্রদান দক্ষিণেশ্বরে। আশ্রমে ভাইফোঁটার আনন্দ ৯ই হয়। এবারে যুদ্ধেও কিন্তু কমতি হয়নি। শ্রীগোপালজীকে চন্দন দিয়ে আনন্দ করে প্রায় ১৪ পর্বের ভোগ দেওয়া হয়। ১৫ই কার্তিকে গোষ্ঠলীলার অপূর্ব সজ্জা—শ্রীগোপালজীর আর তার সঙ্গে ছোট ছোট সাধুদের—চলচ্চিত্রে তোলা আছে। রাসমণ্ডলেও অপূর্ব আরতি ২রা কার্তিক—এটিও চলচ্চিত্রে স্বাক্ষরিত আছে।

সিউড়ী রওনা হবার দিন ২৭শে কার্তিক, পথে পড়ে অভেদানন্দ কলেজের আলোক-সজ্জা। ছাত্ররা একে একে প্রণাম ক'রে যায়, প্রসাদ বিতরণও হয়। ছাত্ররাও কিছু উপহার দেয়। প্রণামীগুলি কলেজের ভাণ্ডারে দেওয়া হয়। ক্লাসের ঘরগুলি এই সময় সব দেখায় কৃষ্ণানন্দ। পরের দিন দুবরাজপুর যাত্রা। এখানে ২৯শে থেকে রোজ গোপালকে নিয়ে রেল লাইনের ধারে ভক্তদের মেলা। ভজন, ভোগ নিবেদন এসব একটানা সঙ্গীতের মত চলতে থাকে। কলকাতা থেকে চরণ দাস গেছে, ফটিক, রেণুরা সব উপস্থিত। কাত্যায়নী পূজার বিরাট পর্ব হ'ল সুরু। প্রায় ৫০।৬০ মণ চাল এই নিয়ন্ত্রণেও ভক্ত আর দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে পরিবেশিত হয়। অন্য নানা অনুষ্ঠানও ছিল যথাযথ। ১৪ই থেকে ১৭ই চার দিন পূজায় ব্রতী ছিলেন শ্রীযুত ভোলাপদ ভট্টাচার্য। ১৭ই অগ্রহায়ণ সঙ্গীতানুষ্ঠান—নির্মলা, আশীষ প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। রাত্রে আশীষের বন্ধুর ঘড়ি চুরি যায়। গোপালকে মানসিক করার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে পাওয়া যায়। রাত্রি তখন অনেক। ঘড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আসে একজন। তাঁরা বক্রেশ্বরে যান।

২৪শে পাহাড়েশ্বরে সকলে যাই। পূজা আর ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীগোপালজীর ভোগ নিবেদনের পর শালনদী দেখে আমরা ফিরে আসি প্রায় ২৷৷০ টার সময়।

২৫শে অগ্রহায়ণ শ্মশানে দুপুরে সমবেত জপ, এর আগে তিনদিন জপ করা হ'য়ে গেছে। ছেলেরা প্রায় রাত্রেই জপ করে রাত কাটায়। নদীর স্রোতের মত দিন চলে যায়। এদিকে সিউড়ীর আমন্ত্রণ এসে পড়ে। সিউড়ী ফিরলাম সকলে।

শ্রীমার তিথিপূজা ২৯শে অগ্রহায়ণ। ৬ই পৌষ থেকে ১০ই পৌষ পর্যন্ত অখণ্ড হোম। ৯ই পৌষ ভগবান ঈশামসির পূজা, জার্মানী থেকে X'mas tree আসে, সেটি জ্বেলে দেওয়া হয়। চকলেট ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ রাত্রে সঙ্গীতের সঙ্গে। ১২ই পৌষ দুমকার নিমন্ত্রণ রক্ষা। সেখানে কিছু রাজকর্মচারী আর ভক্ত সমাগম ও কিছু শাস্ত্রচর্চা। বিমলানন্দের অসুস্থতায় তাকে রেখে আসতে হয় সেখানে। সে পরের দিন ফিরে আসে। শ্রীমান সম্বুদ্ধ দুমকা যাত্রার সংবাদে কলকাতা থেকে সোজা চলে আসে, পথে গাড়ী বিকল হয়। সেই সময় হঠাৎ অরুণানন্দ একটি গাড়ী নিয়ে আসায় সম্বুদ্ধের আশ্রমে পৌছানর সুবিধা হয়।

সারদামেলার ১৪ই পৌষ সন্ধ্যায় যথারীতি উদ্বোধন, কিছু বিঘ্নের আভাস পাওয়া যায়। সজ্জা ও ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়। ১৬ই পৌষ জানুয়ারীর প্রথম দিনে কল্পতরুহোম, বিতর্কসভার শেষে কিছু গোলমাল হয়। শ্রীমান সত্যেনের মধ্যস্থতায় সব ঠিক হ'য়ে যায়—১৭ই শান্তিনিকেতনের দু'জন অধ্যাপক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৬ই 'উমাহৈমবতী' বেশ সাফল্যের সঙ্গে হোল। পরেরদিন বৃষ্টি সুরু, উৎসব পণ্ড হবার উপক্রম। ১৮ই পৌষ সঙ্গীত সম্মেলন; প্রায় সব শিল্পীই আসেন কিন্তু অঝোর বৃষ্টিতে আশানুরূপ সমাগম হয়নি। কম্বল, গেঞ্জি এসব দরিদ্রনারায়ণদের দেওয়া হয়। পৌষের ২০ তারিখে কলকাতায় ফিরে আসা। ২৮শে পৌষ স্বামীজির উৎসব—অখণ্ড হোম, পূজা এসব আর রাত্রে ১২টায় গঙ্গায় জলধারা; প্রায় সকলেই যোগ দেয়। ৭ই ফাল্গুন শিবরাত্রি ব্রতপোবাসে কেউ কেউ যোগ দেয়। সমগ্র রাত্রিব্যাপী পূজা। এর পর এসে পড়ে শ্রীঠাকুরের পূজা মহোৎসব। অধিবাস উৎসবে দক্ষিণেশ্বর মার চরণতলে ব'সে আরত্রিক ও ভজন। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনেকেই যোগ দেয়। শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা, নীলকণ্ঠ, ডঃ উমা রায়, সত্যেন ও আরও অনেকে। 'উমাহৈমবতী'র অভিনয় এখানেও হয়। শিশু মেলায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'রামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য' থেকে আবৃত্তি করেন। সঙ্গীতে নির্মলেন্দুর সম্প্রদায়, বড়ে গোলামের সম্প্রদায়, শ্রীযোগের বেহালা আর জ্ঞান ঘোষের সঙ্গত। দরিদ্রনারায়ণদের সেবা এসব অনুচিতেই শেষ হয়। বিশ্ব-

রূপায় দু'টি অভিনয় 'উমাহৈমবতী' আর 'ক্রিষ্টফার'। এতে রাস্তায় ছেলেদের গাড়ীতে বেশ ধাক্কা লাগে। কিন্তু বেশী জখম কেউ হয়নি।

চৈত্রের হোমে অগ্নিতিলকে সারা বৎসরের যত শোক-দুঃখ ভালমন্দ সব সমর্পণের পালায় বহু সম্মেলনেই শেষ হয় সম্বৎসরের এই পারায়ন। প্রণাম জানাই মহাকালকে—চক্রধারী শ্রীঠাকুর আর শ্রীমার চরণে—প্রণাম জানাই সব ঘটের প্রকাশকে—হে পরম দেবতা—জয় হোক তোমার নাম। অনাগত তোমার লীলা ছন্দকে স্বাগত জানাই—জানাই প্রণাম তোমার কল্যাণ মূর্তিকে। রুদ্র যত্তে দক্ষিণামুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্।

বৎসরের প্রথম দিনে

বৎসরের গণনার সঙ্গে ধর্মের সঙ্গতি যে বহুদিনের একথা আমরা ইতিহাস অনুধাবন করলেই পাই। হিব্রুজাতির মাস ও বৎসর গণনায় দেখি যদিও তারা নিজের দেশ ছেড়ে আসবার আগে চাষ আবাদের সঙ্গে মাস বৎসর গণনা জুড়ে দিত তবু পরবর্তীকালে কতকগুলি feast জুড়ে দেওয়া হয় বর্ষগণনায়। যথা "Dedication." কামবোডিয়াতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর থেকে বর্ষগণনা করা হয়।

গ্রীসদেশেও পাই কতকগুলি festival বা ধর্মীয় উৎসব অনুসারে বৎসরাদি নামিত হ'ত। ঈজিপ্টদেশেও দেখি যে তাদের বর্ষগণনা ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। ঈজিপ্টের ধর্মের তত্ত্ব তাদের বর্ষগণনার মধ্যে পাওয়া যায়। আরো তাদের পুরাণকথারও কিছু উদ্ভূত হয়েছে বর্ষগণনা থেকে।

ক্রিশ্চিয়ান বর্ষগণনা খুলে দেখি যে বিভিন্ন চার্চের বিভিন্ন সাধুসন্তদের ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার দিন থেকে সুরু হয়েছে।

ব্যাবিলোনিয়ার বৎসর, মাস গণনার পর্বগুলি আর ধর্মানুষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধিত। মার্কিনবাসী ইণ্ডিয়ানদের কারো বৎসর মাসের কোন নিরিখ নাই, আবার কারো কারো বৎসর গণনায় তাদের পর্বাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে।

জাপানে পাঁচটি ধর্মানুষ্ঠান বর্ষগণনার সঙ্গে সংযুক্ত।

রোমক বর্ষাদি গণনাতেও ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়।

আমরা দেখি যে প্রায় সর্বত্র বর্ষের সঙ্গে ধর্মের যোগ র'য়েছে। আমাদের বর্ষগণনার সঙ্গেও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান র'য়েছে যুক্ত হ'য়ে।

আজ বৎসরের প্রথম দিনে আমাদের প্রার্থনা, যেন ধর্মের সঙ্গে আমাদের এই যোগ কোনদিনই ছিন্ন না হয়।

Ency. of Rel. & Ethics—P. 61.

প্রথম বৈশাখে

বৈশাখের দাবদাহের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দাবদাহে বৈশাখ পুড়ে গিয়ে যখন কালো রঙ ধরবে, তখন সেই রঙে Radiation ও Absorption সবচেয়ে বেশী হবে। যা কিছু ভাল জিনিস তখন এই বৈশাখ তা' ছড়িয়ে দেবে, যা কিছু শুভ জিনিস তা আকর্ষণ ক'রবে।

জীবনের প্রথম দিকে দাবদাহ থাকলে, এই কালো রঙ ধরলে, সব দিকেই মঙ্গল—নিজেরও কল্যাণ, পরেরও কল্যাণ। এই কালো রঙ ধরা চাই জীবনে। কালো রঙ Radiation ও Absorption বেশী করে। বস্তু বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব, জীব-বিজ্ঞানেও সত্য। তপস্যাতে জীবনে যখন কালো রঙ এসে যাবে তখন সেই জীবন মঙ্গলময় সবদিকে।

দেবতাদের বর্ণনায় আছে যে, তাঁরা শ্বেতশুভ্র। এই শ্বেতশুভ্র কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়। প্রথমতঃ তপস্যার অগ্নিতে আমাদের পুড়ে যেতে হবে, জ্বলে যেতে হবে, কালো হয়ে যেতে হবে—তারপর আসবে শ্বেতশুভ্রের মহিমা।

এই তপস্যা ব্রহ্মকেও ক'রতে হ'য়েছিল—তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব তপস্যা দ্বারা বর্ধিত হয়। তিনি সৃষ্টির জন্য তপস্যা করেছিলেন। এসবই উপনিষদের বাণী। ব্রহ্ম তপস্যা দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন।

শিবের জন্য উমা মহেশ্বরীর তপস্যা আমাদের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি তীব্র তপস্যার দ্বারা শিবকে লাভ করেছিলেন।

ভগীরথের তীব্র তপস্যায় গঙ্গা আসেন্ নেমে—পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা—এতেই তো সগরের শতসন্তান পুনর্জীবন লাভ করেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখি তপস্যা ছাড়া কিছুই হয় না। শিল্প হয় না, বিজ্ঞান হয় না, প্রতিষ্ঠা হয় না, দর্শনের নব নব তত্ত্ব উন্মেষ—তাও হয় না। জমির ফসল—তাও হয় না। নব নব দেশ আবিষ্কার—সেও তপস্যার ফল। তপস্যায় পুড়ে আমাদের কালো হ'তে হবে।

বৈশাখ তারই প্রতীক।

চৈত্রের নীলপূজা

বীরভূমে একটি প্রসিদ্ধ পূজা, নীলের পূজা বা নীলকণ্ঠ শিবের পূজা। এ পূজা চৈত্রের শেষ দিনের আগের দিনে হয়, এর কোন তিথি বা নক্ষত্রের নিরিখ নাই।

এর সাধারণ বিধি নিরম্বু থেকে সন্ধ্যায় দেবতার আরতি করা। তবে যাঁরা নীলের সন্ন্যাস নেন তাঁরা সাতদিন কেউ ফলাহার করে থাকেন, কেউ কেউ বা একবার হবিষান্ন গ্রহণ করেন, রাত্রে শিবমন্দিরে ভূমিশয়ন ও সপ্তাহব্যাপী সংযম প্রভৃতি এঁদের বিশেষত্ব। নীলপূজার দিন রাত্রে পূজার পর এক বিরাট হোম হয়। হোমে একমাত্র সেবক ব্রাহ্মণের অধিকার। তারপর হোমাগ্নি নিভে যাওয়ার আগে 'ফুল খেলা' আরম্ভ হয়। যাঁরা সন্ন্যাস নেন, তাঁরা এই জ্বলন্ত আগুন আঁজলা আঁজলা নিয়ে ফুলের মত খেলা করেন। এটি দেখতে যত সুন্দর তত ভয়ঙ্কর। ভোর হবার আগে পর্যন্ত এই খেলা চলে। শুধু ছেলেরাই এই উৎসবে যোগ দিতে পারে।

নীলের পূজার এই ফুলখেলা বীরভূমের কোটাশূরের মদনেশ্বর শিবতলায় বেশ জমকালো ভাবেই হয়। এখানকার একটি বিশেষত্ব হ'ল এই মন্দিরে সাতটি মহাদেব পূজিত হন। কিন্তু বৎসরের এই নীলপূজার দিন ছাড়া দেবতা মন্দিরে থাকেন না। গ্রামের কাছেই ময়ূরাক্ষী নদীর খানিকটা অংশ—গ্রাম্য ভাষায় এটিকে কাঁদর বলে। এই কাঁদরের জলেই সাতটি মহাদেব সারা বছর থাকেন। নীলপূজার দিন প্রত্যুষে নীলের সন্ন্যাসীরা এদের মাথায় ক'রে নিয়ে এসে মন্দিরে বসান এবং ফুলখেলার শেষে আবার তাঁদের মাথায় ক'রে সেই জলে স্থাপন ক'রে আসেন। কিন্তু কি আশ্চর্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন কাঁদরের

সবটুকুই শুকিয়ে যায়, তখনও এর জল শুকায় না বা প্রচণ্ড বানের সময় এই অংশটুকুর জলের কোন বৃদ্ধি হয় না। মহাদেব যেমনটি ছিলেন তেমনটি থাকেন। একটুও সরে যান না।

সেদিনে যখন বন্যায় শুধু সেই গ্রামখানিই নয় বীরভূমের প্রায় সর্বত্রই ময়ূরাক্ষীর প্রবল বানে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সে বৎসরও কাঁদরের ঠিক ঐ জায়গাটুকুর কোন ক্ষতি হয়নি—মহাদেবও অচল অবস্থায় সেই স্থানেই অবস্থান করেছিলেন।

অকারণে

যুগে যুগে নেমে আসা, অবতীর্ণ হওয়া সেটি অকারণে···মনে হয় বিরাট শিশু সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকেন ব'সে—হঠাৎ জাগে অবতরণের ইচ্ছা—কোন হেতু নাই, কোন কারণ নাই—যেমন ব্রাহ্মী ইচ্ছা অকারণেই জেগেছিল সৃষ্টির বিলাসে—"বহুশ্যাম্"—বহু হব।

"যদা যদাহি" বলে গীতামুখে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা—সে কথা মনে হয় পার্থকে ধর্মযুদ্ধে প্রচোদনা দিতে, ধর্মরক্ষাকল্পে নিয়োজিত ক,রতে······

আমাদের নৈয়ায়িক জগৎ—আমাদের দেশকালের নিমিত্তের গণ্ডীরপারে —সমস্ত Relativity বা আপেক্ষিকতার পারে·· তিনি কত কি ভাবে লীলা ক'রছেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া তো যাবে না—তাই তাঁর অবতীর্ণ হবার কারণ মনে হয় অকারণেই—বৈজ্ঞানিক চিন্তাও এখন এই অকারণ বাদে অনেকটা এসেছে—নিয়মগুলি Probability তত্ত্বে পরিণত হ'য়ে পড়েছে।—Indeterminacy তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে পড়েছে—Hysenberg প্রভৃতির চিন্তার অবদানে—বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি সম্ভাবনা মাত্র—averages মাত্র দাঁড়িয়েছে।

Einstein-এর বিজ্ঞান জগৎ Relative জগৎ—আপেক্ষিক জগৎ-এর পারে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি পারে না পৌঁছাতে·····মনস্বী Kant এই অজ্ঞেয় লোকের চিন্তায় দিশা হারিয়েছেন—অজ্ঞেয়বাদের প্রচার করেছেন—Noumenon জগতে ইঙ্গিত মাত্র করেছেন,—আজকার দর্শনেও অতীন্দ্রিয়বাদের কথা এসে প'ড়েছে--"George Santayana" Transcindental

Absolutism এ (Twentieth century Philosophy) বলেন, A changing world is defined at each moment or in each movement by the essence of that moment or of that movement and when it drops that pattern the essence then dismissed remains in its logical identity .. The eternal selfidentity is therefore a condition for the possibility of change.

রাসেল বলেন, দর্শন organic viewকে ছাড়িয়ে আজ atomism-এ এসে পড়েছে। কিন্তু আমরা যদি দর্শনকে বন্ধনে না ফেলি, সত্যকে অনন্ত ক'রে রাখি তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে organic ও atomism দুইই সত্য হতে হবে। জগৎটী একটী organic whole ও বটে আবার atom গুলিও সত্য—এদের ভেদও আছে অভেদও আছে—দুইই সত্য। অনির্দেশবাদে বিজ্ঞানদর্শনে আজ জোর ক'রে কোন কথা বলা চলে না, মনে হয় সবই Indeterminacy. Russel interaction কে মানছেন না তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে, কিন্তু আত্মার Vibration ও nuclear vibration পরস্পর interact যে করে, এটী না মেনে পারা যায় না। যখনই আমরা মন দিয়ে কোনো বিষয় চিন্তা করি তখনই আমাদের মনের vibration বস্তুর vibration এর উপর প'ড়ে বস্তুকে বদলে দেবে নিশ্চয়; কারণ Rassel এর কথায়—"The staff of the mental and physical world is the same"—বস্তু জগতের ও মনোজগতের প্রকৃতি একই (Twentieth century Philosophy. page 348).

Russel আরো বলেন·· All the laws of dynamics have been put together into one principle called "the principle of least action" আবার the fact that quantum is an unit of action is also fundamental in the empercal structure of the universe.

কিন্তু এই দুই-এর সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না বিজ্ঞানে—There is no bridge connecting the quantum theory and the theory of relativity (A. B. C. of relativity p. 102).

কিন্তু আমাদের অসীম অনির্দেশ্য চৈতন্য সত্তায় এ-দুয়েরি অস্তিত্ব রয়েছে—আমরা এদের সামঞ্জস্য, একত্ব চিন্তা করতে পারি—তখন এরা দুই-ই সত্য ontological truth. কাজেই বিজ্ঞানে এদের প্রমাণ সময় সাপেক্ষমাত্র।

Whiteheadও বলেন, ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে "His existance is the ultimate irrationalitiy (Seicnce and modern world).

ধর্মরাজ্যে অবশ্য-এর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। গীতামুখে ভগবান বলেছেন—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌।

আর দক্ষিণেশ্বরের বাসুদেব বলেছেন, "যার অচল আছে তার চল ও আছে" (কথামৃত)। কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে, কি সামাজিক সমস্ত চিন্তা ও কার্যে আমরা এই এক অনির্দেশ্য অকারণের ধারাই দেখছি। এর পিছনে আছে চলার ধর্ম আবার আছে অচলত্ব।

শ্রীঠাকুর ব'সে আছেন, দক্ষিণেশ্বরে সমাধিতে নিথর—মন হু-হু করে উঠে যাচ্ছে বিলোম মার্গে…জ্যোতি বেড়া দেওয়া রাজ্য পেরিয়ে অখণ্ডের ঘরে—দেখেন—সাতটি ঋষি বসে আছেন ধ্যান নিথর।

আর দেখেন সেই অখণ্ডের এক অংশ দিব্য জ্যোতির শিশুরূপে প্রকাশিত হ'য়ে প্রবীণতম ঋষির কাছে গেলেন—তাকে অবতীর্ণ হবার কথা ব'লতে… তাকে সাক্ষী করে নিতে… এর পিছনেও আছে এক বিরাট অকারণ অহেতুকী প্রীতি—শুদ্ধ লীলা মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা

অপ্রকাশ-অথচ প্রকাশ তত্ত্ব অতি গূঢ় তত্ত্ব। এক কাল ও পাত্রে বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুগ (Transcendental ও Immanent) তত্ত্ব আরো গভীরতত্ত্ব। অন্য অন্য অবতার লীলায় এ তত্ত্ব প্রকটিত তেমন হয়নি। ঠাকুর ভাবমুখে বলেছেন যখন দেহে ফুটে উঠেছে স্বর্গের সুষমা—Penticostral fire (Bible)—কত সাধনায় দেহ হয় ভাগবতী তনু—তখন ঠাকুর ব'লছেন, "ঢুকে যা ঢুকে যা, এসব চাই না মা।" চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধনার পর দেহ মনে অদ্ভুত দ্যুতি—সেটি দিলেন সরিয়ে প্রার্থনা ক'রে মার কাছে। আবার এদিকে লোকের জন্য মার কাছে প্রার্থনা ক'রছেন, ভক্তদের জন্য বুক নিঙরে কেঁদে কেঁদে ব'লছেন মার কাছে, "মা নরেন্ যেন ডোবে না—রাখালকে সরিয়ে দিস না।" দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা না হ'লে সেখান থেকে উঠবেন না—"এদের যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই" বলেন মথুরের সঙ্গে তীর্থযাত্রা পথে দেওঘরের কাছে। "মা

দেখিয়ে দিলেন কালে ঘরে ঘরে এর পূজা হবে।" এসব জেনেও যিনি চান অপ্রকাশ হ'তে তার তত্ত্ব—তত্ত্বাতীত।

তখনি দেখি ছেলে মানুষের মত ফষ্টিনষ্টি করছেন, তখনি ছোট ছেলেদের দেখে সন্দেশের চাঙরা লুকোচ্ছেন, আবার পরমুহূর্তে একেবারে নিথর সমাধিস্থ, নির্বিকল্পস্থ। সাক্ষাৎ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন, দু'পা যেতে না যেতে, চান ক'রতে যাবেন দাঁড়িয়ে পড়লেন—হাত দু'টি নিজস্ব ভঙ্গীতে বেঁকে গেল, পরণের কাপড়টি গেল খ'সে, অর দিব্যশিশু দাঁড়িয়ে পড়লেন—মুখে বিচ্ছুরিত স্বর্গীয় হাসি, আর মার সঙ্গে আপন মনে বিড় বিড় করে কথা। এরি ভেতর হ'য়ে যাচ্ছে কত লীলা—মার সঙ্গে ছেলের লীলা—অথবা বিশ্বাতীত হয়ে বিশ্বানুগের লীলা। শ্রীকথামৃতের ছত্রে ছত্রে কত লীলা, কত চিত্র, কত তত্ত্ব যে ছড়িয়ে আছে, তার ধারণা আমরা কখনও করতে পারব না। 'মুসলমান কুমারী' বেশে কখনও হাস্‌ছেন, 'রতির মার' বেশে কখন হাস্‌ছেন, কখন মুড়ি সেলাই নেই জামা পরে সাজছেন—ছেলের সঙ্গে মা'র এ দিব্য খেলা কে বুঝবে? সাধককে অনুগ্রহ ক'রতে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা শাস্ত্রে আছে। যখন স্বয়ং তিনি এইসব দেখান ও দেখেন তখন সেগুলি কি, আর তার দ্যোতনাই বা কি ও সেগুলি কি ভবিষ্যৎ বাণী ছড়াচ্ছে কে জানে? "ব্রহ্মদর্শন কি বা ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না, এ জিনিস উচ্ছিষ্ট হয় নি।" কিন্তু আবার বলেও গেছেন "চীনে দেশলাই জ্বাললে যেমন দেখা যায়।" এসব গূঢ় রহস্য শাস্ত্রের কোথাও নাই। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন কেমন হয় তাও বলেছেন, "যেন জরে রয়েছে।" সগুণ ব্রহ্মদর্শন ক'রে জ্যোতি সমুদ্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। এটি সারদানন্দ মহারাজের লীলা প্রসঙ্গে বেশ ভাল ভাবেই দেওয়া আছে। যোগের গোপন কথা ব'লতে কত প্রচেষ্টা। সব কথা বলা উচিত নয়—তাই ব'লছেন, "বলতে দেয় না, মা মুখ চেপে ধরেন।" তবু বলবার কত চেষ্টা। সমাধি থেকে মন নামবে না, তবু কত চেষ্টায় "জল খাব" বলছেন, "মুখ ধোব" বলে কুণ্ডলিনীকে স'রে যেতে ব'লছেন। "মা আমাকে বেহুঁস করিস না, রসে বশে রাখিস" বলে জীবের জন্য নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে দেবার মত চেষ্টা এই প্রথম। তবু যা বলে গেছেন তত্ত্বাতীত, শাস্ত্রাতীত— বেদবেদান্তের পার। "শেষ চক্রে যখন মন যায় তখন সচ্চিদানন্দের সঙ্গে একটা স্বচ্ছ সূক্ষ্ম ভেদমাত্র থাকে, যেন কাঁচের লণ্ঠনের মত।" ভক্তি রহস্যের কথা ব'লতে গিয়ে মাকে বলছেন, "মা, মুখ্যু বলে আমায় ফাঁকি দিলি, তোর বেদবেদান্তে কি আছে জানিয়ে দে···মা আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন, সব শাস্ত্রের সার কি·· সমন্বয় কি···বেদে যাঁকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম

বলেছেন, পুরাণে তাঁকে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ বলেছেন, তন্ত্রে তাঁকে সচ্চিদানন্দ শিব বলেছেন।" এমন সমন্বয় কোন যুগে কেউ করেনি। তাঁর নাম ক'রে তাঁর লীলা রসে দেহ বদলে গেছে, পুরুষদেহ প্রকৃতিদেহ হ'য়ে গেছে, পাগল হ'য়ে গেছেন—সেই অবস্থায় কত দিন ছিলেন। চোখের পলক পড়ত না—পাগলের মত মাথা ঠুকে পঞ্চবটীতে "মা" "মা" ব'লে কাঁদতেন। "মা দেখা দিবি না, ঐ আর এক-দিন চলে গেল আজও তুই এলি না", বলে নিজের মাথা কেটে ফেলতে গেছেন। স্বয়ং অবতার হয়েও ১২ বৎসর ঘুম হয়নি। কত বৎসর চোখে পাতা পড়েনি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখেছেন, আরসির সামনে। নিঃশ্বাস নিতে মনে পড়িয়ে দিতে হ'ত। কোন এক মহাপুরুষ এসে মেরে মেরে দেহজ্ঞান এনে খাইয়ে দিয়ে তবে দেহ রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জটাধারীর গোপালের সঙ্গে যে লীলা এ যুগে কেউ বিশ্বাস করবে! দেহ ধারণ ক'রে সেই সচ্চিদানন্দ, গোপাল হ'য়ে, ছোট্টটি হ'য়ে ঠাকুরের সঙ্গে লীলা ক'রছেন। গঙ্গায় ঝাপাই ঝুড়ছেন, কোলে চাপতে চাইছেন, খাবার চাইছেন, এমন কত দিন! নিজে ব'লেছেন, "এক একটা ভাব যেন ভূতের মত চেপে বসত।"

নিজে ব'লেছেন রত্নাকরের তীরে ব'সে, যেমন ক্রমাগত ইচ্ছা হয় আরো কত রত্ন আছে দেখি, তেমনি মা'র নব নব রূপ দেখতে ইচ্ছা হ'ত—সাধনা ক'রতে ইচ্ছা হ'ত। তন্ত্র মতে, বৈষ্ণব মতে, বেদান্ত মতে, খৃষ্টান মতে, মুসলমান মতে—প্রধান প্রধান সব মতের সাধন ক'রে সব মতের প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। এক অপূর্ব লীলা। সব মত পথ, সব ভাব রূপ, সব কিছুর সমন্বয়। সম্বল শুধু অসীম আকুলতা, তীব্রব্যাকুলতা।

সোপেনহাওয়ার বলেছেন, "world as will" আর শ্রীঠাকুর বলেছেন, **Sadhana as will.**

জগতের মহাপুরুষরা আজ এই কথা স্বীকার ক'রেছেন—"রামকৃষ্ণরূপে কে এসেছিলেন এত ধ্যান ক'রেও তা বুঝতে পারলুম না"—স্বামীজির এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হিরণ্যগর্ভের দর্শন, মহম্মদের দর্শন, যীশুখৃষ্টের দর্শন, গৌর নিতাই দর্শন ও তাঁদের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া—ভাগবত, ভক্ত ভগবান সব এক এই দর্শন, কুয়াশার মধ্যে দেখা আবক্ষলম্বিত হিরণ্ময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক পুরুষ এসে বল্লেন, "ভাব মুখে থাক" —এসব দর্শনে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, বেদের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে—চিরদিনের জন্যে। নিরক্ষর হ'য়ে আসার কি এই উদ্দেশ্য—কে ব'লবে?

বিবেক কথা

স্বামীজি ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গিয়েছিলেন আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। এই স্বাধীনতা ভারত পেয়েছে কার তপস্যায় বলা কঠিন। আজ স্বামীজির বাণী সফল হ'য়েছে। স্বামীপাদ সিস্টার নিবেদিতাকে ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যৎ মুক্তির পথে সাহায্য ক'রতে ব'লেছিলেন। আর এ ছাড়া তিনি প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মঠে।

স্বামীজির আর একটি কথা 'পরিব্রাজকে' দেওয়া আছে। গঙ্গার দৃশ্য বর্ণনা ক'রেছেন অনেকে। বঙ্কিমবাবুর গঙ্গা-যমুনাতীরের প্রাবৃট্ দিনান্তের কথা আমরা ভুলতে পারি না—"আয় আয় আয় জল আনিগে,—জল আনিগে চল"—এখানে 'পল্লীবালাদের মল' যেন আপনিই বেজে ওঠে।··রবীন্দ্রনাথের গঙ্গার শোভা যে দেখেনি তার বাঙলার শোভাই দেখা হয়নি। "গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো এক একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।" তবে স্বামীপাদের হৃষীকেশের গঙ্গার কথা মনে আছে—যার দশহাত নীচে মাছের পাখ্না গোণা যায়- সে গঙ্গাও যেন আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ে। স্বামীজি এই 'গঙ্গাবারি চ মনোহারী' নিয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যে···বাগে পেলেই তার এক আধ বিন্দু পান ক'রতেন। আর পান করলেই সেই পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সেই কোটি কোটি মানবের উন্মত্ত প্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হ'য়ে যেত···সেই বিলাসক্ষেত্র···অমরাবতী সম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ পেয়ে যেত আর শুনতেন মা ভাগীরথী যেন শিরায় শিরায় গর্জে গর্জে ডাকছেন—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।"

স্বামীজির আর একটি ভবিষ্যৎবাণীর জন্য অপেক্ষা ক'রছি—স্বামীজি ব'লেছিলেন, গঙ্গার শোভা দেখে নাও···এর পরে এসব শোভা থাকবে না। এ আর বেশীদিন থাকবে না···"সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার—তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল, নারিকেল, খেজুরের মাথা যেন চামরের মত দুলছে · হরেক রকম সবুজের কাঁড়িঢালা—আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে, আর সকলের নীচে ইয়ারকান্দী গালচে হার মানানো জলের কিনারা পর্যন্ত ঘাস। ঐ ঘাসের

জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা—নামবেন ইট খোলার গর্ত…আর ঐ তাল, তমাল, আম, লিচুর রং আর ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওর জায়গায় দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট, আর পাথুরে কয়লার ধোঁয়া…আর তার মাঝে মাছে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনী…

স্বামীজির আর একটি ভবিষ্যৎবাণী ছিল এবারে শূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব ঘটবে। লণ্ডনে আর একটি বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছিলেন, এবার শূদ্রযুগ আসছে—নবযুগের এই কি পূর্ব ছায়া ?

শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজির একটি কথা

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি পত্রে লিখেন, শিক্ষা হ'চ্ছে—মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম হ'তেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। এ কথার ভিতর কত যে দ্যোতনা আছে আমরা সেটি আজ ধারণা ক'রতে চেষ্টা ক'রব।

বেদান্তকেশরীর এই কথা বেদান্তের একটি মন্ত্র বিশেষ। তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষাধ্যায়ে ব্রহ্মের কথাই প্রধান। এই ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা আখ্যা লাভ করেছে উপনিষদে। দ্বে-বিদ্যে বেদিতব্যে…পরা চৈবপরা চ (মুণ্ডক ১।১।৪) উপনিষদে ধীরে ধীরে ঋষিপুত্রদের এই ব্রহ্মবিদ্যা বা ভূমাতেই নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতেন ব্রহ্মবিদগণ। অন্নব্রহ্ম, জলব্রহ্ম, তেজোব্রহ্ম, আকাশব্রহ্ম, স্মৃতিব্রহ্ম শেষ ভূমাব্রহ্মে নিয়ে গেছেন—সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ।

উপনিষদে ব্রহ্ম সর্বানুস্যূত ব'লে আখ্যাত হ'য়েছে। প্রানৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা। (মুণ্ডক ৩।১।৯) আরো ব'লেছেন উপমা দিয়ে—তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নি… সর্ব্বব্যাপিনমাত্মনং আবার ইনিই শিবরূপে সর্বভূতে নিগূঢ়—শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্ (শ্বেতাশ্বতর – ৪।১৬) তিনিই বৃহৎ আবার সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনিই দূরে আবার নিকটে, বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ…(মুণ্ডক ৩।১।৭) তিনি সর্বত্র—পুরোভাগে তিনিই পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধঃ ও উর্ধ্বে। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্

ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম। (মুণ্ড ২।২।১১)

তিনিই সবেরি ভিতরে আবার সকলের বাহিরে অবস্থিত—তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ (ইশ—৫)।

এই ব্রহ্মই সকলের প্রকাশক। কঠোপনিষদে ব্রহ্মর্ষি সত্য দৃষ্টিতে দেখেন তস্য ভাসা সর্ব-মিদং বিভাতি। তাঁর জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে ·· (২।২।১৫) আরো বলেছেন ;—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি --তাঁর জ্যোতিতেই সমগ্র জ্যোতির্ময়। (কঠো ২।২।১৫) তাই ব্রহ্মকে জানতে পারলে সমস্তই জানা হ'য়ে যায়।

এখন আমরা কয়েকটি আধুনিক শিক্ষার কথা আলোচনা করবো—দেখবো স্বামীপাদের সঙ্গে তারা তুলনীয় কি-না?

প্রথমতঃ জীবিকা বা অর্থ উপার্জনের শক্তি বা কৌশল আয়ত্তই শিক্ষা। এটি শিক্ষার অতি স্থূল সংজ্ঞা। বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা পর্যায়ে অনেকে ফেলেন। এই শিক্ষায় জ্ঞান যদি কাজে না লাগে--তবে তাকে অফলা বিদ্যা বলা হয়। ব্যক্তিগত ও জাতিগত কর্মে ইহার প্রয়োগ থাকা প্রয়োজন নচেৎ ইহা পূর্ণশিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না।

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃজনেই শিক্ষার সার্থকতা। এ দৃষ্টিভঙ্গিও পূর্ণ নহে, কারণ প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিচার শিক্ষার সার্থকতার একটি নির্দেশিকা। আর একটি মতবাদ। পরিপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুতি। পরিপূর্ণ জীবনযাত্রা শিক্ষা করার শিক্ষার বিশেষ আদর্শ আমরা পাই না। পরিপূর্ণ কোন্ দিকে? মানুষের বিভিন্ন দিক আছে, তার ব্যক্তিগত দিক, তার সামাজিক দিক, ব্যষ্টিগত দিক আবার তার আধ্যাত্মিক দিকও আছে। এ সবের পূর্ণ পরিণতি কি সম্ভব অথবা ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি সম্ভব? এ বিষয়ে শেষকথা খুবই কঠিন। আর একটি মতবাদ মানসিক শক্তির উৎকর্ষতা সাধন ও তাহার ব্যবহার। এটিত খুবই সংকীর্ণ মতবাদ। সকল মানসিক শক্তির অনুশীলন করা চলে না। চোরের চৌর্য্যবৃত্তি অনুশীলনীয় নয়। সর্বাবয়ব বিকাশের আদর্শও আর একটি শিক্ষার সংজ্ঞা। এই আদর্শকেও ব্যাপকভাবে ধ'রলে স্বামীপাদের শিক্ষার আদর্শই আসে।

পরিবেশের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধানই শিক্ষা। এটিও আধ্যাত্মিক দিক হ'তে সংকীর্ণ।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতবাদে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সামাজিক

উন্নতি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার বিরোধী তিনি ছিলেন। সেইজন্য সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার বিধান তিনি দিয়েছিলেন।

প্লেটো বলেন, প্রত্যেক মানুষই একটি বিশিষ্টসম্পন্ন এবং তার শ্রেণী-বিভাগ আছে এবং সেই সেই শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্তব্যের জন্য ব্যষ্টির শিক্ষাদান, তাদের উপযুক্ত শক্তি তাদের প্রকৃতি এ সব নির্ধারণ করা। তবে এঁদের মতে সমস্ত জ্ঞানই আমাদের ভিতর বর্তমান তবে শিক্ষা হচ্ছে সেই জ্ঞানকে ফিরে পাওয়া, ভুলে যাওয়া জ্ঞানকে স্মরণপথে আনা মাত্র। স্বামীজির আদর্শও অনেকটা এই।

এ্যারিষ্টটল চেয়েছিলেন, মানুষকে শিক্ষার দ্বারা ধার্মিক করতে।

দার্শনিক জন লক্ চেয়েছিলেন, শিক্ষাবিধানে পরিপুষ্ট মনের সঙ্গে পরিপুষ্ট দেহ। এঁর শিক্ষার মূলকথা—শিক্ষা হবে কার্যকরী সমাজের নানারকম অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি। কিন্তু রুশো শিক্ষার্থীকে সমাজের অকল্যাণকর আবেষ্টনী থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলের। শিক্ষা—সামাজিক দুর্নীতি থেকে তাকে রক্ষা ক'রবে। তাঁর শিক্ষা ছিল প্রকৃতির কাছে শিক্ষা এবং যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ক'রতে পারবে। প্রেষ্টলজি—নামে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ব'লেছেন যে—শিক্ষা হ'চ্ছে স্বাভাবিক অগ্রগতিশীল এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণরূপে আমাদের ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন। হার্ভার্ড বলেন যে—শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীর অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রকৃত শিক্ষক এমন আবেষ্টনীতে শিক্ষার্থীকে রাখেন যে সে ভাল সংস্কারগুলি আয়ত্ত করতে পারে। শিশু শিক্ষার প্রবর্তক ফোব্রেল বলেন যে—ছেলেদের ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই তিনি বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছিলেন কিণ্ডার গার্ডেন বা শিশুদের বাগান। তাঁর মতে ছেলেদের শিক্ষার ভেতরে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারও আছে আবার সমাজগত ব্যাপারও আছে।

জন ডিউই শিক্ষাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় সমাজের কল্যাণকর যাতে হয় সেইমত ব্যবস্থা ক'রতে বলেন। তাঁর মতে সমস্ত শিক্ষাই হ'চ্ছে একটা নৈতিক চেষ্টা। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যবহারিক, শিক্ষা আমাদের কার্যকরী হওয়া উচিত। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে, আমাদের হাতে প্রকৃতির দেওয়া যে সমস্ত শক্তি আছে, সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। (ডেমোক্রেসি এণ্ড এডুকেশন) ডিউই শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের কল্যাণের দিকটাই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন।

এইসব মনীষীদের মতবাদ আলোচনা ক'রে আমরা দেখি যে স্বামীপাদ শিক্ষা বিষয়ে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে আধুনিক ও প্রাচীন সব মতবাদের সার কথাই আছে।

প্রথমতঃ জ্ঞান আমাদের মধ্যেই আছে, বাইরের থেকে কিছু পাওয়ার কথা জ্ঞানে নাই। এটি সক্রেটিস প্রভৃতিরও মতবাদ। সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথাও এই মতে আছে ; কারণ প্রকাশ হ'তে হ'লেই বাধা সরানো দরকার। ব্রহ্মের স্বতঃ প্রকাশশীল সত্তা বাধাহীন হওয়া চাই।

তার জন্যেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের প্রয়োজন। এইসব পথ দিয়েই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ বুঝতে পারি। তাই জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ থাকা চাই—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রতে হ'লে আমাদের জগতের সঙ্গে যোগ রেখে সৎকর্ম ক'রতে হবে, ধার্মিক হ'তে হবে। সম দমাদি ষট্ সম্পত্তি যুক্ত হ'তে হবে। আরো ব্রহ্মবিৎ সর্বভূতহিতে রত হন। গীতামুখে ভগবান এই কথা বলেছেন। কাজেই আমাদের পূর্ণতার সঙ্গে সমাজের কল্যাণ জড়িয়ে আছে।

পূর্বাপর এইসব মতের আলোচনায় আমরা স্বামীপাদের শিক্ষার আদর্শ যে কত নিখুঁত এটি দেখতে পাই। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই শিক্ষার আদর্শ নিতে হ'লে এর টাকার প্রয়োজন। একে প্রয়োগ ক'রে যেতে হবে নিত্যকার কাজে। বর্তমানে যে সব শিক্ষাকেন্দ্র ধর্মের মাধ্যমে হয়েছে সে গুলিই আমাদের শিক্ষার ব্যবহারিকতার নির্দেশিকা হলেই আদর্শ পথে আমরা এগিয়ে যাব।

শেষের কথা এই যে ধর্ম বিরহিত শিক্ষা অপশিক্ষা ব'লেই মনে হয়। আর সে কথা প্রায় কোন শিক্ষার আদর্শে বলা হয় নাই। এক্ষেত্রে বিখ্যাত চিন্তাশীল হোয়াইট হেডের মতবাদ তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, "The essence of education is that it be religious . a religious education which inculcates duty and reverence ··The foundation of reverence in this perception, that the present holds within itself the complete sum of existence, backwards and forwards, that whole amplitude of time which is eternity. (The aims of education P. 26) তিনি আরো বলেন, শিক্ষা হ'চ্ছে তাদের আত্মবিকাশের সহায়তা করা। স্বামীপাদের কথার প্রতিধ্বনী মাত্র—পূর্ণতার প্রকাশই শিক্ষা—এই পূর্ণই অনন্তের নামান্তর।

স্বামীজির কবিপ্রতিভা

কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী ; আদিস্রষ্টা সেই পরম পুরুষকেই "কবীং পুরাণম্ অনুশাসিতারং" বলেছেন গীতামুখে ভগবান স্বয়ং। দ্রষ্টা কবি ঋষিদের মন্ত্রবেদ, উপনিষদে ধ্বনিত হ'য়েছে কবিতার ছন্দে। তাই প্রতি মন্ত্রের শীর্ষে তার ছন্দের নাম থাকে লেখা। দ্রষ্টা ঋষিরা মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন—ঋতমের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কবিতারূপে আবার কবিতার নবরূপের প্রথম প্রকাশ হয় আকস্মিকভাবেই, ঋষি বাল্মিকীর "মানিষাদ" কবিতার·· তিনি প্রথম কবি—আদিকবি—

স্পিনোজা ও শেলিং-এর মতে চরম সত্যকে—অদ্বৈত তত্ত্বকে—আমরা শিল্পীমনের সহজাত অনুভূতির দ্বারা জানতে পারি। অন্য উপায় নাই।

ইংরাজীতে কবি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'চ্ছে Maker বা স্রষ্টা—কবির কল্পনার গতিশীল মনের পরশে সমাজ জীবনে দেয় নবরূপ। সত্য-শিব সৌন্দর্যের মাধ্যমে—নানা বিষয়ে গঠনের কাজই হচ্ছে—কবির কাজ। ইংরাজী কবিতায় দু'টি রূপ দেখি ; একটি গতিশক্তিযুক্ত লীলায়িত প্রকাশ—যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ, virgil প্রভৃতি কবির লেখনীতে পেয়েছে রূপায়ণ। আর একটি·· প্রধানতঃ ভাবের—অনুভূতির রসঘন রূপ। যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র প্রভৃতির লেখনীমুখে। ইংরাজীতে কবিতার একটি স্বরূপ প্রকাশের কথা আছে। কবিতা হবে শিল্পীমনের অনুভূতির ছন্দঃ, যেটী একটি বিশেষ ভাবকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয়ে উঠে।

এঁদের মতে প্রথম শ্রেণীর কবিতা হচ্ছে Absolute dramatic vision নিয়ে লেখা। এঁদের লেখা ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা অতিক্রম ক'রে ছুটে যায় অসীমের পানে—সত্য-শিব সুন্দরের পানে—হারিয়ে ফেলে ক্ষণিকের জন্য তার নিজেদের সত্তা—যেমন দেখি কালিদাস, দান্তে, সেক্সপীয়র, কবিগুরু প্রভৃতিদের লেখায়। আর আছে relative vision-এর কবি—নিজের গণ্ডী এঁরা ছাড়তে পারেন না—পারেন না অনন্তের দিশা দিতে—শেলী প্রভৃতির অবদানে কবিতার এই রূপ আমরা পাই। Epic কবিতা বর্ণনা ভঙ্গিতে ও কথার ছলে পায় তার রূপ ; যেমন হ'য়েছে আমাদের রামায়ণে, রবীন্দ্রনাথের পদ্য কাব্যে আর হ'য়েছে ওদেশে Odessy প্রভৃতিতে। কিন্তু Drama কবিতায় জোগায় চিন্তার

খোরাক। ode-গুলি Mono Drama—এতে কবি নিজেই অভিনেতা। যেমন শেলীর ode to right কবিতা। বর্তমানে কবিতার রূপায়ণ হয়েছে জর্জিয়ান কবিতার যুগ হতে। Edward Marsh লিখিত কবিতাবলীতে প্রথম এই নাম প্রচারিত হয়। Irise Verse, House man ও Yeats-এর কবিতায় বিশেষ গতিভঙ্গী পেয়েছে। মার্কিনের কবিতায় গতি দিয়েছেন Walt whitman, (তৃণ পল্লবের কবি) Dickinson প্রভৃতি।

যাই হোক ইংরাজী কবিতার অবদান বাংলার কবির লেখনীতে বেশী পাওয়া যায় না। মধুস্থদন, তরুবালা, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির কবিতা বাংলায় একটা নিজস্বরূপ নিয়েছে—। দেশের বাণীদেবী Minervaকে দিয়েছে নব সজ্জা।

স্বামীজির ইংরাজী কবিতায় আমরা দেখি বেশীরভাগ অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা সম্ভার; প্রথম দেখি Song of the Sannyasin—এতে পাই বেদোদ্গাতা উচ্চশির বিবেকানন্দকে···জগতের সত্য বস্তু সেই ব্রহ্মকে যেন করামলকবৎ দেখিয়ে দিয়েছেন :

> ···· No more is birth
> Nor I, nor thou, nor God, nor man The "I"
> Has All become, the All is "I" and Bliss
> Know thou art That···

দুঃখবাদের চরমপথে এনেছেন—চরম শান্তির বাণী—দেখিয়েছেন কেমন ক'রে একে একে সব বন্ধন ভেঙ্গে দিয়ে পেতে পারি অসীম মুক্তির স্বাদ—স্রষ্টা না হ'লে, উপলব্ধি না থাকলে এমন বলিষ্ঠতার সঙ্গে বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাকে ধ'রে দেওয়া যায় না—মনে পড়ে বেলুড় প্রাঙ্গনে এক কথায় দিয়েছেন ধরে ব্রহ্মতত্ত্ব সমাগতদের মাঝে মনকে করেছেন ব্রহ্মাবগাহি—এক কথায়—"দেখতে পাচ্ছিস না এই যে ব্রহ্ম—করামলকবৎ"

Kali the Mother কবিতা লেখা এক অভূতপূর্ব দ্রষ্টার আসন থেকে—ঠাকুর বলেছিলেন, "দেখ তোকে আমার কাজ করতে হবে"'—একথা হয় যেদিন নির্বিকল্প সাধনে সিদ্ধপুরুষ এসে দাঁড়ান শ্রীগুরুর চরণ নিকষে। ঠাকুর বল্লেন, "এখন চাবি দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে, সময় হ'লে খুলে দেবো।" এর পরই দেখি কর্মবীর বিবেকানন্দকে—নির্বিকল্পের যোগীরাজের হ'ল সমাধি ···সেই চাবি হয়ত খুলে দিলেন ক্ষীর ভবানীতে ঠাকুর স্বয়ং—অম্বা ভবানীর দৈববাণীতে···। এই সময় মার দর্শন পেয়ে ভূমিশয্যায় শয়ান মহাপুরুষ কোন

রকমে একটি পেন্‌সিল জোগাড় করে এই কবিতা লেখেন—"মৃত্যুরূপা মার" দর্শন উপলব্ধি মহাপ্রয়াণের পূর্বাভাষ কিনা কে বলবে?

Who dares misery love
And hug the form of death
Dance in Destruction's Dance
To him the Mother comes.

স্বয়ং শিবই একথা ব'লতে পারেন ··প্রলয়ের এই ছবি শিল্পী রণদাচরণ শুনে শুধু অব্যক্ত চীৎকার মাত্রই করেছিলেন···রূপায়িত ক'রতে গিয়ে তুলিকা হয়েছিল অক্ষম..

The stars are blotted out,
·· Comes Mother come.

মৃত্যুরূপা মাকে এমনি ডাকা ডাকলেই না অমৃততত্ত্বের মেলে সন্ধান।...'The Cup' কবিতায় ধ'রে দিয়েছেন পথিকের হাতে দুঃখের পাত্র, কিন্তু পথিকের পথের শেষে, হবে তার সব চেষ্টার সমাপন তখনি পাবে মার দেখা—হবে তার সব চেষ্টার I bid close your eyes to see my face. Peace কবিতায় আমরা পাই রহস্যবাদ .

The power that is not power,
It is joy that never spoke,

ভাষাহীন আনন্দ।

'সমাধি' কবিতায় আমরা স্বামীপাদের এক বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ দেখি। নির্বিকল্প সমাধির পর এটি লেখা।

যেথা নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর—ভাসে ব্যোম
ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।

সমাধির স্তরে স্তরে নিস্তরঙ্গতা লাভের ক্রমানুভূতি ছন্দে ধরা দেওয়া এই প্রথম।

To the Fourth of July কবিতাটির একটি বিশেষ দ্যোতনা আছে। ৪ঠা জুলাই তাঁর মহানির্বাণের দিন...তাই কি দ্রষ্টা কবি এ দিনটীকে অমর ক'রে গেলেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়? এই কবিতায় প্রকৃতির রূপ-সুষমা যেমন অনবদ্য···ভাবের ব্যঞ্জনাও তেমনি লীলা-চঞ্চল।

এর ভেতর মার্কিনের স্বাধীনতার স্বর্গের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে জ্ঞানসূর্য সমন্বয়াচার্যের আপন ভোলা লেখনী—জগতের কথা ভাবতে গিয়ে যেত আপনা হারিয়ে··। মাত্র দেহান্তের চার বৎসর আগে এটি লেখা—

My play is done—চিত্র কবিতায় দেখি এক ক্লান্ত শিশু দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের দুলাল—কর্মশ্রান্ত নয়ন পল্লবে নেমে এসেছে—চির নিদ্রার আভাস ·· দুয়ারে দাঁড়িয়ে মাকে ডাকছেন—

Open the gates of light O Mother, to me thy tired son,

I long oh long ! to return home ! Mother my play is done,

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে দাঁড়িয়ে যে শিশু শ্রীঠাকুরের মুখের কথা নির্বাক বিস্ময়ে শুনতো সেই শিশুই যেন দাঁড়িয়েছে—মা ভবতারিণীর কাছে—যে শিশু বার বার আপন ভুলে ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করেছেন—সেই যেন আবার বন্ধ দুয়ারে ক'রছে করাঘাত—Take me O Mother, to those shores where strifes for ever cease·· 'মাগো আমায় নিয়ে চল যেখানে অশান্তির হয় চির সমাধি···

সাধারণ মনের আরোপ ক'রে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ব্রহ্মর্ষি ডেকেছেন মাকে—জেগেছেন অশব্দের তীরে মহানির্বাণের কূলে···ঘরে ফেরা ছেলের পরম আকুতি

My play is done oh mother break my chains.

বাংলার বীর সন্ন্যাসী সমাজে যা কিছু ক্ষুদ্র, যা কিছু হেয়, যা কিছু দীনতা ছেড়ে দিয়ে বীরত্ব অর্জন ক'রতে ব'লেছেন—ব'লেছেন বারবার "ভাঙ্গ বীণা··· সুধা পান—আগুয়ান সিন্ধুরোলে গান" এটী তাঁর "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতার অবদান—শিবাবতার স্বামীজির শিব সঙ্গীতগুলিতে জটা জটিল শঙ্করের যে রূপ প্রকাশিত হয়, তার পিছনে আছে স্বরূপের আভাস।

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা"—মনে পড়ে গুরু ভ্রাতার দর্শন—এক বিছানায় রাত্রে সকলে আছেন শুয়ে···হঠাৎ দেখেন স্বামীপাদগণের রূপের হয়েছে পরিবর্তন···যেন জগৎ নাট্যমঞ্চে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে···শুয়ে আছে ক'টি শিশু ভোলানাথ···শয়ন নিষন্ন না ধ্যানে নিথর···

তাঁর "Who knows how mother plays" কবিতায় রহস্যময়ী জগজ্জননীকে অঙ্কিত করা হয়েছে—

What law would freedom bind ?
What merit guides Her will,
Whose freak is great'st order,
Whose will resistless law ?

কি বলিষ্ঠ অথচ নিপুণ অভ্রান্ত হাতে এঁকেছেন বিশ্বমাতৃকার অব্যক্তরূপ।

No winter was but Summer came behind

এ দু'টি লাইনে Shellyকে মনে পড়ে। "If winter comes can spring be far behind"—কবিতাটী নিরাশায় আশার দীপস্বরূপ।

'Requiescat in peace' কবিতায় অমর আত্মার রহস্যময় গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে "Speed forth O Soul upon thy star strewn path."—এই কি উপনিষদের অর্চিমার্গ!

মৃত্যুর আঁধারের পারে মুক্ত আত্মার বিলাস যেন ভগবৎ চরণে নিবেদিত গোলাপ স্তবক। Like alter rose fill thy place behind—কি অপূর্ব চিত্র—কত আশার কথা…"To the Awakened India" কবিতা "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার জন্যে লিখিত হলেও জননী ভারতবর্ষের জন্যেও যেন লিখিত মনে হয়। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে তাঁর দান আজ সকলেই জানেন। বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত জননী ভারতবর্ষই তোমার একমাত্র উপাস্য হোক।" "প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি"—কবিতাটী নিদ্রিত ভারত মাতার এক অতি অপরূপ চিত্র—

"For sleep it was, not death, to bring the life"

মা যেন শ্রান্ত; পদ্ম-পলাশনেত্রে নেমেছে ক্লান্তির সুষুপ্তি, A new and rest to lotus eyes,—আর সেই বিশ্রাম শেষে মার চোখে ফুটবে সত্যের জ্যোতি; জগৎ যার জন্যে প্রতীক্ষারত। মৃত্যু 'ত' তার জন্যে নয়—আর ভারতজননীর জন্যে তাঁর ছিল চির প্রার্থনা—

And all above.

Himalaya's daughter Uma, gentle, pure, give thee untiring Strength, which is Infinite Love মাতৃপ্রেমোন্মত্ত কবির দৃষ্টি মাকে কখন পারেনি ভুলতে…Angels Unawares কবিতায় দেবদূত কত রূপে যে লীলা করেন, সেটি হয়েছে মোহনীয়া তুলিকায় চিত্রিত…

One bending low with load of life
That meant no Joy,
but suffering harsh and hard—

শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকের এক কঠোর চিত্র···কিন্তু তারি চোখে যখন নামে স্বপ্নের সুষমা, দেবতার করুণা ধারা তখনি আনে গভীর আশার বাণী :

Hope an utter stranger, came to him and spread,
Through all his parts······

জীবন তখন স্বপ্নের অতীত সুরটীতে যায় ভ'রে, এমনি ক'রে আবার এঁকেছেন দারিদ্র্যের অবদান—ধনীর বক্ষে নামে যখন অভাব ব্যথার ঢল তখনই পায় বিশ্বের সঙ্গে মিতালি।

Made him kinship find with all the human race.
O ! Blessed Misery

তারপর এঁকেছেন পাপের পথে কেমন ক'রে মানুষ পায় ধর্মের ও শান্তির বাণী—আত্মজয়ের বাণী—তখনি তার কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে :

And with a joyful heart declared it—
"Blessed Sin !"

বৈদান্তিক দৃষ্টির কি মহনীয়তা······

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির মধ্যে শ্রীঠাকুরের নরেন উঠেছে ফুটে—দক্ষিণেশ্বরের কিশোর—এখানে ছন্দ ও ভাষা গতিবেগে উচ্ছল···কভু ক্রোধ করি তোমা প'রে, যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে, নির্বাক আনন ছলছল আঁখি চাহি মম মুখ পানে"—মনে পড়ে পাওহারী বাবার আশ্রমে যেতে উদ্যত—হটযোগ শিক্ষার সংকল্পে। গাজীপুরের এক বাগানে স্বামীপাদ আছেন শয়ান—রাত্রে শ্রীঠাকুর দিলেন দেখা······কোন কথা নাই। নির্বাক বিষণ্ণ নয়নে জাগে নিষেধ বাণী—

"বাণী তুমি বীণাপানি কণ্ঠে মোর"—"তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যায় নরনারী" —এর পরিচয় পাই মার্কিনের ধর্মমহাসভায়। এই সভায় স্বামীজি পূর্বে কোনরূপ প্রস্তুত না করেও শ্রীঠাকুরের কৃপায় হ'লেন জয়যুক্ত ··এই কবিতাটিতে তিনি নিজেকে আদিকবি বলে বর্ণনা ক'রেছেন—এই আমি কিন্তু বেদান্তের সোহহং—

স্বামীপাদের কবিতাবলী বিশেষতঃ ইংরাজী কবিতাগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিদের সমালোচনায় দেখি, পাশ্চাত্ত্য কবি যাঁরা প্রথম শ্রেণীর কবি যথা Shakespear প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া বহু উর্ধ্বে নিজের আসন রচনা ক'রেছেন। Kipling-এর কবিতায় ভগবৎ নির্ভরতা পাই, কিন্তু স্বামীপাদের কবিতায় ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকারের পর যে নির্ভরতা আসে সেই নির্ভরতা পূর্ণ

নিদর্শন রয়েছে। Keats এ সৌন্দর্যের প্রতি যে গভীর প্রীতি দেখা যায়, তার মূলে আছে ধর্ম ও প্রজ্ঞা (Intelectual and Spiritual passion) স্বামীপাদ এ বিষয়ে ধর্মের প্রজ্ঞার মূর্তরূপ ছিলেন। তবে Keats এর Romanticism তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না।

তিনি যে নৈতিকতার আদর্শ সন্ন্যাসী :—

যোদ্ধাকবি Rupart Brook-এর সঙ্গে তাঁর মিল আছে এ বিষয়ে— Rupart মৃত্যু ও প্রীতির কথা বলেছেন বড় ক'রে। স্বামীজি যোদ্ধা তো ছিলেনই আত্মিক রাজ্যের যোদ্ধা। আর মৃত্যু মাঝে প্রীতি ছিল তাঁর চির লক্ষ্য। Dance in Destruction dance, To him Mother comes.

Wordsworth প্রকৃতির গম্ভীর শান্ত মূর্তি দেখেছেন—সমাজের জটিলতার হাত থেকে পবিত্রাণের উপায় পেয়েছেন প্রকৃতির শিক্ষায়। স্বামীপাদ কিন্তু প্রকৃতিকে মায়ার বিলাসরূপে দেখেছেন।

From day to day and year to year,
'Tis but dilusion's toy

Walter De-La Mare ছিলেন জগতে থেকেও এক আদর্শ জগতের জন্য চির ক্ষুধিত। স্বামীপাদের কবিতায় আমরা এর বহুল নিদর্শন পাই—শুধু নিদর্শন নয়, এর পারে যাবার বলিষ্ঠ নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। Truth never comes where lust, fare and greed of gain reside.

কবি Browning প্রীতির এক সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী পেয়েছিলেন। স্বামীজির লেখাও দেখি "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"— আর তার মূর্তরূপ আজ সারা বিশ্বের নরনারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠান—

Browning-এর মনোবিশ্লেষণও তাঁর কবিতার মধ্যে দেখি।—Song of Sannyasinn,এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে যেখানে আমাদের বন্ধন সেইখানেই করেছেন আঘাত। আর ভগবৎসত্তার বিশ্বাস দিব্য জীবনের প্রতি আস্থা এসবের স্বামীজি ছিলেন আদর্শ কবি। মহাকবি Milton-এর কবিতায় এক বিশেষ গাম্ভীর্য ও মহনীয়তা পাই। তিনি যে সে যুগে ইংলণ্ডের এক বিবাট পুরুষ ছিলেন কবিতায় তার ছায়া প'ড়েছিল। স্বামীপাদের জীবন কবিতা এ বিষয়ে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনীয়। "সন্ন্যাসীর গীতি" প্রভৃতি কবিতা যেন অভ্রভেদী হিমরাজের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ইংলণ্ডে, কবি Milton-কে যদি বলা সার্থক হয়ে থাকে—The soul was like a star তবে আমরাও শ্রীঠাকুরের অনুভূতির কথা নিয়ে বল্‌তে পারি—"স্বামীজি ছিলেন

সপ্তলোকের সাতসায়র সেচা ধন। জীবনবেদে—কবিতায় বা কাব্যে তার ক্ষীণ আভাষ মাত্রই জগৎ পেয়ে আজ ধন্য—উপনিষদের ভাষায় অভিমন্ত্রের ঋষিকে বলি—

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসাসহ।

শ্রীঠাকুর যাঁর জন্য বলেছিলেন—"মনে হয় তোমা হারাই হারাই"—সত্যি আমরা সব রকমেই তাঁকে হারিয়েছি।

F. N. স্বামিজীর বেশীর ভাগ ইংরাজী কবিতা Lambic Metre এ লিখিত। বোধ হয় এই ছন্দে উন্মাদনা বেশী প্রকাশিত।

স্মৃতি তীর্থে

সেদিনের ঘটনা—আজো বেশ মনে আছে। স্বামীপাদ অভেদানন্দ এসে বসেছেন বেদান্তমঠে তাঁর বসবার ঘরটিতে। আলমারীতে একধারে বই সব রাখা আছে। ঘরে আছে কয়েকটি ছেলে, তাঁর দিকে চেয়ে আছে উৎসুক চোখে—বোঝে না কতবড় চিন্তাশীল, কতবড় কর্মী আর Dynamic সে Personality. শিশুর মত স্বচ্ছ দিব্য হাসি নিয়ে জনৈককে ডেকে বলেন—"দেখ্‌, রাধাকৃষ্ণান্‌ আমার কথা লিখেছে তার বইতে Contemporary Philosophy দেখেছিস্‌"—মূঢ় দৃষ্টিতে থাকে চেয়ে—বইটি আলমারী থেকে নিয়ে বলেন —"পড় দেখি"—পড়া হয়—তখনকার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্বামীজিকে দার্শনিকের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন—নিয়েছেন তাঁর লেখা— "Hindu Philosophy in India" সঙ্গেই রয়েছে তাঁর নিজের লেখা জীবনবেদ। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে আজ মনে পড়ে—তাঁর মর্যাদা দেওয়া হয়নি সেদিন—মনে পড়ে আর একদিনের কথা—বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীপাদ—কত মুক্তা মাণিক প'ড়ছে ছড়িয়ে তাঁর কথায় আর মূঢ় দর্শক ক'রছে বৃথা গল্প। "Of the tree of knowledge, true Philosophy is the flower and religion is the fruit"·· আজ আমরা স্বামীপাদের লিখিত দর্শনের এই সংজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের মনীষীদের কয়েকটি চিন্তার তুলনা ক'রে দেখতে পাই স্বামীপাদের যোগজ দৃষ্টি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আমাদের কত উর্ধ্বে নিয়ে যায়।

প্রথমেই পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক ঋষি প্লেটোর কথায় দেখি—Philosophy aims at the knowledge of the eternal of the essential nature of

things, এই মতে দর্শনকে তত্ত্ব বিদ্যাতে (ontology) পরিণত করা হয়েছে —এই মতে প্লেটোর Theory of the ideas-এর কথাও এসে পড়ে। এই idea-গুলির অর্থ জগতের পারে, চিরন্তনী সাধারণ কতকগুলি ভাববস্তু, জগতের মধ্যে তাদের স্থান নাই। জগৎ এদেরি অর্ধপ্রকাশ মাত্র। Eternal বলতে প্লেটো এইগুলি বুঝেছেন। মনস্বী ক্যাণ্ট, Philosophy is the science and criticism of cognitism. এই মতে Epistemology বা জ্ঞান-তত্ত্বের সঙ্গে দর্শনের অভিন্নতা স্থাপন করা হয়েছে। আরো এই মতে প্রত্যক্ষের স্থান নাই। দর্শনে প্রত্যক্ষের প্রথম স্থান। ব্রহ্মবাদী হেগেলের মত—Philosophy is science of the absolute idea·· ···হেগেলের Absolute idea হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম। হেগেলের সগুণ ব্রহ্মই জগতে পরিণত হয়েছেন—দ্বান্দিক ক্রমে, (Dialectic Process) তবু এই মতে ধর্মের স্থান নেই, Art-এর কথা নাই, জ্ঞানের science-এর কথাই বলা হ'য়েছে ; শ্রীঠাকুরের মতে বিজ্ঞানের কথা, Art-এর কথা বা কার্যে প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। অভেদানন্দজীর বাণীর পেছনে প্রথমেই পাই দ্রষ্টার কথা —যেমন দ্রষ্টার কথা পাই উপনিষদের ঋষিদের কাছে। দ্রষ্টাদের বিজ্ঞানপ্রসূত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠে সত্যের এমনি এক রূপ, যাতে মানুষের মনে তার একটি গভীর ছাপ না রেখে যায় না। তাই শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতিদের দর্শন পাঠ করা এক কথা, আর হেগেল প্রভৃতিদের দর্শন পাঠ করা আর এক কথা। স্বামীপাদ জ্ঞানকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—এই জ্ঞান ব্রহ্ম স্বয়ং। উপনিষদের ঋষি ও ভগবান বাসুদেব গীতাতে এই বৃক্ষকে উপমা স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। উপনিষদে দেখি—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক··· (শ্বেত ৩।৯) ব্রহ্ম বৃক্ষের ন্যায় স্ব মহিমায় বিরাজিত। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখ-মশ্বত্থংপ্রাহুরব্যয়ম্" ঈশ্বর সমন্বিত এই সংসার যেন বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ। আবার উপনিষদেই আছে—"দ্বাসুপর্ণা দ্বাসুজ্যা সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।" একই বৃক্ষের দুটি পক্ষী—একজন ফল ভক্ষণ করে অন্যটি দর্শন করে। যদি আমরা স্বামীপাদের বৃক্ষটিকে দেহবৃক্ষ ধরি—এই বৃক্ষের ফল খাওয়াটি দর্শনের ব্যাপার —আর দর্শন করছি—ধর্ম ব্যাপার বলে গ্রহণ করা যায়। ধর্ম আমাদের trans-cendental বা অপরোক্ষ দর্শনের অধিকারী করে। তাই সেটি দর্শনের ব্যাপার—উপলব্ধির ব্যাপার।

•

ফুল যেমন বৃক্ষের শোভা তেমনি জ্ঞানবৃক্ষের শোভা প্রচলিত দর্শনগুলি। দর্শনের তত্ত্বগুলিকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে স্বীকার করা হয়নি—এগুলি কিছুদিন

থাকে, ফুলের মত সুগন্ধ বিতরণ করে—মানুষের মন হরণ করে কিন্তু চিরন্তন সত্য এগুলি নয়। দর্শনের বিভিন্ন মতবাদে দোখ চরম কথা কেউ বলতে পারেনি। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বৃক্ষের ফল ধর্ম। শ্রীঠাকুর বলেছেন—"ফুল আগে তারপর ফল, সাধারণতঃ ফুলই ফলে পরিণত হয়। কাজেই ফুলের মধ্যেই রয়েছে ফলের প্রকাশ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যেখানে শেষ—ধর্মের সেখানে আবির্ভাব। ধর্মে ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করা দুষ্কর—সেকথা ভাল-ভাবেই বলেছেন দার্শনিক গ্যালাওয়ে। তিনি বলেন—ধর্মের দর্শনের দিকটা দেখতে গেলে তার মনোবিজ্ঞান, তার জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব Metaphysics) বিষয়ের কথা এসে পড়ে—(Philosophy of religion P. 44) হয়ত মনে হবে দর্শন আমাদের ক্ষতি করে কিন্তু এদেশে ওমত চলে না। বাগ বৈখরী এনে দেয়—ধর্ম ফলপ্রসূ হয় না। বিশেষ ক'রে সত্যিকার দার্শনিক যারা তারা ধার্মিক না হয়েই পারে না—শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি তার প্রমাণ। ওদেশেও এই প্রকার মত আছে। বেকন বলেন—দর্শনের সঙ্গে অল্প পরিচয় আমাদের মনকে ভগবৎ বিমুখ করে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা আমাদের ধর্মনিষ্ঠ করে।" (Patric—Introduction to Phil. P. 38)

শেষে দর্শন-বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের মতে দেখি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কত ধর্মনিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছেন, দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চাতে। আইনষ্টাইন বলেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরকে আমরা রহস্যময় বলতে পারি। এর থেকেই সমস্ত বিজ্ঞান ও চারুকলার উদ্ভব। ধর্ম এই রহস্যলোকের যাত্রা পথের দেয় নিদর্শন। আরও খাঁটি বেদান্তবাদীদের মত স্বামীপাদ এই উপমার বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন নি। স্বগতভেদই মাত্র গ্রহণ করেছেন। আবার পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের মতে আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষমতা কমে যায়, বিশেষ করে যে সব ক্ষমতা (abilities) দৈহিক কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে। আমাদের শারীরের স্নায়ুগুলির ক্ষয়ের উপর মনের অনেক কার্যক্রমের নির্ভরতা আছে। অবশ্য এর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন পারস্পরিক ক্রম নাই। (Ency. of Psy. P. 39) সেই হিসাবে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনায় দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও হ্রাসের একটা ক্রম সূচিত হয়েছে।

স্বামীপাদের এই বাণীতে কত গভীর জ্ঞানের কথাই না রয়েছে। আবার আর একদিন গিয়ে দেখি বিচ্ছুরিত বিভায় একখানা বই নিয়ে বসে আছেন। প্রসাদ প্রসন্নমুখে বলেন "আয় কেমন আছিস্" তার পরেই হয়ত ভুলে গেলেন সব মনীষার কথা,—বলেন, দেখ্ আমেরিকার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ পথচারী

এসে ধরে, বলে, আপনার একটি ছবি নেব—আপনার মূর্তি খুব নিখুঁত—দেখান সে সব ছবি আমেরিকার তোলা। হয়তো প্রশ্ন হ'ল নির্বিকল্প সমাধি কোথায় হয়েছিল মহারাজ? ধ্যান প্রসন্ন মুখে হঠাৎ চিন্তা ক'রে হেসে দেন উত্তর আমেরিকার লেকের ধারে ধ্যান ক'রতে ক'রতে নির্বিকল্পে গেছি ডুবে। শ্রীঠাকুরের কাছেও হয়েছিল। হয়তো আবার ব'লছেন, দেখ, নিজ হাতে টুপি সেলাই ক'রতে পারি—এনে দেখান, খদ্দরের টুপি সুন্দর সুদৃশ্য—ব'লছেন দেখ, যখন যেমন তখন তেমন চলতে হবে—নিজেই ইস্তিরী ক'রে স্যুট 'পরে কাজ ক'রতে হয়। সেদিন Imperial Bank এ দরকার ছিল—গেছি বেশ ভাল পাট করা স্যুট প'রে—সেক্রেটারী হাসিমুখে দেয় কাজ সেরে আর সেখানে ঐ মহারাজ গেছেন খদ্দরের পোশাক প'রে। সাহেব দিয়েছে আপিসের বাইরে পাঠিয়ে। কাজ নিয়ে কথা। এমনি শতকথা উপদেশে দিয়েছেন জীবন অমৃতায়িত করে, আজ স্মৃতির তীর্থ দীর্ঘশ্বাসে যায় ভ'রে।

অভেদ স্মৃতির তীর্থে

সে অনেক দিনের আগেকার কথা। স্বামীজি তখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকতেন বীডন ষ্ট্রীটে। আমি গেছি—তখন শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। বহু সজ্জন সমাগতি হ'য়েছে। শুনলাম দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে। কলিকাতায় দরিদ্রনারায়ণ সেবা ক'রতে হ'লে একটু ব্যবস্থা ক'রতে হয়। দরিদ্রনারায়ণদের একজন ক'রে প্রধান থাকে—তার মাধ্যমে সব খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। যতদূর মনে আছে আমি দরিদ্রনারায়ণদের বোঁদের ব্যবস্থা করার জন্য একটা হিসেব চাই। টাকার পরিমাণ জেনে আমার সঙ্গে যে একজন ছিল তাকে বাড়ী থেকে টাকা আনতে পাঠাই।

খুব সম্ভব স্বামীজির ভাই (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) ও কয়েকজন সাধু-সন্তও বসেছিলেন। প্রথম আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। ফটোতে যেমন তাঁর ছবি দেখা যায় এসময় তাঁর শরীর তার থেকে ভাল ছিল। তিনি আমার পিতৃ পরিচয়, তোমরা অমুক জায়গায় থাকতে এইসব কথা বলে আলাপ ক'রলেন।

বলা বাহুল্য সেবার দরিদ্রনারায়ণ সেবা বেশ সুবিধা হয়নি—তারা একটু রাগারাগি করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ আর একদিনের কথা মনে পড়ে। স্বামীজির আর এক ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদ্য এসেছেন জার্মাণ থেকে ফেরার পর। স্বামীজির সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এটাও হয়েছিল বীডন ষ্ট্রীটে ভাড়াবাড়ীর আশ্রমে। দত্ত মশায়ের হাতে একটি বেত। তিনি সেটি পিছন দিকে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন। একটি কথা বেশ বলেছিলেন, "স্বামীজি আর যাই করুন বা না করুন—বিদেশে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।" ভূপেন দত্ত পুরানো দিনের অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বামীজির একটি জীবন আলেখ্য লিখেছিলেন,—'দি পেট্রিয়ট প্রফেট্ অফ্ ইণ্ডিয়া'—তাতেও স্বামীজিকে এইভাবেই চিত্রিত করা হয়েছিল।

বক্তৃতা দেওয়ার পর দত্ত মশায় প্রসাদ খেতে বসলেন। ফল মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। বড় বড় দু'টি হাত পেতে বলছেন, "আমাকে এতগুলো প্রসাদ দিতে হবে।" বোধ হয় সেইসময়ে তাঁর জুতা জোড়াটি খোওয়া গিয়েছিল। সম্ভবতঃ কোন একজনের বেশী প্রয়োজন ছিল। আর একবার গেছি, স্বামীজির সঙ্গে তখন দেখা হয়নি। জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। তিনি কথা-প্রসঙ্গে একটি দিব্য-স্বপ্নের কথা বলেন। 'জ্বর হয়েছে একান্ত অক্ষম। উপরের ঘর থেকে কে নিয়ে যাবে ঠিক করতে পারছেন না—নীচে যেতে হবে। দেখলেন ঠাকুর এসে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। অসহায়ের একান্ত সহায় ঠাকুর যে আছেন এ কথা সেদিন মনে বেশ একটা আশ্বাসই দিয়েছিল এনে।' এরপর স্বামীজির সঙ্গে দেখা। স্বামীজি যে কেবল দ্রষ্টা সাক্ষীর মত আমাদের কথা শুনতেন সে কথা আজও আমাদের মনে আছে। একদিন ধর্ম প্রসঙ্গ হচ্ছে, স্বামীজির কাছে বসে আছি ওদেশ থেকে আনা সেই টেবিলের ধারে। হঠাৎ স্বামীজি হাতের দিকে নজর ক'রে বললেন,—"অমন কোরনা ওটা ছিঁড়ে যাবে।" আমি অন্যমনস্ক হয়ে টেবিলের ওপর আঙুল ঘষছিলাম ওপরের রেক্সিনের আস্তরনটা হয়তো ছিঁড়েই যেতো।

স্বামীজির শেষ অসুখের কথা। যেমন করেই হোক আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর অসুখ হয়তো আর সারবেই না। তাই যাদের দীক্ষা হয়নি তাদের স্বামীজির কাছে পৌঁছে দেবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। স্বামীজির কল্যাণে কিছু করা হচ্ছিল আশ্রমে৭ আমাদেরও ইচ্ছা ছিল তাতে যোগ দি, কিন্তু শুনলাম বাইরের লোকদের নেওয়া হবে না।

আরো একবারের কথা। নতুন আশ্রম তখন তৈরি হ'য়ে এসেছে। বালীগঞ্জের সচ্চিদানন্দ স্বামীজি এসেছিলেন; আমাকে সহস্রাধিক টাকা দেবেন বলেছিলেন—আমি তখন এ টাকা স্বামীজিকে দেবার কথা বলি। স্বামীজি আসেন কাশীপুরের বাড়ীতে। গুরুদেবকে বাড়ীর গাড়ীতে ক'রেই আনা হয়। সেই সুযোগে পায়ে হেঁটে কাশীপুর মহাশ্মশান দর্শন ক'রে যান।

স্বামীপাদের স্মৃতি

বহুদিনের ফেলে আসা দিন—একটি একটি ক'রে কুড়িয়ে আনা স্মৃতির সঞ্চয়ে রেখে বুক ভরে না—

মনে পড়ে বেদান্ত মঠের প্রথমদিকের সে একদিন—প্রথম আবেগের একমুঠো মোহমেদুরতা। তখন চোখে সবই ভাল লাগে। পুরোনো টেবিল, ফ্ল্যাটের ধূপ সুরভিত ঠাকুরঘর সবই। এর আগে ভোলা গিরি মহারাজের কাছে গেছি, জনৈক সহপাঠী গেছে নিয়ে। মধ্য কলকাতার ছোট্ট একটি ঘর, ভক্তের সংঘট্ট —কোন রকমে পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, মনে জাগে ইনি যদি অন্তর্যামী হন তবে আমায় ডাকবেন। রাত হ'য়ে আসে বাড়ীতে পড়ার তাগিদও রয়েছে, অভিভাবক-দের ভয়ও আছে। মন দুটানায় দুলছে, আরতি সুরু হয়ে গেছে-শ্রীগিরিজীরই আরতি। সুন্দর শুভ্র দেহে গৈরিক বস্ত্র, চোখে কালো চশমা; ধর্মপুস্তকে নানা ঐশীকথা প'ড়ে মনে তারি অনুরণন। যাই হোক ফিরে আসি শুষ্ক মুখেই, তেষ্টা তখন অনেকটাই।

বেলুড়ে শ্রীঠাকুরের, স্বামীপাদের মন্দিরেও গেছি—ধ্যান, জপ নিষমে কেটেছে সে সব দিন, ওপারটা তখন মনে হ'ত আলোর দেশ—আমায় পার হ'য়ে যেতে হবে—বাগবাজারের ঘাটে বসে এমনি চিন্তায় দিন গেছে কেটে।

যাই হোক, সেদিন গিয়ে দেখি এক অল্প-বয়সী সাধু শ্রীশ্রীকালী মহারাজের কাছে এসেছেন দীক্ষাপ্রার্থী; একটিমাত্র কাপড় গলায় গ্রন্থি দিয়ে পরা—ইংরাজীতেই বলেন, "আমি এমনি করে একবস্ত্রে মাদ্রাজ থেকে এসেছি।" সেখানে ছিলেন শিক্ষাব্রতী, প্রাণের তাগিদে ঘর ছেড়ে প'ড়েছেন বেরিয়ে—দূর মাদ্রাজ থেকে। অন্যত্র স্থান পাননি। স্বামীপাদ, দাক্ষিণ্য-ভরা

দু'টি আঁখি মেলে ব'ললেন—"আমি তোমায় আশ্রয় দেব।" এর সঙ্গে দেখা এরপর অনেকবার হয়েছে। দেখেছি ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ক'রছেন জপ—তপোক্লিষ্ট তাঁর দেহ। কোন বাগবিতণ্ডায় তাঁর স্পৃহা ছিল না সে সব দিনে। এরপরও দেখা—সেবার হিমালয়ে যাবার জন্যে মনে আকুল আগ্রহ। স্বামীপাদ বললেন, যা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়। মাদ্রাজের সেই সতীর্থ। তাকে বলতেই বলে, যদি অর্থ থাকে যাও না হ'লে মারা যাবে। সেখানে সত্রের আটা ময়দায় পাথর গুঁড়ো মেশান—শরীর থাকা মুস্কিল। ছেলেটির জীবনেও তাই ঘটেছিল ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনেক নদীর ধারা এমনি করেই শুকিয়ে যায় মরণপথে। হিমকান্তারের ডাক এমনিভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন। তবে স্বামীপাদ বলতেন সবাইকে, "কোথায় যাবি, এইখানেই তপস্যার আগুন জেলে দে। ঘুরে ঘুরে আমাদের শরীরের ত এই অবস্থা"···দেখেছি হঠাৎ পা ফুলে উঠতো। শরীরের অযথা মেদ বৃদ্ধি হ'য়ে পড়েছে। বলতেন, "এদেশে এসে আমার শরীর এমন হয়ে গেল। এখানে জল খেলেও মোটা হচ্ছি।" রুটি খেতেন, অতি শুকনো পাতলা রুটি। শুনতাম ২॥০ সের চালে তাঁর সারা মাস চলে। রুটিও তেমনি। তবে Balanced diet-এ থাকতেন, খুব নিয়মেই থাকতেন। ওদেশের পঁচিশ বৎসরের ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া যায় না একেবারে। মার্কিন-স্বাস্থ্যের কথা ব'লতে বলেছেন, "তোরা কি ক'রছিস্—না যোগ না ভোগ। এই শরীরে কি করবি—আর খাবার আছে কি যে এত বাছ বিচার করবি ?" শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে রেকর্ড ক'রে এলেন। সেদিন বেশ ক্লান্ত মনে হ'ল। রেকর্ডটি শুনান হ'ল। বড় ভাল লেগেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে তাঁর প্রধান এক পার্ষদের মুখে। মৃদুমন্থরে সে আবৃত্তি আর একবার শুনেছি জনৈক ভক্তের আকুতিতে—"আপনার শ্রীমুখে শুনবো প্রকৃতিম্ পরমাং স্তোত্রটি।" শোনালেন এমনি, কোন দ্বিধা না ক'রেই।

কত যে কৃপা অযাচিত হ'য়েই এসেছে। জনৈক মাদ্রাজী দীক্ষার পর পড়েছে দ্বন্দ্বে ; ইষ্ট নিয়ে তার এই দ্বন্দ্ব। পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে, যা ওর কাছে ক'রে নে তোর মীমাংসা। আর একদিন গেছি। একটি ছোটছেলের মৃত্যু যোগ—তাদের বিশ্বাস দৈবের কৃপায় যদি কিছু হয়। ব'লে দিয়েছেন একটি মন্ত্র—ছেলেটার মৃত্যু যোগ গিয়েছিল কেটে। সেবার সিউড়ীতে আশ্রম করবার কথা নিয়ে গেছি। সিউড়ীর আশ্রম তখন পোড়োবাড়ীর মত প'ড়ে ছিল। হিমালয়ের নিভৃতিতে যেতে না পেয়ে ওখানে থাকি তখন, মাঝে

মাঝে চলেও আসি। কথা পাড়ায় বলেন—"ওরে আশ্রম করতে গিয়ে লোক দেউলে হয়ে গেছে।" কিজন্যে বলেছেন আজও বুঝি নাই। সেবার জন্মতিথি—সেই সঙ্গীতটী লিখেছি—

"যুগে যুগে একি করুণা ভরে
এসেছ নামি' ধূলার ঘরে।"

স্মিতমুখে অমৃত ছড়িয়ে বলেছিলেন,—প্রজ্ঞাকে দে, সুর ক'রবে। এপারে ওপারে অমৃতময় এই বিস্তৃতি—মধ্যে মহাকালের ব্যবধান—চেয়ে থাকি উধাও হ'য়ে—কোথায় এর শেষ।

সংস্কার কাটে কি করে ?

ছেলেবেলার কথা—অতি আবছা—সব কথাই মনে পড়ে, সন্ধ্যেবেলা দুধ খেতে একান্ত নারাজ এক ছোট্ট ছেলে—কোন উপায় না দেখে আঁধার গাছে ছাওয়া দিক দেখিয়ে মা, ঠাকুরমা এঁরা সব ব'লছেন, ওরে ছ'কড়া ন'কড়া আয়তো—ভয়ে ছোট্ট বুক উঠে দুলে, দুধ হয় নিঃশেষ। শিশু-শিক্ষার দিকে এটি ভাল কথা নিশ্চয়ই নয়। এই ভয় দিনে দিনেই উঠে বেড়ে। এমন কি ছোট ভাই-বোনদের হাত ধ'রে না চ'ললে আঁধারের ভয় তার যেত না। আবার এই ভয়ের reaction জাগত অন্যদের ভয় দেখানোয়। গাছে কালো সুতো বেঁধে আঁধার রাতে সরল মনে জাগান হ'ত আঁধারবাসীদের কথা। হয়তো দেখা যেত বালিশের খোলে লাল কালি ছড়িয়ে মুখ মাথা ঢেকে নির্জন কোণে আছে দাঁড়িয়ে ; পল্লীবাসী কোন অতিথি এসেছে সেখানে। সহসা আর্তনাদ, পালিয়ে বাঁচে। দিন যায়, ভয় দেখানো ধীরে ধীরে সরে গেছে, তবে ভয় পাওয়া অবচেতনে যেন থেকেই যায়।

সেদিন স্বামীপাদ ভক্ত মধুচক্রে আছেন বসে দিব্য বিভায় ললাট উদ্ভাসিত। লিলিডেল প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে তার জীবনের বিচিত্র ঘটনা সহজ হাসিতে মিশে এক রহস্যলোকের হয়েছে সৃষ্টি। শ্লেট রাইটিং-এর শ্লেটটি দেখিয়ে বলেন, কেমন করে ভেতরে একটি পেনসিল রেখে দিলে প্রেতলোকের বাসিন্দারা এসে তাতে লিখে দিয়ে যায়। একটা কিচ কিচ শব্দ ক'রে এরা লিখতে সুরু করে।

সেই ছেলেটি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে। সাধারণে মনে করে বুঝি জানার সব কিছু এইখানেই শেষ হয়ে যায়। বিদ্যার অহং-এর একটা গভীর রূপরেখা আছে। সেইসব কথার পিঠে সে বলে বসে, প্রেতের যদি এই সব ক্ষমতা আছে তবে তাদের যাদের হাতে মৃত্যু হয়েছে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয় না কেন ?

ভাগীরথীর যেন গতিভঙ্গ হয়—উদ্বেল হ'য়ে স্বামীপাদ বলেন, তোরা একটু পড়েই মনে করেছিস্ সব বুঝে ফেলেছিস। ইহপরলোকে কত রহস্য যে আছে —নির্বাক মূঢ়তা নিয়ে সবাই শুনে সেই বেদবাণী। তখন তার মনে হ'য়েছিল এতো প্রশ্নের উত্তর ঠিক হ'ল না। আজ বহুদিনের পরে পিছনে ফেরা দৃষ্টিতে সে দেখে, সেই দিন থেকে প্রেতলোকের রুদ্ধ যবনিকা ঠেলে কোন কথা জানার চেষ্টা আর তার হয়নি। কত প্রেত রহস্যের সামনা-সামনি হ'তে হ'য়েছে তাকে ; কি নির্জন বাসে, কি সজনসংঘে বহু প্রেতের সঙ্গে বুঝা পড়া ক'রতে হয়েছে কিন্তু সেদিনের সেই এক কথায় বৃথা অনুসন্ধিৎসায়, সেইদিন থেকেই হয়ে গেছে শেষ যবনিকা পর্ব।

চক্র তাঁর হাতে

ছত্রিশ সালের কথা হবে—বেদান্তমঠের নূতন বাড়ীতে সেদিন গেছি রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে, স্বামীপাদের দর্শনে—সন্ধ্যায় পরমরম্য ধূপমদির সে ক্ষণ। ভক্ত-'মধুপ সব আছেন বসে প্রতিক্ষারত—ধীরে স্বামীপাদ দরজা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। সেবক ব্রহ্মচারী দিয়ে গেলেন প্রিয় আলবোলাটি। স্বামীপাদ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'রাধাকৃষ্ণানের দর্শনের বই বেরিয়েছে দেখেছিস্, আমার লেখা তাতে আছে।' তাঁর সামনের আলমারিটা দেখিয়ে বল্লেন,— 'বার কর'। ফিকে নীল মলাটের বইখানি বার ক'রলাম। যেখানে স্বামীপাদের লেখাটি আছে সেটি বার ক'রে পড়তে বললেন। উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা খুলে যতদূর মনে আছে কিছু পড়া হ'ল—দ্বিধা-সঙ্কোচ নিয়ে সে পড়া— আধো জাগা স্বপ্নের মতই আজ আবছা হ'য়ে এসেছে সে সব দিন।

সেদিন তার অর্থ বুঝিনি—বুঝিনি জ্ঞানঘন মূর্তির কাছে কি ইঙ্গিত সেদিন পেলাম। তখন জলবার মন্ত্র নিয়ে চলছে জীবনায়ণ। স্বামীপাদের কাছে

গেছি পরম অশান্তি নিয়ে। দর্শনের কথা তখন আমার কাছে অর্থহীন। মন তখন শান্তির আশায় আকুল। শমী-গর্ভে তখন বহু জ্বালা। আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম না। অর্থনীতি নিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায় তখন শেষ হয়েছে। আজ পিছনে তাকিয়ে দেখি তাঁর সেই বেদান্ত দর্শনের একটি পৃষ্ঠা খুলে দিয়ে আমার জীবনের এক নবায়ণ ক'রলেন রচনা। হৃদয়গুহার গোমুখীতে যে দর্শনের ফল্গু ছিল সুপ্ত, ভগীরথের শঙ্খে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল এই দিনে। তাই তাঁর চরণে উৎসর্গ করে World Philosophy পুস্তকটির সার্থকতা খুঁজে পাই—

ওগো কাণ্ডারী দিশারিয়া ওগো
পান্থজনের সখা
চলিতে চলিতে রিক্ত বেদনা
নিয়ে যে দাঁড়ালো একা।
আলেয়ার দেয়া ডেকেছে যাহারে
জাগেনি যে জন ঘুম আঁধিয়ারে
ডাক দিলে বুঝি বজ্র আরাবী
মেঘে বিদ্যুৎ ঢাকা।
দেখেছি সেদিন তোমারে হে স্বামী
বেদবন্দিত হাসিটিরে হানি
ধূলার দেউলে জেগেছিল এক
সোনার প্রদীপ শিখা।

মনে পড়ে

স্মৃতির কল্পলোকে ভেসে আসা দিনগুলি যেন পদ্মের দল···মনে পড়ে একটি কলেজের ছেলে, দীন তার বেশ, বহু অনুসন্ধানে এসে পড়েছে, চরণান্তিকে—যেন কৃপা মূর্তি—বলেন, আমি ত' তোদের জন্যেই ব'সে আছি। না হ'লে গঙ্গার ধারে হরিদ্বার এসব স্থানে থাকলেই হ'ত···কৃপা মুহূর্তেই হয়···মনে পড়ে সেই সৌম্য, শান্ত, শুচিস্মিত মূর্তি—বাইরের সকল আড়ম্বর হীন···ব'সে আছেন—ইডেন হস্পিটাল রোডের দ্বিতলে—গীতার আলোচনা চলেছে—ছোট হলটিতে বহুলোক—জ্ঞানঘন মূর্তি··একেবারে চুপ করে বসে আছেন—কে বলবে ইনিই দেশদেশান্তরে পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ—

তখনও আশ্রমের নিজস্ব গৃহ হয়নি—কত চেষ্টা—কত সাধনা কত বুকভাঙা ব্যথা বর্ত্তমান আশ্রমের পিছনে যে আছে, সেকথা আজ অনেকেরই মনে নাই··· কত ধনীর দুয়ারে স্বামীজির আকুতি জেগেছে, ফিরে এসেছেন ব্যর্থতায়··

তেমনি...বিহার ভূমিকম্পের দিনে··ব'সে আছেন অভীমন্ত্রের ঋষি নিজের ঘরে···নেমে আসবার চেষ্টা মাত্র নাই···

মনে পড়ে জ্ঞানের নব নব প্রকাশে শিশুর মত আকুলতায় নব প্রকাশিত তত্ত্বপুস্তক পাবার আকুতি ভক্তের কাছে।

মনে পড়ে স্যার রাধাকৃষ্ণনের Contemporary Indian Philosophy পুস্তকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, আর শিশুর সারল্যে সেটি দিয়েছেন পড়তে—স্মৃতির তীর্থে জেগে ওঠে, ভারতের কোন বিখ্যাত ঋষি দার্শনিকের লেখা বুঝতে গিয়ে তাঁর কাছে মৃদু তিরস্কার, ওরে আমাদের লেখাতেই সব পাবি, প'ড়ে দেখ—"ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহ বৈ"।

মনে পড়ে প্রজ্ঞাঘনমূর্তি—ললাটে বিচ্ছুরিত দ্যুতি—ব'সে আছেন বিংশ শতাব্দীর শঙ্কর···ভক্তদের দেখে মুখ ঈষৎ হাসির আলোয় আলো···

স্মৃতির অন্ধকার উছলিত হ'য়ে উঠে···ক্লান্ত, কর্মপরায়ণ, জন্মোৎসবের দিন ভক্তের জন্য স্নেহ বিগলিত হৃদয়ে প্রশ্ন "কিছু খেয়েছিস্···ক্ষিদে পায় না···"

মনে পড়ে ভক্তের সামান্য উপহার কিছু পেয়ে—আনন্দোজ্জ্বল নয়নে বলা ···ওরে নূতন ত'—তা না হ'লে শুদ্ধ ক'রে নেব।

আবার কোন কোনদিন হয়ত নিজের হাতের কাজ দেখিয়ে ব'লছেন, "দেখ ওদের কাছ থেকে শিখে ওদেরি ওপর গুরুগিরি করেছি—না হ'লে কি গুরু বলে ওরা মানত"?···আর একদিনের কথা—ভক্তগৃহে এসেছেন কৃপায় ধন্য ক'রতে—এসেই শ্রীঠাকুরের সমাধি মন্দির দেখতে গেছেন· আসবার সময় হেঁটেই আসছেন আর ব'লছেন সেই বরানগর মঠের কথা মনে প'ড়ছে —কতদিন এই পথে হেঁটে গেছি—বলছেন—আমরা ভগবানকে দর্শন করেছি ··আর এই হাতে তাঁকে সেবা করেছি—এই আমাদের জীবনের পরম সৌভাগ্য···জীবনের নানা কথা ব'লতে ব'লতে ব'লছেন···একটা দৈত্যদানার মত বিনা পয়সায় ঘুরে এসেছি সারা বিশ্ব···ইতালীর বিখ্যাত আঁকিয়েদের আঁকা চিত্রগুলি নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছা হ'ল· তাই গেছি চলে ইতালীতে—আবার এই তো সেদিন ঘুরে এলুম—পায়ে হেঁটে—বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতের হিমীশ মঠ থেকে—জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রেরণায়। মনে পড়ে ভক্তের কাছে ছোট হ'য়ে সমপ্রাণ হ'য়ে বলা, ওরে একদিনে কি হয়? সময় নেবে—চাক্ষুষ দর্শন কলিতে সহজ নয়—আমিই সেদিন প্রার্থনা করছি—ঠাকুর, বুঝি ছবি হ'য়ে গেলে, আমাদের ভুলে গেলে—এই টেবিলেই তন্দ্রিত হয়েছি, দেখি ঠাকুর এসে ব'লছেন—কালী, মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের যাত্রা দেখতে যাওয়া—লোক বেশী না থাকায় যাত্রা জমলো না—

বেদান্ত মঠে অসুস্থতায় প্রার্থনা, এই গোলমালের স্থান থেকে যদি স'রে যেতে চান নির্জন গঙ্গাতীরে—সানন্দে সম্মতি দেন—চেষ্টা ক'রে দেখ। সেদিন সম্ভব হয় নি, তবে তাঁর সে ইচ্ছায় আজ তার পুণ্যপীঠ হয়েছে বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন। আবার স্থিতপ্রজ্ঞ—কবিরাজ ইত্যাদি দেখাবার কথায় বলেন—না, চিকিৎসা সঙ্কট করার প্রয়োজন নাই—যার হাতে আছি সেই যা ব'লবে তাই হবে—শ্রীঠাকুরের এই ইঙ্গিত।—

কোন দরদী ভক্ত পাঠিয়েছেন গলাবন্ধ তৈরি ক'রে তাই দেখাচ্ছেন আনন্দ করে·· দেখ, জপ ক'রে ক'রে এটি কোরে পাঠিয়ে দিয়েছে.. আবার কাশ্মীর থেকে ফুল দেয় পাঠিয়ে একটুও খারাপ হয় না, তিনদিন রেলে আসা তো!

ভক্ত স্বামিপাদের তৈলচিত্র আঁকছে, এখন সেটা পূজা হয়···ডেকে বলছেন, দেখতো কেমন হচ্ছে···মুখে অপার্থিব দিব্য হাসি একটু ছুঁয়ে গেছে···জনৈক ভক্ত

করে চলেছে অজস্র প্রশংসা···তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী ; থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার না আজ কোথায় কণ্ট্রাক্ট পাবার কথা আছে···শিগ্‌গির সেরে এসগে···

ভক্তের আকুতি নিয়ে প্রার্থনা হয়তো জাগে, ঘরটা ঠাণ্ডা করার একটা উপায় হয় না রুমকুলার দিয়ে ? আমেরিকার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর থাকার পরও দিব্য শিশুর কাছে এ তত্ত্ব অজ্ঞাত। বলেন কলকাতার গরমে বড় কষ্ট হয়··· পা টা ফুলে যাচ্ছে···কিন্তু এমন দিন গেছে পয়সা ছুঁতুম না···কারু বাড়ীতে থাকতুম না ··বীরভূমের গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মহুয়া খেতে খেতে চলে গেছি ···গীতার অনিকেত মূর্তি···দেখে ভক্ত।

···দ্বিধাসঙ্কুচিত বুকে জাগে···দীন সাধককে এগিয়ে দিতে কত প্রেরণা··· বলেন আমরা রজোগুণী, আর এই দেখ সত্ত্বগুণী ছেলে। ছাতে থাকে, দুধ খেয়ে থাকে, এমনি কত কথা—অশ্রু সজল স্মৃতির তীর্থে মনে পড়ে, যেদিন কর্মবীর, চরৈবেতি মন্ত্রের মূর্ত্ত প্রতীক—শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছেন দীর্ঘদিন। উপর হ'তে নামতে অক্ষম। নেমে এসেছে বিদায়ের আসন্ন লগ্ন—ভক্ত শোনাচ্ছে সঙ্গীত, দিলীপকুমারের প্রসিদ্ধ ভজন—"জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে" শুনে সে এক দ্রষ্টার হাসি—মনে পড়ে সেই রোগকাতর দেহে রাত্র দুই তিন প্রহর পর্যন্ত জেগে নিজের লেখাগুলি ঠিক ক'রে দেওয়া—আবার তেমনি অসুস্থতায় দীক্ষার্থীদের কপাল-মোচনের ব্যবস্থা—মনে পড়ে ভক্তের কাছে চিরবিদায়-সন্ধ্যায় নিষেধবাক্য, "চলে যাচ্ছিস, আমার যে দরকার ছিল শিগগির ফিরে আসিস" এমন শত শত স্মৃতি আজ মহীয়ান হ'লেও বেদনা যায় না মুছে— অস্ফুট অসহ ব্যথাহত চিত্তে ক্ষীণ আশার দীপ তবু জ্বলে অনির্বাণ শিখায়— "কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি সমুদ্রে ।"

স্বামী অভেদানন্দ

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে, ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রাহিঃ।
শেরেস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেন প্রপথে হতাশ্চরৈবেতি—ঋগ্বেদ ॥
জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার, যেজন চলে পথে,
ফলগ্রাহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুঠি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা চড়ি মৃত্যু রথে,
পথে চলার শ্রমে হত, চল পথে ছুটি ॥ অনুবাদক—মতিলাল দাস।

মহতো মহীয়ান স্বামীপাদের সারা জীবন ঋগ্বেদের এই চরৈবৈতি মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মাত্র—দক্ষিণেশ্বরের পথরেখা বেয়ে চ'লেছে এক কিশোর কুমার অনাবৃত গায়ে, চোখে ভূমার আকুতি, চরণে উপলভাঙ্গা অলকনন্দার গতি—দিনকরের তাপে চলার পথ হয়েছে দীর্ণ···চলেছে যোগশিক্ষার ব্যাকুলতা নিয়ে শ্রীঠাকুরের চরণে···জ্ঞানলাভের এই ব্যাকুলতা, চরণের এই চঞ্চলতা—ছিল তার চিরদিন, বলতেন—"এমন না হ'লে দৈত্যদানার মত সারা পৃথিবী কি ঘুরে আসতে পারতুমরে বিনা পয়সায়"—এই কিশোরের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র—উত্তরকালে যিনি স্বামী অভেদানন্দ আখ্যায় জগদ্বরেণ্য হন। কালীপ্রসাদ আহিরীটোলা অঞ্চলে রসিকলাল চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন আর তাঁর মাতার নাম ছিল নয়নতারা। কালিকা দেবীর কৃপায় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করায় জননী তাঁর নাম রাখেন কালীপ্রসাদ। কিশোর কালীপ্রসাদ ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলেন, বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালেই অবিদ্যালাভের চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে ছুটে গেছেন শ্রীঠাকুরের কাছে ···ঠাকুরও নিজের অন্তরঙ্গকে নিয়েছেন চিনে, দিয়েছেন আশ্রয়· তারপর একদিকে চলে জ্ঞানময় তপস্যা···দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে, অন্যদিকে চলে শাস্ত্র মুখে ঋষিযজ্ঞ—শ্রীঠাকুর যেমন ব'লতেন, "অন্যকে বধ ক'রতে হ'লে ঢাল তরোয়াল চাই।"

শ্রীঠাকুরের দর্শনের পরই নবারুণের মত আসে শ্রীঠাকুরের কৃপা, আর সেই দিন থেকেই চলে সমাধিপথে নব নব অনুভূতি—নব নব দর্শনোল্লাস—এই সময়েই একদিন সাকার দর্শনের শেষ সীমায় কালীপ্রসাদের বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়,—

শ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে সমস্ত দেবদেবী অন্তর্হিত হ'তে দেখে—বহুদিনের কল্পনায় রঞ্জিত দিব্য জীবনের এই প্রথম প্রভাত হ'য়ে আসে শেষ—শ্রীঠাকুরের গলরোগের হয় সূত্রপাত—দেবদেহকে করা হয় কাশীপুর বাগানবাটীতে স্থানান্তরিত। বালক ভক্তদের সঙ্গে কালীপ্রসাদও শ্রীঠাকুরের পরিচর্যা তপস্যায় এসে দেন যোগ—বাগানবাটী হ'য়ে উঠে তপোভূমি।

শ্রীঠাকুরের শেষ আশ্রয় কাশীপুর বাগানবাটীতে দেখা যায় তাঁর শয্যাপাশে ব'সে পাঠনিরত কালীপ্রসাদ লণ্ঠনের গায়ে একটা কাগজ দিয়েছেন—শ্রীপ্রভুর বিশ্রামে ব্যাঘাত হয় পাছে—শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন হ্যাঁরে কি ক'রছিস—উত্তর আসে ন্যায়শাস্ত্র পড়ছি—শ্রীঠাকুর পরে বলেন—নরেনের পরেই তোর বুদ্ধি, নরেনের মত তুইও একটা মত চালাতে পারবি—ভগবানের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তখনই ধরা প'ড়েছিল কিশোর কুঁড়ির বুকে কি ভবিষ্যৎ আছে ঘুমিয়ে।

শ্রীঠাকুর অদর্শনের পূর্ব মুহূর্তে দ্বাদশটি বালককে গৈরিক দিয়ে সন্ন্যাসের অগ্রসূচিরূপে করেন যে দিব্যমাল্য রচনা···অনাগত ভবিষ্যৎ যেন তারি প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে ছিল বসে। পরে বরানগর মঠে সকলে অগ্নিসাক্ষী ক'রে সন্ন্যাসের ত্যাগ মন্ত্রে বিধিবৎ নেন দীক্ষা। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এটি এক স্মরণীয় দিন—এই দিনেই নব সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রথম প্রতিষ্ঠা—আর এই দিনেই এখান থেকেই বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ নামে ভূষিত যুগচক্র প্রবর্তনকারী সন্ন্যাসীদলের হয় আবির্ভাব।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনে কাশীপুর বাগানবাড়ী ছেড়ে বারটি দেবকুমারের আশ্রয় হয় কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে মুন্সীদের একটা পোড়ো বাড়ী—এখানেই সৃষ্টি হ'ল ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—ত্যাগ ও তপস্যার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে—।

কখন দেখা যেত কালী তপস্বী অন্য কিশোর সাধকদের সঙ্গে শয়ন নিষণ্ণ মৃতবৎ আছেন প'ড়ে—ধ্যানমগ্ন জপমগ্ন—কখন আহারের ব্যবস্থা তেলাকুচো সিদ্ধ ভিক্ষান্ন, মানকচু পাতায় ঢালা কখন আবার তাও জোটে না—কখন নামমাত্র সহায়ে শ্রীঠাকুরকে শরণ ক'রে শ্রীঠাকুরের কৃপা পরীক্ষা ক'রতে দ্বাদশটি কিশোরই আছে উপবাসী—দুপুর রাত্রে আসে প্রসাদ, কৃপার ধারাসারের মত··· কখন বা চলেছে কুস্তি—পোড়ো বাড়ীতে হিমার্ত নিশিথে, শরীরকে ক্ষণিকের উত্তাপ দিতে···তখন বারজনের একখানি মাত্র বাস ছিল লজ্জা নিবারণের সম্বল —কখনও বা উপাধানের অভাবে রহস্য ক'রে ব'লছেন—নরম দেখে একখানি ইট আনিস্—এমনি তপস্যার তোড়ে দিন কেটেছে, কেটেছে রাত্রি।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সর্বহারা প্রাণে জাগে তীর্থের ক্ষুধা—প্রিয়হারা

'বৃন্দাবন' আর যেন কারো লাগে না ভাল—তাই তীর্থঙ্কর বেশে ছুটে যান সকলেই—ছ'ড়িয়ে পড়েন সারা ভারতে। কিশোর সন্ন্যাসী অভেদানন্দও দুর্বার বেগে ছুটে চলেন তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে—পিছে প'ড়ে থাকে শত স্মৃতিজড়িত মর্ত্যের অলকাপুরী দক্ষিণেশ্বর—পিছে রেখে চলেন কাশী, কাঞ্চি, বৃন্দাবন, মথুরা—প্রাণের পিপাসা মিটাতে ছুটে চলেন হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারিকা। কিন্তু সপ্তসিন্ধুর শতধারাতেও তৃষ্ণা থেকে যায় অনির্বাণ—তিনবাড়ী অথবা পাঁচবাড়ীর ভিক্ষা মাত্র সম্বল। অনিকেত, পথতরুতলবাসী, অনাবৃত পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে শঙ্কর দীপঙ্করের দীপ্তি—রোগ, মৃত্যু, ভয়ে অভীঃমন্ত্রে প্রতিষ্ঠ কিশোর সন্ন্যাসী—এমনি ক'রে প্রায় আট বৎসর পরিব্রাজকরূপে কাটান—ভারতজননীর সত্যকার পরিচয়ে—এই পরিচয়ের কথাই ইয়োরোপ, আমেরিকায় তিনি দ্রষ্টার ভঙ্গীতে ক'রে এসেছেন প্রচার, যার প্রকাশ India and her people প্রভৃতি পুস্তকে। ঝুসি পাহাড়ে তপস্যার সময়ে শ্রীভগবানের গীতামুখে প্রতিজ্ঞা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।
(গীতা ৯।২২)

তিনি প্রমাণ ক'রে দেখান সঙ্গের এক নানকপন্থী সাধুকে বর্ষণ মুখর দিনে—নির্জন পাহাড়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ছিলেন ব'সে আহার বিষয়ে—আর ভগবৎ প্রেরিত হ'য়ে জনৈকভক্ত নিয়ে আসেন ভোজন সম্ভার—সঙ্গের সাধুটি হয় চমৎকৃত—হৃষিকেশে কিশোর পরিব্রাজক আর একবার নিজেকে পরীক্ষা মানসে মনের জোরে নিজের দেহে বিষম রোগের করেন সৃষ্টি—মরণাপন্ন অবস্থায়ও 'শিবোহং শিবোহং' ক'রে দেহাতীত অবস্থা লাভের করেন প্রমাণ। কিন্তু শাস্ত্র আলোচনাও যায় না বাদ। এই সময় বিখ্যাত সাধু কৈলাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ধনরাজ গিরির কাছে বেদান্তের পাঠ নেন। দু'টি তরবারিই তিনি রাখতেন শ্রীঠাকুরের শিক্ষামত—জ্ঞান আর কর্ম··শ্রীঠাকুর এমনি ক'রেই ভারততীর্থে তৈরি ক'রে নেন জগৎতীর্থের পরিব্রাজক.. অভেদানন্দকে।

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন বিজয়ের উত্তরে একটি অভিনন্দন মার্কিনবাসীদের দ্বারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা স্বামীজিকেই ক'রতে হয়। এরপর আসে লণ্ডনের আহ্বান—স্বামী বিবেকানন্দ একলার অক্ষমতায় তাঁকে ডেকে নেন—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের একদিন, লণ্ডনের উইম্বলডন পল্লীস্থ মিস মুল্লারের বাড়ীতে স্বামীজির কাছে উপস্থিত হন। তাঁর পৌঁছাবার মাসাধিক কালের মধ্যেই তাঁকে বক্তৃতার জন্য তৈরি হ'তে হয় বিবেকস্বামীর নির্দেশে, আর

স্বামীজি প্রথম ভীতির আড়ষ্টতা জয় ক'রে বক্তৃতাটি সুন্দর ভাবেই দেন—এই প্রথম চেষ্টাতেই জয়যাত্রার পথ গৈরিক প্রবাহের মত অপ্রতিহত হ'য়ে ওঠে। লণ্ডনের বেদান্ত ক্লাস, মিষ্টার ষ্টার্ডীর গৃহ হ'তে তিনি নিয়মিত চালাতে থাকেন। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের যোগ্য পাত্রে লণ্ডনের সমস্ত ভার ন্যস্ত ক'রে চলে আসেন ভারততীর্থে। লণ্ডন মহানগরীতে তিনি প্রঃ পলডয়সন প্রমুখ পণ্ডিতগণের সঙ্গে হন পরিচিত। মোক্ষমূলারের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করেন। লণ্ডন ছাড়া উইম্বলডন প্রভৃতি স্থানে রাজযোগ ইত্যাদির ক্লাস নিতে সুরু ক'রলেন।

এরপর আসে তাঁর নিমন্ত্রণ—নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির পক্ষ থেকে। স্বামীজি আর অপেক্ষা না ক'রে নিউইয়র্কে মিস্ ফিলিপিনের গৃহে চ'লে আসেন। মিস্ ছিলেন বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা। এই সময়েই বিখ্যাত দার্শনিক প্রঃ উইলিয়ম জেম্‌সের সঙ্গে স্বামীজির হয় এক বিচার—এ বিচার যেন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে মার্কিন সভ্যতার সংঘর্ষ। বিষয় ছিল, বিশ্বসত্তা এক না বহু। এই বিচার সভায় বিখ্যাত পণ্ডিত প্রঃ জোসিয়া রয়েস, প্রঃ ল্যানম্যান ও ডঃ জেম্‌স উপস্থিত ছিলেন · বিচার অন্তে প্রঃ জেম্‌স্ স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বিশ্বসত্ত্বার একত্বের পক্ষে তাঁর যুক্তি সকল অকাট্য···ক্যাম্ব্রিজে অধ্যাপকের গৃহেই এই আলোচনা হয় প্রায় চার ঘণ্টা ধ'রে।

মার্কিনে স্বামীজি যখন যেখানে সুবিধা পেতেন ছুটে যেতেন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে···এমনিভাবে একদিন গ্রীন-একারে বিবেকানন্দ অধ্যুষিত পাইনের তলায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রালফ্ ওয়ালডো ট্রাইনের সঙ্গে আলাপ হয়—ইনিই 'ইন্‌টিউন্ উইথ্ ইন্‌ফিনিটি' গ্রন্থের লেখক—পরে ইনি স্বামীজির ছাত্র হিসাবে গণ্য হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট ধনবান ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য মিষ্টার গেটের সভাপতিত্বে বেদান্ত সমিতিকে সংঘবদ্ধ করা হয়। আর স্বামীজিকে এর জন্য বিশেষ পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছিল। বেদান্তের প্রচারকেন্দ্র নিউইয়র্কের কাজের অবকাশে তিনি নানাস্থানে বেদান্ত প্রচারের কাজে ঘুরে বেড়াতেন, সময়ে সময়ে নিজের আহারের ব্যবস্থা নিজেকেই ক'রতে হ'ত। সহৃদয় মার্কিনবাসীরা তাঁকে গুরুর মত নিজেদের বাড়ীতে রেখেছে আর তাঁর প্রচারের সহায়তা ক'রেছে।

মার্কিনে মাধুকরী বৃত্তিতে যদৃচ্ছাদানে তাঁর নিজের ব্যয় সঙ্কুলান হ'ত না তাই ছাত্ররা প্রায়ই তাঁকে আহারের নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি মার্কিনবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের সঙ্গে এক হ'য়ে তাদের হৃদয় জয় করেন।

তাই দেখি তিনি কখনও তাদের 'গল্‌ফ্‌' খেলার সঙ্গী কখনও তাদের সঙ্গে বরফে 'স্কী' খেলছেন কখনও পর্বত অভিযানের সভ্য হিসাবে ছুটে চলেছেন খাঁটি মার্কিনি চালে। হৃদয় জয়ের এইত' প্রকৃষ্ট পন্থা···ফলে দেখি বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলি মার্কিনবাসীরা আপনার ধন ক'রে নিয়েছে বিনা বিচারে, তাই দেখি মার্কিনবাসীরা তাঁকে "সিটিজেন শিপ" দিয়ে নিতে চেয়েছে আপনার জন ক'রে। তাই দেখি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইংরাজী অধ্যাপকের পদে বরণ ক'রে নিতে চেয়েছেন সাদরে, তাই দেখি বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রেণীর ভক্তেরা তাঁর চরণে মস্তক নত ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। ভারতের পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর জ্যাক্‌সন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য নিয়ে যান। এই সময় লিলিডেল-এ নয়দিন তিনি অবস্থান করেন। এই নয়দিন তিনি বিভিন্ন প্রেততাত্ত্বিকদের সভায় গিয়ে পরকাল বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হন। তার পরিচয় আমরা তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ্‌' পুস্তকে ভালভাবেই পাই।

মার্কিন যাত্রার সময় ফরাসী ভাষা শিক্ষা ক'রতে হয়—বেদান্ত প্রচারের সহায় কল্পে—এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় মার্কিনে আসেন—স্বামী অভেদানন্দ এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন মিঃ লেগেটের বাড়ীতে। এইস্থানে সেই সময় স্বামী তুরিয়ানন্দও ওখানে ছিলেন। বিবেক স্বামীজি নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির নিজ আবাসভবনের ব্যবস্থা হ'য়েছে জেনে বিশেষ সুখী হন। ক্রমে এই সমিতিতে ১৬০০ সভ্য যোগদান করেন—এদের অনেকেই গণ্যমান্য ও বিদ্বান। তাঁর এক প্রিয় শিষ্যা মিস্‌ মিন্নিবুক ক্যালিফোর্ণিয়ার ১৬০ একর জমি তাঁকে দেন। স্বামীজি এটি বিবেকস্বামীকে সমর্পণ করেন। তুরিয়া নন্দজী এটিতে 'শান্তি আশ্রম' স্থাপন করেন। আজ এই শান্তি আশ্রম বেদান্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রয়েছে—বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়...১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের ছাত্রদের অনুরোধে ফিরে আসেন লণ্ডনের কর্মকেন্দ্রে—এখানে বেদান্ত সমিতির ব্যবস্থা ক'রে আবার মার্কিনে যান ফিরে। এই সময়ে ব্রুকলিন ইন্‌স্টিটিউটে 'ভারত ও তাহার নরনারী' বইটির বিষয় ধারাবাহিকভাবে বলেন। এই সময় 'বেদান্ত বুলেটিন' নামে এক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় ও ইহার বহুল গ্রাহকের সংখ্যা বেদান্তের প্রতি অনুরক্তির পরিচয় দিতে থাকে।

প্রথমবার ভারত আসবার পূর্বেই স্বামীজি মহারাজ মেক্সিকো, আলাস্কা, কানাডা ও ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের নানা সহরে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন···

প্রথমবার ভারত আগমনে বিজয়ী বীরের মত নানাস্থানে তাঁর বিপুল অভ্যর্থনা হয়···কলম্বো, জাফনা, অনুরাধাপুর, টুটিকোরিন, তিলেভেলী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, তানজোর, কুড্ডালোর, মাদ্রাজে রাজ অভিনন্দন পান। মাদ্রাজে বিরাট সম্বর্ধনার পর 'ষ্টুডেন্টস্ হোমের' প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ইহা মাদ্রাজে একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

বাঙ্গালোরে বিরাট অভ্যর্থনার পর তিনি মহীশূরে আগমন করেন—তথাকার জনসাধারণের প্রাণের অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে শ্রীরঙ্গপট্টমে আসেন—এরপর পুরী, কলকাতা, চন্দননগর, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, আলোয়ার, আমেদাবাদে বহুশ সম্বর্ধিত হয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে এসে পৌছান আর সেইস্থান হ'তে পুনরায় মার্কিন অভিমুখে করেন জয়যাত্রা। এইসব স্থানে তাঁকে যথাযোগ্য বক্তৃতা ক'রতে হয়—সহস্র সহস্র লোকের শ্রদ্ধা ও ভাবের আকুতি দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মাল্যের মত ভ'রে তুলেছিল তাঁর চরণপ্রান্ত।

যাই হোক পুনরায় বেদান্তের কাজ মার্কিনে ও ইংলণ্ডে পূর্ণোদ্দমে চ'লতে থাকে—কর্মক্লান্ত শরীরে স্বামীজির ইচ্ছা জাগে সেই হিমাচলের নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন। তাঁর এক শিষ্য প্রদত্ত ১২০০ বিঘা জমিতে বার্কসায়ারে এক আশ্রম ছিল। সেখানে তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের হিম নিবাসের শান্তি স্মৃতিতে ছুটে গেলেন, এ আশ্রম তাঁরি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ঠাকুরের চিহ্নিত কর্মবীরের নির্জনতা এ জগতে পাওয়া দুরূহ—তাই শেষে স্থির করেন ভারতে ক'রবেন প্রত্যাবর্তন। সেটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝির কথা—শ্রীঠাকুরের কথা, "হাসপাতালে নাম লেখালে চলে আসতে দেবে না।" সীমারেখার সময় এখনও নয়।

প্রত্যাবর্তন মুখে প্যান প্যাসিফিক এডুকেশন কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন···এরপর জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্মের বাণী শুনান আর কলকাতায় এসেই বেলুড় মঠে শ্রীঠাকুরের চরণোপ্রান্তে গিয়ে জানান তারি গৌরবের বিবরণ—গুরুগত প্রাণ সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত কেশরীর বয়স তখন ৫৬-৫৭। ক্লান্তি বিহীন আত্মার শক্তি তখনও গতিহারা হয়নি। হিমিস মঠে রক্ষিত যীশুখৃষ্টের জীবনীর সন্ধানে চ'ললেন

তিব্বতের দুরাবরোহ পথে···যীশুখৃষ্টের এই অজ্ঞাতবাসের কাহিনী তিনি আনেন—জ্ঞানের অনির্বাণ শিখার সমিধ হিসাবে।—এরপর তিনি কলকাতার বিখ্যাত বেদান্ত মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা—শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের লীলাপূত কলকাতা —এতদিনে তাঁর একটা স্থায়ী দেবরামে ধন্য হ'ল—তিল তিল ক'রে বুকের ব্যথা দিয়ে গড়া এই প্রতিষ্ঠান। এর আগে তিনি দার্জিলিং-এ 'রুবী কটেজ' নামক স্থানটা ক্রয় ক'রে সেখানে বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করেন। পরে এই স্থানে বড় একটা বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'য়েছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে তিনি দুইবার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কলকাতার বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনি লাভ করেন। প্রঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁকে দার্শনিক বলে বরণ ক'রলেন তাঁর বিখ্যাত Contemporary Indian Philosophy বইতে। (Radhakrishnan and J. H. Muerhead).

জীবনের সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে—ঘনিয়ে আসে ভারতের দুঃখেরও সন্ধ্যা—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে প্রত্যাবর্তন পথে রেলের দুর্ঘটনায় অসুস্থ হ'য়ে পড়েন আর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ভাদ্র সেই জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশিখা চিরতরে যায় মিলিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্লোকে—ভারতের তথা জগতের এক মহা দুর্দিনে।

আজ জগতের এমনি মহামানবের প্রয়োজন কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মত ব'লতে হয় Milton Thou shouldst be living at this hour আজ জগতের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক বিরাট Dynamism এসে পড়েছে Bergson, Whitehead, Dewey প্রমুখ চিন্তাবীদদের লেখনীতে আমরা তার প্রমাণ দেখি—আর স্বামীজি সেই elanvital তত্ত্বের চিরচঞ্চল প্রাণ প্রবাহের ছিলেন মূর্ত প্রতীক। Prometheus বিশ্বের দুয়ারে গেছেন বহন ক'রে পবিত্র জ্ঞান শিখা, উপনিষদের ঋষিদের মত ব'লেছেন বার-বার—তমসো মা জ্যোতির্গময় ···উপল বিক্ষুব্ধ অলকানন্দার মত শত ক্ষত ক্ষতিতে হয়নি সে গতি ভঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণলোকের জ্যোতিচক্রবালে সেই শক্তি আমাদের অলক্ষ্যে, আজও প'ড়ছে ঝ'রে শতরূপা ভঙ্গে শুধু প্রকাশ ভঙ্গি গেছে বদলে·· ঋষিদের ভাষায়···

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

—ঈশোপনিষৎ

॥ **পরিশিষ্ট** ॥

আমাদের দেশে দার্শনিক আর দ্রষ্টা আছেন…দার্শনিক বা দ্রষ্টা অভেদানন্দের কথায় পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের কথাই এসে পড়ে…স্বামীপাদেরা ছিলেন রামকৃষ্ণ দর্শনের প্রকৃত ভাষ্যকার…শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় দর্শনের তাঁরাই প্রকৃত রহস্যবিৎ তাই তাঁদের দর্শনে ফুটে উঠেছে—শ্রীঠাকুরের বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের, বাস্তববাদের সঙ্গে আদর্শবাদের, আপেক্ষিকতার সঙ্গে নিরপেক্ষিকতার সমন্বয় বাণীর ভাষ্য—তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ লেখার মধ্যে এই সব ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন—জড়বাদ যেমন একপেশে…ভাববাদও তেমনি একদেশদর্শী…(সেলফ নলেজ)। জগৎটা একটা বিরাট চুম্বক—এর একদিকে আছে বাস্তব জগৎ আর একদিকে আছে ভাব বা চৈতন্যের জগৎ—আর মধ্যে আছে নিরপেক্ষিক সত্বা…কি সুন্দর সমন্বয়—জড়, চৈতন্য আর দৃষ্টি চৈতন্যে (সেলফ নলেজ)।

এই সমন্বয় জ্ঞানকে কি ভাবে পরাজ্ঞানে নিয়ে যেতে হয়, দ্রষ্টার ভঙ্গীতে তিনি তা'ও বলেছেন…যে মুহূর্তে ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা বুঝব, সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যের…ব্যক্তিগত চৈতন্যের মধ্যে থাকতে পারি না (আওয়ার রিলেশন্ টু দি এ্যাব্সোলিউট্)। স্বামীপাদের প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশ রূপ পেয়েছে—এগুলি সমগ্রের এক চতুর্থাংশ মাত্র। —শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্।

স্বামীজির স্মৃতি

প্রথম দর্শন মনে পড়ে—নানা সাধু-সন্তের দিশায় ফিরে গিয়েছি কলকাতার এক কেন্দ্রে বৌবাজারে ; স্বামীজি তখন বেলুড় থেকে চলে এসেছেন—বেদান্ত মঠের গোড়াপত্তন হ'য়ে গেছে সুরু। দু'টি চারটি ছেলে আসে যায়। একটা ঘরের মাঝখানে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীঠাকুরের মূর্তিখানি রাখা আছে দেখলে গা ছমছম করে—জীবন্ত জাগ্রত মূর্তি। সেক্রেটারীর মত একটি ছেলে থাকে বি. এ. পাশ। আমাদের প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতেন। স্বামীজিকে এই প্রথম দর্শন। এর পর মঠ উঠে আসে ইডেন হস্পিট্যাল রোডে, তখন স্বামীজির গীতা উপনিষদের ক্লাস সুরু হ'য়ে গেছে। ছোট খাটো তিন চারটি

ঘর নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে স্বামীজি থাকেন। বর্তমানের মহারাজরা তখন আসতে স্বরু ক'রে দিয়েছেন। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে দেখি গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছেন স্বামীজি মহারাজ একা নিঃসঙ্গ নির্বিবোধ সন্ন্যাসী—কে ব'লবে এঁকেই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইংরাজী অধ্যাপনার ভার দিতে চেয়েছিল।

একদিন গেছি—স্বামীজির প্রসাদ এনে দিলেন একটি ব্রহ্মচারী—শুকনো রুটি মাত্র। শুনলাম শুকনো রুটি রাত্রে খান আর দিনে আতপ চালের ভাত। ভক্তটি জানান স্বামীজি মহারাজের কথা—কেমন ক'রে তিনি তিরস্কার করেছিলেন জনৈক ব্রহ্মচারীকে। সে যখন জানায় এ তিরস্কার তাকে বৃথা করা হ'য়েছে, স্বামীজি বলেন এ তিরস্কারে তার কুষ্ঠির যে দুর্ভোগ ছিল সেটি কেটে গেল।

সে এক শীতের সন্ধ্যা—কল্পচোখে ভেসে আসে স্বামীজি বসে আছেন। সাবিত্রী, স্বামীজির বিদেশী মেয়ে—স্বামীজির সঙ্গে কথা বলছেন। স্বামীজির জন্য তিনি দূর কাশ্মীর থেকে ফুল পাঠিয়ে দেন—জপ ক'রে ক'রে গলাবন্ধ তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দেন—অনেক জায়গা ঘুরে স্বামীজির আশ্রয় নিয়েছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে ভাল ভাল পাখী ছেড়ে দিয়ে বলেন, "হে ঠাকুর, এদের যেমন আমি মুক্তি দিলাম তেমনি মুক্তি আমাকেও তুমি দিও।" সেই সঙ্গে মনে পড়ে, বর্ষণ মুখরিত বিদায়ের দিন—স্বামীজির ফেলে যাওয়া দেহের অনুগমন ক'রছেন—নয়ন অশ্রুসিক্ত, হাতে একগোছা জলন্ত ধূপ। খালি পায়ে অনুগমন ক'রছেন, অসহ ব্যথায় আপন হারা।

দু'জন আচার্য (Doctor) গেছেন দেখা ক'রতে—স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আত্মার যদি এত শক্তি, যদি আত্মার অতিন্দ্রীয় দর্শনাদির ক্ষমতা আছে তবে আমরা বুঝতে পারি না কেন ?" স্বামীজি তাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝিয়ে দিলেন, ক্যামেরাতে যদি দুটো ছিদ্র থাকে তাহলে ছবি ওঠে না—তেমনি আত্মার বহুমুখীনতার জন্য আত্মার শক্তি ব্যাহত হ'য়ে যায়।

তখন আশ্রম গৃহ নির্মাণ স্থরু হয় নাই—অর্থের চেষ্টা চলছে। স্বামীজিকে একটু লেখা হ'ল—ইউনিভার্সিটির Fellowship লেকচারে দাঁড়ালে গৃহ নির্মাণ কল্পে কিছু পাওয়া হয়'। স্বামীজি লিখলেন,—"কখনও মূল্য দিয়ে লেকচার দিই নাই—আমার বক্তৃতা সব Free gift to humanity."

অস্ফুটে মনে পড়ে—মাদ্রাজী একটি ছেলে ছুটে এসেছে একবস্ত্রে। বলে, "বেলুড়ে গিয়েছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ নই বলে স্থান দিলে না।" স্বামীজি করুণার্দ্র নয়নে বলেন—"আমরা তোমায় নেব।"

অসুস্থ অবস্থায় নেতাজী গেছেন দেখা ক'রতে। আচার্যপাদ বলেন, "সুভাস তুমি আমায় আলিঙ্গন কর।" এটি বোধ হয় নেতাজীর ভারত থেকে শেষ বিদায়ের আসন্ন লগ্ন।

ভক্ত প্রশ্ন ক'রছে, "আমরা যা প্রার্থনা জানাই মনে মনে, তা কি জানতে পারেন?" উত্তরে বলেন, "যখন দুইমন একমুখী হয় তখন বুঝতে পারি।" প্রশ্ন জাগে, "নির্বিকল্প কখন হ'য়েছিল।" স্বামীপাদ উত্তর দেন—"একবার ভারতে আর একবার মার্কিনের একটি হ্রদের তীরে।"

টুক্‌রো স্মৃতি

সে অনেক দিনের কথা—

মনে পড়ে স্বামীপাদ তখন একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দোতলায় ব'সে আছেন। মধ্য-কলকাতায় দোতলায় মধ্য আয়তনের সে একটি ঘর। ললিত বিদগ্ধ কথার মুক্তাধারা ব'য়ে চলেছে—এদেশে ওদেশে দর্শন অনুভূতির কত সব মণিমুক্তা—ভক্তের মধুচক্র মুগ্ধ হ'য়ে সব শুনছে। এমন সময় জনৈক উত্তপ্ত মস্তিষ্কের লোক এসে অকথ্য ভাষায় শ্রীশ্রী মহারাজাকে আক্রমণ ক'রল। আমরা অনেকেই তার উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা ক'রতে সচেষ্ট। স্থিতপ্রজ্ঞ স্বামীপাদ শুধু বললেন, ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

সেদিন গেছি—মঠ তখন বীডন স্ট্রীটে। শিশুর উচ্ছলতায় বসলেন তাঁর সব ফটো ছবি দেখাতে—কত রকমের সেসব আলোকচিত্র। বললেন, মার্কিনে হঠাৎ রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে জনৈক পথচারী, আর ছবি নিয়েছে—বলে আপনার খুব Parfect figure দেখে আমি ছবি না নিয়ে পারলাম না। মহাপুরুষের কাছে সময় তখনই অমূল্য আবার তখনি শিশুর ছেলেখেলা। বলে চলেছেন, —দু'চাকার গাড়ী, তখন সদ্য হ'য়েছে। আমার জিদ চাপলো একদিনেই চাপতে শিখব—একদিনেই শিখে ফেললাম। একজনকে চাপিয়ে দিতে ব'লে একটা গড়ানে জায়গায় ঠেলে দিতে ব'ললাম। আমি বেশ চেপে বসেছি—গাড়ী চ'লতে লাগল। গড়ানে জায়গাটি পার হ'তেই আমি বেশ শিখে ফেললাম। অনেক রকম আচার নিয়ে গেছি। দেখে বললেন,—"এত রকম আচার এক

সঙ্গে দেখিনি।" কি শিশুর দৃষ্টিতেই না দেখতেন জগৎটাকে। সেবার এসেছেন কাশীপুরে আমাদের পূর্বাশ্রমের বাড়ীতে। বললেন, "শ্রীঠাকুরের সমাধি মণ্ডপে যাব।" গাড়ী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিছুদূর গিয়ে গাড়ী গেল খারাপ হয়ে। হেসে বললেন,—"ঠাকুর সব মিলিয়ে দেন, তখন তো রাস্তায় হেঁটে হেঁটেই গেছি কিনা তাই আবার হাঁটিয়ে নিলেন।" এসে বসেছেন বৈঠকখানা ঘরে—জনৈক প্রশ্ন করেন, "ভগবানকে দর্শন ক'রেছেন ?" সমাধি গহীন আঁখিতে চিন্তা ঘনিয়ে বললেন,—"দেখা কি ? এই হাতে ভগবানকে সেবা ক'রেছি যে।" প্রশ্নকর্তার মুখে আর কথা নাই।

স্বামীপাদের একটি আলোকচিত্র নিতে গেছি। তখন দণ্ড হাতে বিবেক-স্বামীর মত ছবি ছিল না। পরে এই রকম ছবি হয়। অবুঝের বলা,—"এইবার আপনি একটু ধ্যান করুন।" উত্তর আসে, সহজ মুখের উত্তর; "আমার মন এখন হিমালয় গঙ্গোত্তরীতে।" আরো বললেন,—"ছবি তোলে, কেউ দেয় নারে।"

প্রথম পরিচয়—প্রথম যে দিন চরণ দর্শনে গেছি—ইডেন হস্পিটাল রোডের দোতলার কয়েকটি ঘরে তখন মঠ চলেছে। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'স্থ' মহারাজের সঙ্গে রহস্য কথায় লিপ্ত।

"বললেন,—কি চাও ?" "কিছু উপদেশ চাই", শুনে বললেন, "গীতার ক্লাশে এস।" আমি বললাম, "সে রকম উপদেশ নয়।" তখন বললেন, "কি কর, কে আছে ?" শুনে বললেন,—"বস আসছি।" এর পর একটি জামা গায়ে দিয়ে এসে বসলেন, বললেন মধুর হেসে, "দেখ্ তোদের জন্যেই ত' এখানে ব'সে আছি। না হ'লে হিমালয়ে গিয়ে বসলেই হ'ত।" এরও আগের কথা, বৌবাজারের কয়েকটি ঘরে তখন প্রথম থাকেন। বেলুড় মঠ থেকে সদ্য চলে এসেছেন। দূর থেকে দর্শনের পালা সেবার। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীঠাকুরের মূর্তি তখন সবে এসেছে। একটি ঘরে সেটি উঁচু ক'রে রাখা আছে, অনেকটা বিদেশী ভাবেই রাখা। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে গা ছমছম করে, এমনি জাগ্রত মনে হয়েছিল সেদিন সে মূর্তি। প্রণাম ক'রে এলাম। তখন নগেন মহারাজ ছিলেন মহারাজের কর্মসচীব। ভবিষ্যৎ ত্যাগীর দল কিছু কিছু আসছে তখন। তাঁরা মালকোচা দিয়ে কাপড় পরেছে দেখলাম। সমিতির কথাও কিছু হ'ল সেদিন।

শিশুর মত কেমন ছিলেন। সেবার একটি Waterman কলম নিয়ে গেছি চরণে নিবেদন করব, তা বললেন, নূতন তো ? তখন অর্থ কৃচ্ছ্রতা চলেছে। আমি ভাবলাম Stephanos Nirmalendu লেকচারে ত' টাকা পাওয়া

যায়। অপর কেউ ঐ বক্তৃতা দিয়ে টাকা ত' নেবেই, তার চেয়ে তাঁর দুদেশের দর্শনেই ত' অধিকার রয়েছে। 'স' মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পত্র দিলাম। এর পরে স্বামীপাদ লিখে জানালেন,—দেখ জীবনে কখনও পয়সা নিয়ে বিদ্যা দান করিনি। বিশেষ বললেন,—আমার ত Degree নেই যে তারা Lecture দিতে দেবে।

সেবার যখন বাড়ীতে আসেন ভাল ভাল জিনিস সব দে'ওয়া হয়েছে সাজিয়ে, সামান্য কিছু কিছু ছুঁলেন মাত্র। বলায় বললেন,—ঐ যে এত সুখে খাচ্ছি—বলেই বারান্দায় ব্রহ্মচারীদের দেখিয়ে দিলেন। আর একদিনের কথা। মঠে গেছি; দেখি কলম পরিষ্কার ক'রছেন। আমি প্রণাম ক'রে বসেই চেয়ে নিলাম কলমটি। তখন এক টুকরো কাপড় আলমারী থেকে বের ক'রে এনে বললেন,—রাখা ছিল এই কাজের জন্যে। কাজ হ'য়ে গেলে আবার রেখে দিলেন সেই স্থানে।

এইসব জ্যোতি মেদুর ক্ষণগুলি জীবনে কি সম্পদ রচনা করে তার কথা সব সময়ে বোঝান যায় না।

তবে ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মনে ভেসে ওঠা শুচিশুভ্র একরাশ ডাফোডিল ফুলের মত স্তব্ধ মানসলোকে তারা যে থাকে এ কথার ভুল নাই।

স্বামীপাদের দু'টি কথা

স্বামীপাদ অভেদানন্দ তাঁর ১৩৪৪ সালের ১২ই আশ্বিনের বক্তৃতায় বলেন, "ধর্মপথে চলিয়া তোমরা নিজ নিজ চরিত্র গঠন কর, এবং জগতের মঙ্গলসাধন কর।" এখানে নীতিশাস্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় সূত্র রয়েছে। আবার তাঁর Attitude of Vedanta towards religion পুস্তকে বলেছেন,—নৈতিকতাই ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবনের একমাত্র সহায়—নৈতিকতা ও ভগবৎ বিশ্বাস। আমরা দেখি যে, সাধারণতঃ নীতিশাস্ত্রে ভগবৎ বিশ্বাসের কথা বিশেষ থাকে না। বর্তমানের জনৈক লেখক F. S. Elder তাঁর Morals and religion বইতে স্থাপন করেছেন যে, নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নাই। উক্ত পুস্তকে স্বামীপাদ বলেন, নৈতিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। তিনি আবার

বলেছেন যে, এর মধ্যে বেদান্ত সার্বভৌমিক নৈতিক সূত্রগুলিকে তার সার্বিক ধর্মের ভিত্তিতে নিয়েছেন। এইসব নৈতিক নিয়ম যে ভগবানের বাণী সেকথা দ্বৈতবাদীদের জন্য রাখা আছে।

সব ধর্মনেতারাই যথা—বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, আহুরমাজদা তাঁদের নীতির সঙ্গে বেদান্তের নীতির ভেদ রাখেন নাই।

ভগবৎ বিশ্বাস না হলে যে নৈতিকতা দৃঢভূমি লাভ করে না একথা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্যবিহীন কর্মের দৃঢ়তা থাকে না। লক্ষ্যবিহীন তরণী কেবল এককূল হতে অন্য কূলেতে ভেসেই চলে। তার নির্দিষ্ট স্থলে সে পৌছায় না। যদি নৈতিক জীবনের কোন দাঢ্য না থাকে, সত্যকথা ব'লে পবিত্র হ'য়ে আমরা ভগবৎ পথে এগিয়ে যেতে না চাই, তবে আমাদের সে পথে চলার দৃঢ়তা ক'মে যাবে।

কেবল চলাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে সে চলার ভিতর মাধুর্য থাকে না, সে চলা যন্ত্রারূঢ় হ'য়ে পড়ে, আর যন্ত্রের ভিতর প্রাণের আবেগ না থাকায় সে বেশী দিনের স্থায়িত্ব অর্জন করে না।

আজ আমরা পশুপদবী থেকে মানুষের পর্যায়ে এসে পড়েছি। আমাদের মস্তকের উপরের অংশটা (Cortex বা New brain) গড়ে উঠেছে মনুষ্য পদবী লাভের পরে 'Growth of mind.' Koffka P-23)। এই নূতন মস্তিষ্কের কাজই উচ্চতর চিন্তা করা। সাধারণতঃ তাই আমাদের উচ্চ চিন্তা করা এত দুরূহ। নৈতিকজীবন তাই এত কঠিন। বিশেষ বর্তমান জগতে নৈতিকজীবনের মান অনেক নেমে গেছে কাজেই আমাদের প্রতিদিন অনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংঘাত হয় আর তার ফলে আমাদের ঐ মান নীচু হ'য়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে উর্ধ্বলোকের কোন শক্তি যথা গুরুশক্তি, ভগবৎশক্তি বা মহাপুরুষের শক্তিতে আমরা সঞ্জীবিত না হ'লে নৈতিক স্রোত ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতোয়া হ'য়ে উঠবেই। ভগবৎ ভক্তি তাই এত প্রয়োজন। নৈতিকজীবন ও ধর্মজীবন যেন শৃঙ্খলিত ভাবে অগ্রসর হয়। নৈতিক চরিত্র যত উন্নত হবে ধর্মজীবনও তত অগ্রসারিত হয়। আবার ধর্মজীবন যত উন্নত হবে নৈতিক প্রতিষ্ঠাও তত দৃঢ় হবে। সত্যকথা বলা উচিত কিন্তু সত্য স্বরূপ ভগবানকে লাভ না ক'রলে সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই স্বামীপাদ তাঁর বক্তৃতায় নৈতিক জীবন গ'ড়তে ধর্ম পথে চ'লতে ব'লেছেন। তখন শ্রীমার কথায় মনই গুরু হয়। Le comte do Nouy নামে বিশ্ব বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বলেন,

Religious sentiment in its broadest sense, and in its Primitive form of superstetion, has as we have seen, an origin almost as ancient as conscience. It is universally distributed and solidly rooted. No cataclysms of human or material origin can shake it ; (The human destiny p. 173).

একথা ধ্রুব সত্য যে, ধর্ম তার মূলকথা নিয়ে আমাদের চেতনা যত দিনের ততদিনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। আর সে এত দৃঢ়মূল যে কোন মানবিক বা জাগতিক শক্তিই সে দৃঢ় ভিত্তিকে বিচ্যুত ক'রতে পারবে না।

স্বামীপাদের দু'টি উক্তির সঙ্গে আমরাও বলি ধর্ম ও নৈতিকতা পারস্পরিক আর ধর্মের উদ্দেশ্য কোন দিনই কেউ মানব মন থেকে সরাতে পারবে না। আপাতভাবে ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষয় ক্ষতি হ'লেও পরিণামে এ জয়যুক্ত হবেই। এটি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে নয় সমষ্টিগত ভাবেই।

এই কথার অর্থ এই যে ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেক সময় নিজেদের মত নিয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু সমষ্টিভাবে দেখলে সেটা ব্যর্থ ও মিথ্যা বলে মনে হবে। ধর্মে ও নৈতিকতায় সমষ্টিগত দৃষ্টিতে মহাপুরুষের কথা ধরাও প্রয়োজন। এরা একাই বহুর সমান। যে সমাজের অঙ্গে বিবেকানন্দ ; অভেদানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটছে সে সমাজের নৈতিকতা কম বললে সত্যের অপলাপ হয়। কারণ ব্যষ্টি পুরুষ সমষ্টিরই দান। আরো আমরা দেখি যে, হঠাৎ ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক জীবনের স্ফুরিত রূপ দেখা যায়।

কম্যুনিষ্ট রাশিয়ায় আধুনিক সময়ে নৈতিক ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থা জেগে উঠেছে, আর তারা কিছু কিছু দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে চেষ্টিত হ'য়ে প'ড়েছে। মনে হয় যাদের চেতন মনে নৈতিকতার প্রকাশ কম তাদের অবচেতনে একটি নদীর মত ভাঙ্গন জেগেছিল। কাজেই আমাদের দৃষ্টিতে যেখানেই চেতনে নৈতিকতার স্বল্প প্রকাশ সেইখানেই অবচেতনে হয়ত অনৈতিকতার বিশেষ ভাঙ্গন র'য়েছে। না হ'লে শ্রীঠাকুর স্বামীপাদের আগমন বৃথা হ'য়ে যায়।

আলমবাজার মঠে

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর নীড়হারা পাখীর মত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেরা এসে বাসা বাঁধে বরানগরের এক জীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ীতে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র, শ্রীশ্রীঠাকুর যাকে ব'লতেন সুরেন্দর ; তিনিই এগার টাকা ভাড়ায় মুন্সীদের এই গৃহটি ভাড়া নেন স্বামীজিদের আশ্রয় হিসাবে। প্রথম প্রথম অল্প অল্প ক'রে দিলেও পরে মাসিক একশত টাকা মত দান ছিল এই মঠে। এই মঠ ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর প্রায় পাঁচ বৎসর থাকার পরে আলমবাজারে স'রে আসে। লোচন ঘোষের ঘাটে যাবার রাস্তায় দক্ষিণ পাশে এই বাড়িটি আছে। মঠটি রাস্তার উপর মোটা থামওয়ালা দোতালা ছিল। সদর দরজা ছিল পূর্বদিকে গলির মধ্যে, সদরে ঢুকেই উত্তর আর দক্ষিণ দিকে দু'টি রক, সামনে একটি উঠান এর পর পশ্চিমমুখী তিন ফোকর ঠাকুর দালান। উত্তরদিকে একটি সিঁড়ি দোতলায় উঠেছে। সেখানে দক্ষিণ আর পূর্বদিকে দু'টি বারান্দা। বারান্দায় লাল, নীল টালি বসান। পূর্বদিকের বারান্দায় একটি লম্বা ঘর, তিনটি দরজা আর সদরের দিকে একটি গবাক্ষওয়ালা বারান্দা। বড় ঘরের পূর্বে একটি দরজা আর তারপর একটি ছোট ঘর। দক্ষিণে গবাক্ষওয়ালা বারান্দা দিয়ে একটি কাঠের ঝিলমিল দেওয়া স্নানের ঘরে পৌছান যায়। দক্ষিণ আর পূর্ব বারান্দায় গোল থাম আর কাঠের বারান্দা। স্নানের ঘরের পাশ দিয়ে গেলে দক্ষিণদিকে একটি দরজা ছিল। ঐ দিকে দক্ষিণে যাবার পথ ছিল। দক্ষিণদিকে দরজা হ'তে আরম্ভ ক'রে একটি প্রশস্ত পথ। পথটির বামে একটি আর ডানদিকে সারি সারি তিনটি ঘর। উভয় পার্শ্বে দু'টি ঘরের জানালা এং গলির ভিতর। বামদিকে একটি ঠাকুর ঘর, দরজা ও দু'টি জানালা দাক্ষণমুখী। ভিতর বাড়ীতেও উঠান ছিল, আর উত্তর-পশ্চিম আর দাক্ষণ দিকে একটি ছাদওয়ালা বারান্দা ছিল। পূর্ব দিকে বড় একটি ছাদ তার উপর আবরণ ছিল না। ঠাকুর ঘরের পাশে নীচে নামবার একটা সিঁড়, আর ঠাকুর ঘরের সামনে যে দালানটি তার পূর্বে একটি ছোট ঘর, সেটি ভাঁড়ার ঘর ছিল। পূর্বের গোলা ছাদের ঘুলঘুলী ছিল। পশ্চিমে তিনটি ছোট ঘরের দক্ষিণ পশ্চিমে শশী মহারাজ থাকিতেন। এই ঘরের জানালা হ'তে বাইরের গলি দেখা যেত। শশী মহারাজের ঘরের লাগাও অর্থাৎ মধ্যের ঘরে

কালীমহারাজ পড়াশুনা আর তপস্যা ক'রতেন। ঠাকুর ঘরের পাশে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় বাঁদিকে রাঁধবার ঘর। রান্নাঘরের দক্ষিণে একটি অন্ধকার ঘর ছিল। তারপর রান্না ঘরের সামনে দক্ষিণে গেলে পূর্বদিকে একটি গলি। গলিটি এক শান বাঁধান ঘাটে শেষ হ'য়েছিল। পূর্বের পুকুরটিও বাড়ীর অন্তর্গত। উঠানের উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি অব্যবহার্য ঘর ছিল। বাহির বাড়ীর উপরে হলঘরের নীচে একতলায় গোটা দুই অব্যবহার্য ঘর ছিল। বর্তমানে এ মঠের কিয়দংশ আগরওয়ালারা অধিকার ক'রেছে সেটি ঠাকুর দালান ছিল। পুকুরটিও বুজিয়ে দিয়ে ঘর হ'য়েছে। যে অংশে স্বামীজিরা থাকতেন সেটি এখন জীর্ণদশায়। এই অংশটি বর্তমানে সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বহু আয়াসে ও বহু ব্যয়ে ক্রয় ক'রেছেন। বাড়ীটি পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার করাতেও বহু অর্থের প্রয়োজন হবে।

যাই হোক এই আশ্রমে স্বামীপাদ অভেদানন্দজী প্রথম এসেই খুব আনন্দিত হ'য়েছেন। তাঁর লেখা 'আমার জীবন কথা' বইতে রয়েছে···'মঠে আহার্যের ব্যবস্থা অনেক স্বচ্ছল, ভক্তদের যে যেমন পারতো তেমনি খাবার জিনিস মঠে পাঠাতো। ভক্তরা নূতন দু'টি সতরঞ্চি দিয়েছিলেন, একটি ছোট চৌকি আর একটি পড়ার ছোট আলোও পাওয়া গিয়েছিল। সব সন্ন্যাসীর জন্য আর একখানি মাত্র কাপড় ছিল না; কাপড়, চাদর প্রত্যেকের জন্যেই জোগাড় হ'য়েছিল। এই মঠে তুলসী মহারাজ এসে যোগ দিয়েছিলেন।

এখানে কালী মহারাজ সারাদিন জপ ধ্যান আর তপস্যা নিয়ে থাকতেন। ঘরটির নাম হ'য়ে গিয়েছিল কালী বেদান্তীর ঘর। অদ্বৈত বেদান্ত আলোচনা আর তপস্যা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ ধ্যান ক'রে তার মর্মার্থ গ্রহণ ক'রে তবে অন্য শ্লোক পাঠ করতেন। গীতার এই প্রথা, আমাদের মনে পড়ে স্বামীপাদ পেয়েছিলেন শ্রীঠাকুরের কাছে—কাশীপুর—মহাপীঠে। এই ঘরে তিনি নিরন্তর স্বাধ্যায় আর ধ্যানে দিন কাটাতেন। কেবল আহারের সময়েই আসতেন বাইরে। দিন কেটে যেত গঙ্গাধারার মত। মধ্যে মধ্যে গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে বিচার হ'ত। সকলেরই লক্ষ্য ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শে গঠন করা। এই মঠেই তাঁর গিনিওয়ার্মের ক্ষত দেখা যায়। দীর্ঘদিন খালি পায়ে ভারত পরিক্রমায় শরীরে এই রোগ দেখা দেয়। সাতবার অস্ত্রোপচারের পর শরৎ মহারাজের পরম পরিচর্যায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। নিরঞ্জন মহারাজও পরে এই সেবায় যোগ দেন। প্রায় তিনমাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। শরৎ মহারাজের সাহায্য ব্যতীত চলতে

পারতেন না। একদিন শরৎ মহারাজ তাঁকে নীচে একলা ছেড়ে দিয়ে উপরে উঠে আসেন আর সেখান থেকে নানা উপহাস ক'রতে সুরু করেন। স্বামীপাদ তখন নিজের আত্মশক্তি যেন ফিরে পান। তিনি তখনি নিজের পায়ে ভর দিয়ে উপরে উঠে আসেন। এটি শরৎ মহারাজের একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এখানে এক ইংরেজি কাগজে লিখিত পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রথম সকলে জানতে পারেন। এ ঘটনা ১৮৯৩ সালের অক্টোবরে ঘটে। বলা বাহুল্য আমাদের স্মরণ হবে যে, এই পত্র লেখকই মারউইন মেরী স্নেল নামে চিকাগো ধর্ম মহাসভার বিজ্ঞান শাখার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, আর পরবর্তীকালে তিনি স্বামীজির বিশিষ্ট বন্ধু হ'য়ে পড়েন। প্রথম প্রথম তাঁর স্বামী বিবেকানন্দকে চিনতে পারেন নাই। স্বামীজি ভারত ভ্রমণের সময় স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রভৃতি নামে নিজেকে ক'রেছেন পরিচিত, পাছে গুরু ভাইরা তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। তাঁর চিকাগোতে ধর্মসভার কথা প'ড়ে ক্রমে এঁরা বুঝতে পারেন যে, স্বামী বিবেকানন্দই তাঁদের বড় আদরের নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের একটি পত্র ইতিমধ্যে এসে পড়ে ও সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু বিষয়টি ছিল গুরুতর। সেখানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আর মার্কিনের মিশনারীরা স্বামীজির বিরোধিতা ক'রতে সুরু ক'রে। এরই জন্যে স্বামীজি এদেশ থেকে একটি সাধারণ সভায় তাঁর কাজের সমর্থন করে পত্র দিতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে অভেদানন্দ, সারদানন্দ আর রামকৃষ্ণানন্দ তিনজনে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। সেই কাজের জন্যে তাঁরা আলমবাজারের মঠ থেকে বলরাম বসুর বাড়ী চলে যান। কলকাতায় প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়। আর রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করা হয়। সভার বিবরণ ছাপিয়ে স্বামীজিকে আর পার্লামেণ্টের সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান হয়। আলমবাজার মঠে দু'চারদিন বিশ্রামের পর স্বামীপাদ তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এ ১৮৯৫ সালের ঘটনা। কাজেই আমরা দেখতে পাই ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আলমবাজার মঠটির সঙ্গে যোগ র'য়েছে। ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন স্বামীজির আহ্বানে। কাজেই এই সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মঠের নিবিড় যোগ ছিল। এরপর যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে।

১৮৯৭ সালে স্বামীজি কলকাতায় ফিরে এসে গোপাললাল শীলেদের

প্রাসাদোপম গৃহে দিনে থাকতেন, রাত্রে থাকতেন আলমবাজার মঠে। যদিও সাধারণ লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হ'ত শীলেদের বাড়ীতে তবে ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গোড়াপত্তনের ব্যবস্থা হ'ত এই মঠে। এখানে তিনি গুরুদেবের পুরানো কথা, নিজের জীবনের ঘটনা, বিশেষ ক'রে মার্কিনের স্মরণিকাগুলি গুরুভাইদের ব'লতেন কত না আনন্দ ক'রে। এখানেই তিনি তাঁর বিদেশী শিষ্যদের সম্বন্ধে গুরুভাইদের সামাজিক বাধা যা'তে দূর হয় তার চেষ্টাও ক'রতেন।

এই ঘরেই স্বামীজি ব্যক্তিগত মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সমষ্টির মুক্তির কথা, দরিদ্রনারায়ণের জন্য সেবার কথা ব'লে সন্ন্যাসের নূতন আদর্শ স্থাপনের কথা গুরুভাইদের কাছে তাঁর অগ্নিগর্ভ মন্ত্রে প্রচার করেন। ব'লতে গেলে নূতন আলোয় স্বামীজি এই মঠেই যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ক্রমে গুরুভাইরা তাঁর কথার মধ্যে গুরুদেবকেই পেতেন খুঁজে—নূতন আলোয় মুক্তিস্নানের সে লগ্ন। এরপর ১৮৯৮ সালে মঠ বেলুড়ে নিলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে স্থানান্তরিত হয় ব'লে জানা যায়। তবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়মাবলী এই মঠে থাকার সময়েই তৈরি হ'য়েছিল, যদিও যে সভায় এটি ঘটে সে সভার অধিবেশন বলরাম মন্দিরে হয়।

এই আলমবাজার মঠেই স্বামী নিত্যানন্দজীর কথায় শিষ্যদের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করার কথা বলেন। সুধীর মহারাজ সেগুলি লিখে নেন। স্বামীজি তাঁ'কে নিয়মগুলি ব'লে বলেন,—'দেখো যেন কোথাও নেতিবাচক না থাকে'।

সুধীর মহারাজ, পরে যিনি স্বামী নিরঞ্জন মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ নাম পেয়েছিলেন, তাঁর দীক্ষা এখানেই। স্বামীজি তাঁর হাতটি ধ'রে কিছুক্ষণ ধ্যান ক'রে তাঁর মন্ত্রের নির্দেশ দেন। এটি আলমবাজার মঠের ঠাকুরঘরে হয়।

এই মঠেই প্রেমানন্দজীর নির্দেশে স্বামীজির ইংরাজী বইগুলি নূতন ব্রহ্মচারীরা তর্জমা ক'রতে সুরু করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ এখানেই স্বামীজির নির্দেশে রাজযোগের ইংরাজী তর্জমা সুরু করেন।

কালীকৃষ্ণ মহারাজ, যিনি পরে স্বামী বিরজানন্দ নামে মঠে খ্যাত হ'য়েছিলেন, তিনি ১৮৯২ সালে আলমবাজার মঠে এসে যোগ দেন। বরানগর মঠেই তাঁর প্রথম যোগ দেওয়া। আর সেখানের মত তিনি এখানেও ঠাকুরের আর মঠের সাধুদের সেবা নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রতেন। গোপালের মার সেবা তিনি

এই মঠেই ক'রেছিলেন। গোপালের মা তখন মঠে এসে দু'চার দিন ক'রে থাকতেন। এই আলমবাজার মঠে স্বামীজি ১৮৯৭ সালে সুশীল মহারাজ (প্রকাশানন্দ), কানাই মহারাজ (নির্ভয়ানন্দ), যোগেন চট্টোপাধ্যায় (নিত্যানন্দ) এঁদের বিরজা-হোমে সন্ন্যাস দেন। এই সন্ন্যাস ব্রতে স্বামীজির অকুণ্ঠ আশিষ লাভ ক'রেছিলেন নবীন সন্ন্যাসীরা। গোপালের মাও সাধুদের আশীর্বাদ ক'রেছিলেন এই মঠে এসে। আলমবাজার মঠের উপরে ওঠার সিঁড়ির এক পাশে বসে বিরজানন্দ শাস্ত্রাদি পাঠ ক'রতেন ; আর হরি মহারাজ সময়ে সময়ে তাঁকে পাঠ বুঝাবার সাহায্য ক'রতেন। খগেন মহারাজও আলমবাজারে দীক্ষিত হ'ন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। নাম হ'ল স্বামী বিমলানন্দ। ইনিও তুরিয়ানন্দের কাছে শাস্ত্রাদি প'ড়তেন। স্বামী প্রকাশানন্দও আলামবাজার মঠের সাধু। এই মঠে তিনি ১৮৯৬ সালে যোগ দেন। এর পূর্ব নাম ছিল সুশীল।

স্বামী বোধানন্দ তখন হরিপদ মহারাজ। তিনি প্রথম বরানগর মঠে মাষ্টার মশায়ের নির্দেশে আসেন। এর পর বরানগর মঠে তাঁদের আসা যাওয়া বেড়ে যায়। যোগোদ্যানেও হরিপদ মহারাজ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন। দক্ষিণেশ্বরে সেবার শ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। সেই উৎসবে যোগ দিতেই হরিপদ মহারাজ আগের দিন আলমবাজার মঠে এসে উপস্থিত হ'ন। এর পরের দিন স্বামীজি নিজের গাড়ীতে তাঁকে তুলে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। এই সময় মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ দিন দিনই বেড়ে চলেছিল। এই মঠে একদিন প্রেমানন্দ মহারাজ ধ'রে বসেন বিবেকপাদকে শ্রীঠাকুরের পূজা ক'রতে হবে। স্বামীজি শুনে গম্ভীর হ'য়ে ওঠেন আর পূজার আসনে বসে ধ্যান সুরু করে দেন। দীর্ঘ ধ্যানের পর পুষ্পার্ঘ্য তুলে নিয়ে বেদীতে পাদুকায় আর আত্মারামের কৌটতে অঞ্জলি ভ'রে দেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিকে ফুলময় করে তোলেন। তারপর অবশিষ্ট ফুলগুলি নিয়ে গুরুভ্রাতা আর শিষ্যদের মাথায় ছিটিয়ে দেন। হরিপদ মহারাজও এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় গ্রীষ্মাবকাশটি হরিপদ মহারাজ মঠেই কাটান। এখানেই স্বামীজির নির্দেশে রোজ দশটি ক'রে গীতার শ্লোক মুখস্থ ক'রতেন।

স্বামী আত্মানন্দের প্রথম জীবনের নাম ছিল গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নির্দেশে তিনি আলমবাজার মঠে যোগ দেন, এটি ১৮৯৬ সালের কথা।

শুকুল মহারাজকে একদিন স্বামীজি জিজ্ঞাসা করেন, 'কিহে শুকুল! তুমি সাধু হ'তে এসেছ।' উত্তর আসে 'সাধু হবার উপযুক্ত শরীর-মন কোনটাই

নাই। এই পচা শরীর যদি আপনার সেবায় শেষ হয় তবে পরজন্মে ভাল দেহ-মন হবে, এই বিশ্বাসেই এসেছি।' স্বামীজি আনন্দে বলেন, 'বেশ কথা'। এর দুই একদিন পরেই তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা পান স্বামীজির কাছে। এটি ১৮৯৭ সালের ঘটনা। পরিণত বয়সে দু'টি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলতেন—'গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস সাধু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল।'

স্বামী বিবেকানন্দ তখন পরিব্রাজক। হাথ্‌রাস্‌ ষ্টেশনে ব'সে আছেন। সহসা ষ্টেশন মাষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—"ক্যা মহারাজ! যাওগে নেহি?" স্বামীজি উত্তর করেন,—'যায়েঙ্গে ত জরুর।' এরপর ষ্টেশনমাষ্টার স্বামিজী মহারাজকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন,—'কি দিয়ে তুমি অতিথি সৎকার ক'রবে?' তখন ইনিই বলেন,—'কল্‌জোকা কাবাব।' ইনিই গুপ্ত মহারাজ—পুরো নাম শরৎচন্দ্র গুপ্ত। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্ত সন্ন্যাস নিয়ে সিন্ধু প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে ছিলেন। এঁর নাম ছিল তালিদার বাবা। ইনি হাততালি দিয়ে সর্বদা ওঁকার গান করতেন।

শরৎ মহারাজের গৃহে সেবার স্বামীজি কয়েকদিন থাকার পরই তাঁর বৈরাগ্যের বন্যা নেমে আসে জীবনে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি তাঁকে বলেন, 'বিদ্যা যদি লভিতে চাও, চাঁদমুখে ছাই মাখ'—সরল মনে শরৎচন্দ্র হুঁকার ছাই মেখে এসে দাঁড়ান। এরপর গুপ্ত মহারাজ গৈরিকবস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়েন স্বামীজির সঙ্গে। পিছে প'ড়ে থাকে হাথ্‌রাস্‌ ষ্টেশন।

১৮৯১ সালে সদানন্দ স্বামী আলমবাজার মঠে প্রথম আসেন। তখন সেখানে রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও মঠের কাজে যোগ দেন। ধ্যান, ভজন ছাড়া জলতোলা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, ঠাকুর ঘরের কাজ এইসবে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। গুপ্ত মহারাজকে তখন সকলে 'পিরীত পাগ্‌লা' ব'লত—ভালবাসার কাঙ্গাল তিনি ছিলেন। কিছুদিন শরীরের জন্য হাথ্‌রাস্‌ ফিরে যান। পরে আবার এসে আলমবাজার মঠে যোগ দেন। এখানে গীতা উপনিষদ বেদান্ত গ্রন্থাদি পাঠ ক'রতেন। বাইবেলও তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

আমরা আলমবাজার মঠের উপরের ঘটনাগুলি দিলাম যে পাঠকেরা আলমবাজার মঠের মূল্যায়ণের চেষ্টা ক'রবেন। এই মঠ বর্তমানে কতকটা সংস্কারবিহীন ও অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে—আমার জীবন কথা,—স্বামী অভেদানন্দ। স্বামীজির পদপ্রান্তে, স্বামী অব্জানন্দ। Life of Swami Vivekananda—C. Works.

আমার দেখাশোনার সাধুসন্ত

সরোজিনী মাকে দেখি সিউড়ী আশ্রমে। হঠাৎ এসে পড়েন—তখন আমরা প্রসাদ গ্রহণ ক'রছি। বেলা প্রায় ডুটো কি আড়াইটে হবে। দর্শনের ব্যাঘাত হ'ল বলে উনি একটু ক্ষুন্ন হ'য়েছিলেন। যাই হোক দেখা হ'ল ভোগের পর। নানা কথা হ'ল। উপরেই শুতে দেওয়া হ'ল। এত যে ক্লান্ত বৃন্দাবন থেকে আসায়—সব ভুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন—পলকহীন চোখে—যোগদৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন। তাঁকে ধরে নিয়ে যাবার পর হিমালয়ে যান। সেখানে বড় বড় কলা পাওয়া যেতো, তিনটি খেলেই পেট ভরে যায়। গরুরা এসে আপনি দুধ দিয়ে যেতো।

ছোটদের অভিনয় একটু দেখলেন আর নিজেও কিছু বললেন। রামকৃষ্ণ লোকের অংশ বিশেষ দর্শন হ'য়েছিল। ভোরের বেলায় যাবার সময় সে কথাও বলে গেছেন।

বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন। স্বামী বিলেত থেকে এসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়েছিলেন। কিন্তু বেশীদিন গৃহে থাকেন নি। সাধু হ'য়ে বেরিয়ে যান। সরোজিনী মা সেই সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেন নি। পরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর কাছে দীক্ষা নেন। পরে এঁর দেহত্যাগের কথা শুনি। নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছেন বৃন্দাবনের রজে। শুনেছিলাম গভীর ধ্যানের সময় তার কাছে যেতে ভয় ক'রত আর ধ্যানের চোখ যেন খুলতে পারতেন না।

কৈলাসপতি দক্ষিণগ্রামের সাধু। সুন্দর গায়ের রং, নাতিদীর্ঘ শরীর। তন্ত্রে সিদ্ধ ইনি। একটি ছোট পাত্রে রন্ধন ক'রতেন আর তার থেকে সকলকে প্রসাদ দেওয়া তাঁর চিরদিনের রীতি ছিল।

কাশীর এক সাধু এদেশে আসেন, সুন্দর তার রঙ। এসে এক হোম করেন। ১২০ টাকা চান হোম ক'রবেন। বলেন, তোমাদের বংশ থাকবে না, তবে একটি মেয়ে হবে। সে ভাগ্যবতী আর সাধু হয়ে যাবে। এই সাধুজীকে আর সে গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় নি। কাশীতেও সংবাদ নিয়ে তাঁকে যায় না পাওয়া। এই মেয়েটিও পরে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যায়। সাধুর কথা ফলে গেছে।

বছর দশেক আগেকার কথা—সেদিন শুনলাম এক অদ্ভুত সন্তের কথা।

বড়বাজারে কোন মাড়োয়ারীর বাড়ি। বাড়িতে ভাই বেশই অসুস্থ। ডাক্তার রোগ ধ'রতে পারছেন না। সকলে চিন্তিত হ'য়ে বসে আছে, সহসা এক সন্তের হ'ল আবির্ভাব। কত সাধুই তো আসেন বড়বাজারে নানা প্রয়োজনে, কাজেই এতে চমক লাগার কিছু ছিল না। কিন্তু এই সাধুজী এসেই বলেন,—ঘরমে কোইকা বেমার হৈ। চমকে ওঠেন উপস্থিতগণ। কেউ কেউ একটু বিরক্তও হন,—ঘরে এমন অসুখ। যাই হোক তার প্রশ্নের জবাব দিতেই তিনি বললেন, নিয়ে চল সেখানে। সাধুজীর মূর্তিটির একটু বিশেষত্ব ছিল। মুখটি ঠিক হনুমানজীর মত সরু আর সর্বাঙ্গে লোম। শরীর জীর্ণ কৃশ লোলচর্ম। যাই হোক রোগীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল সাধুজীকে। তিনি গিয়ে রোগীর দেহের উপর তিনবার হাত চালিয়ে বলেন,—চিন্তা মৎ করো—ঠিক হো যায়গা। এঁরা টাকা দিতে চাইলেন, নিলেন না। এঁরা বলেন,—বাব আপ কাঁহা রহতে হৈঁ। তিনি বলেন,—অযোধ্যাজীমে। এরপর যখন দোতলা থেকে নীচে নামেন তখন আর তাঁকে দেখা যায়নি। এর পর অযোধ্যায় বহু অনুসন্ধানেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আর একটি ঘটনা এই বড়বাজারেই ঘটে। সেদিন বৃহস্পতিবার। দু'টি শিষ্যসহ জনৈক সাধু এসে বলেন, আমায় একজোড়া জুতা দিতে হবে। চামড়ার জুতা তিনি পরবেন না। সেই রকম ব্যবস্থাই হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে এঁকে আর দেখা যায়নি। সমবেতদের ধারণা ইনি ছলনা ক'রতেই এসেছিলেন।

আর একটি সাধুকে আমি দেখি। এটি প্রায় তিরিশ বৎসর আগেকার কথা। এঁর নাম সাধু সরলনাথ। ওপরের বারান্দা থেকে দেখি ছাতা আর লাঠি, দুটিকে এক সঙ্গে ধ'রে শ্মশ্রুবিশিষ্ট জনৈক লোক রাস্তা দিয়ে চলেছেন। সবার মধ্যে যেন তাঁকে আলাদা ক'রেই চিনে নেওয়া যায়। বৃদ্ধ হ'লেও উন্নত শরীর এক ভঙ্গীতেই চলেছেন। পরে এর সঙ্গে আমার নানা কথা হয় সাধন সম্বন্ধে। কারো হাতে ইনি খেতেন না, স্বপাক আহারই ছিল তাঁর ব্রত। ইনি সদ্‌গুরু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। ইনিই সহস্রার হ'তে মধুক্ষরণ হ'য়ে কয়েকদিন সমাধিস্থ হ'য়েছিলেন। গোস্বামীপাদের জীবনীতে ঐ ঘটনা আছে। নামেই এই মধুক্ষরণ ও সমাধি হয়েছিল। তবে পরে ইনি যোগসঙ্কটে পড়েছিলেন। নিয়ত মনে হোত কে যেন ঘরে ঢিল ফেলছে। শ্রীঠাকুরকে ইনি দক্ষিণেশ্বরে দেখেছিলেন। বলেন,—এমন সুন্দর রূপ দেখিনি আর। আমরা প্রশ্ন করি সুন্দর মানে ফরসা—উনি ঠাকুরের বড় আকারের যে

ছবি ঘরে ছিল সেটি দেখিয়ে বলেন এটি ঠিক হয়নি। ফরসা খুব ছিলেন না— তবে এত অবর্ণনীয় মূর্তি দেখা যায় না। দেখেছি—দু'পা চ'লতে না চ'লতেই শ্রীঅঙ্গের বাস খসে' পড়ত আর হাত তুলে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন। মুখে স্বর্গের জ্যোতি আর তাতে লেগে আছে দিব্য এক টুকরো হাসি। দেখে ভুলতে পারা যায় না।

খুলনার এক গ্রাম, নাম প্রতাপকাঠি। সেখানে থাকতেন এক ফকির, আলেখ ফকির তাঁর নাম। কারো বাড়ী তিনি যেতেন না। দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া—শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রৌঢ় ফকির মুখে প্রসন্নতা ভেঙ্গে পড়ছে। একটি উঁচু আসনে বসে থাকতেন, কাছে থাকতো গোল গোল পাকানো মাটি। এই মাটি আর জলপড়া দিতেন যারা কোন অসুস্থতা নিয়ে যেতেন তাঁর কাছে। অযাচক বৃত্তি। তবে মা ভবতারিণীর মূর্তি ছিল প্রতিষ্ঠিত তাঁর মন্দিরে। পাশেই দু'টি কুটীর—সেখানে তিনি থাকতেন। ইনি ছিলেন বিবাহিত। তবে অসংসারী। বহু দূরের কথা, অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ইনি ঠিক ব'লে দিতে পারতেন। কথা খুব কম বলতেন। বেশীর ভাগ মৌন থাকতেন না হয় গান করতেন। দরিদ্রের গৃহে জন্ম। মায়ের কষ্ট দেখে একটি বন্ধ ঘরে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকেন একমাস। মা দেখা দিয়ে বলেন—আমায় প্রতিষ্ঠা কর —তুই যাকে জলপড়া দিবি সেই আরোগ্য লাভ করবে। ভগবানের কত যে লীলা—আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার সীমা পাওয়া দায়।

দুঃখ ভূমা

···পার্থিব সুখ কখন ভূমা—কখনও অসীম বা অনন্ত হ'তে পারে না। এবং এর দ্বারা ভগবৎ লাভ হয় না। কিন্তু দুঃখের পথে অসীমের একটা আলো পাওয়া যায়, দেখা যায় দুঃখকে আমরা যতই বাড়িয়ে যাই না কেন সেটা দুঃখই থাকবে। কাজেই অসীমের একটা আভাস এতে আছে। আর মানুষ যারা অমৃতের সন্ধানে চলেছেন, তাদের মধ্যে বেশীরভাগই একটা না একটা আঘাত, দুঃখ পেয়েই ছুটেছেন।··· ব্রহ্ম নিজে দুঃখ বা দহনের সূত্রে সৃষ্টি বিলসিত করেছেন। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা'—গীতা।··

সাধুর কথা

রমতা এক সাধু, নাম তাঁর শ্রীচতুর্ভুজ রামানুজ দাস। হাতে একটি কুঠার। সঙ্গে আছের শালগ্রাম, নিত্যসঙ্গী। মাথায় রামানুজী তিলক। সহজ সারল্যে শাস্ত্রকথা ব'লতে হ'য়ে যান আপনহারা, আর স্বভাবের মধ্যে তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে যাওয়া। সেদিন এসেছেন তিনি আশ্রম প্রাঙ্গনে। এবার এঁর পরিক্রমা ছিল নেপালের মুক্তিনাথ তীর্থ দুর্গম সে স্থান। বলেন মুঠব্বল থেকে পদব্রজে যেতে হয়। যাতায়াতে প্রায় দেড় মাসের এ যাত্রা। কঠিন পগডণ্ডী পথ—শুধু পায়ে হাঁটা কষ্টকর। সহযাত্রীরা বলেন, জুতোর প্রয়োজন হবে মহারাজ, —বাড়তি র'য়েছে একজোড়া নিন না দয়া করে। চতুর্ভুজজী বলেন, ভগবানকে দর্শন ক'রতে গেলে কৃচ্ছ্রতার দরকার—পাদুকার প্রয়োজন হবে না। আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি বলিষ্ঠ ভক্তিস্নিগ্ধ তাঁর গঠন। প্রকৃতই পাদুকাবিহীন হ'য়ে তিনি অতিক্রম করে এসেছেন দুর্গম মুক্তিনাথ তীর্থ।

কথা প্রসঙ্গে বলেন—শ্রীঠাকুরের কৃপায় অভাব হয়নি কোন দিন—দুঃখকষ্টও হয়নি কখনও। সেবার বদরীর পথ বেয়ে চলেছি—সঙ্গে রয়েছেন নারায়ণ। নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াই আমার চিরদিনের প্রথা—পথে কালীকমলীতে চাইলাম একটি টিকিট—তাঁরা বলেন সব টিকিট দেওয়া হ'য়ে গেছে আর উপায় নাই। কি করা যায়। এমনি চলেছি। পথে এক সন্ন্যাসী দিলেন দেখা। অনেকটা আটা এনে বলেন—আমি তো তৈরি জিনিস খাই আপনি মহারাজ এটি নিয়ে নিন। সাধুমূর্তি যেন সুদামাজীর মত। ক্ষীণ ছোটখাট শরীর আজানুলম্ব হাত, দেখি কি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন যান মিলিয়ে।

যাই হোক মুক্তিনাথে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি দেখে আসছেন ফিরে—তৃপ্ত তুষ্ট সাধু। মুঠব্বল ষ্টেশনে আসছেন সহসা পিছনে পড়ে ডাক। শুনতে পান, কেউ যেন পিছনে ডাকছেন, ওরে আমায় যে ফেলে গেলি। হতচকিত সাধু ফিরে চান—কারো নাই দিশা—সহসা মনে পড়ে শ্রীবিগ্রহের কথা—সঙ্গে সাথী ঠাকুরটিকে যে ফেলে এসেছি—ছুটে চলেন ফেলে আসা পথ বেয়ে। নিয়ে আসেন বুকে করে প্রাণের ঠাকুরকে। ১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এই ঘটনা।

১৩৬৪ সালের কথা—সেবার তীর্থঙ্কর সাধু ফিরে এসেছেন পুরী রথযাত্রা হ'তে। যাবার আগে কিছু পাথেয় প্রয়োজন ছিল। আশ্রমে ফিরে

এসেছেন তীর্থের প্রসাদ প্রসন্নতা নিয়ে। উৎসুক সমবেতদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ কিছু অনুভূতি হল? ঈষৎ হাসি হেসে বাবাজী বলেন,—পুরীর একটি মঠে আশ্রয় নিয়েছি সেবারকার মত, রাত্রি আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় ইষ্ট নামে আছি বসে, হঠাৎ মনে হ'ল পিছনে মন্দিরের দরজা খুলে কেউ যেন এলো। প্রথমে মনে হ'য়েছিল কোন চোরটোর হবে। কিন্তু তাকিয়ে দেখি, বিরাট পুরুষ স্বয়ং রামজী এসে দাঁড়িয়েছেন—মাথায় মুকুট। একটু বুঝে নেবার জন্যে কেউ জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজ,—রঙ কি রকম দেখলেন, সজ্জা কি রকম ছিল। সাধু বলেন, চরণ দিকে তত্‌টা নজর পড়েনি তবে শ্রীমুখের দিকে দেখলাম। রঙ শ্যামবর্ণ। আরো একটু যাচাই করার ছলে প্রশ্ন হয়,—মহারাজ আপনার কি মনে হল? উত্তরে বলেন—মনে আর কি হবে, আমার তখন অসীম রোয়াই জেগে উঠল, আমি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম। সবাই ছুটে এসেছে—কি পাগল হ'য়ে গেছি না স্বপ্ন দেখছি? এই ক্রন্দন আমার কিছুদিন ছিল। আধখানা বিশ্বাস নিয়ে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখে—সাধুর মুখে শুধু এক তৃপ্তির ছায়া।

তাঁর অন্য কথাগুলিও এই সঙ্গে দিচ্ছি। সেবার বোধহয় ১৩৬৫ সাল। ফিরে এসেছেন বৃন্দাবনধাম থেকে। যতবার আসেন কিছু প্রসাদ দেন। সামান্য সে বস্তু মনে হবে, তবু হয়ত থাকে গঙ্গাসাগরের কিছু পূতবারী, কিছু চরণ তুলসী, এমনি সব 'অমৃতলব' বস্তু। স্মৃতির ঝাঁপি আমরা খুলে বসলুম। সত্যিকার প্রাচীনপন্থী সাধুর দর্শন তো সুলভ নয়। সাধুজী বলেন—যমুনা পাড়ে সাধুরা জমায়েত হয়েছে নানা রকম সাধু সব জুটেছেন। কথার মধ্যে কথা ওঠে লাড্ডুপ্রসাদ যদি এসময় জুটতো; বেশ হ'ত। সাধুদের অনেক সময় শ্রীভগবানকে নিয়ে এরকম পরীক্ষার বিলাস তো দেখা যায়। কথার কথা হ'য়ে গেছে—হঠাৎ একজন ছোটখাট লোক এসে বলেন,—যমুনার ওপারে একবার যেতে হবে। সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। সাধুরা বলেন,—যমুনা পার হব কি ক'রে? আগন্তুক বলেন,—সে ব্যবস্থা আছে, নৌকা রয়েছে। ওপারে গিয়ে সাধুজী দেখেন এক বড় গাড়ীতে ক'রে কাপড়ে বাঁধা লাড্ডু। টুকরো টুকরো বহির্বাসের উপযুক্ত কাপড়ে প্রত্যেক সাধুর জন্য সে ব্যবস্থা। সকলের খুব আনন্দ—এই তো তাঁরা চাচ্ছিলেন। রামানুজজী লাড্ডুর কাপড় নিয়ে ফিরে দেখেন কেউ কোথাও নাই। রামজী নিজে যেন ভোজবাজীর মত গেছেন স'রে কিন্তু লাড্ডুর থলি সত্যিই পরম উপাদেয় মনে হ'য়েছিল।

শ্রীদুর্গা মা স্মরণে

পূজা পেতে হ'লে পূজা দিতে হয়। মরণজয়ী দেবী দুর্গাপুরীর জীবন আজ রামকৃষ্ণ চক্রবালে গেছে স'রে। দেবতার নির্মাল্য হ'য়েই তিনি এসেছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসরে জগন্নাথে সমর্পিত, অষ্টম বৎসরে শ্রীশ্রীমা'র কাছে তাঁর দীক্ষা এবং ত্রয়োদশ বৎসরে সর্বত্যাগের মন্ত্র তিনি মার কাছেই পান। মাতৃজাতির কল্যাণ মন্ত্র তিনি গৌরীমার কাছে পান। আর গৌরীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই দিয়েছিলেন এর নির্দেশ। আরো স্বামীপাদ বিবেকানন্দের অর্থানুকুল্যে তাঁর বি. এ. ও দুইটি তীর্থ পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। আজ যে সারদেশ্বরী আশ্রমে আশ্রিত চারিটা শাখায় বারশত কুমারীর বিদ্যার্জনের সঙ্গে ধর্মার্জনের সুবিধা আছে তার পিছনে দুর্গামার কি বেদনার নীরবতা জড়িয়ে আছে ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। নিমন্ত্রণ পত্রে কত যে আকুতি জমে উঠত তাঁর জ্যান্ত জগদম্বাদের সাহায্যের জন্য, সে কথা আজো অনেক গৃহেই অঙ্কিত আছে।

একদিনের কথা দুপুর গড়িয়ে গেছে—কলকাতায় পিচ্ঢালা রাস্তায় ল্যু চ'লছে। আমাদের আশ্রমের জনৈক ত্যাগী ছেলে চলেছে গাড়ীতে। সহসা কলকাতার কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থূল শরীরটাকে কোন রকমে টেনে চলেছেন দুর্গা মা। ছেলেটা তাড়াতাড়ি নেমে এসে প্রণাম জানিয়ে মাকে বলে,—একি। মা! হেঁটে চলেছেন কেন? বড় মধুর কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞাসার পরে মা বলেন ···"তুমি কে বাবা, মুখটিকে চেনা চেনা লাগছে।" সেবায়তনের পরিচয়ে আনন্দে যেন উছল হ'য়ে ছেলেটির মাথায় জপ ক'রে দিয়ে বলেন, "ভিক্ষায় বেরিয়েছি এই সীমানার কাছেই। গাড়ীর প্রয়োজন হ'বে না বাবা।" আশ্রমে এসেছেন অনেকবার - সারদা রামকৃষ্ণের কথার গঙ্গাধারা ব'য়ে গেছে উপলমুখে। আশ্রমবাসীদের ক'রেছেন কত আশীর্বাদ, দিয়েছেন পথচলার কত নির্দেশ আর পাথেয়। দীক্ষাপ্রার্থীদের এই আশ্রমের উদ্দেশে দিয়েছেন ফিরিয়ে—বলেছেন, 'ওখানেই নেবে বাবা।' আশ্রমের কন্যাদের বলেছেন—"আশ্রমের Descipline নিয়ম সব মেনে চলবে।" আর বলেছেন, "কেমন সব হাসি মুখ, জ্যোতি বেরুচ্ছে।" আর একদিন এসেছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের উৎসবে, শরীর কাতর তবু এসেছেন। বলেছেন, আমার বাবার জায়গা, তাই না এসে পারি না। কোনদিন এসে মায়েদের বলছেন, "তোমরা

দেবকন্যা।" আশ্রম থেকে ব্রহ্মচারীরা গেলে প্রসাদ তো দিতেনই, পূজাবস্তুও দিতেন আর বলতেন, 'দিব্য-ভাবে থাকবে। মা'কে ধ'রে, এই গো-পালকে ধ'রে থাকবে'—এমনি কত কথায় যে ভক্তরা পেত পথের নির্দেশ ও শক্তি। আজ শুধু মনে হয়—একে একে নিবেছে দেউটি।

লক্ষণ সাধু

পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলে, অসুস্থ সে বেশই। সে সময় রোগের প্রতিকার এত সহজ ছিল না। তাই দৈবের আশ্রয় নিতেই হ'ল তাকে। সে শুনেছিল ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জের মাঝখানে পাগলা বলে একটি স্থান আছে। সেখানে প্রায়ই থাকেন এক যাট বছরের বৃদ্ধ। জাতে তিনি অতি খাটো, দেখতে তেমনি নিকষ কালো। তবে সিদ্ধপুরুষ। যাকে যা ব'লে দেন তারই সফল হয়। তবে সেই পাগলা নামে সেই স্থানটিতে তিনি সবসময় থাকেন না। একান্তে তাঁর জীবন যেখানে খুশী থাকে পড়ে—পাগলা দেশের যে এক অদ্ভুত পাগল। পরণে একটিমাত্র কাপড় তা কি শীত কি বর্ষা। আর সে কাপড় কোনদিনই ছাড়েন না, বদলানও না। একেবারে ছিঁড়ে গেলেই দেন ফেলে। অন্য কাপড় দিলেও নেন না। পয়সা কড়ির তো কথাই নাই। মাথায় থাকে একটি হাঁড়ি। তাতেই থাকে খাবার জিনিস কিছু; এঁরই নাম শঙ্কর সাধু। তিনি যা বলতেন তাই সব এক সঙ্গে রান্না করে প্রথমে দু'টি কাককে ডাকতেন তারা খেয়ে গেলে অন্য কেউ থাকলে তাকে দিয়ে নিজেও খেতেন। আনন্দ জ্যোতিষী বলে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী—সেই ছেলেটিকে ব'লেছে এক বৎসরেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ছেলেটি তাই মরিয়া হ'য়েই বেরিয়ে প'ড়েছে দৈবের কৃপাভিক্ষা ক'রতে।

সেটা পৌষ মাস, পাতা ঝরার পালা। তারি মত প্রকৃতির শীতার্তরূপ। সহসা চ'লতে চ'লতে দেখে একস্থানে গাছগুলি হ'য়ে গেছে নব মুকুলিত যে কোন অজানা দক্ষিণায় আর কোয়েল-দোয়েলের ডাকে মুখরিত সে স্থান। আশার আলো জলে উঠলো দুই চোখে, এই স্থানেই মিলবে সেই দিব্য পুরুষকে।

বৃক্ষচ্ছায়ে বসে আছেন সেই পুরুষ। কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রেই ছেলেটি বলে তার কথা। দিব্যপুরুষ মৃদু হেসেই বলেন, "সব মিথ্যাকথা—তোর কিছুই হবে না। পাঁচটি লেবু খাবি তাতেই সেরে যাবে।" কথা তো নয় যেন সত্যদ্রষ্টার মন্ত্র। ছেলেটি আজ প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে। তারই কাছে এ ঘটনা শোনা।

আর একটি ঘটনা না ব'ললে পুরো বলা হবে না। জনৈকের পিত্তশূল হয়েছে। পূর্বের কাহিনী শুনে সেও গেলো সেই দিব্য পুরুষের কাছে। তিনি ব'ললেন একমাস ধরে লেবু খেতে হবে। ভদ্রলোকের হ'ল ক্ষোভ। অন্যের বেলা পাঁচটি লেবু তার বেলা একমাস। কয়েকটি খেয়েই দিল ছেড়ে—অবিশ্বাসের এমনি মোহ। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুরের বলা গল্পের একব্যক্তি যাবে সাগরপারে, বিভীষণের কাছে গেলেন। তিনি একটি রামনাম লেখা কাগজ মুড়ে দিলেন, এই নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে যাও। কিন্তু মাঝপথে আসে অবিশ্বাস আর তার ফলে মাঝ সমুদ্রেই গিয়েছিল তলিয়ে। এ ভদ্রলোকও মৃত্যুর অতলে গিয়েছিলেন ডুবে। বাংলার এমনি গহনে গোপান কত যে সাধু সন্ত মিলিয়ে গেছেন—মহাকালই তার সাক্ষী।

৬ডাঃ সত্যসাধন মুখোপাধ্যায় ডি. এস্. সি.

মহাকালের প্রয়োজনে কৃতি সন্তানরা আসেন আবার তাঁর ইঙ্গিতেই যান চলে। প্রায় সঙ্ঘবদ্ধভাবেই হয় শ্রীঠাকুর ও তাঁর পার্শ্বদদের আবির্ভাব ও তিরোভাব; মহাত্মাজীর ও তাঁর সহকর্মীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব এমনি ভাবেই ঘটেছে। রাশিয়ার ভিসিনস্কি, পোলাণ্ডের রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা লুব্যর্ক, বাংলার শিল্প বিভাগের পরিচালক ডাক্তার এস্, এন্, গাঙ্গুলি ও দিল্লীর কৃষি কলেজের কীটতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সত্যসাধন মুখোপাধ্যায় এঁরা একই রোগে ও প্রায় সমকালেই পরলোক গমন ক'রেছেন। মহাকালের প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিশ্চয় কিন্তু আমাদের পৃথিবী যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে এ বিষয়ে মতানৈক্য নাই।

মাতা কাশীশ্বরীর শ্মশান তপস্যার ফলেই সত্যসাধনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এক সিদ্ধপুরুষের আশীর্বাদে এঁর জন্ম। পরবর্তীকালের দিব্য কর্মময়

জীবন শ্রীভগবানের ও মহাপুরুষের আশীর্বাদেরই ফল। ১৯০০ সালের শ্রাবণে এঁর জন্ম হয়।

গৃহে ধর্মানুষ্ঠান শিশুদের ধর্ম জীবনের ভিত্তি। এঁর ধর্মানুরাগের অঙ্কুর এইভাবেই হ'য়েছিল। কোন 'আনন্দ' পরিবেশেই ইনি পূর্ণভাবে দিতে পারতেন না যোগ, অতি শৈশবেই। আনন্দ পরিবেশে ব'সেও পরীক্ষার কথা চিন্তা করতেন। বিবাহের বিতৃষ্ণা সেই শৈশবেই ছিল প্রবল; যদিও পিতামাতা ও পিতামহীর ইচ্ছায় ষোড়শ বৎসরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হয়।

১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ক্রমে এম. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে ইনি পুসা কৃষি কলেজে উচ্চ উপাধির জন্য যোগদান করেন। আর সেই কলেজে পাঠদ্দশায় তিনি একটি Thisis লেখেন। এটি তাঁর ইচ্ছাক্রমে ইংলণ্ডে ও জার্মানীর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের নিকট পাঠান হয়। তাঁরা বৎসরাধিক ধ'রে এটি পরীক্ষা করে তাঁকে ডি. এস. সি. উপাধির উপযুক্ত বিবেচনা করেন। বলাবাহুল্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যায় ইনি প্রথম ঐ উপাধি লাভ করেন এবং এই উপাধি তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বলে তাঁরা ঘোষণা করেন।

পরবর্তীকালে Tropical School of Medicine-এ জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ে বহু গবেষণা করেন ও D. T. M.-এর ছাত্রদের অধ্যাপনাও এই সময় করেন। এই সব গবেষণার ফল বহু Medical পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর ইনি করাচীতে Locust station-এ Superintendent হিসেবে গমন করেন। এই পদে থাকাকালীন বহু বিপদের সম্মুখীন হন। আরব সমুদ্রে, সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমিতে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফ্রিদিদের সম্মুখে ও নানা অবস্থান্তরে এঁর শ্রীঠাকুরের প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রণোদিত সাহস এঁকে রক্ষা করে। এরপর ইনি নয়াদিল্লীতে গবেষণা কার্যে রত হন। শেষ জীবনে সাময়িকভাবে ইনি নিজ বিভাগের সর্বময় কর্তা হিসাবে উন্নীত হয়েছিলেন। কর্মজীবনে উন্নতিতে ইনি কোন দিনই হীন উপায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও এই নীতিতে উন্নতির অবকাশ বর্তমানে অতি সামান্য। এঁর গবেষিত বিষয় পঁয়তাল্লিশটি। পাশ্চাত্যের Current Science, Nature প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় মৌলিক গবেষণা হিসাবে এগুলি প্রকাশিত হয়। British Museum, Japan University, Bristol University, Berlin University, Iowa University, Cambridge University, Sydney University, Washington University, Academy of

California, Algiers University, Rostok University, Schools of Tropical Medicine, London ; Newyork University, National Research Institute, France ; Yugoslovia's School of Public Health ; Institute of Plant Pathology, Rothamasted প্রভৃতি পুস্তকাগারে এগুলি গৃহীত হ'য়েছে। Dr. A. D. Imms-এর Text Book of Entomology পুস্তকে এঁর গবেষণা উল্লিখিত আছে। দেহান্তের পরও কতকগুলি অপ্রকাশিত গবেষণা অর্ধ সমাপ্তিতে র'য়েছে। ইনি যে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন সেই 'Systematic Entomology'-তে বর্তমান ভারতে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা মাত্র ২।৩ জন।

এঁর বহু ছাত্র কেম্ব্রিজ, লণ্ডন প্রভৃতি ইউনিভার্সিটিতে Ph. D. প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছেন। ইনি এক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post Graduate-এ Zoology-র পরীক্ষক ছিলেন ও বর্তমান Aligarh বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এস্. সি. পরীক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি Federal পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য চর্চা এঁর বাল্যেরই সাধনা ছিল। শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'অর্চনা' পত্রিকায় এঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর 'বসুমতী', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'দেশ', 'ভাবমুখে' প্রভৃতি পত্রিকায় এঁর লেখা প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত রচনা এঁর এক বিশেষ অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত এঁর দ্বারা বিশেষ পুষ্ট হয়েছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ চরণতলে সব করেছি সমর্পণ', 'দিনফুরাল সন্ধ্যা হ'ল রামকৃষ্ণ জপজী' প্রভৃতি সঙ্গীত বহুল সমাদৃত। দ্বিতীর সঙ্গীতটি বর্তমানে দক্ষিণ কলিকাতা Scout Zambory-তে গীত হ'বে ব'লে গৃহীত হ'য়েছে। এইসব গীত নানা দুর্গম পরিস্থিতিতে লিখিত হ'য়েছে। কখন মরুভূমির জনহীন প্রান্তরে, কখন আরব সমুদ্রে, কখন অসহায় অবস্থায় রোগশয্যায়। এইসব সঙ্গীতের প্রেরণা শ্রীঠাকুরের দান। ইনি কবিখ্যাতি লাভে চেষ্টিত ছিলেন না সেই কারণে অধিকাংশ লেখা অপ্রকাশিত আছে।

ধর্মজীবনে ইনি এক বিশেষ আদর্শ দিয়ে গেছেন। বাল্যেই বেলুড়মঠ ও স্বামীপাদগণের কাছে যাতায়াত ছিল। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য ব্রতে বিধিবৎ দীক্ষিত হন। আহারাদি বিষয়ে এঁর সংযম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সন্দেশ মিষ্টান্নাদি ইনি এই কারণে ত্যাগ করেন। স্বামী অভেদানন্দের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্বেই করেন। ধর্মজীবন যাপনের ইনি একটি নীতি রাখতেন সেটি এই যে, "শ্রীঠাকুর আমাদের বেশী সময় দেন নি

তাঁর চিন্তায় থাকতে, সংসারের কর্মজড়িত জীবনে আমাদের যেটুকু সময় আমরা দিতে পারি সেটুকু সময় যেন "Pin Point Focus করে তাকে ডাকি।"

"Pin Point Foucs" এটি বিজ্ঞানের ভাষা। এর অর্থ শ্রীঠাকুরের একটি সূক্ষ্ম দেহাংশে মনকে অন্য বিষয় হ'তে সরিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যও যুক্ত রাখবার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। সে যতটুকু সময়ই হোক না কেন তাতেই শ্রীঠাকুরের কৃপা পাওয়া যাবে।

তিনি Task master-এর মত সময়ের পরিমাণ দেখেন না, দেখেন আমাদের নিষ্ঠা। জীবনে বহু দিব্য স্বপ্নে ইনি ইষ্টদর্শন করেন এবং তিনবার ঠাকুরের দিব্য স্পর্শ লাভ ক'রে ধন্য হন। স্বামীজি মহারাজকে ইনি একবার না দেখেও দার্জিলিং আশ্রমের বর্ণনা দেন ; স্বামীপাদও এঁকে Psychic শক্তির অধিকারী ব'লেছিলেন। শ্রীঠাকুরের শক্তি ধারা এক বিশেষ দিনে এঁকে শক্তিমান ক'রে তুলেছিল। তাই দেখি বিজ্ঞানের উচ্চচিন্তার মাঝেও প্রায়ই মধ্যরাত্রে বসে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতেন। নিত্য কথামৃত পাঠ ও অশ্রুর অভিষেকে পূজা এঁর নিত্যকর্ম ছিল। কর্মের মাঝেও দেখা যেত ধ্যান করছেন, নিজের কর্মস্থলে। সহকর্মী ও অন্যেরা একথা বুঝতেন না। এঁর দেহান্তে তাঁরা সেকথা বুঝতে পারেন ও Dr. Pradhan প্রভৃতি অন্যান্য সহকর্মীরা বলতে বাধ্য হন "Now we can understand Dr. Mukherji was an extremely pious man"। দেহান্তের কয়েকদিন আগে এঁর দিল্লীর কালী-বাড়িতে মার এক দিব্যদর্শন লাভ হয় ও তখন সজলনেত্রে সবাইকে ব'লতে থাকেন "আমার কিছু ভাল লাগছে না"এর পর তিনি শেষ মাতৃবন্দনা লেখেন—

মা

যদি রেখেছিস মা চরণ দুটি
পরমসুখে হরহৃদে
তবে ছেলের বুকে রাখতে চরণ
কে তোরে গো রাখে বেঁধে॥
কালাকালের পরম কারণ
(মেয়ে) চরণে তোর রইল পড়ে
(শুধু) ছেলের কাছে আসতে গেলে
চরণ সরে মরি খেদে।
কেন থাকিস মাগো ছেলে ভুলে
এই কি মা তোর মায়ের ধারা

ধুলো মাখা হলেই ছেলে
হয় মা সে কি মাতৃহারা ॥
(তাই) ডাকি মাগো তোমায় শ্যামা
চোখের জলে কেঁদে কেঁদে
(মাগো) জাগবি কবে ছেলের বুকে
রাখবি চরণ নিজেই সেধে ॥

এর পরেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার বৈকালে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত কিছু আলোচনার পর ইনি "Coronary thombosis" হৃদরোগে অক্রান্ত হন। তাঁর ছাত্ররা পালাক্রমে নার্সিংহোমে সেবার ভার গ্রহণ করেন। এইসব ছাত্রদের অনেকেই বিদেশের উচ্চ উপাধিধারী। মৃত্যুর কিছু আগে সহকর্মী Dr. Pradhan যখন আরোগ্য সান্ত্বনা দিতে থাকেন, তখন তিনি নির্ভীক উত্তরে তাকে স্তম্ভিত করেন—"If the mission of God is fulfilled I am prepared."

অসুস্থ অবস্থায় এঁকে প্রাণায়াম ও চোখ বুজে জপ ক'রতে দেখা গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ কোন কথাই ইনি বলেন নি। জীবনের শেষ প্রার্থনা ছিল গঙ্গার তীরে আশ্রম নিকষে বসে ধ্যান সমাহিত হ'য়ে দেহত্যাগ ক'রব—বোধহয় সেই প্রচেষ্টায় একবার বসবার চেষ্টা করেন ও সবাইকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

গৃহে থেকেও অগৃহী—এইসব জীবন ধন্য—এঁদের মরণ অমরতার নামান্তর। বিখ্যাত দার্শনিক Pringle Patison-এর কথায় ব'লতে হয়, "এমন একজনেরও অন্তর্ধানে বিশ্বের মূল্য হ্রাস হয়ে যায়।" "Ruin of even a single individual life would lesson the value of the Universe."

আজ যে জীবন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তী, তাঁর অমর আত্মার নিকট আমাদের প্রার্থনা—যেন এই ধূলার ধরণী যোগ্য সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়।

কেশবের সান্নিধ্যে

গঙ্গা-যমুনা ব'য়ে যাচ্ছে সেদিন—কথার সে গঙ্গা-যমুনা—সুরধুনীর সুরে মিশে যায় সে সুর। কাছে আছেন ব্রাহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র। কেশবের ইচ্ছা মায়ের কথা শুনেন, শ্রীঠাকুর ব'লে চলেন মা'র কথা। তিনি সাকার, আকার, নিরাকার আরো কত কি। ভাবগঙ্গা ভেসে চলে আর ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভক্তকে। সহসা লুটিয়ে পড়েন শ্রীঠাকুর—আর ব্রহ্মানন্দ। বলেন,—দেখতে পাচ্ছনা—মা সমস্ত জুড়ে আছেন। জগৎটা যেন জ'রে র'য়েছে তাঁতে—যেমন বর্ষায় সমস্ত জ'রে থাকে—আবার লুটিয়ে পড়েন ঠাকুর যন্ত্রণায় অঙ্গ বিবর্ণ, চোখ দিয়ে দেখিয়ে দেন কাঠুরেকে। কাঠ কাটবার জন্য সে গাছে উঠেছে। কাঠে ঘা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুর চীৎকার করে উঠেন,—কেটে ফেল্লে, আমার মাকে কেটে ফেল্লে। ব্রহ্মানন্দ এখন অন্তর দিয়ে বুঝতে পারেন সর্বভূতে মাতৃদর্শন কি বস্তু—। এমনি নানাভাবে শ্রীঠাকুরকে দেখে ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরকে নিজ গুরুপদবীতে করেন গ্রহণ। নিজের খাসগৃহ কমলকুটীরে প্রত্যেক ঘরে নিয়ে যান শ্রীঠাকুরকে আর প্রত্যেক ঘরে তাঁর চরণের মঙ্গল চিহ্নটি নেন এঁকে।

এই কেশবই বলেছিল এক কথার মধ্যে পরমকথা,—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত এমন বড় লোক আজ জগতে বিরল। এঁদের শরীর গ্লাসকেসে ক'রে রাখতে হয়, না হ'লে থাকে না। সব যুগেই এক কথা। মহাপ্রভুর দেহও এমনি গ্লাসকেসে রাখবার মতই ছিল—খুব সাবধানে না রাখলে এঁদের ধ'রে রাখা যায় না।

একটি দিব্য দর্শন

কলকাতার ইডেন হস্‌পিটাল পল্লীর একটি গৃহকোণ—সামনে হোম সমিদ্ধ—বসে আছেন এক সীমন্তিনী—ধ্যান নিবিষ্ট। সহসা প্রকাশিত হয় এক দিব্যসত্ত্ব। শুচি স্নিগ্ধতার রূপ। হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। মনে হয় যেন সমস্ত দেহে জড়িয়ে র'য়েছে একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি! কি যেন বলেন, কি যেন তার কথা অবুঝ সে বাণীর মধ্যে র'য়েছে শান্তি, অমৃতের একটি ফুট। দীর্ঘ ছন্দের দেহে দিব্য এক সুষমা।

এই দিব্য দর্শনের সঙ্গে আরো দর্শন যায় জড়িয়ে। সহসা কল্যাণীর

মনে পড়ে বহু পূর্বের মার কাছে শোনা একটি কথা। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার একটি ঘটনা।

অমঙ্গলের পথে কেমন ক'রে যেন মঙ্গল আসে—সেদিন ছিল শ্রাবণী রবিবার। খাওয়া দাওয়ার কিছু বাচ-বিচার হয়ই সব সংসারে। ঢাকার একটি গ্রাম,—জমিদারের বাড়ীতে সেদিন মুগ ভাজা হচ্ছিল সেই পর্যায়ে। জলন্ত উনুনের ধারে একটি কড়া চাপান ছিল আর সামনে রাখা ছিল মুগগুলি। মেয়েটিকে নিয়ে তার পিসতুতো দাদা এসেছে মুগ চুরির অভিসন্ধিতে। নির্দোষ শিশুটি যায় প'ড়ে সেই উত্তপ্ত কড়াটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে পা'টি যায় পুড়ে। পরের দিন ছিল হাটবার। দাদামশায় শিশুটির অবস্থা সুবিধার নয় দেখে এক দিব্য ফকিরের কাছে যান। হাটবারে তাঁর আসার কথা। ফকিরের সঙ্গে কি কথা হ'ল কে জানে। হাট হ'তে এল একটি বড় রুই মাছ। দাদু শিশুর মাকে ব'ললেন, মেয়ে বাঁচবে তবে ফকির সাহেবের কথামত কাজ ক'রতে হবে। উনানটি ভালভাবে নিকিয়ে পবিত্রভাবে নূতন হাঁড়িতে মাছটি রাঁধতে হবে। তবে তার কোন অংশই ফেলা যাবে না। সেই মাছের সঙ্গে চাল ডাল আনাজ পত্র সব একসঙ্গে দিতে হবে। রান্নার দিকে কারো নজর পড়বে না, কেউ হাসতে পাবে না, কেউ থুথু ফেলতে পাবে না। আর মুখে কাপড় দিয়ে রান্না ক'রতে হবে যাতে গন্ধও না নাকে যায়। এরপর রাত্রে ভিতর বাড়ীর উঠানে সেই অন্ন রাখা হ'ল। ফকির সাহেব এসে ব'সলেন অন্ন গ্রহণ ক'রতে। তিনটি গোটা কলাপাতায় অন্ন ঢেলে দিলেন সিদ্ধ ফকির। তারপর ডাক দিলেন —"আয় সব আয়"। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর, শিয়াল, বিড়াল সব দলে দলে এসে উপস্থিত। শিকল বাঁধা যে সব কুকুর ছিল তারাও শিকল ছিঁড়ে এসে হাজির। বারান্দায় বৃদ্ধ পিতামহ জপের মালা হাতে মুদ্রিত চোখে আছেন বসে, আর মাতা ভয়-ত্রস্তে জানলা দিয়ে নির্বাক দুই চোখ মেলে সব দেখছেন। এদিকে সিদ্ধ সেই ফকির বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলেন আর উন্মত্তের মত হাসেন। খাওয়ার পর আবার শোনা গেল—"যা-যা সব যা"। আর আশ্চর্যের কথা সবাই যে যার চলে গেল। এরপর পাতাগুলি হাঁড়িতে ভ'রে ফকির সাহেব সেগুলি ভিতরের পুকুরের মাঝখানে ফেলে দিলেন। হাত মুখ ধুয়ে শিশু মেয়েটিকে আনতে বললেন। দাদুর কোলে চড়ে এলো বেদনার্ত শিশু"। ফকির সাহেব হাসিতে উচ্ছল। বললেন—"অনেক দিন বাঁচবে কাজ আছে। কোলে নিয়ে তিনটি ফুঁ দিলেন আর ঝুলি থেকে একটি মলম বের ক'রে দিলেন, বললেন—"তিনদিনেই ঘা ভাল হবে, যদি

না হয় তবে সাতদিন পর্যন্ত তিনি সাত মাইল দূরের এক বটতলায় থাকবেন তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।" তবে সে প্রয়োজন হয় নাই। মেয়ে সম্পূর্ণ নীরোগ হ'য়ে গিয়েছিল এমনিই।

সেই সিদ্ধ মহাত্মাই কি আজ এসে দাঁড়িয়েছেন মৃত্যু-মন্ত্রে কাঁপা এই হোম গৃহে।

আমাদের চেনা জানা রাজ্যের পারে যে রহস্যগহীন রাজ্য আছে তার কথা, তার বাণী ছিটকে পড়া তারার মতই মাঝে মাঝে এসে পড়ে আমাদের সম্বিতের দ্বারে। আর তার অর্থ চিরদিনই মূক।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে

নূতনের বরণ কঠিন তবে অতীতের স্মরণও সহজ নয়। বিশেষ প্রগতির যুগে।

অতীতের স্মরণই পূজার পর্যায়ে এসে পড়ে···পূজার প্রথা ক'মে যাচ্ছে তাই অতীতের স্মরণ নিরর্থকের পর্যায়ে পড়ে। পুরাতনের পূজারী আমরা আজ স্বামীপাদের জন্মতিথি স্মরণে তাঁর মঙ্গল আবির্ভাব তিথিতে তাঁর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা আলোচনা ক'রব।

ঠাকুরের অদর্শনের পর তখন স্বামীপাদের বয়স হবে বিশ। এই বয়সে একটি কম্বল, দু'টি বহির্বাস, একটি কমণ্ডলু সম্বল ক'রে চলেছেন পুরীর পাহাড় জঙ্গলে। সহসা একজন পাহাড়ী এসে তাঁদের ফিরিয়ে আনে—সেটি ভয়ের জঙ্গল। বাঘের ভয় বেশ সেখানে।

আবার একবার এলাহাবাদের কিছু দূরে একটি গুহায় আছেন। স্বামীপাদ তপস্যা নিরত আকাশবৃত্তি অবলম্বনে। শ্রাবণের জলধারে একদিন সমস্ত ছেয়ে যাচ্ছে, আহারের নেই কোন সংস্থান। সঙ্গে একজন সাধু ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা কিছু ভিক্ষাদি ক'রে আনেন। কিন্তু স্বামীপাদের তখন অজগর-বৃত্তিমুখী মন। বলেন, শ্রীঠাকুরই এখানে খাবার এনে দেবেন। খানিক পরে দেখা গেল দু'জন ভদ্রলোক ঠোঙ্গায় ক'রে ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকারী, এনেছেন—শ্রীঠাকুরই পাঠিয়ে দিয়েছেন—'যোগক্ষেমংবহাম্যহম্' গীতার এই কথা ফলবতী তো হ'তে হবে।

আর একবার মিরাটের কাছ দিয়ে তুলসী মহারাজ ও স্বামীপাদ চ'লেছেন—রাত্রি নটার সময় একটি নির্জন বাগানে এসে এঁরা আসন বিছালেন। তুলসী মহারাজের ইচ্ছা ছিল পথে মন্দিরে প্রসাদ সংগ্রহ করে নেবেন, কিন্তু স্বামীপাদ দেন বাধা। আমার যেখানে মাপা আছে সেখানে পাবো। ঘণ্টা খানেক সেই নির্জন বাগানে থাকার পর এক শেঠ তাঁদের প্রচুর খাবার দিয়ে যায়।

আর একদিন মিরাটের আর একটি নির্জন বাগানে কিছুদিন ছিলেন। হঠাৎ কে যেন বলে "অনেক দূরে স'রে বস"। তিনি তাড়াতাড়ি অনেকদূরে গিয়ে বসলেন। খানিক পরে এক দমকা হাওয়ায় কাছের একটা বড় দেওয়াল পড়ে যায়। কাছে থাকলে তাঁর দেহ চুরমার হ'য়ে যেত।

স্বামীজি মহারাজ নিউইয়র্কে একটি Quaker সম্প্রদায়ের মহিলার বাড়ীতে থাকতেন। একদিন তিনি বাইরে গেছেন। সেখানে সন্ধ্যায় ফিরছেন এমন সময় একজন Professor-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রায় পনেরো মিনিট দেরী হয়। ফিরে দেখেন তাঁর বাড়ীর ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে। পনেরো মিনিট আগে এলেই তাঁর সর্বনাশ হ'ত। তখন সেই Quaker সম্প্রদায়ের মহিলাটি যুক্ত করে সজলনেত্রে প্রার্থনা করেন আর বলেন—তোমার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ প্রার্থনা ক'রেছিল।

সুইজারল্যাণ্ডে একবার তিনি বেড়াচ্ছেন—রম্য প্রকৃতির দৃশ্যে একান্ত মগ্ন হ'য়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময় কে যেন হাত ধ'রে সেখান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড বড় পাথরের চাঙড়া গড়িয়ে সেখানে প'ড়ল, আর একটু দেরী হ'লেই তাঁর অস্তিত্ব থাকত না।

প্রথম পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের সুরু যখন হয় তখন স্বামীজি বিলেতে। জাহাজে ক'রে মধ্য ইউরোপে যাবার জন্য টিকিট ক'রতে যাচ্ছেন। যে জাহাজে উঠবেন সে জাহাজের নাম লুসিটানিয়া। দুদিন বাদে জাহাজ ছাড়বে। কে যেন জানিয়ে দিলে আসন্ন বিপদের কথা। আর সে জাহাজে চড়েননি স্বামীপাদ। পরে জার্মাণ জাহাজের ধাক্কায় সে জাহাজ ডুবে যায়।

বেদান্ত সমিতির বড় বাড়ীতে তখন আশ্রম সরিয়ে আনা হ'চ্ছে—কিন্তু আসবাবপত্র কিছুই নাই; টাকা পয়সা স্বামীজির হাতে নাই যে কিনবেন। সহসা এক আমেরিকান মহিলা এসে সব কিনে দিয়ে গেলেন।

ত্রিগুণাতীত স্বামী একবার তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে চলেছেন। নির্ভর শুধু

ভগবান, আর তাঁর নাম। রাত্রি এসে নেমেছে, তার উপর নেমেছে আষাঢ়ের ধারা। পথের রেখা গেছে মুছে। নিরুপায়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে প'ড়ে রইলেন পথের পাশে। দেখা গেল ষ্টেশনের দারোয়ান অযাচিতভাবে এসে হাজির হ'য়েছে। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে নিজগৃহে যায় নিয়ে।

আর একবার ত্রিগুণাতীতজী মানস-সরোবরের তীর্থপথের যাত্রী। পথ তখন আজকার চেয়ে ছিল দুর্গম। একদিন পথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সামনে চেয়ে দেখেন একটি কাঠের পুরানো ভাঙ্গা সেতু। ম্লান-জ্যোৎস্নায় সাহস ক'রে মহারাজ এগিয়ে চলেন। যেখানে যেখানে ভাঙ্গা সেই সেই জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন। হঠাৎ, মেঘে অন্ধকার ক'রে ফেলে চারিদিক। মহারাজ সামনের পথ দেখতে পান না। দাঁড়িয়ে আছেন। সহসা দিব্যকণ্ঠে শুনেন "আমায় অনুসরণ কর।" সেই দিব্যবাণী অনুসরণ ক'রে সে যাত্রা আসন্ন-মৃত্যু থেকে উদ্ধার পান।

স্বামী সুবোধানন্দ একবার ফল্গুনদী পার হবেন। সেটা ভাদ্র মাস, মহারাজ জানতেন না। সহসা ফল্গুতে সাঁতার জলের বাণ এসে গেছে। তিনি ডুবে যেতে বসেন। সঙ্গে আর একজন নদী পার হচ্ছিল। তিনি তাঁকে মঠে সংবাদ দেবার কথা জানিয়ে শেষ মুহূর্তে শ্রীঠাকুরের চরণে শেষ প্রণাম জানান। শেষ প্রণামের পর তিনি জলে ডুবে যান। কিন্তু শ্রীঠাকুর যখন রক্ষা করেন, তখন যে মৃত্যু হ'য়েও হয় না। কে যেন সেই জলমগ্ন অবস্থায় তাঁকে উপরে এনে নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ শ্রীঠাকুরের ঈশ্বরকোটীর থাকের ভক্ত। শ্রীঠাকুর বলতেন বিষ্ণুর অংশে জন্ম। শ্রীঠাকুর এঁকেই ভাবে দর্শন করেন—দৌড়াদৌড়ি খেলা এই সব করেন। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর এঁর যখন বয়স তখন একবার মরণাপন্ন ব্যাধি হয়। প্রেমানন্দ মহারাজ তখন এঁর শয্যাপাশে ছিলেন; তিনি ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বলেন, "শ্রীঠাকুর এঁর পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন। ছেলেরা সব ছোট ছোট তাই।" বলাবাহুল্য সে যাত্রা পূর্ণচন্দ্র সুস্থ হ'য়ে উঠেন।

সেবার স্বামী সারদানন্দ কাশ্মীরের যাত্রী। রাওলপিণ্ডির পথে চলেছেন এক ঘোড়ার গাড়ীতে। গাড়ীও চলেছে তীব্র গতিতে, সহসা মোড়ে আর একটি গাড়ী আসায় তাঁর গাড়ীখানি নীচে প'ড়ে যায় আর দ্রুতগতিতে পড়তে থাকে। আর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একটি পাথর পড়তে থাকে পিছনে। ধীর স্থির সারদানন্দ মহারাজ গাড়ীর মধ্যে চুপ ক'রেই বসে থাকেন। নীচে মাঝপথে একটি গাছ ছিল। গাড়ীটি সেই গাছে বাধা পায় আর তাইতে সে যাত্রা শরৎ মহারাজ রক্ষা পান।

স্বামী তুরিয়ানন্দের জীবন ছিল তপস্যার মহিমায় চির উজ্জ্বল। স্বামীজির আকুতিতে গ'লে গিয়ে মার্কিনে যেতে রাজি হয়েছিলেন। শান্তি আশ্রমে প্রথম দিকে ছিল অরণ্যের অব্যবস্থা। সেই সময় ধ্যানাবস্থায় এক বিষাক্ত কীট তাঁকে দংশন করে। স্থিতপ্রজ্ঞভাবে ধ্যানমগ্ন থাকলেন। কিন্তু হাতটি ধীরে ধীরে ফুলে উঠতে থাকে। সহসা দেখা গেল সেই দুর্গম প্রদেশে চল্লিশ মাইল পদব্রজে অতিক্রম ক'রে এসে পড়েন এক মার্কিন ভক্ত। সঙ্গে তার কিছু ওষুধও ছিল। শ্রীঠাকুরের কৃপার দান সেই ঔষধে এই দুর্গমপুরে মহারাজ রক্ষা পান।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ সালে। ছয় বৎসর কাল ঐ মঠে তরুণ সাধকের দল তপস্যার অগ্নিপরীক্ষায় অতিবাহিত করেন।

তখন আহারাদির ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। তপস্যার চেষ্টায় সে বিষয়ে খেয়ালও থাকত না এইসব অগ্নিতুল্য সাধকদের।

একদিন আহারের কোন সংস্থান নাই। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দেখ আজ আমরা আহারের কোন চেষ্টাই ক'রবো না, দেখবো আজ ঠাকুর আমাদের সে ব্যবস্থা করেন কিনা।' কীর্তন সুরু হল, সারাদিন যায় রাত্রিও তখন অনেক। এমন সময় দরজায় ঘা পড়ে, দরজা খুলে দেখেন নিকটে গোপালের মন্দির থেকে প্রচুর মালপুয়া এসেছে।

স্বামীপাদ রামকৃষ্ণানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠে। শ্রীঠাকুরের উৎসব আসন্ন কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। মধ্যরাত্রে দেখা গেল শশী মহারাজ অন্তরের আকুলতা জানাচ্ছেন শ্রীঠাকুরের কাছে। পরের দিনই জনৈক অনুরাগী প্রচুর অর্থে সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

আর একদিনের কাহিনী স্বামীপাদ কর্মব্যাপদেশে গিয়েছিলেন আশ্রমের বাইরে। শ্রান্তক্লান্ত দেহে এসে দেখেন যে শ্রীঠাকুরের ভোগের কোন ব্যবস্থাই নেই। তিনি মন্দির দ্বার রুদ্ধ ক'রে অন্তরের আকুতি জানান শ্রীঠাকুরের চরণে, বলেন—"সমুদ্রের বালি এনে ভোগ দেব, আর সেই প্রসাদই পাবো।" সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ-দ্বারে পড়ে আঘাত। দ্বার মুক্ত ক'রে দেখেন ভোগের প্রচুর উপচার এসে দাঁড়িয়েছে। যোগক্ষেম তিনিই তো বহন করেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীঠাকুরের এই পরীক্ষা একাধিকবার হ'য়েছে—বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে স্বামীজি স্নানরত। সহসা দেখেন তাঁর কৌপীন একটি বানরের হস্তগত আর ছিন্নভিন্ন তার অবস্থা। একান্ত অভিমানে স্বামীপাদ গভীর বনে আত্মগোপনে চঞ্চলপদে করেন যাত্রা। বাসহীন অবস্থায় পরিক্রমা চলে না। সহসা জনৈক ব্রজবাসী সেখানে আসেন ও স্বামী-

পাদকে সযত্নে স্বগৃহে যান নিয়ে। বলাবাহুল্য নববস্ত্র ও আহার দানে ব্রজেশ্বরীর মহিমাই বর্ধিত করেন।

হৃষিকেশে স্বামীপাদ তখন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। গুরু-ভ্রাতারা কেউ কেউ ছিলেন সঙ্গে। একদিন স্বামীপাদের অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়ায়, তিনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়েন। সকলে মনে করে স্বামীজির শেষ অবস্থা। তখন হৃষিকেশে সেই স্থানে, বহু ক্রোশের মধ্যে কোন চিকিৎসক পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সহসা দৈব প্রেরিতের মত এক দিব্যদর্শন সাধু কুটীর দ্বারে এসে দাঁড়ান। তিনি সামান্য মধু ও পিপুলচূর্ণ স্বামীজিকে ওষুধরূপে দেন। এই মহৌষধেই স্বামীপাদের চেতনা হয়। তিনি মৃদুস্বরে জানিয়ে দেন এ যাত্রা তাঁর মৃত্যু নাই।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাড়িঘাট ষ্টেশনে স্বামীজি এসে নেমেছেন। একটি কম্বল মাত্র সম্বল। উত্তর-পশ্চিমে মধ্যাহ্নে তখন "লু" চলার সময়। স্বামীপাদকে ষ্টেশনের চৌকিদার প্লাটফর্মের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে অর্থ না থাকায় পিপাসায় জলেরও অভাব ঘটে। এদিকে সহযাত্রী এক বণিক জল ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করেন অর্থের বিনিময়ে। বণিকটি সাধুদের প্রতি বৃথা আক্রোশে স্বামীপাদের প্রতি অযথা বিদ্রূপাদি ক'রতে থাকেন। সহসা দেখা গেল এক হালুইকর কিছু আহারাদি ও এক কুঁজা ঠাণ্ডা জল নিয়ে উপস্থিত। স্বামীপাদকে লুচি মিষ্টি ও সেই জল দিয়ে তৃপ্ত করেন। পরে তার পরিচয়ে সে বলে, সে একজন স্থানীয় দোকানদার। মিষ্টান্নের দোকান তার। দুপুরে সে ছিল শুয়ে। সহসা এক দেবমূর্তি এসে তাকে উঠিয়ে দেন, বলেন, "আমার সাধু কষ্ট পাচ্ছে তাকে কিছু দিয়ে আয়।" "আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বারবার তিনবার ঐ ঘটায় আমি ছুটে এসেছি এইসব খাবার নিয়ে"—অবশ্য এরপর সেই বণিকের অবস্থা বর্ণনা না ক'রলেও চলে।

এইসব শ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ ভক্তদের কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমানে অনেক ভক্তই শ্রীঠাকুরের এইভাবে কৃপালাভে ধন্য হচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখি বীরভূমের একটি রামকৃষ্ণ আশ্রমে জনৈক ব্রহ্মচারী একদিন পণ ক'রলেন আজ অজগর বৃত্তিতে দেখবেন যে শ্রীঠাকুর কিছু আহারের ব্যবস্থা করেন কিনা। ঠিক হ'ল উনান ধরানো হবে না, শ্রীঠাকুরের ভোগও হবে না। যাই হোক ধীরে সময় যায় কেটে। তখন বেলা প্রায় ১২টা। এমন সময় দেখা গেল একান্ত অযাচিতভাবে এক দীনবেশী নারায়ণ কিছু চাল, গুড়, দুধ ও কিছু তরিতরকারি নিয়ে উপস্থিত। সকলে শ্রীপ্রভুর দান বলে সেগুলি ভোগে লাগিয়ে দিল।

ভগবানের সৃষ্টি যদি এই বিশাল জগৎ হয়, তবে তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর ভক্তেরা প্রথম প্রথম কষ্ট পেতে পারে কিন্তু শেষরক্ষা তিনি করবেনই করবেন। শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, "অন্নপূর্ণার রাজত্বে খেতে সবাই পায় তবে কারো সন্ধ্যা হ'য়ে যায়।" তিনি গীতামুখেও প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯।৩১

আরো বলে গেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

আজো তাই দিকে দিকে দেশে দেশে ভক্তদের নাশ নাই। শেষরক্ষা তিনি করেনই করেন।

শ্রীঠাকুরের কথায়—হরি মহারাজ ছিলেন গীতোক্তযোগী। ত্যাগে, তপস্যায় আর নিষ্ঠায় তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে চিরদিনই ছিলেন ব্রহ্মণ্য আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ। সেবার বৃন্দাবনে স্বামীপাদ ভক্তি হিমে চেয়েছেন জমে যেতে "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" এইভাবে তখন দিন কাটে। সঙ্গে ছিলেন ব্রজের রাখাল ব্রহ্মানন্দ।...মণিকাঞ্চন সংযোগ। একদিন ঠিক ক'রলেন সেদিন যোগক্ষেমের ভার শ্রীঠাকুরের উপরই দেবেন ছেড়ে—জপধ্যান তন্ময়তায় সব দিন যায় কেটে। রাত্রিও কেটে যায়। পরের দিন বেলা ন'টায় ভগবানের আসন উঠে ট'লে। জনৈক ভক্ত এসে হাজির হন আর প্রচুর উপচারে তাঁদের তৃপ্ত করেন।

শীতে বৃন্দাবনে সেবার ছয়মাস বাস ক'রছেন স্বামীপাদ, গরম গাত্রবস্ত্র কিছুমাত্র নাই। যাঁরা বৃন্দাবনে শীতের কথা জানেন না তাঁদের বোধহয় আশ্চর্য বোধ হবে শুনে যে শীতে তাঁর শরীরে রক্তপাত হ'ত। সহসা সেদিন এক বৃদ্ধ মহাত্মা এসে পড়েছেন। হাতে তাঁর একখানি কম্বল, গায়ে দিয়ে বলেন নম্রকণ্ঠে—"এখানি দয়া ক'রে নিতেই হবে।" নানা আপত্তিতেও সাধু নারায়ণ সেই কম্বল গায়ে চ'ড়িয়ে দিতে বিরত হন নি।

উজ্জয়িনীতে সেবার পরিব্রাজক তুরীয়ানন্দ ছিলেন একটি গাছের তলায়, বিশ্রান্তিমুখে আছেন শুয়ে। বাইরে তখন প্রকৃতির বিপর্যয়—অন্তরে 'তুরীয়ানন্দ' নিয়ে শুয়ে আছেন হরি মহারাজ—সহসা গায়ে হাত দিয়ে কে যেন জাগিয়ে দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাছের একখানি ডাল হঠাৎ পড়ে ভেঙ্গে। অসহায় ভক্তের শিয়রে ভগবানই যে থাকেন জেগে।

এবার আমরা আধুনিক শতকের যুগ থেকে ফিরে যাই নবম শতকের দাক্ষিণাত্যে। রামানুজাচার্যের তখন প্রথম আশ্রমী জীবন। আচার্য যাদব প্রকাশের ঈর্ষাবহ্নিতে তখন তিনি সমিধ হ'তে বসেছেন। রামানুজাচার্য শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্যের উপনিষদের ব্যাখ্যার উপর নিজের এক ব্যাখ্যা স্থাপন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'তস্য যথা কপ্যাংসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী'

এখানে অর্থ করা হ'য়েছে সূর্য-মণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটি কপির গুহ্যদেশের ন্যায় রক্তবর্ণ। কিন্তু আচার্য বলেন অর্থ এইরূপ হবে—সেই সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষের নয়নদ্বয় সূর্য বিকশিত কমলের ন্যায়। এই ব্যাখ্যায় তাঁর গুরুদেব বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। এইসব কারণে গুরু আচার্যপাদের জীবননাশের চেষ্টায় মধ্য প্রদেশের বনমধ্যে তাঁকে কৌশলে যান নিয়ে; পলায়নরত আচার্য বনমধ্যে মূর্ছিত হ'য়ে পড়েন। মূর্ছাভঙ্গে দেখেন এক ব্যাধদম্পতি তাঁর শুশ্রূষারত। ব্যাধদম্পতি তাঁর পরিচয়ে তাঁকে পথ দেখাতে স্বীকৃত হন। অল্প কিছুদূর পথচারণ করেই রাত্রি আসে নেমে আর তাঁরাও সকলে নিদ্রিত হন। প্রভাতে উঠে জল সংগ্রহের জন্যে বেরিয়ে দেখেন যে অদূরে শালকুঞ্জের নীচে এক দিব্য কূপ। সমাগতদের কাছে জানেন এই কূপই কাঞ্চিপুরের শ্রীবরদরাজ মন্দির প্রান্তবর্তী বিখ্যাত শালকূপ। সহসা চোখের মোহবন্ধন যায় স'রে, ব্যাধদম্পতিও অন্তর্হিত। প্রজ্ঞানয়নে উদ্ভাসিত হয় ব্যাধদম্পতি আর কেহ নন স্বয়ং তাঁর ইষ্টদেব। আর তাই যদি না হয় তবে কে তাঁকে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের মধ্যপ্রদেশের অরণ্য হ'তে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরমের মধ্যে এল নিয়ে।

শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান পূজারীর স্বার্থ ভঙ্গে তিনি রামানুজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা ক'রতে চেষ্টা করেন। এক পরম রমণীয় সন্ধ্যায় শ্রীমূর্তিদর্শন এসে উপস্থিত। কপট ভক্তিতে পূজারী এনে দেন শ্রীমূর্তির স্নানাভিষেক বারি। বলাবাহুল্য এতে মিশান ছিল বিষম বিষ কিন্তু দেববরে বলীয়ান আচার্যবরের এতে কিছুই হয়নি। দুষ্কৃতকারীই পরে পরম বৈষ্ণব হন রামানুজের ক্ষমাসুন্দর স্পর্শে।

আর্তের তরে এসেছ নামি

জর্ডনের জলটা বড় লাল হ'য়ে গেল—আজও হ'চ্ছে, বাঁশী কিন্তু বেজেছিল নীল প্রেমে—প্রেমার্ত প্রাণের সে ডাক বধির হ'য়ে শুনলো না জগৎ—এই হ'চ্ছে কালের অভিশাপ···যারা জর্ডনের জল রক্তে রাঙ্গা ক'রে তুলেছিল তারা ভাবেনি। তুষার-দ্রব জল রক্ত দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়েই তাকে রঞ্জিত করা যায় না—সে চিরদিন তুষার স্নিগ্ধ—পবিত্র···

কুমারী মেরী—সে এক দিব্য স্বপ্নের দিন, তিনি দেখলেন তাঁর গৃহে আবির্ভূত হ'য়েছেন স্বর্গের দেবতা—জ্যোছনা চকিত সে রাত্রি মেরী কোনদিন ভোলেননি—জগৎও কোনদিন ভুলতে পারবে না। স্বর্গের দূত বলেছিলেন, হে পবিত্র কুমারী তোমার কাছে আবির্ভূত হবেন যিনি—তিনি অর্ধ জগতের ত্রাতা ঈশামসি—তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও।

যীশুর পিতা যোশেফের কাছেও প্রকটিত হ'য়েছিল এক দিব্যস্বপ্ন। ভগবান ঈশামসি এসে জানালেন—পুত্র হ'য়ে তিনি আসবেন। যোশেফ যেন এ বিষয়ে কোন দ্বিধা না করেন। গভীর রাত্রে তারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনজন পূর্বদেশীয় ঋষি—তারার কাছে এক বার্তা পেলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন ওই তারা তাঁদের জানাচ্ছে, ওই অসীম অনন্ত আকাশ থেকে জন্মেছেন একটি আত্মা—যিনি জগৎকে পাপ থেকে উদ্ধার ক'রবেন ভবিষ্যতে।

তাঁরা সেই তারার ছায়াপথ লক্ষ্য ক'রে—বেথেলহেমে এসে দেখেন সেখানে গোবৎসের খাদ্যোধারে শয়ন ক'রে আছে সোনার এক টুক্‌রো ছেলে—জগতের সব তাপিতদের আশ্রয় স্থল ভগবান ঈশামসি···তাঁরা তাকে স্বর্ণ ইত্যাদি দিয়ে পূজা ক'রে গেলেন নিজ নিজ স্থানে। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত মাতা মেরী ও পিতা যোশেফ দেশ থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজা হেরোদের অত্যাচারের ভয়ে। হেরোদ জানতে পেরেছিলেন ইহুদিদের ভবিষ্যৎ রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তিনি কংসের মত তার রাজ্যের সমস্ত শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ভগবানের আবির্ভাব লগ্নও যেমন অসতর্ক মুহূর্তে এসে দাঁড়ায়, ভগবানের আবির্ভাব ক্ষেত্রেও বুঝিবা তেমনি বিশেষত্ব থাকে না—তবু মনে হয় নাজারেথ গ্রামটি যেন স্বর্গ থেকে খ'সে পড়া অম্লান ফুলের মতই জেগেছিল—এর একদিকে

তিমির বিদারী পর্বতশ্রেণী—অন্যদিকে সবুজের সমারোহ নিয়ে সমতলভূমি—আর একদিকে নীল পান্নার মত গালিয়েয়া সাগর আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের ডাক নাজারেথকে ক'রে তুলতো চঞ্চল…

যুগে যুগে ভগবান আবির্ভূত হন ধর্ম বিপ্লবের সময়—কি ভারতে, কি নাজারেথে। এই সময় একদিকে রোমক শাসন শোষণ ক'রে চলেছে। অন্যদিকে গ্রীকদের সভ্যতা বহু দেবতাকে নিয়ে মানুষের কাছে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রেছিল। এই দুই দ্বন্দ্বের মাঝে জেগে উঠলেন নারায়ণ ভগবান ঈশামসি… দীন সূত্রধরের কুটীর দীন হলেও হৃদয়বত্তায় দীন ছিল না। মাতা মেরী ধর্মে, ধ্যানে, স্তুতিগানে, গৃহকর্মে নাজারেথকে ধন্য ক'রে তুলেছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মতন ঈশামসিও দারিদ্রকে ক'রে তুলেছিলেন অতুল বৈভবে বরণীয়। তার যে বাণীই ছিল,—দীনার্তরাই ধন্য আর তাদেরই স্বর্গরাজ্য। দীনের ঘরে না জন্মালে দীন নারায়ণ না হ'লে দীনের মর্যাদা কে বোঝাবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—আচার্যেরা সব রকমে যোগ্য হন। তাঁদের দেহে মনে প্রেমে বুদ্ধিতে সবরকমে তারা মানুষের মধ্যে অতি মানুষ। ঈশাও তেমনি সব রকমে যোগ্য ছিলেন।

ঈশামসির মা শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদার মত স্নেহময়ী ছিলেন। মা চেয়ে চেয়ে দেখতেন স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া ড্যাফোডিলের মতন একটি ছেলে শুয়ে আছে—নীল নীল তার দুটি চোখ, ছোট্ট বলিষ্ঠ দুটি তার হাত, আর একরাশ চুল সোনা ছড়ানো মেঘের মতন ছড়িয়ে থাকতো। আরো যখন মা অন্যান্য নাজারেথের মেয়েদের সঙ্গে জল আনতে যেতেন, তখন যীশু দুটি পায়ে ছন্দ তুলে একটি ছোট্ট কলসী মাথায় নিয়ে সঙ্গে যেতেন। আমাদের মনে পড়ে যায় বেনহুরের বদ্ধ তৃষ্ণার্ত দুটি হাতে ঝরে পড়ছে যীশুর হাত থেকে স্নিগ্ধ-শীতল একরাশি জল। জল তো নয় যেন তরলিত চন্দ্রিকা—সেই কূপ থেকে কলসী ভরে নেওয়া জলই। আরো মনে হয় স্নিগ্ধ স্বাদুকূপের তলে শিশুকে পেয়ে গ্রামের মেয়েদের জল তোলার আগে তাকে তুলে নিয়ে একটি ক'রে চুমো এঁকে দেওয়া—যেন রোজকার কাজ হ'য়ে পড়েছিল। পিতা যখন কাঠের কাজ ক'রতেন তখন ঝাঁপিয়ে পড়া সোনার চুলের উপর কাঠের টুকরো মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে যেতেন পিতার কাছে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে পিতা বুঝি হ'য়ে যেতেন আপনহারা। হয়তো দুটি বাহু মেলে বুকের মাঝে আঁকড়ে নিতেন স্বর্গের সুষমাকে। এমনি ক'রেই গ্যালেলিয়াতে নীল জলে ঠিকরে পড়া চাঁদের মতন বাড়তে থাকেন ঈশমসি—মায়ের আদরে,—বাপের স্নেহে।

ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র মতে জন্মের পর চল্লিশ দিনের দিন শিশুকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তার নাম রাখা হয়—এইখানেই শিশুটির নাম রাখা হয় যীশু। এই মন্দিরে মাত্র দুইজন তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন,—একজন সাধু সাইমিয়ন ও অপর একজন জনৈকা বৃদ্ধা আন্না। অল্প বয়সেই এই রিক্তা মহিলা জিওভার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন পরিত্রাতার দর্শন মানসে। শবরীর মত বাল্য-বিধবা এই মহীয়ষী নারী মন্দির আশ্রয় ক'রেই এতদিন ছিলেন।

সাইমিয়ন যীশুকে কোলে তুলে নিয়ে ভগবানের স্তবগানে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়লেন এ যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলার চিনু শাঁখারী। তিনি বল্লেন—হে দেবতা আমার আশা মিটেছে। তোমার প্রেরিত পুরুষকে দর্শন ক'রে আজ আমি ধন্য। আমাকে শান্তিতে বিদায় দাও। ইনি জগতের পরিত্রাতা—একথা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

এরপর যীশু তাঁর বাপ মায়ের সঙ্গে জেরুজালেমের ধর্মমন্দিরে গেলো—এ মন্দির ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র মন্দির, সলোমন এটি নির্মাণ ক'রে গিয়েছিলেন। যীশুর বয়স তখন বারো বছর। এই মন্দিরেই যীশুর ঐশী শক্তির প্রথম প্রকাশ।

শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা বসে আছেন, যীশু তাঁদের মধ্যে বসে পড়লেন তাঁদের সঙ্গে, আর ধর্ম সম্বন্ধে অপূর্ব নূতন ব্যাখ্যা তাঁদের সামনে ধ'রে দিলেন। এদিকে বাপ মা, জেরুজালেমে পূজো দিয়ে চলে গেছেন, রাস্তায় গিয়ে দেখলেন সঙ্গে যীশু নেই। তাঁরা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ফিরে এলেন জেরুজালেমে। এসে দেখেন যীশু মন্দিরে ধর্ম আলোচনায় রত—জেরুজালেমের মন্দিরে প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মাঝে বসে আছেন মধ্যমণির মত। তাঁরা এসে জিজ্ঞাসা করেন, এই তিনদিন আমাদের না দেখে তোমার মন কাতর হয়নি। তাতে তিনি স্থিরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, এই তো আমার পিতার মন্দির।

যাই হোক ফিরে চললেন মেরী ও যোশেফ। তাঁদের পুত্রও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলেছেন দু'হাতে জলের আধার নিয়ে—দুই চোখের প্রসন্ন দৃষ্টিতে নাজারেথের রাস্তা হয়ে উঠলো শুভ্র সমুজ্জল।

ত্রিশ বছর এমনি ক'রে যায় কেটে, এই ত্রিশ বছরে তিনি কাঠ নিয়ে কাজ করেছিলেন না নিজের মন নিয়ে কাজ করেছিলেন, কে জানে? আমরা জানি ভগবান বুদ্ধও এমনি উনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন।...পিতা যোশেফ ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন।

গভীর রাত্রির অবসান ভগবান ঈশামসির এবার প্রকাশ উন্মুখের দিন। ইতিমধ্যে জন্ দি ব্যাপটিষ্ট্ আবির্ভূত হয়েছেন, জর্ডনের পবিত্র জল দিয়ে

তিনি সবাইকে দীক্ষা দিতে স্বরু ক'রেছেন। তিনি সবাইকে জানালেন, এবার পরম পরিত্রাতার দিন সমাগত, তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। ঈশ্বরের সন্তান —ঈশামসির আবির্ভাবের লগ্ন সমাগত।

এদিকে ঈশামসিকে ডাক দিয়েছে জর্ডনের পবিত্র জল। স্বর্গের দূত যেন নেমে এসেছে সেদিন একটি শুভ্র কপোতের মত। দেখা গেলো সেই জর্ডনের জলে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশামসি আর তাঁর মাথায় জলষেক করছেন, জন দি ব্যাপটিষ্ট্।

ভগবান ঈশামসি এবার কঠিন তপস্যায় ব্রতী হ'লেন। তিনি জন্ দি ব্যাপটিষ্টের কাছে দীক্ষা নিয়ে মরুভূমিতে অনাহারে ভগবানের চিন্তা ক'রতে লাগলেন। জ্বলে যাচ্ছে পারশিয়ার মরুভূমি। সেখানে একা অনন্য হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভগবান ঈশামসি—তাঁর অন্তরের এক মৌন প্রার্থনা,—হে ভগবান, পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। শয়তান এসে তাঁকে প্রলোভন দেখাতে স্বরু ক'রল—সে ব'ললে,—তুমি আমার অনুগত হও তোমাকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতি ক'রে তুলবো। আরও জানালো,—তোমার ইচ্ছায় ঐ পাথরগুলো রুটী হ'য়ে যাবে। ঈশামসি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চল্লিশদিন ধ'রে ভগবানের প্রার্থনা ক'রে যেতে লাগলেন, অনাহারে অনিদ্রায়। শয়তানের কোন কথাই তিনি মেনে নিলেন না। চল্লিশ দিন তপস্যা ক'রেছিলেন, এতে আমাদের বছরের নয় অংশের এক অংশ।

আমরা দেখি ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দাবদগ্ধ মরুভূমিতে নিরন্তর প্রার্থনা ক'রে চলেছেন ঈশামসি। শয়তানের প্রলোভনে তিনি বলেছিলেন,—মানুষ কেবল খেয়েদেয়েই বাঁচতে পারে না, তার আর একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা; সেইরূপ খোরাক তাঁর চাই। এরপর তিনি বলেছিলেন, ভগবানের অনুসন্ধানই আমাদের কর্তব্য আর যা কিছু তিনি আমাদের দেবেন।

শয়তানের আর একটি প্রলোভন, যীশু মন্দিরের উচ্চ শীর্ষ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে কিনা। কারণ সে তো ভগবানের পুত্র, তার তো কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। যীশু বললেন, শাস্ত্রে বলা আছে ভগবানকে পরীক্ষা ক'রতে যাওয়া অনুচিত। আর একটি প্রলোভনের প্রচেষ্টা ক'রতে চেয়েছিল শয়তান,—তুমি আমাকে প্রণাম কর, আমি তোমাকে পৃথিবীর রাজ ঐশ্বর্যদান ক'রবো। যীশু বলেন,—একমাত্র ভগবানই প্রণম্য, তিনিই একমাত্র সকলের অধীশ্বর, আর কাউকে প্রণাম করবার যোগ্য দেখতে পাচ্ছি না।—

শয়তান পরাস্ত হ'ল। আমরা দেখেছি ভগবান বুদ্ধও এরকম 'মারের' দ্বারা প্রলুব্ধ হ'য়েছিলেন।

চল্লিশ দিন মরুভূমির জ্বালাময় বুকে থেকে ঈশামসি শান্তির যে সব বাণী পেয়েছিলেন, সেগুলি তপস্যারই ফল, আজ তা বিশ্বকে অমৃতায়িত ক'রছে। এই অগ্নিতপস্যা তাঁকে অনন্ত শান্তির পথ দেখিয়েছিল। শয়তানের প্রলোভনকে স্তব্ধ ক'রে কিভাবে ভগবৎ পথে চলতে হয়, এও এইখানকার শিক্ষা।

তপস্যার শেষে আপ্তকাম যীশু ভগবানের আলোর দূত হ'য়ে বেরিয়েছিলেন গ্যালিলিতে। ভগবান তথাগত যেমন আপ্তকাম হ'য়ে লোকশিক্ষা দিতে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, ঈশামসিও তেমনি তপস্যার অন্তে স্নিগ্ধশীতল এক শৈল সানুদেশে গিয়ে সমবেত লোকদের সম্বোধন ক'রে তাঁর নব-প্রবর্তিত ধর্মের মূল সত্যগুলি প্রচার করলেন। সে বাণী তাদের অন্তরে শান্তির ছায়া দিয়েছিল বিছিয়ে। আমরা দেখি ভগবান তথাগতের অষ্টশীলের সঙ্গে কি অপূর্ব মিল র'য়েছে এই মহাবাণীগুলির। তিনি বললেন,—

অন্তরে যারা দীন তারাই ধন্য। ধর্মরাজ্য যে তাদেরই। কঠোরতা নেই যাদের ধন্য তারাই, তারাই যে দুনিয়ার অধিকারী হবে। যারা কাঁদে তারাই ধন্য, তারাই তো সান্ত্বনা পাবে। পবিত্রলাভের জন্য ক্ষুধিত তৃষিত যারা ধন্য তারাই, তারাই যে পরিতৃপ্ত হবে। অপরকে দয়া করে যারা তারাই ধন্য, কারণ তাদেরই তো দয়া করা হবে। অন্তরে পবিত্র যারা ধন্য তারাই, তারাই যে ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে। শান্তিকামী যারা তারাই ধন্য, ভগবানের সন্তান বলে তারাই পরিগণিত হবে। ন্যায়ের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করে যারা ধন্য তারাই, কারণ ধর্মরাজ্য তাদেরই হবে।

যুগে যুগে ভগবানের প্রেরিত পুরুষরা ভগবানের বিশেষ শক্তি নিয়ে আসেন। যুগে যুগে এঁরা লোকহিতকর কর্মে নিজেদের ঐশীশক্তি প্রয়োগ ক'রে গেছেন। যীশুর জীবনেও এরূপ বহু ঘটনা আছে। একবারের কথা,—যীশু তাঁর মার সঙ্গে গালিলেয়ার ছোট্ট শহর 'কানায়' এক বিবাহসভায় গেছেন। ওদেশে বিবাহসভায় ভোজের টেবিলে দ্রাক্ষারস পরিবেশন না ক'রলে চলে না। যাই হোক গৃহকর্তা সহসা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন, কারণ সংগৃহীত দ্রাক্ষারস সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। কি ক'রে অতিথিদের সৎকার করা যায়, কেমন ক'রে লজ্জা নিবারণ হয়—একথা ভেবে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। মাতা মেরী এই সংবাদ শুনে যীশুকে গিয়ে বললেন সব কথা। তিনি জানতেন যে যীশু ঐশী শক্তিতে সব কিছুই ক'রতে পারেন। মার কথায়

ভগবান ঈশামসি রাজী হ'লেন। করুণাময় যীশু দ্রাক্ষারসের পাত্রগুলি জল দিয়ে পূর্ণ ক'রে রাখতে বললেন, পরে সেগুলি ঢাকনা খুলে দেখা গেল সমস্ত পাত্রগুলিই উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। বিবাহ সভায় আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়নি।

আর একটি দিব্য ঘটনা। ভগবান ঈশামসি তখন কাফার নাইম শহরে। সে সময় তিনি আর এক ঐশী শক্তির—নব-শক্তিতে শক্তিমান। তিনি পিটারের বাড়ীতে গেছেন। সেখানে জমায়েত হ'য়েছেন অনেক ভক্ত; কিন্তু তার শাশুড়ী অসুস্থ, সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যাবে এই দেখে ভগবান যীশু তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বললেন—তুমি ভাল হ'য়ে গেছ ওঠো। সঙ্গে সঙ্গে পিটারের শাশুড়ী সুস্থ হ'য়ে ওঠেন। এতদিনে সর্বত্র প্রথম ঈশামসির আরোগ্য শক্তির প্রথম প্রকাশ দেখা দিল।

যে যুগে ডাক্তার কবিরাজের অভাব খুব বেশী ছিল। কাজেই ভগবানকে ডাক্তার কবিরাজের কাজ কিছু অংশে ক'রতে হত। মার্থা ও মেরী দুই বোন আর তাদের এক ভাই তার নাম লাজারাস। মার্থা-মেরী ঈশামশিকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাসতেন। একদিন সহসা সেই ভাইটি মারা যায় তারা তাকে কবর দিয়ে এসে সেই খবর ঈশামসিকে দিলে আর ব'ললে, প্রভু তুমি যদি থাকতে তাহলে আমাদের ভাই আজ মারা যেত না। তখন ঈশামসি যেখানে ছেলেটিকে কবর দেওয়া হ'য়েছিল সেখানে গিয়ে বজ্র নির্ঘোষে ডাকলেন,—Lazarus come forth—'সহসা সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে তার ভাই জীবন্ত হ'য়ে বেরিয়ে এল।

নাইম নগরে একদিন ভগবান ঈশামসি ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে দেখলেন একটি মৃত দেহকে সবাই নিয়ে যাচ্ছে আর তার পেছনে তার বৃদ্ধ মা কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছেন। তখন ভগবান তাঁর সহজ স্নেহসিক্ত মন দিয়ে বলে ওঠেন, শোক কোরো না। তারপর বললেন—যুবক ওঠ। যুবকটি তৎক্ষণাৎ পূর্ণস্বাস্থ্য নিয়ে ওঠে।

আর এক দিনের কথা। এই নাইম নগরের সমুদ্রের ধারেই ঈশামসির ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। সহসা সমাজ গৃহের ভক্ত নাম জাইরুস এসে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে বললেন, প্রভু আপনি একবার চলুন আমার মেয়েটিকে বাঁচান। ঈশামসি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে সঙ্গে চললেন। রাস্তায় খবর পেলেন, মেয়েটি মারা গেছে। লোকেরা ব'লল, আর গিয়ে কি হবে? ফিরে চলুন। কেননা তারা জানতো না যে ঈশামসি মৃতকেও বাঁচাতে পারেন।

যাই হোক জাইরুসের বাড়ী পৌঁছেই শুনতে পেলেন সকলের আকুল কান্না। ঈশামসি সকলকে বাইরে যেতে বললেন—কেবল তাঁর তিনজন শিষ্য পিটার, যোহন, জ্যাকব ও মেয়েটির বাবা মা সেখানে রইলো ; তিনি মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বিদ্যুৎ বিসারিত কণ্ঠে হিব্রু ভাষায় বললেন, কুমারী ওঠ। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটি উঠে বসলো, সে বহুদিন অসুস্থ থাকায় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে ভগবান যীশু তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। মেয়েটি এতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হলো। আর যীশুর জয় জয়কারে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো।

করুণাবতার ঈশামসি তাঁর বারোজন শিষ্যকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, সঙ্গে আরো অনেক লোকও থাকে। এরকম ক'রে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে সময় একটি কুষ্ঠরোগী তার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঈশামসির পদতলে কাতর প্রার্থনা জানানো মাত্র তিনি বললেন, আমি চাই তুমি সুস্থ হও। তৎক্ষণাৎ সেই কুষ্ঠ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো এবং ভগবানের আদেশে জেরুজালেমের মন্দিরে গেল।

এই রকম আরেকদিন ভগবান ঈশামসি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর সেই পথে তারই অপেক্ষায় ছিল দশজন কুষ্ঠরোগী তাদের মনের একান্ত ইচ্ছা তাদের রোগমুক্তির। এদিকে ভক্তরা ঈশামসিকে দেবেন না যেতে কিন্তু তিনি সকলের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে তাদের কাছে গিয়ে বললেন,—তোমরা মন্দিরে পুরোহিতের কাছে যাও তোমাদের পাপের কথা তাঁর কাছে নিবেদন কর। তারাও তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে দৌড়ে চলে গেল তারা তখনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে দরদী একজন ভগবান ঈশামসির কাছে ফিরে এসে নতজানু হ'য়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলো আর তাকে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতা জানালো। আর্তপ্রাণ ঈশামসি তাঁকে বললেন,—যদিও ওরা মন্দিরের দিকে ছুটে গেলো তবুও ওরা কেবলমাত্র তোমার বিশ্বাসের জোরেই সুস্থ হ'য়ে উঠবে। এই রোগীটি ছাড়া আর বাকী নয়জন অ্যামোরিয়াবাসী তারা ঈশামসির ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো না।

এক ধনী পিতামাতার একটি জন্মান্ধ পুত্র ছিল। সে জন্মান্ধ ছিল বলে তারা ছেলেটিকে বাড়ীর থেকে বের করে দিয়েছিলেন আর সে জেরুজালেমের বিখ্যাত মন্দিরের পাশে ভিক্ষা করে দিন কাটাতো। সেই ছেলেটির দুর্দশা দেখে ঈশামসির শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতো জন্মান্ধ কিন্তু এ কার পাপে এ শাস্তি পাচ্ছে তার পিতামাতার বা তার নিজের পাপের ? ঈশা বললেন,

এই ছেলেটির দ্বারা ভগবানের মহিমা বর্ধিত হবে তাই এই ছেলেটি জন্মান্ধ। তারপর ছেলেটির চোখে কিছু কাদা মাখিয়ে দিয়ে বললেন,—ঐ জলাশয়ের কাছে যে লোকটি র'য়েছে তার কাছে জল চেয়ে নিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলো। ছেলেটি সরল বিশ্বাসে এগিয়ে গেলো। আর লোকটির কাছে জল চেয়ে নিয়ে চোখ পরিষ্কার করা মাত্র সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। সে তখন ভগবান ঈশামসির কাছে ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে তার বাপ মায়ের কাছে গেল। কিন্তু সকলেই, এমন কি তার বাপ-মাও তাকে প্রথমে চিনতে পারলোনা। তাঁরা সবাই বলেন—সে ছেলে কখনই নয়, নিশ্চয় তারই মত দেখতে অন্য কোন ছেলে। কিন্তু ছেলেটি যখন তার বাপ-মাকে বললো যে—না, সে জন্মান্ধ ছিল ঈশামসির একান্ত করুণায় আজ সম্পূর্ণ ভাল হ'য়ে গেছে তখন তারা তাকে বিশ্বাস করলো।

কাফার নাইম শহরে ঈশামসি উপদেশ দিচ্ছেন বহু আর্ত ভক্ত তাঁর উপদেশ শুনতে সমাজগৃহে এসে জড়ো হ'য়েছে। সমাজগৃহ ভরপুর এমন কি একজন ভূতাবেশগ্রস্তও সেখানে এসেছে। সে তার উপদেশ বাণী শুনে ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো,—নাজারেথবাসী যীশু আমাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি কি আমাদের শেষ ক'রে ফেলতে এসেছ? তোমাকে চিনেছি তুমি কে? তুমিই ভগবানের পুত্র ঈশামসি। ভগবান তাকে বললেন, তুমি মুক্ত হও। বলা মাত্র সেই ভূতটি লোকটির শরীর থেকে অপসৃত হ'ল।

আর একদিন একজন লোক তাঁর কাছে তার একটি ভূতাবেশগ্রস্ত ছেলেকে নিয়ে এল সে কথাও বলতে পারে না চোখেও দেখতে পায় না। তাঁর আদেশ-মাত্র সেই বোবা ও অন্ধ ভূতটি ছেলেটিকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল ও ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। কেবলমাত্র ইহলোকে নয় পরলোকের আত্মারাও ঈশামসিকে ভয় ক'রছে, তাঁকে সম্মান ক'রছে, তাঁর কথার অনুসরণ ক'রছে এই দেখে সকলেরই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল—তিনি যে সত্যিই ভগবানের প্রেরিতপুরুষ সে বিষয়ে আর কারো কোন সন্দেহ রইলো না। তখনকার দিনে এইটিতেই দৃঢ় বিশ্বাস আসতো,—অসুস্থদের বিনা চিকিৎসায় সুস্থ করা ভূতাবেশদের আরোগ্য করা। (অসমাপ্ত রচনা)

স্মৃতির টুক্‌রো

আপার ইণ্ডিয়া থেকে রেলগাড়ি আসছে—জনৈক রেল কর্মচারী একটি কামরায় উঠে পড়েন। সহসা সামনে তাকিয়ে দেখেন গৈরিকবস্ত্র বেশ শক্তি-মান এক পুরুষ বসে।

কর্মচারিটী নিজেও বেশ বলিষ্ঠ, কিছু পাণদোষ আছে। বোধ হয় কর্ম-বিপাকে তার এ দুর্দশা! স্বামীপাদ একটি পুস্তকের মধ্যে যেন হারিয়ে গেছেন। ভদ্রলোক সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের দিকে এক একবার দেখেন, ক্রমে গাড়ী বর্ধমানে এসে যায়। ভদ্রলোক নামবার উপক্রম ক'রছেন, এমন সময় স্বামীজি হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দেন বেশ জোরে জোরেই—আর বলেন, তোর হবে—হবে। ভদ্রলোক নিজেও বেশ বলিষ্ঠ কাজেই ঝাঁকুনিটী আজও মনে আছে। কিন্তু দেহের ঝাঁকুনি মনেও এসে লাগলো—সমস্ত মনটা যেন কেমন হ'য়ে যায়। বিরাট একটা শক্তি অনুভব করেন। বাড়ী গিয়েই সমস্ত মদের বোতল চুরমার ক'রে দেন। আজো তিনি তার এই স্মৃতি বহন ক'রে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছেন। পরিচয় অবশ্য এরপরে পান—ইনিই দেশ-বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ।

বৈশাখে

দেশ আর কাল এই দুইটি নিয়েই জগৎ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান অথবা অঙ্কশাস্ত্র এই বিভিন্ন দিকের পরিস্থিতিতে একই দেশ-কাল বুঝায়। আবার দেশ ও কাল এরা দুটি তত্ত্ব নয় এরা একই তত্ত্বমাত্র। পদার্থবিজ্ঞানে দেশ ও কালের বিস্তৃতি Extusion ও duration, অথবা মনোবিজ্ঞানে মনের দ্বারা দেশ-কাল যেভাবে অনুভব করি অথবা অঙ্কশাস্ত্রে বিষয়ীভূত Order of relation বুঝাই মূলতঃ এক—এরা শেষ পর্যায়ে এদের পার্থক হারিয়ে ফেলে।

[Alexander—Space Time and Diety-p 280]

কালস্রোতে আর একটি বৎসরের ৩৬৫ দিন একে একে ভেসে গেল। কান্না-হাসিতে অবিচল এই মহাকাল বিরাট সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে দেখছেন আমাদের সব কর্ম—শুভ বা অশুভ দুই-ই। কর্মফল অমোঘ, ক্ষমা ভিক্ষা করি আর

নাই করি গতদিনের কর্মফল আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। শুভ বা অশুভ কর্মের যথাযথ ফল আমাদের পেতেই হবে। চণ্ডীতে বলা হয়েছে—"কলা কাষ্ঠাদি রূপেন পরিণাম প্রদায়িণী।"

দেশ-কাল দুয়ে মিলে এক বিরাট পুরুষ যেন ব'লছেন গীতামুখে—আমি মহাকাল লোকক্ষয় করতে প্রস্তুত (গীতা১১, ৩২) কালক্ষয়েরই প্রকাশ।

তবু কৃপার স্থান আছে—তিনি যে দয়াময়। তাই যতই অশুভকর্মের বন্ধন থাক না, তাঁর এক মুহূর্তের কৃপায় সবই মুছে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—একটি দেশলাই জ্বাললে যুগের অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়।

বেদে আদিত্যদের স্তুতির কথা আছে (১।১৪) এই আদিত্য অদিতির সন্তান। অদিতি অর্থে যার সীমা করা যায় না। তাহলে বেদের এই অদিতি অসীম আর ইনি দেবমাতা। অর্থাৎ সীমার কথা এই অদিতির বা দেবমাতার নিকট হ'তেই আমরা পাই।

প্রার্থনাবহুল ঋগবেদের ঋষিদের সঙ্গে আজ আমরা বলি—

দেবী যদি ত বিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং
সিষক্ত্যুষসং ন স্থর্য্যঃ।
যো ধষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্ত্তি
রেণুং বৃহদর্হরিষ্বণিঃ॥ ১।৪।২১

অর্থাৎ তোমার যা কিছু শক্তি সামর্থ আছে ভগবৎকার্যে বিনিযুক্ত কর; তাহা হইলে সকল পাপ হইতে ভগবান তোমায় উদ্ধার করবেন।

একমুঠো ব্যথা নিঙড়ানো আনন্দ

ফেলে আসা দিনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক মুঠো ব্যথা নিঙড়ানো আনন্দ। সেবার কিছু দুঃখ নিয়ে গেছি আশ্রমে। স্বামীপাদের দর্শনে কৃতার্থ হ'য়ে নিবেদন ক'রলাম হরিদ্বারের গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসের কথা। বহু ক্ষতির সঙ্গে ভেসে গেছে বহু সাধু-সন্ত।

গম্ভীরভাবে উত্তর দেন স্বামীপাদ, "সত্যিকার সাধুদের এতে কিছু যায় আসে না। দেহটাই তো ভেসে গেছে, প্রাক্তন কে খণ্ডন করবে?" দার্জিলিং-এর ট্রেন বিভ্রাটে হৃদযন্ত্রে আঘাত নিয়ে এসেছেন ফিরে। কলকাতায় থাকতে সময়ে সময়ে পা যেত ফুলে, কষ্ট হোত। পঁচিশ বছর মার্কিণের স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় থাকা অভ্যস্ত শরীর, মনের জোরে কতক ঠিক থাকলেও কষ্ট দিত সময়ে সময়ে। বলতেন আমাদের, "এখানে এসে মোটা হয়ে গেলুম রে।" আমরা গেছি দর্শন কামনায়। অপারেশনের কথায় বলেছেন, "যে শরীর ভগবানকে দিয়েছি সেটাকে আর ডাক্তারের হাতে দেবো না।"

শুনলাম শ্রীঠাকুরের নির্দেশে কবিরাজী করান হচ্ছে। আমাদের জানা একজন বড় কবিরাজ ছিল। তাঁকে আনবার কথা বলা হ'ল। বল্লেন ঈষৎ হেসে, "চিকিৎসা বিভ্রাট করার প্রয়োজন নেই।" আমাদের ইচ্ছা ছিল, এখন যেখানে রামকৃষ্ণ সেবায়তন আশ্রম গড়ে উঠেছে সেই শ্যামায়িত বাগানে গঙ্গার স্নিগ্ধ নির্জনতায় তাঁকে নিয়ে আসবো। তিনিও বলেছিলেন, "চেষ্টা করে দেখ।" শহরের নানা কোলাহল থেকে সরিয়ে আনলে যদি বা মহাকালকে ঠেকান যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে যাত্রা তাঁকে আনা সম্ভব হয় নি। রোগক্ষিন্ন শরীরে কিছু আনন্দ দিতে পারবো ভেবে সেবার নিয়ে গেছি কিছু রেকর্ড। শ্রীযুক্ত দিলীপ বাবুর অনবদ্য কণ্ঠে গাওয়া রেকর্ডখানি দিলাম। 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে, আমি তাইতো জ্বলি, কেবল জ্বলি, জ্বলি ভুবন ভ'রে।' বড় চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে শুনে, ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে শ্রীমুখে। অন্তরাগের সে পাণ্ডুরতা।

অন্যদিনের কথা। গিয়ে দেখি স্বামীপাদ বড় চেয়ারটায় শুয়ে আছেন। বললেন, দেখ কিছু কাজ বাকী আছে? এটি হ'লেই আমার ছুটি। শ্রীমন্দির হ'লেই আমার হ'য়ে গেল। মন্দিরের কাজ কিছু বাকী আছে। বললেন,—

"এখন কোথায় যাচ্ছিস ?" আমি তখন যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি। বললেন,—
"তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস্।"

এরপর আর দেখা হয়নি। ফিরে এসে দেখি হিমশৃঙ্গ গেছে ধ্'সে। তাড়াতাড়ি আসার প্রয়োজন কি এই ! কাশীপুরের মহাশ্মশানে তাঁর শেষ ইচ্ছা, "শ্রীঠাকুরের পায়ের কাছে আমায় রাখিস্" ; তাঁরি ইচ্ছার হ'য়েছিল সম্ভব। চণ্ডী মহারাজও সঙ্গে ছিলেন।

শ্রাবণের সেই শেষ বর্ষণেও সেদিনের কথা মুছে যায়নি, যাবেও না।

ভাবমুখের কথা

বৎসরের প্রথম দিকে আমরা সর্বভূতের জন্যে কল্যাণ প্রার্থনা শ্রীঠাকুরের চরণে জানাই।

ধর্মরাজ্যে যারা পথিকৃৎ, পথচারী তাদের সকলেরই "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" জীবনযাপন করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতামুখে ভগবানের বাণী—

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ১২।৪

সর্বভূতহিতে রতা—সর্বভূতের কল্যাণকামীরা আমাকেই (শ্রীভগবানকেই) লাভ করেন।

সর্বভূতহিতে রতা Therefore all things what so ever you would that men should do to you. Do ye even so to them ; এখানে Bible এই নীতির কথাই বলেছেন। ধর্মরাজ্যে এইভাবে যার যা খুশী সেই ভাবে ধর্মাচরণ করা চলবে না। সমষ্টির কল্যাণ দৃষ্টিও প্রয়োজন।

সংঘই শক্তি। বৌদ্ধধর্মে সংঘকে ত্রিরত্নের মধ্যে স্থান দেওয়া ছিল—সংঘের শরণ মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত বুদ্ধ শরণের পরেই। এই সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা সব ধর্মপথের পথিকদের কর্তব্য। ভগবান বুদ্ধদেব, আচার্য শঙ্কর, শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য বিবেকানন্দ—এঁরা সকলেই সংঘকে শক্তিযুক্ত ক'রে তুলেছেন। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংঘের প্রতি প্রীতিযুক্ত হ'তে হবে। ধর্মকে মহনীয় ও শক্তিমান ক'রে তুলতে হবে। বিশেষ ক'রে অনার্যদুষ্ট বাংলার সংঘবদ্ধ মনোবৃত্তি কম। আমাদের অবচেতনে সংঘভঙ্গের বৃত্তি আছে। সংঘশক্তি

বৃদ্ধি ক'রতে হ'লে সংঘগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখা চলবে না। প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে যে এই দুষ্ট বৃত্তিকে ছাড়িয়ে একে পরাজিত করতে হবে। যেন সংঘের বিরুদ্ধে, পরস্পরের বিরুদ্ধে আমরা চিন্তা ও ব্যবহার না করি। ব্যাসসূত্রেও আছে অনাশ্রমী ভাব থেকে আশ্রমী ভাব ভাল।

ধর্ম শুধু নিজের জন্যে নয়—ধর্মাচরণ বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনেও সাধিত হওয়া উচিত। তাই ধার্মিকদের আচরণ সর্বভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ দৃষ্টিতে করণীয়। ইংরাজী পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে Perfectionism যার ভেতর greatest good of the greatest number এই নীতিও আজ বিশ্বনীতির পর্যায়ে পড়ে। 'Live and let live' এই চিন্তার দিন এসেছে। উপনিষদে 'সহনাববতু'—কথা ভাববার দিন এসেছে। প্রতি ধর্ম সংঘকে অন্য সংঘগুলির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে—ধর্মে U. N. O. গ'ড়ে তুলতে হবে। ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষের দিন চলে গেছে—যেদিন ধর্মসমন্বয়ের বাণী এনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্মের এই দুর্দিনে প্রত্যেকের এই বিষয়ে অবহিত হবার জন্য চেষ্টা হোক এই প্রার্থনা—আজ ধর্মের এই দুর্দশার দিনে আমরা শ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি একান্ত আকুতিতে।

... .

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ইচ্ছায় ভাবমুখের একাদশ বর্ষের পাদচারণ সুরু হ'ল। পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কল্যাণ কামনা বৎসরের প্রথমপাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমাদের একান্ত কাম্য আর—আজ এই বৈষম্য মথিত বিশ্বের কল্যাণও বিশ্বেশ্বরের চরণে জানাই।

"ভাবমুখে থাক" শ্রীভবতারিণীর এই বাণী—তিনবার শ্রীঠাকুর শুনেন। এই বাণীর গভীর তাৎপর্য আমাদের বুদ্ধির পারের কথা। তবু মনে হয় শ্রীঠাকুর ব'লতেন, ভাবমুখ আর অভাবমুখ।

জগজ্জননীর জগৎ চলার ব্যাপারে বারবার লোকোত্তর পুরুষদের প্রয়োজন। পাপপুণ্যের পার্থক্য সামাজিক ব্যাপার ধরে নিলেও জগতের চক্রগতির পরিবর্তন প্রয়োজন, তাই মাঝে মাঝে এইসব অবতারদের আসা প্রয়োজন। এঁরা যদি অভাবমুখে থাকেন অর্থাৎ জগৎ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন তবে আর জগচ্চক্র পরিবর্তন সম্ভব হয় না। দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এঁদের মধ্যে স্বার্থগন্ধহীন ভগবৎ প্রেমিক পুরুষদের স্থান সর্বোচ্চ। কারণ বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিশ্বকল্যাণ ব্রতে এঁরাই সর্বোত্তম কের পুরুষ আর ঈশ্বরলাভের পর এঁদের স্বার্থগন্ধহীন কর্মে সার্বজনীন একটা

ভাব থেকেই যায়। ভাবমুখে থাকার নির্দেশে শ্রীঠাকুর তার সন্তানদের দিয়ে যে কর্ম তথা ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তার ফলে বিশ্বের যে কি কল্যাণ হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। ভাবমুখের পৃষ্ঠায় শ্রীঠাকুরের সেই বিশ্বজনীন কৃপাই বর্ষিত হোক যে কৃপার মঙ্গল-লীলায় বিশ্ব নিত্য এগিয়ে যাচ্ছে—"চরৈবেতি" "এগিয়ে পড়" মন্ত্রে।

আমাদের কথা

বিশ্বনাথের হাতে বিশ্বের মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের একদিকে আছে অর্থনৈতিক মূল্য, (Economic value) অন্যদিকে আছে পারমার্থিক তত্ত্ব (Higher values of life) ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে।

জগৎ আজ অর্থ নৈতিক মূল্য (Economic Value) নিয়ে প্রাণান্ত ব্যস্ত। কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগতভাবে হানাহানি চ'লছে—এই প্রচেষ্টায়। অন্যদিকে ধর্ম চায় উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে (Higher values of life) এগিয়ে যেতে। অতি মুষ্টিমেয় ব্যষ্টি-সমষ্টি চ'লেছে সেই পথে নীরবে নিস্পন্দে।

কিন্তু বিশ্বনাথের ইচ্ছায় বেশী হ'য়ে যাচ্ছে সমষ্টি ও সেইজন্যেই ব্যষ্টি ভাবে অর্থ নৈতিক দিক, ভোগবাদের দিক আর সেই পরিমাণেই ত্যাগের দিক, পরমার্থের মূল্য বা value যাচ্ছে কমে। চাহিদা অনুসারে মূল্য; আর সেই চাহিদা এখন অর্থের—পরমার্থের নয়।

অর্থনীতির অনুসারে এ যুগে Purchasing power তাই কমে গেছে অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা আগের মত ফল পাই না। আর জগতে Compection-এর দাম আছে (Competitive price)। যেমন একটা কলমের দাম বাড়লে অন্য একপ্রকার কলমের দাম বেড়ে যেতে পারে তেমনি একটি জিনিষের দাম কমলে অন্যটার দাম কমতে পারে। সেই হিসাবে ধর্মের মূল্য কমলে, ভগবান ভক্ত ও ভাগবতের মূল্য কমলে, পবিত্রতা ও সততা এইসব নীতির মূল্যও কমে যেতে পারে। অথবা ভগবানে বিশ্বাস কমলে ভাগবৎ ও ভক্তের বিশ্বাস কমে যাবে। আবার Joint demand and supply অনুসারে বাড়ীর মূল্য কমলে বাড়ী তৈরীর দ্রব্যাদির মূল্য কমে। তেমনি

ভাগবতের প্রতি বিশ্বাস কমলে ভাগবৎ লিখিয়েদের চাহিদা কমে যায়। Competive price-এর একটির মূল্য বাড়লে অন্যটির মূল্য কমে অথবা উল্টাও হয়। সেই হিসাবে অধর্মের প্রসারে ধর্মবিষয়ে হীনতা উৎপন্ন হ'তে পারে। এইসব ঘটনা পর্যালোচনা ক'রলে মনে হয় ধর্মের এখন খুব দৈন্যদশা। চলচ্চিত্র, সন্দেশসদন প্রভৃতির আধিক্যে মন্দির, আশ্রম প্রভৃতি মূল্যহীন হ'য়ে পড়েছে। তবে আর একটা দিক আছে সেটি এই যে সব শক্তির পিছনে বিপরীত শক্তির খেলা চলে। [Each action has an equal but opposite reaction. Newtons 3rd law] সে হিসাবে অধর্মের ঠিক নীচে নীচেই ধর্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের কীর্তন অনুরাগ, রাজনৈতিকদের বুদ্ধপ্রীতি ও পাশ্চাত্ত্য দেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যথা Eddingtion, Jeans, Einstien প্রভৃতিদের ভাগবৎ বিশ্বাস এই কথাই প্রমাণ করে। আধ্যাত্মিক মূল্যের (Higher values of life) চাহিদা আজ বিশ্বের বিশ্বশোষী তৃষ্ণার শেষকথা রূপেই এসে গেছে। Truth, Beauty, Goodness, Co-existences প্রভৃতির কথা আজ বড় কথা।

ভগবান তাঁর রাজ্যে চিরন্তন, ভাগবতশক্তিও চিরন্তন—ধর্ম ধার্মিককে শেষ পর্যন্ত জয়শ্রীতে নিয়ে যাবে, এই আশা করি—এই প্রার্থনাই আমাদের শ্রীঠাকুরের কাছে বৎসরের এই প্রথম দিনে।

"নমে ভক্ত প্রণশ্যতি" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা) ভগবানের এই বাণী আজ সার্থক হোক—যুগ-সন্ধিক্ষণে। কুরুক্ষেত্রের মহাভারতীয় রণাঙ্গনে পার্থ সারথীর এই বাণী আমাদের যুগ-সন্ধিক্ষণে পরম আস্পদ হোক। রামকৃষ্ণার্পণম্।

আমাদের কথা

Prof. Radhakrisnan বলেছেন—**It (Philosophy) must inspire us with the faith to sustain the new world, to produce the men who subordinate national, racial and religious divisions to the ideal of humanity. (History of Philosophy Eastern and Western, II).**

দর্শনের বিশ্বতোমুখ ঐতিহাসিক গতিভঙ্গী দেখে এ যুগের সেরা দার্শনিক রাধাকৃষ্ণান্ এই সিদ্ধান্তে এসে পড়েছেন—এই আদর্শবাদ বা ভাববাদ এ যুগের চরম ও পরম কথা—যুগাবতারের প্রতি মা'র কথা—তাঁকে সমাধি থেকে নামিয়ে আনতে তাঁর শ্রীমুখের বাণী "ভাবমুখে থাক"—এটির অর্থ আজো পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়নি।

শ্রীঠাকুরের প্রতি মা'র বাণী—ভাবে থাকা আজ জয়যাত্রার পথে চলেছে। হোয়াইডহেড, ইউইং, রাধাকৃষ্ণ্‌ন্, স্যান্টায়না, মেকৃজি প্রমুখ দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং আইনস্টাইন, জিন্স, এডিংটন প্রভৃতি দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও এই কথাই পাই। শ্রীঠাকুর এনেছিলেন সমন্বয় বাণী আর বৈজ্ঞানিকের মত খাঁটি এটি প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন প্রধান প্রধান ধর্ম সাধনায়। ধর্মই বিজ্ঞানের মূলভিত্তি, একথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা মূলতঃ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যাঁরা বলেন ঠাকুরের আগমনের সার্থকতা কোথায়, তাঁদের বলি শ্রীঠাকুরের ধর্ম-সমন্বয়ের ফলে আজ বিশ্বের সর্বত্র সমন্বয়ের বাণী জেগে উঠেছে। ইউ. এন. ও. প্রভৃতির ওয়ানওয়ার্লড (বিশ্বৈক্য) প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সর্বত্রই এই সমন্বয়ের সুর, সর্বাবয়ব সমন্বয় আজ বিশ্বের আদর্শ। তাকে কার্যে পরিণত করা আজ প্রত্যেক মানুষের স্বধর্ম।

ভাবমুখে পত্রিকা তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই বিরাট সমন্বয়ে হবিতে ক্ষুদ্র সমিধ যোগাতে চেষ্টা ক'রছে মাত্র।

শ্রীঠাকুরের কৃপাই সম্বল ক'রে তাঁর চরণে একান্ত প্রার্থনা আজ যেন মানবের এই সমন্বয় মূর্তি সেই বিরাট সমন্বয়কারীর চরণপ্রান্তে পার্থের মত প্রার্থনা জানাতে পারে—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। বিশ্বের কল্যাণের অন্য পন্থা নাই।

কথাপ্রসঙ্গে

পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে কথা উঠলে একটি কথা স্বতঃই মনে ওঠে গীতামুখে ভগবানের বাণী—

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।' ৩/২৭

প্রকৃতিই যদি সবকিছু করে চলেছেন, তবে আমরা অন্যায়ের সাজা পাই কেন? এর উত্তরে বলা যায় প্রকৃতিই তো সব কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু সে বোধ তো আমাদের নাই—মাঝে আছে যে অহংকার। প্রথম কথা হচ্ছে,—যদি ভালমন্দ সব প্রকৃতিই করছেন বা করাচ্ছেন, তুমি নিষ্ক্রিয় এই বোধ করতে পার, তাহলে ভাল ভাল কাজে প্রশংসা পেলেও তোমার আনন্দ হবে না। আবার মন্দ কাজে শাস্তি পেলেও তোমার কিছুই হবে না। তখন ঠাকুরের বলা সেই সাধুর মত বলতে পারবে। এক সাধু একদিন ভিক্ষা করতে কোন গ্রামে গিয়ে দেখলে, এক জমিদার একটি লোককে খুব মারছে। সাধুটি দয়া-পরবশ হয়ে তাকে মারতে বারণ করলে, কিন্তু জমিদার এত রেগেছে যে, সেই সাধুকেই তখন বেশ করে দুচার ঘা দিয়ে দিলে। তার ফলে সাধুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে একটি লোক সেটি দেখতে পেয়ে সেই সাধুর মঠে গিয়ে খবর দিল। মঠের অন্যান্য সাধুরা দৌড়ে এসে তাকে ধরাধরি করে মঠে নিয়ে গিয়ে সেবা করতে লাগলেন। তার মধ্যে একজন বললে, 'মুখে দুধ দিয়ে দেখা যাক।' মুখে দুধ দিতেই সাধু চোখ চেয়ে দেখতে লাগল। তখন আর একজন সাধু তাঁকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, তোমাকে এখন কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু তখন আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই যিনি মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন'। সাধুটির তখন অবস্থালাভ হয়েছে, তাই বোধ হয়েছে ঈশ্বরই সব করছেন। কিন্তু এ বোধও আমাদের নাই, আর আমরা সমাজবদ্ধ জীব—কাজেই সমাজের নিয়ম মানতে হবে। আমরা যাদের ভোট দিয়ে বসাই, তারা যখন যা নিয়ম করবে তাই মানতে হবে।

তাছাড়া মানুষ বুদ্ধিজীবী। কাজেই মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধও আছে, শাস্তি বা প্রশংসা জ্ঞানও আছে।

একটি বেড়াল কি কুকুর যখন অন্যের বাড়ীতে দুধ কি মাছ খেয়ে নেয়—কি গরু যখন অন্যের বাড়ীতে ফসল খেয়ে নেয়, তখন কি তার শাস্তি বা জেল হয়? হয় না—তাদের মধ্যে তো rationality grow করেনি। এই জীবজন্তু বড়জোর তাড়া খায়, কি এক লাঠি খায়, এই পর্যন্ত। কিন্তু মানুষ যদি অন্যের

বাড়ীতে ঢুকে খেতে আরম্ভ করে, কি কোন জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায় তো তাকে ধরে জেলে পুরে দেবে, এই হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থা;—সমাজে থাকলে সমাজের পাপ-পুণ্য অনুসারে শাস্তি পেতে হবে।

যে সিদ্ধপুরুষ, সেও যদি খুন করে, পুলিস তাকেও ছাড়বে না। অবশ্য যদিও সিদ্ধপুরুষের আত্মিক ক্ষতি তাতে হয় না বা সাধারণতঃ সিদ্ধপুরুষের দ্বারা হিংসার কাজ অন্যায় কাজ, সম্ভবও হয় না, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের জন্য সমাজের নিয়ম ব্যাহত হয় না। সমাজের বাইরে জঙ্গলে গিয়ে এমন অনেক কাজ আছে যা তুমি করতে পার, কিন্তু তোমার জেল হবে না। পাহাড়ে কোন গরুকে দুইয়ে দুধ খেয়ে নিলে হয়ত তোমার জেল হবে না, কিন্তু এখানে কারো গরুকে দুইয়ে দুধ নাও, তোমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাবে। এ হল সমাজের শাস্তি।

তাছাড়া আত্মিক পাপ-পুণ্যের বিচার আছে। জঙ্গলে গিয়ে একটি মানুষ খুন করলে কেউ জানতে না পারলে তোমার জেলও হল না, কিন্তু সে পাপ তোমার আত্মায় বিদ্ধ হয়ে থাকবে—তোমাকে সঙ্কুচিত করে তুলবে। কাজেই, পাপ আর তার শাস্তিও পেতে হবে—কর্মফলদাতার কাছ থেকে।

আত্মা হচ্ছে ভূমা স্বরূপ। যেখানে আত্মা ক্ষুব্ধ হয় না, সঙ্কুচিত হয় না, সেখানে পাপও হয় না, কিন্তু যেখানে পাপ, লোভ, স্বার্থপরতা, নরহত্যা, চুরি ইত্যাদির ফলে আত্মার ভূমার স্বরূপটি সঙ্কুচিত হয়, খণ্ডিত হয়—সেখানেই পাপ।

আবার এই পাপ-পুণ্যের একটি general law আছে, একটি special law আছে। একটি সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর যেটি special law সেটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ কালে বা ব্যক্তিবিশেষে প্রযোজ্য। যেমন দেশের স্বাধীনতা, ধর্ম,—এসব রক্ষার জন্য নরহত্যা, শত্রুহত্যা এসবে পাপ হয় না।

আবার সিদ্ধপুরুষের আচরণে অনেক সময় পাপ ধরা হয় না। তাঁরা সময় সময় প্রয়োজনবোধে দুষ্টের দমন তো করেন, কিন্তু তাতে পাপ হয় না। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' এই বাণীটি তখন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একবার স্বামীজি আসছেন জাহাজে করে। এমন সময় একটি সাহেব স্বামীজির সামনে হিন্দু-ধর্মের খুব নিন্দা করতে সুরু করল। কিন্তু স্বামীজি তার প্রত্যেকটি ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাকে নিন্দাবাদ থেকে নিরস্ত হতে বললেন ও বোঝালেন। প্রথমে অনেক মিষ্টকথা বললেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সাহেব হিন্দুধর্মকে চূড়ান্তভাবে নিন্দা করে চললে, স্বামীজি সবলে

তার ঘাড় ধরলেন ও বললেন—'One word more I shall throw you out of the board,' তখন সাহেবটি স্বামীজির ঐ বিদ্যুৎবর্ষী চোখ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে স্বামীজির কাছে ক্ষমা চাইলেন। জাহাজের অন্যান্য সকলে স্বামীজির এই আচরণের সমর্থন করল।

আর একটি ঘটনা। কাশীতে তৈলঙ্গস্বামী একবার ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন, ধ্যান করছেন। একজন পাণ্ডা জুতো পায়ে দিয়ে ধুনীর পাশে গিয়ে বসেছে। জুতো পায়ে বসার জন্য ত্রৈলঙ্গস্বামী ইশারায় দেখালেন ও চলে যেতে বললেন। আর জানোই তো পাণ্ডারা যেমন অর্থশালী হয়, তেমনি গায়ে ক্ষমতাও থাকে—কাজেই সে দম্ভভরে বলতে লাগল—'ম্যায় ভি কাশীবাসী, তুম্ ভি কাশীবাসী। অগর কাশীমে দেহান্ত হো যায় ত মৈ ভী মুক্ত আত্মা, ঔর তুমহারা দেহান্ত হো যায় তুম ভী মুক্ত আত্মা। ইসলিয়ে তুম হম্ এক হি হ্যায়।' ত্রৈলঙ্গস্বামী আবার ইঙ্গিতে সরে যেতে বললেন, সে গেল না। তখন তিনি পাণ্ডাজীর দিকে শুধু একবার তাকালেন ;—ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গেই পাণ্ডাটি মারা গেল। এইসব পুরুষদের কথাও আলাদা। আর তাঁরা যে কারণে যে বিশেষ বিশেষ আচরণ করেন, তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থও থাকে না। কাজেই, তাঁরা সাধারণ মাপকাঠির বাইরে।

যতক্ষণ কাঁচা আমির গণ্ডীর মধ্যে রয়েছ, যতক্ষণ আমি তুমি বোধ রয়েছে, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য-শাস্তি এসব আছেই। তাছাড়া কর্মফল আছেই। মরিচ খেলে ঝাল লাগবেই। কিন্তু যখন গুণাতীত হতে পারা যাবে, যখন 'বাসুদেব সর্বম্' এ বোধ আসবে, তখন মনে আসবে অপরিসীম শান্তি—আনন্দ। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে যায় মন। তখন সবই হরিময়।

* * * *

অবতারের কাজ ঘূর্ণিবায়ুর মত। একটি নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে যখন চারদিকের উচ্চচাপ হতে বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে বৃত্তাকারে ছুটে আসে, তখন তাকে সাইক্লোন বলে। এই সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে কেন্দ্রাভিসারী শক্তি আছে। এজন্য বায়ুপ্রবাহ কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, আর সেইজন্যই ঘূর্ণিবায়ু বলে। এই ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি হয় প্রথমে অল্পস্থান জুড়ে, কিন্তু একটি কেন্দ্রাভিসারী শক্তি এর মধ্যে থেকেই যায়।

অবতারের আবির্ভাব ও কাজ ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টির মত অকস্মাৎ। ঘূর্ণিবায়ু যেমন আকস্মিক কারণে আকস্মিকই সৃষ্টি হয়, তেমনি সমাজের নিম্নচাপ-কেন্দ্রের উদ্ভব হলে, অবতারপুরুষ আবির্ভূত হন। অবতারপুরুষের কর্মের

মধ্যেও একটি কেন্দ্রমুখী ও আবর্তনশীল গতি আছে—একটা আপন করে নেওয়ার ভাব থাকেই। ঘূর্ণিবায়ুর কাজ যেমন শুরুতেই অল্প স্থানের মধ্যে প্রচণ্ডবেগে শুরু হয়, পরে বেগে ছুটতে ছুটতে তার পরিধি বিরাট হয়ে যায় —প্রতিবার অবতারপুরুষও তেমনি যতদিন দেহে থাকেন ততদিন তাঁর কাজ বা লীলা আবর্তিত হতে থাকে—কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে, অতি অল্পসংখ্যক ভক্ত নিয়ে। দক্ষিণেশ্বরের লীলায়—ঠাকুরের লীলা—শ্রীমা, দ্বাদশজন পার্ষদ্ ও গুটিকয়েক ভক্ত নিয়ে ; মহাপ্রভু সাড়ে তিনজন অথবা ছয় গোস্বামী নিয়ে বিলাস করলেন। ঠাকুরকে সারা জগতে যেমন স্বামীজীরা ছড়িয়ে দিলেন, মহাপ্রভুর পার্ষদ্ নিত্যানন্দ প্রভু, তাঁর সহধর্মিণী ও অন্যান্য পার্ষদ্গণ বৈষ্ণবধর্ম ছড়িয়ে দিলেন।

অবতারপুরুষ দেহে থাকাকালীন বহু লোককে নিয়ে বিলাসের চেষ্টা করলে, তাঁর concentrated শক্তির ক্ষয় হয়। সেজন্য দেখা যায়, অবতার-পুরুষের শক্তি ও প্রভাব দেহত্যাগ করার পর যেন প্রচণ্ডভাবে দূর হতে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর দেখ ভগবান ঈশামসী, যাঁর ভক্ত বর্তমানে One-third of the world population। তাঁর মাত্র দ্বাদশজন জেলে ভক্ত ছিলেন, তাও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

তবে একটা কথা তোমাদের মনে হতে পারে অবতারপুরুষের আবির্ভাব ঘূর্ণিবায়ুর মত ; এ কেমন কথা—ঘূর্ণিবায়ুর আবির্ভাব তো ধ্বংসই নিয়ে আসে, আর অবতারের আবির্ভাব তো মঙ্গলের জন্যই? কিন্তু এখানে বলতে হয় যে, সাধারণতঃ 'Simile-কে নিয়ে বেশী টানাটানি করা চলে না। ওটা তো একটা Simile ; কিন্তু এর মধ্যেও বোঝবার আছে। ঘূর্ণিবায়ু বা সাইক্লোনে অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যায়—পুরানো, জীর্ণ, নড়বড়ে যা কিছু বেশীর ভাগ তাই ধ্বংস হয়। তেমনি অবতারের আবির্ভাবে ধর্মের গ্লানি ধর্মের সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক দৈন্য অনেকাংশে দূর হয়ে যায় ;—তবে এখন তো কলির প্রভাব খুব বেশী ; তাও দেখ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের আবির্ভাবে ধর্মের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে, গোঁড়ামি দূর হয়ে সমন্বয়ী ভাব এসে গেছে, এমনকি দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রীতিও গড়ে উঠেছে। জনসাধারণ ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল, খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছিল, সেগুলো অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবতারপুরুষ, মহাপুরুষ, সিদ্ধ সাধক—এঁদের বারবার আগমনে সনাতনধর্ম আজও টিকে আছে, আর থাকবেও, আর অন্যায়ের ধ্বংস অনেকাংশেই হয়।

ভগবান আছেন এও ঠিক বলা যায় না। কে বলবে বল? যে বলবে সে তো তদাকারকারিত হয়ে যায়। কাজেই কে বলবে? আর ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে Full conviction ক'জনের আছে? ভগবানের অস্তিত্ব ক'জন বিশ্বাস করে—প্রমাণ করতে পার?

হ্যাঁ, আপ্তবাক্য দ্বারা কিছু বলা যায় বটে। ঋষিগণ মহাপুরুষগণ সাধকগণ যুগ যুগ ধরে তাঁকে জেনেছেন, তাঁর অস্তিত্ব তাঁর কৃপা—এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন বটে, তবে সাধারণ ক'জনে পারে বল বিশ্বাস করতে?

তিনি আছেন একথা খুবই ঠিক, কিন্তু সাধারণ মানুষ যে বলে, 'ঠাকুর আছেন, এটি বেশীর ভাগই একটা ধারণার ওপর নির্ভর করে বলে থাকে। মানুষ যখন সুখে থাকে, তখন বেশ বলে—যে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যখন দুঃখে পড়ে, কি কষ্টে পড়ে, তখন সব ভুল হয়ে যায়—অভিমান, অবিশ্বাস সাময়িক ভাবেও এসে পড়ে। স্বামীজির বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিলেন—মা বললেন, দূর ছোঁড়া, ঠাকুর ঠাকুর করে এই হল, স্বামীজিরও মনে কি রকম গেঁথে গেল—তিনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। অকটারলোনী মনুমেণ্টের তলায় বসে এ যুগের মনুমেণ্টাল কথা—স্বামীজির কথা তো। বন্ধু গাইছে, 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাস পবন'—সেই গান শুনে তিনি চীৎকার করে ওঠেন—'দূর ছোঁড়া, টানা পাখার তলায় বসে 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাস পবন' বলা সহজ—আর পরনে ছেঁড়া কাপড়, পেটে ভাত নাই, মা-ভাইরা খেতে পায় না, তার আবার ভগবান কোথায়? রেখে দে ভগবান! দু'মুঠো খাবার জোগাড় করে দিতে পারেন না। এমনকি ঠাকুরেরও বিশ্বাস ক্ষণিকের তরে নড়িয়ে দিয়েছিলেন,—অবশ্য যদিও এটি একটি বিলাস মাত্র, তবুও সাময়িকভাবে অবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন—ঠাকুর ভাবলেন, তাই তো নরেন যখন বলছে, 'মশাই, ওসব দর্শন-টর্শন সব' আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও মায়ের কাছে গেলেন প্রশ্ন করতে।

আসলে ওটা একটা বিলাস মাত্র। তবে অবিশ্বাস আসাও কিছু বটে, তা ভিন্ন সঙ্গে সঙ্গে দুই চড় বসিয়ে দিলেই তো পারতেন, কিন্তু মানুষ যখন ভাত খায়, তখন যদি কেউ বলে তুমি ভাত খাচ্ছ না ওসব illusion; তখন যে খায়, সে হয়তো তাকে পাগল বলে। আর না হয়তো দুই থাপ্পড় মেরে দেয়। ঠাকুরও তাই পারতেন। কাজেই ভগবানে বিশ্বাস খুব flimsy.

অবশ্য বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আসে;—অতিবড় পণ্ডিতও প্রথমে অবিশ্বাস করলেও শেষে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। ভগবানের অস্তিত্ব bottom-এ থেকেই

যায়, থাকবেই। জগৎ জুড়েও দেখছি, অবিশ্বাস নিয়ে আর ক'জন রয়েছে বল—সাময়িকভাবে অবিশ্বাস করলেও শেষে বিশ্বাস আসেই।

বিশ্বাসের pragmatic value আছে। অবিশ্বাস সাময়িকভাবে এসে পড়লেও পরক্ষণেই আবার বিশ্বাসটাকে বাড়িয়ে দেয়—শেষে মনে একটা conviction এনে দেয় ভগবানের অস্তিত্বে। বিশ্বাসটা আসলে একটা অন্তর-রাজ্যের কথা। মানুষের মন বলছে ভগবান তুমি আছ। দার্শনিক রুশোর কথা—'আমার অন্তর বলছে তুমি আছ'। এই একটা theory চলছে। অবিশ্বাস সাময়িকভাবে আসে, তার ভিত্তি নাই। কিন্তু একজন ভক্ত সর্বদা মা মা করে। সে মায়ের ভক্ত—তার ছেলেটিও ভক্ত, তা তার ছেলেটির মৃত্যু হল, তখন তার মনে ঘোর অবিশ্বাস এসে গেল; ঠাকুর, তোমায় তিনদিন ধরে এত ডাকলুম, ছেলেও ডাকল, আর তুমি ভাল করতে পারলেনা! যাও আর তোমায় ডাকব না—ভগবান নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে—এখন আবার তারা নতুন জীবনযাপনের জন্য তৈরী হবার চেষ্টা করছে। ব্রহ্মচর্য নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অবিশ্বাসের ভিত্তি বেশী দূর নয়। সাময়িকভাবে এসে পড়লেও, বেশী দূর শেকড় গাড়তে পারে না। সমস্ত জগৎ জুড়ে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হচ্ছে এবং প্রত্যেকের মনেই কিছু কিছু বিশ্বাস আছে, তবে অবশ্য বিশ্বাস খুব flimsy জিনিস—আসল ব্যাপারটা কি জান—ভগবৎ-তত্ত্ব লাভ না হলে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় না—আর ভগবৎ তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুরাজ্যের পরের কথা। কাজেই সেই Metapysical রাজ্যের সঙ্গে তো physical রাজ্যে একটা বিবাদ, একটা clash থেকেই যায়। দুটোতে parity কখনও হয় না। আমরা আমাদের ভোগ, সুখ—এই physical জগতের বাসনা চরিতার্থকল্পে যদি সেই Meta-physical রাজ্যের সহায়তা নিতে যাই—তাতে গোলমাল এসে উপস্থিত হবে। সব সময় ফল ফলবে না। আর তখনই আসবে অবিশ্বাস। কাজেই ভগবৎলাভ একটা কিছু বাস্তব জগতের বিষয় নয়—এটা মনোজগতের কথা—ভগবতলাভে মনে আসে প্রশান্তি—ভগবৎলাভে জাগতিক কিছু আসে-যায় না। তাই বস্তুজগতের প্রমাণের দ্বারা ভগবৎবস্তু প্রমাণ করা যায় না। এটি মনোরাজ্যের উপলব্ধি করার জিনিস।

শ্রীমার একটি উপদেশ

পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজের কথা,—"শ্রীঠাকুরের একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়।" শ্রীমাকে ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন,—"ও সারদা-সরস্বতী।" শ্রীমার কথাতেও স্বামীজির ঐ বাণী প্রযোজ্য।

শ্রীমার একটি কথা—"যাতে লোকের উপকার হয় তা করতে হয়। তবে নিজের মন সায় দিলে করবে—না হ'লে নয়।" এই বাণীটির মধ্যেও বহু তথ্য নিহিত আছে। "উপকার কথাটি নীতিশাস্ত্রে বহু ভাবে বহু অর্থে গৃহীত হ'য়েছে। পাশ্চাত্ত্যের মতবাদে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে, কোন কর্মের নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হ'ত, Tribe বা "গোষ্ঠীর" নিরূপিত আইন বা Law অনুসারে। পরবর্তী কালে সমাজ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রথা, আচার-পদ্ধতি নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদের কোন্ কর্ম কল্যাণকর, কোন্টি অকল্যাণকর, উচিত-অনুচিত-এর নির্দেশ দিত। রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপিত নিয়ম পরবর্তী কালে সমাজের যেটি হিতকর ও উচিত তারই বিধান রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যে সমাজের উপর পালনের দাবি করে। দার্শনিক 'হব্‌স', 'বেন' প্রভৃতিদের এই মত। 'ডেকার্টে' 'লক্' প্রভৃতির মতে শ্রীভগবানের আদেশেই নৈতিকতার মাপকাঠি। শাস্ত্র-লোকোত্তর পুরুষদের বাণী, আপ্তবাক্যই, ভগবানের বাণী রূপেই গৃহীত হয়। এইসব মতগুলি কল্যাণকর কর্মের বাইরের নির্দেশ। কিন্তু আমাদের অন্তর-রাজ্যেও কল্যাণকর্মের মাপকাঠি আছে। 'বেন্‌থাম্' 'মিল' প্রভৃতির মতে আমরা যা কিছু করি, সুখের ইচ্ছাতেই করি। কাজেই কোন কর্মের ঔচিত্যের নিরিখ যাহা সুখদ, যাহা কল্যাণকর তাহাই। এই মতের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত সুখই এক দলের মতে কল্যাণের নিরিখ। আর এই ব্যক্তি-গত সুখ হবে ইন্দ্রিয়সুখ। 'আরিষ্টিপাস' প্রভৃতি ও আমাদের দেশের চার্বাক, অজিত কেষকম্বলী প্রভৃতিদের এই মত। অবশ্য এ মত যুক্তি সিদ্ধ নয়; সমাজের কল্যাণকরও নয়।

'এপিকিটুবাস' প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের সুখবাদে চিন্তাশীলতার প্রকাশ থাকে। কেবল ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়জ সুখবাদই মানুষের কর্তব্য হতে পারে না।

সার্বিক সুখবাদ মতের, 'মিল,' 'বেনথাম' প্রভৃতি মনীষীরা বলেন, বহুজনের সুখ যাতে হয় তাই আমাদের কর্তব্য ও কল্যাণকর। হারবার্ট স্পেন্সার

ছিলেন বিবর্তবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে মানুষের কর্মপ্রেরণা নির্ভর করে নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাতে। যে পরিমাণে সে নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে সেই পরিমাণে তার কাজ কল্যাণকর। আর এই সামঞ্জস্যই তার আনন্দের কারণ হয়।

সেনৃলি ষ্টিফেনও সুখবাদী। তবে তাঁর মতে সমস্ত সমাজটির এক জৈবসত্তা আছে। এটি যেন একটি জীবন্ত প্রাণী—প্রাণীর ব্যষ্টি চৈতন্য যেন এর এক একটি কোষ বিশেষ। এই মতে সমাজরূপ অখণ্ড জৈবসত্তা যাতে সুস্থ ও উন্নত হ'তে পারে সেই কর্মই ব্যষ্টি সত্তার পক্ষে করণীয়। সেইটি তার আদর্শ। আলেকজাণ্ডারের মতে প্রত্যেক মানুষের করণীয় হ'চ্ছে সেইটি যাতে সমাজের 'ভারসাম্য' equilibrium ঠিক থাকে। কল্যাণকর কর্ম এই সমত্ব প্রতিষ্ঠিত, সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। সিজ্‌উইক বলেন, 'বৌদ্ধিক' সুখবাদই কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শে স্বার্থহীনতা প্রেরিত হ'য়ে আমরা ভবিষ্যৎ সুখ ও বর্তমান সুখের প্রভেদ বুঝতে চেষ্টা করি। পশুবৎ সুখভোগ মানবের কাম্য হ'তে পারে না। সমস্ত জীবনের সুখই কাম্য তার জন্যে বর্তমানের কিছু অসুবিধা বা দুঃখ আমরা বরণ ক'রে লই।

আর আমাদের হৃদয়ের এমন একটি প্রসারতা আছে যাতে অন্য পাঁচজনের সুখই আমরা আমাদের জীবনে জড়িয়ে নিয়ে চলি। আর আমাদের অন্তরে এমন একটি বিচারশীলতা আছে যাতে আমরা বিচার ক'রে ঠিক করি কোন্ সুখ বেশী কল্যাণকর, সেটি নিজের বিভিন্ন সুখের পক্ষেই হোক বা অন্য মানুষের সুখের বিষয়েই হোক। কেউ কেউ বলেন, নৈতিক বুদ্ধি আমাদের সহজাত। এটি স্বতঃই আমাদের কাজের পিছনে জেগে ওঠে। আবার 'রাসকিন' প্রভৃতির মতে সুন্দরই সমস্ত মঙ্গলের মাপমাঠি।

ডাঃ মাটিন্যুর মতে মনোবিজ্ঞান সহায়তা নিয়ে আমাদের কল্যাণের মানদণ্ড স্থির করতে হবে। আমাদের কর্মের প্রেরণার মূল কতকগুলি মানস প্রবৃত্তি। এগুলির মধ্যে ভালমন্দের উঁচুনীচু শ্রেণী বিভাগ আছে। Primary propension বলতে ইনি আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য সহজাত প্রবৃত্তিকে বুঝেন। Primary passion—ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি, যেগুলি আমাদের সুখকর, অসুখকর বস্তু প্রকাশে উদ্রিক্ত হয়—যেগুলি আমরা পছন্দ করি না। Primary affection—অন্য মানুষ বা অন্য প্রাণীর প্রতি আমাদের যে স্নেহাদি প্রযুক্ত হয় এগুলি তাদিকে বোঝায়। যথা—সন্তান বাৎসল্য ইত্যাদি। Primary sentiments—সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি আমাদের যে সহজ অনুরাগ

এগুলি তাদের বোঝায়। এগুলি হ'চ্ছে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—চিন্তার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে—আর অভিজ্ঞতার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে আর একপ্রকার প্রবৃত্তি কর্মপ্রেরকরূপে এসে উপস্থিত হয়। এইগুলির নাম secondary instinct—। যেমন,—জীবনধারণের জন্য খাওয়া প্রয়োজন কিন্তু সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবনধারণের জন্যে খাওয়া ভুলে গিয়ে লোভের জিনিসে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এইসব কর্ম প্রেরণার মধ্যে নৈতিকতার মাপ আছে। Secondary passion সব চেয়ে কম কল্যাণকর। আর সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর হচ্ছে primary sentiment of reverence, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ।

সর্বপ্রকার সুখের উপর বাস করাই 'এমারসনের' মতবাদ। এঁর মতে সর্বপ্রকার সুখের চেষ্টা বাদ দেওয়াই জীবনের কল্যাণের পরিচায়ক। ইনি বলেন—ইন্দ্রিয়জ ভোগই অকল্যাণকর। চিন্তাশীলতার প্রাধান্য এই মতের বিশেষত্ব। গ্রীসদেশের Cynic, Stoic ও খৃষ্টীয় সাধুদের এইমত ছিল। "সর্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগ কন্থাপ্যসুখং ন করোতি বিরাগঃ" আচার্য শঙ্করের মতবাদে এই মতের রয়েছে মিল। সুখবাদে যেমন সুখই সর্বস্ব তেমনি র‍্যাসানালিজম্ মতে কর্তব্যের অনুরোধে কর্তব্য করাই মূলনীতি। কোন কাজের নৈতিক মূল্য তার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে তার উদ্দেশ্যের শুচিতা নিয়ে (purity of purpose)।

কান্টের মতে মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ বুদ্ধি নিয়ে। কাজেই আমাদের চিন্তাশীলতার আশ্রয় নেওয়াই উচিত। নৈতিক জীবনে ভাববিলাসের স্থান নেই। ইন্দ্রিয়জ সুখের স্থান নেই—স্থান নেই কোন ভোগাসক্তির। নৈতিকতার দাবী হচ্ছে আমাদের অন্তরের অক্লান্ত নিবেদন। নৈতিকতার তিনটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব আছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা, আস্তিক্যবুদ্ধি আর আত্মার অবিনশ্বরতা। নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হ'লে আমাদের ইচ্ছার ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা থাকা দরকার। আর নৈতিক জীবনে একটা সদ্-সঙ্গের দ্বন্দ্ব থাকে। সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি এক জীবনেই সম্ভব নয়। আত্মার অনন্ত গতিপথেই সত্যিকার নৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর সত্যকার সুখ হয়ত এক জীবনে সম্ভব নয়। সত্যকার নৈতিক জীবনের পরিণতি যে সুখ, সে সুখও হয়ত এক জীবনে সম্ভব নয়। সত্যকার-ধার্মিক লোক হয়তো সারাজীবনই দুঃখভোগ ক'রে গেলেন, তার নৈতিক জীবনের পুরস্কার কোথায়? তাই কান্টের মতে পরলোকে আর নৈতিক জীবনের পুরস্কার-স্বরূপ সুখ ও

শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। আর এই শুভাশুভের ফলদাতা একজন আছেন নিশ্চয়। তিনিই নৈতিক জগতের বিধাতা।

আমাদের মধ্যে বিবেকের বাণী হচ্ছে অভ্রান্ত আদেশ যা আমরা না মেনে পারি না। অন্য সব নিয়মের এক একটি উদ্দেশ্য আছে। যেমন স্বাস্থ্যের নিয়মগুলির উদ্দেশ্য সুস্থ সবল হওয়া। কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলির আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। নৈতিক নিয়মগুলির উদ্দেশ্য নৈতিকতা মাত্র। নৈতিকতাই জীবনের চরম পরিণতি বা ফল। কাণ্টের মত এইভাবে নৈতিক জীবনের জয়গানে মুখরিত।

শেষ কথা হচ্ছে আত্মবিকাশের কথা। পাশ্চাত্ত্যের এই মতের নাম self realisation অথবা perfectionism নিজের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করাই জীবনের লক্ষ্য এই মতের চরম কথা।

শুধু সুখই জীবনের কাম্য নয় অথবা শুধু কঠিন নৈতিক জীবনই আমাদের জীবন বেদ হ'তে পারে না সমস্তই জীবনকে বিকশিত করাই এই মতাবলম্বীদের চরম কথা যার যে বিষয়ে উৎকর্ষ আছে সে সেটিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবে তবে তার সঙ্গে শরীর, মন, বুদ্ধি সুন্দরের প্রতি আকর্ষণের উৎকর্ষতার বৃদ্ধি করে। এগুলির এক সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানই পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্য। এইমতে জীবনকে এক অখণ্ড সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা হয়। স্বার্থ নিয়ে আমাদের ব্যক্তি সত্ত্বা আর পরার্থপরতা নিয়ে আমাদের সমষ্টির সঙ্গে যোগ। এই মতে সমষ্টিকে নিয়েই আমাদের বড় হ'তে হবে। নিজের কল্যাণের সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণ চির যুক্ত। সুখের ইচ্ছাকে এমন করে তুলতে হবে প্রজ্ঞার সাহায্যে যাতে সুখ ক্ষণিকের সুখ না হ'য়ে ভূমানন্দের কারণ হয়। প্লেটো, হেগেল গ্রীণ, প্রভৃতির এই মত।

মূল্যই জীবনের মূল কথা। কতরকম মূল্য তত্ত্বই না আছে—দেহের মূল্য; আর্থিক মূল্য, বৌদ্ধিক মূল্য আর নৈতিক ধর্মের মূল্য। এদের মধ্যে নৈতিক আর ধর্মের মূল্য অন্যকিছু আশার উপর নির্ভর করে না। আরবানের মতে যার মূল্য অন্য মূল্য নিরপেক্ষ যার মূল্য শাশ্বত, যার মূল্য প্রয়োজনীয় সেইগুলি অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর'। সত্য, শিব ও সুন্দরের পূর্ণ বিকাশ তাই তাঁকে লাভ করাই সবচেয়ে কল্যাণতম অবস্থা। চরম ও পরম লাভই এই পুরুষোত্তমকে পাওয়া।

গীতায় শ্রীভগবান এই লাভের, এই আদর্শের কথাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলে গেছেন।

পাশ্চাত্য মতবাদে আত্মবিকাশের পদ্ধতির বিশেষ কোন নিরিখ আমরা পাই না। কিন্তু গীতায় ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সমগ্র মানবাত্মাকে নিয়ে গেছেন এই পদ্ধতিতে। কর্মই আমাদের চরম আদর্শের পথের দিশারী। অলস জীবন কোন দেশে, কোন কালেই আদর্শ হ'তে পারে না বা হয় নাই। Lotous eater-দের Dreamland কারীর ভাববিলাসেরই রাজ্য। গীতার কর্ম নিষ্কাম কর্ম—ব্রাহ্মীস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে বশীভূত ইন্দ্রিয় নিয়ে কর্মই মুক্তির কারণ—ভগবত লাভের কারণ। নিষ্কাম কর্মের চারিটি অঙ্গ আছে। সর্বকর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ আর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সব কর্ম করা। এই বিরাট জগতে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। সেই বিরাট বিশ্বযজ্ঞের হোতা—অধিযজ্ঞ হ'চ্ছেন—পুরুষোত্তম স্বয়ং। তিনি এই বিশ্বরক্ষার্থে নিরন্তর কর্ম নিরত। আমরা সকলেই এই কর্মযজ্ঞের অংশভাগী। তবে আমরা যদি নিষ্কাম কর্মযোগ আচরণ ক'রতে পারি, তবেই আমরা আদর্শ কর্মী হ'য়ে তাঁর বিশ্বযজ্ঞের সহায় হ'তে পারি। মানবের দৈব ও আসুর সম্পদ আছে।—এর মধ্যে দৈবসম্পদযুক্ত মানবেরা মুক্তকর্মের অধিকারী। দৈবসম্পদগুলির সংখ্যা গীতামতে চব্বিশটি, যথা—অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, দম স্বাধ্যায় ইত্যাদি। সাত্ত্বিক কর্মই নিষ্কাম কর্ম—এই কর্মই মুক্তির দ্বার। কর্মের ফলাফল অপেক্ষা কর্তার বাসনাত্মিক বুদ্ধিই কর্মের শুভাশুভ বিচারের মাপকাঠি। এইগুলিই গীতার নৈতিক কর্মের বিচার।

বৌদ্ধিক দর্শন নীতির দর্শন। এ দর্শনে সংযম হ'চ্ছে প্রধান কথা। প্রথমত চেতনা সংযম বা ইচ্ছার সংযম। দ্বিতীয়ত মনোবৃত্তির সংযম—তৃতীয়ত মনঃসংযম—চতুর্থত বাক্য ও দেহের সংযম। মনোবৃত্তির সংযম বলতে সাধারণ ভাবে চিত্ত সংযম, মনকে সাধু কর্মে ও সাধুচিন্তায় নিযুক্ত রাখা—শীতাদিতে অভিভূত না হওয়া, জ্ঞানে সর্ব অবস্থায় সংযত থাকা, আর সর্বদা ইচ্ছা শক্তিকে সংযত জীবনে নিযুক্ত রাখা। এইগুলি বৌদ্ধধর্মের শীল বা নৈতিক জীবনের পদ্ধতি। শ্রীমার বাণীতে আমরা 'শব্দবারী' শাস্ত্র বাণীর অরণ্যে পথ হারাই না। মা বলেছেন,—'কি চাইতে কি চাইবে—নির্বাসনা চাই।' এই বাসনাই সমস্ত বন্ধনের মূল। ভগবান বুদ্ধদেবও এই কথাই বলেছেন। মা'র কথায় সহজ প্রার্থনার কথাই আছে আর সার কথাটি আছে। ভগবান বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলে তিনি নিরুত্তর থাকতেন এইজন্যে যে প্রথম করণীয়-গুলি না ক'রে আমরাও বড় বড় বিষয় নিয়ে বৃথা চিন্তা করি। প্রথম পাঠ পড়া শেষ না ক'রে আমরা এগিয়ে যেতে চাই জ্ঞানের দিকে। মাও তাঁর শিষ্য

সন্তানদের ভালভাবেই জানেন—আর জানেন ব'লেই প্রথম পাঠের উপায় দিয়েছেন—নির্বাসন। মা ব'লেছেন,—"কি চাইতে কি চাইবে এক কথায় বলতে গেলে নির্বাসনা প্রার্থনা ক'রতে হয়।" সত্যিই আমরা বাসনার বশে বাসনার জিনিসই চেয়ে নিই ঠাকুরের কাছে। কাজেই সেই বাসনার বীজটিকে ধ্বংস ক'রতে প্রার্থনা জানাতে হয়, তারপর যা আসবে সে কল্যাণের জিনিস। এই কল্যাণের নানা ব্যাখ্যা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাসনাদিগ্ধ মনে ঠিক কল্যাণের নিশ্রেয়ময় বিধান পাওয়া যায় না, তাই শ্রীমা বাসনার ধ্বংসই আগে প্রার্থনা ক'রতে বললেন। "এরপর মনই আমাদের গুরুর কাজ ক'রবে"—শ্রীঠাকুরের কথা। তখন যা কল্যাণতম সেই প্রার্থনাই জানাবে। তখন হৃদিস্থিত হৃষিকেশের হাতে ঠিক ঠিক ভার দিতে পারবো। বৃথা বাসনাদিগ্ধ অহংকারকে সারথি ক'রে জীবন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়গান চাইবো না। শ্রীঠাকুরের উপমা "যতক্ষণ বিয়ে বাড়ীতে ভাণ্ডারী থাকে, ততক্ষণ কর্তা চাবি হাতে নেয় না।" আমাদের বাসনাযুক্ত অহং ভাণ্ডারী স'রে গেলেই না আমাদের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সারথ্য গ্রহণ ক'রবেন।

মা বলেছেন—"লোকের উপকার ক'রবে,—তবে মন যেন সায় দেয়।" নির্বাসনা হবার আগে আমাদের কি ভাবে সেইপথে এগিয়ে যাওয়া যায়—এর উত্তরে মা বলেছেন,—"মনের সায় চাই।" শাস্ত্র, গুরু, মহাপুরুষ এদের উপদেশ কল্যাণকর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার উপায়। তবে মনের সায় চাই। "মন মুখ এক ক'রে কাজ কর।" শ্রীঠাকুরের এই বাণী। এ কথাটীরও গভীর মনোবিজ্ঞান সিদ্ধ অর্থ আছে। এই মন প্রথম মন, যা অন্য এক জায়গায় এটি বলেছেন, "বাবা প্রথম মনের কথা শুনতে হয়।" এটি হ'চ্ছে Intuition বা প্রজ্ঞার বাণী। আমাদের মধ্যে যিনি সর্বসাক্ষী, সর্ব অন্তর্যামী আছেন—এটি তাঁরি বাণী। যদিও সব সময় এঁর কথা ধরতে আমরা পারি না। শুদ্ধ মনে এ বাণীর সম্যক প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধী একেই Inner voice বলেছেন। এই মতের সঙ্গে Intuitionism মতবাদের কিছু মিল আছে।······

শ্রীমার বাণীর অনন্ত দ্যোতনা আছে। আমরা তার কিছুটা এখানে আলোচনা ক'রে মহাকবি কালিদাসের মত,—

ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প বিষয়া মাতঃ
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম—বলেই ক্ষান্ত হ'চ্ছি।

বৈশালী পূর্ণিমা

দেখেছ আকাশটা জ্বলে জ্বলে লাল হ'য়ে গেছে—

সন্ধ্যার একটা তারা সেটাও যেন ঝলসা পোড়া হ'য়ে মিট্‌মিট্‌ ক'রছে পশ্চিমের একটা কোণে।

তৃষ্ণাতুর গাছের পাতাগুলোও হলদে হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়েছে অঙ্গনে।

কিষাগৌতমীর দেবতা জুড়াতে কি পারবেনা এই দাহ······ ?

ভোরের গঙ্গায় সারি সারি আলো দেখেছি—

চোখ জুড়ান সে আলো—ছায়া ছায়ায়।

বেজে উঠেছে যেন প্রভাতীর একটা মাঙ্গলিক।

শান্তির দূত তথাগত এসেছিলেন—ধ্বংসের দূত নীট্‌সেও এসেছিলেন—শান্তির বাণীর কাছে ধ্বংসের বাণীর পরাজয় কি হ'য়েছে—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—ব'লে অর্দ্ধজগতে উঠেছিল যে প্রশস্তি—প্রার্থনা, ধ্বংসের দেবতার কাছে তা'র পরাজয় কি সিদ্ধ—মন এতে দেয় না সায়—কুলঙ্কষা পদ্মার তীর ধ্ব'সে পড়ে, আবার সেখানেই নীড় বাঁধে মানুষ।

বলিদানের মেষ শাবকের ভীরু দু'টি চোখের আকুতি কি জয় ক'রবে না রক্তলোলুপ খড়্গ। শুনঃশেফ কি রক্ষা পাবে না কোন মন্ত্রশক্তিতে······হে করুণার দেবতা আমরা উচ্চারণ করি তোমার প্রেমের মন্ত্র—সর্ব্বে সত্ত্বা সুখিত্ত হোন্তু, অবেরা হন্তু ·····

সুরসাধক ত্যাগরাজ

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতগুরু ত্যাগরাজ ঘরে বসে নিজ ইষ্টদেব রামজীকে ভজন শোনাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতবিদ্যা ও পদ রচনার প্রশংসা তখন অনেক দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেদিন এসেছিল তাঞ্জোরের রাজদূত। ত্যাগরাজের কাছে সবিনয়ে জানালেন রাজ আজ্ঞা, তাঞ্জোর রাজের গুণগাথা রচনা ক'রে গেয়ে তাঁকে শোনাবার জন্য রাজা তাঁকে দরবারে ডেকেছেন। ত্যাগরাজ রামজীর দিকে চেয়ে বল্লেন "কি করি বলুন ? এই যে ঠাকুরটি দেখছেন ইনিই আমার মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছেন। আমি এঁকে ছাড়া আর কারো গুণগান কর্ত্তে পারি না।

এই যে স্বর্ণময় ঠাকুর এঁকে বিক্রী ক'রলে মহাধনী হ'তে, পারতুম কিন্তু ঐ যে সোনালী রং-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে নবঘন দূর্বাদল শ্যাম মূর্তি, উনি আমায় বশ ক'রে ফেলেছেন। তার মোহ আমি ছাড়তে পারি না।" ফিরে গেল রাজদূত। ধনসম্পদ ও সম্মানের প্রলোভন ত্যাগরাজ অবহেলায় ত্যাগ ক'রলেন। এই ত্যাগের জন্য তিনি ত্যাগরাজ নামে প্রসিদ্ধ।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যখন সম্পত্তি ভাগ হয়। তখন রামজীর স্বর্ণমূর্তি তাঁর ভাগেই পড়ে। কলহপ্রিয় ও অসূয়া প্রকৃতির লোক ত্যাগরাজের দাদা তা কোন মতেই সহ্য ক'রতে পারলেন না। একদিন অকারণে কলহ সুরু ক'রে দিলেন ও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রামমূর্তিটি ভরা নর্মদায়। বড় আঘাত পেলেন ত্যাগরাজ দাদার এই ব্যবহারে। প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তিনিও বাণের মুখে লাফিয়ে পড়লেন নর্মদায়। নর্মদা তখন কানায় কানায় ভরা, সেখানে মূর্তি পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

কিন্তু ভক্ত যখন প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে প্রভুর খোঁজে ডুবে গেল, তখন কি তিনি পারেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে? সেই রামমূর্তি তাঁর হাতে ঠেকল। তিনি মহানন্দে বুকে ক'রে তুলে নিয়ে এলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরটিকে। সেই থেকে তিনি নিজেই পূজো ক'রতেন রামজীর। রামজীর জন্য গান লিখতেন আর তাঁকেই গেয়ে শোনাতেন। রামজীর সঙ্গে তাঁর দর্শন হোত, কথা হোত। সুরের রাখী দিয়ে তিনি রামজীকে বেঁধেছিলেন। অদ্ভুত জ্ঞান ছিল তাঁর সঙ্গীতবিদ্যায়। দরবারে ডেকে সঙ্গীতাচার্যপদে ভূষিত ক'রতে চান ত্রিবান-কোরের মহারাজা। এবারেও তিনি বলে পাঠান ভগবৎ অনুরাগই পরমপদ, অন্য পদবীর কি প্রয়োজন। এরূপ বহু উচ্চপদ তিনি অস্বীকার ক'রেছেন। প্রবাদ আছে তিনি ৮৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ সময় তিনি সন্ন্যাস পেয়েছিলেন। দক্ষিণভারতে সঙ্গীত জগতে তাঁর বহু অবদান র'য়ে গেছে।

মেঘের মত মেদুর হ'য়ে আসে

মনিমন্দির থেকে দূর গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকি—মন ভেসে যায় লাল লাল ফুল ভাসাচ্ছে একটি ছেলে, তারি সঙ্গে মনে পড়ে ঝড় এসেছে সন্ধ্যার গঙ্গায়—সঙ্গে বৃষ্টি। হাওয়ার তোড় যেন থামতে চায় না। ঠেলে নিয়ে যায় আমাদের সবাইকে। ছুটে গিয়ে কিনারার দেয়ালে আশ্রয় নি। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় নেমেছে গঙ্গার ঢল। পায়ের থেকে জুতো যায় হারিয়ে। ভয়-চকিত চোখে খুলে দেওয়া রাস্তার জল যাবার পথগুলোর দিকে তাকানো—সেদিনের বর্ষায় ভেজাও ছিল মিষ্টি কত! আবার জানালায় বসে বর্ষার দিনে মুড়ি খাওয়া আর রাস্তার পথচারীদের দেখা সে কত মিষ্টি।.....

চোখে যেন ভেসে আসে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাঁতার কাটছে—পুকুরে দুপাশে 'রাণা' নেমে গেছে, তাই ধ'রে ছেলেরা পিছলে পড়ছে জলের গভীরে, 'রাণার' দুপাশে কল্কে ফুলের গাছ ঘন হ'য়ে জলে নেমেছে—মধু-চিকচিকিরা এসে জলে প'ড়ছে। সেদিনের গান ছিল না—'এ ভরা বাদর, মহাভাদর শূন্য মন্দির মোর'.........

গঙ্গায় বড় বড় ফোঁটা প'ড়তো, সিঁড়ি ধ'রে সাঁতার' কাটা হ'ত। ভেসেও গেছি—। এদিন একটা যেন মোহ সৃষ্টি করে। বর্ষার দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা আর কাগজের নৌকা ভাসান—সে নৌকা যেন 'মন পবনের না'ই ছিল...গল্পের দেশে ভেসে যাওয়া মন। কৃষ্ণকান্ত মেঘের সেদিন আজও যেন ফুরোতে ফুরোয় না ......

খেলার মাঠে বর্ষা দিনের খেলা, পিছলে প'ড়ে যাওয়াতেও একটা কান্না মধুর ছোঁওয়া আছে। ঝড়ের রাতে বুনো গাছের মাথায় জটলা আর তা'র সঙ্গে গান—'ঝড়ের মাতন লাগালো গাছের আগাতে'—আর নাচ—সেকি উদ্দাম নাচ—আজও মুছে যায় নি...ইস্কুলে যাওয়ার পথের ওপর ঝুলে পড়া গাছ থেকে ফুল তুলে নিয়ে যাওয়া রাস্তায়—সে রাস্তা তো আমরা ফেলে আসতে পারিনি...আর ফেরার পথে কিছু কিনে নিয়ে খেতে খেতে আসা...

আজও যেন মেঘের মত মেদুর
হ'য়ে আসে সে দিনগুলি।

একে একে নিবিছে দেউটি

সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র জীবন প্রদীপে শুধু দহনের কাহিনীই ছিল উজ্জ্বল হ'য়ে। ধনীর দুলাল হ'য়ে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও চিরব্যথাই নিয়ে গেছে বুক ভ'রে।

আজ হ'তে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কলকাতার সারপেনটাইন লেনে তার জন্ম হয়। পিতা ছিলেন জাহাজের কারবারে স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী। তার জন্মের এক অদ্ভুত রহস্য আছে। তার জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে এক আত্মার আবির্ভাব হয় সূতিকাগৃহে। সে আত্মা আর কেহ নয়, সম্পর্কে তার মামীমা। সে বলে,—আমার পুত্র এসেছে তোমার কাছে, তাকে ফিরিয়ে দাও। শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃদেবী এতে অনিচ্ছা প্রকাশে, ছায়ার শরীর জানায়—যেন ছেলেকে অনাদর না করে, আরো অনেক কথাই সে জানিয়ে যায়।

প্রথম জীবনেই দেখা যায় দীর্ঘ শিখা বিশিষ্ট বালক ব্রাহ্মণোচিত গুণে শোভিত। সংস্কৃত পাঠ তার পরম অনুরাগের বস্তু—পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে, বাল্মীকির শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণের বর্ণনায়—"তং তু দেশ্চং ন পশ্যমি যত্র ভ্রাতা মহোদয়"···শুনে অশ্রু পারে না রোধ করতে। এই ভ্রাতৃপ্রীতি তার সারা জীবনের সঞ্চয় ছিল—

সেই শৈশবেই তার শ্মশান প্রীতির নিদর্শন এক পরম বিস্ময়। ধনীর দুলাল কিসের হাতছানিতে মৃত্যুতীর্থকে ভালবাসতো তার নিরিখ পাওয়া দুরূহ। পরিণত বয়সেও দেখা গেছে দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সান্নিধ্যে যে শ্মশান সেখানে পরম আনন্দে আছে বসে। শ্মশানের প্রতি টান তার শেষদিন পর্যন্তই ছিল। কাশীপুরের মহাশ্মশান—সে সময় পেলেই গিয়ে দর্শন ক'রত।

কত যে গৃহহীনের গৃহ গ'ড়ে উঠেছে তার পরম বদান্যতায়, কত কন্যাদায় গ্রস্তের দায়কে মাথায় তুলে নিয়েছে পরম আদরে তার হিসাব আজ লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকবে। দান পুণ্যের হিসাব চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে সে রাখতো। ভৃত্যদের বলত সহকর্মী—বৃদ্ধ হ'লে পেত পেন্সন্। সেবার জাহাজের কর্মীরা বিশেষ বোনাস প্রার্থী পূজার সময়। দাবী অত্যন্তই মনে হয় সকলের। রামচন্দ্র তাদের দাবী তখনই মেটাতে আদেশ দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

জানিয়ে দেয় যে তার সঙ্গে অন্তরের যে সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে গেল আজ থেকে। প্রেমের যাদুমন্ত্রে কঠিন হৃদয় যায় গ'লে—সমস্ত বোনাসের অর্থ তারা ফিরে দেয় প্রফুল্লমনে। গভীর শীতের রাত্রে বালীগঞ্জের রাস্তা দিয়ে গেছে বেরিয়ে। সোজা চলে যায় যেখানে দীন নারায়ণরা শুয়ে আছে রাস্তার ধারে। তাদের মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়ে আর মাথার নীচে রেখে দেয় কিছু কিছু অর্থ—আর্তস্বরে বলে—মনে ক'রেছিলুম এদের পাশে শুয়ে দেখব আর্তদের কত ব্যথা! কারো পুত্রের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার ক'রেছে বহন। কারো মূল্যবান পুস্তকের প্রয়োজন—সে পুস্তক এসে পড়ে অযাচিত ভাবে প্রার্থীর হাতে। কারো পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় সামর্থ্য নাই—সে ব্যয়ভার গ্রহণ করে রামচন্দ্র। মৃত্যুর পর জানা যায় কতজনের আর্তি হরণই না ক'রেছে গোপনে। বর্তমান বন্যার্তদের বস্ত্রদান ক'রে গেছে মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও।

ধর্মরাজ্যেও তার দান বহুল। সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম তার বহুল কর্মসূচী নিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে তারি দানপুণ্যে! উৎসব সূচীগুলি সমৃদ্ধ হ'ত তারি অধ্যক্ষতায়। সমস্ত ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত ভক্তদের আগমনে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে আশ্রম প্রাঙ্গণ।

সঙ্গীতজগতে তার দানপুণ্যের কথা অকুণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে এবার All India Music Conference-এ। বহু সঙ্গীতজ্ঞদের সে স্বগৃহে স্থান দিয়ে তাদের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা ক'রত ভূরিদানে। তার বালীগঞ্জের গৃহটি সঙ্গীতজ্ঞদের একটি জলসার স্থান ছিল।

উত্তর ভারতের সব তীর্থপীঠেই সে গেছে আর দান সমৃদ্ধে সেই তীর্থগুলি সবই পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত।

শেষ জীবনে কর্মক্ষেত্র থেকে কতকটা অবসর নিয়ে শান্ত জীবন হ'য়ে উঠেছিল অনবদ্য। সূর্য অভ্যুদয়ে উঠে স্নানাদি সেরে গীতাপাঠ নিত্য অভ্যাসের বিষয় ক'রে তুলেছিল। নিত্য রাত্রে নিদ্রার আগে কথামৃত পাঠ যেন নিষ্ঠার বস্তু হ'য়ে উঠেছিল। আর গীতার একখণ্ড নিত্য সঙ্গী হ'য়েই থাকতো সর্বকর্মে। গভীর রাত্রেও দেখা যেতো তাকে ধ্যান তন্ময় হ'য়ে বসে থাকতে। অথবা আর্তস্বরে উঠত ক্রন্দন ক'রে। ব্যবসাক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা আমরা বিশেষ বলতে পারি না তবে এই প্রয়োজনে দুইবার ইংলণ্ড যাত্রা করে আর একবার অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশও তাকে যেতে হয়। বলাবাহুল্য কর্মব্যাপদেশে যে সব কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল আজ বহুল শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্রই তার প্রমাণ।

জপ কুশলতায়ও কিছু কিছু শক্তি ক'রেছিল অর্জন। জনৈক ব্রাহ্মণের

চক্ষুদান এই ভাবেই হ'য়েছিল—সে ব্রাহ্মণ আজও আছেন জীবিত। সেবারে পেশোয়ারের যাত্রী ছিল রামচন্দ্র আর তার কন্যারা। মধ্যমটি চার পাঁচদিন জ্বরে অচৈতন্য—সহসা রামচন্দ্র গাড়ীর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে ব'লে আধঘণ্টা চুপ ক'রে এক গেলাস জল নিয়ে জপ করে ও রোগীকে খাইয়ে দিতে বলে, এতেই তার জ্বর সত্ত সত্ত ছেড়ে যায়।

মৃত্যুর সময়ে তার শয়ন কক্ষের চারধারে অশরীরীদের আবির্ভাবে সচকিত হ'য়ে উঠেছে সকলে। অসুস্থ অবস্থায় তার শয়ন কক্ষে অশরীরী জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দেখে অন্যেরা হ'য়েছে আতঙ্কিত। মৃত্যুর কিছু আগে সমস্ত ঘর মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী সন্ন্যাসীতে ভরে গিয়েছিল—কমণ্ডলু হাতে দেখে মনে হয়েছিল যাত্রা আসন্ন। আর মহাযাত্রাপথে তাকে সন্ন্যাসী বেশে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে দেখে মনে হয় গীতার কথা,—শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্টোহভিজায়তে। যোগভ্রষ্টই সে ছিল।

তার গুরুর কাছে তার প্রশ্ন ছিল,—নিষ্কাম ভাবে কি ভাবে কর্ম ক'রতে হয়। এর উত্তর সে জীবন দিয়েই দিয়ে গেছে। আজ শ্রীঠাকুর তাকে তুলে নিয়েছেন কোলে…সব দাবদাহ আজ চিরশ্রান্তির অমৃত প্রলেপে গেছে জুড়িয়ে—আমাদের বলা শুধু…

"স্বর্গে যখন বোধন তোমার
মর্ত্যে মোরা রোদন করি।"

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি

১৯৬৬ সালের আম্বালা। সহসা বোমাবর্ষণ সুরু হ'য়ে গেছে হাঁসপাতালের ওপর। হাঁসপাতালে সেবার রোগী আসার কথা, তারা কিন্তু তখনও এসে পৌঁছয়নি। যে ডাক্তারের ওপর ভার ছিল দেখাশোনা করার, তিনি তখন অনুপস্থিত। সহসা আকাশ থেকে হাজার টন বোমা এসে প'ড়ল হাসপাতালের ওপর। রোগীরাও বেঁচে গেলো ডাক্তারও বেঁচে গেলো। ডাক্তারের নিজের মুখের কথা, গিয়ে দেখি ১০০ হাত গর্ত হ'য়ে গেছে, তাঁর মধ্যে ঝরণার মত জল বেরুচ্ছে। আর একটি ঘটনা, এখানেই একটি Military Officer যখন সাইরেনের শব্দ শোনে তখন তার নির্দিষ্ট গড়খাই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে,

দেখে গর্তের মধ্যে দুটি গোখরো সাপ, ছুটে গিয়ে আর একটি গড়খাই এ ঢুকে পড়ে। তারপরই একটি বোমা এসে প'ড়ল সেই গড়খাইএ যেটিতে সাপ ছিল আর officerটী গেল বেঁচে।

পাকিস্থানের যুদ্ধের সময় cease fire হওয়ার পর ছয় ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তখন তার ৪৫ মিনিট সময় পেরিয়ে গেছে। একটি officer মাত্র ১৫ মিনিট আগে বেরিয়ে প'ড়েছে। ঠিক সেই সময় তার মাথায় একটা বোমা পড়ে—এমনি নিয়তি।

বরানগরে সিদ্ধেশ্বরী তলার কাছে কিছুদিন আগে একটি মজুর কাজ করছিল। কাজটা ছিল ঘরের বাইরে। এমন সময় ঝড় জল সুরু হ'য়েছে। সে ভাবলো বজ্রপাতে কেন মরি—ঘরের ভিতর যাই। কিন্তু তার কপালে বজ্রপাতে মৃত্যু লেখা। বাজ এসে প'ড়ল ঘরটির মাথায় আর মারাও সে প'ড়ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা তখনও ভারত ভাগ হয়নি, স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ী ক'রে চলেছে দুটি প্রাণী। সহসা দেখে দু'ফুটের মত উঁচু একটা গাছ কেটে ফেলে রাস্তার ওপর রেখেছে বোধহয় যাত্রী আটকাতেই। যাত্রীদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ছিল একটি ভবতারিণী মায়ের মূর্তি। ভয়ে চেপে ধরে হাতের মুঠোয় সে মূর্তি—৪০।৫০ মাইল বেগে চলেছে গাড়ী—পাহাড়ের রাস্তা। দূরে পাহাড়ের উপর ছোট ছোট গুমটি এতে আফ্রিদীরা বসে আছে বন্দুক নিয়ে। আর চারদিকে কুয়াশায় পথের চারপাশ ভাল দেখাও যায় না। কিভাবে যে গাড়ী সেই গাছ পার হ'ল আজও সেকথা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না—

এই সেপ্টেম্বরের ইরানের ভূমিকম্পে একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা কাগজে বের হয়। একটা বড় বাড়ী গোটাটাই ভেঙ্গে পড়ে। বাড়ীশুদ্ধ লোকই মারা যায়। কেবল ছোট্ট একটি ৫।৬ বছরের ছেলে ভগ্নস্তূপের ওপর দেখা যায়, হতাশ হ'য়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ইরানের ভূমিকম্পে প্রায় ২০ হাজার লোক মারা যায়।

অবতার তত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রশ্ন: ঠাকুর অবতার হ'য়ে না এসে ওখান থেকেই তো মানুষের মনগুলিকে ঘুরিয়ে দিতে পারতেন, অবতার হবার কি দরকার ছিল?

শ্রীঠাকুর: প্রথম সিসৃক্ষা যখন তাঁর হলো, এক হ'তে বহু হবার কামনা যখন তাঁর জাগলো, তখনই এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি হলো—বিরাটকায় হাতীটা থেকে ক্ষুদ্র পিঁপড়েটা পর্যন্ত কোথাও শক্তির অল্প বিকাশ, কোথাও শক্তির বেশী বিকাশ। ছোট আগুনটাও ক'রলেন, আবার বড় আগুনটাও ক'রলেন। অবতার হ'লেন এই রকম বড় আগুন—'অবতার' এই নামটাই মানুষ দিয়েছে। দুটো theory আছে, একটা বলে mass mindই অবতার তৈরী করে, অর্থাৎ দুঃখেকষ্টে পড়ে, দুর্বিষহ যাতনায় আকুল হ'য়ে মানুষ যখন সমবেত ভাবে চীৎকার করে, আর পারি না, হে ভগবান! রক্ষা কর, তখনই অবতার আসেন। আবার আর একটা আছে, যাতে বলে, অবতার এসে সাধারণ মানুষের মনের গতি ফিরিয়ে তাদের শান্তি এনে দেন। বিচারের দ্বারা মীমাংসা হবে না, কোন দিন হয় নাই। অবশ্য আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে বিচার ভাল, আর শুধু বিচার তর্কাদি intellectual feats ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী। Bertrand Russel-এর মত intellectual giant এর কাছে গেলে তিনি তোমাকে যা খুশী বুঝিয়ে দেবেন। তিনি যেমন বলেছেন—সাধুও ত্যাগ করে মাতালও ত্যাগ করে। সাধু—তার আত্মসুখের জন্য স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গের দিকে তাকায় না, তাদের ত্যাগ করে—মাতালও মদ খেয়ে আত্মসুখ পাবার জন্য তার পরিবারবর্গের গহনাগাঁটি, জিনিসপত্র নষ্ট করে, তাদের দিকে তাকায় না। দুইয়ে তফাৎ কি? এই রকম বহু যুক্তি তাঁরা দেন সেগুলো কাটা বহু সময় শক্ত, কিন্তু সেগুলো মূল্যহীন। সিসৃক্ষার ফলে সৃষ্টি হলো, আবার যখন ইচ্ছা হয় তখন ধ্বংস, মড়ক, যুদ্ধ এনে প্রলয় ক'রলেন। যখন পোকাগুলোর সংখ্যা বেড়ে ওঠে, সেগুলো চতুর্দিকে কিলবিল্ ক'রে বেড়ায়, তখনই দেন কতক গুলোকে মুছে—ইচ্ছায় কৃমিকীটকে হিমালয়ের শিখরে তুলছেন, আবার ইচ্ছে হ'লে হয়ত সাগরে ডোবাতে পারেন। একটা কথা পড়েছি—A day may

come, when the very graves will throw up their dead bodies. কোথায় শেষ, এর পর কি হবে কে জানে, কে বলতে পারে? আমাদের কাজ, বিশ্বাস—জোর ক'রে তাঁর চরণ শরণ নিয়ে পড়ে থাকা। তাঁর কাজ তিনিই বোঝেন, তাঁর খেলা তিনিই জানেন। প্রশ্ন যদি ক'রতে হয় তাহ'লে তাঁকেই ক'রতে হয়, কিন্তু তিনি কোথায়?

প্রশ্ন: জার্মান Psycho-Analyst সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে দিলীপবাবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস সম্বন্ধে তাঁর কি মনে হয়—এই যে তাঁর ভগবানকে চোখে দেখা ইত্যাদি সে সম্বন্ধে তিনি কি বলেন? তাঁতে তিনি বলেছিলেন—কালী কালী ক'রে তার মাথা খারাপ হয়েছিল, ভগবানকে কি দেখা যায়?—এ সম্বন্ধে, ঠাকুর আপনি কিছু বলুন।

শ্রীঠাকুর: প্রথমত: শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, তাঁর কথাবার্তায়, আচরণে এমন কেউ কিছু দেখেনি যাতে তাঁকে পাগল বলা যায়—যে লোকের কাছে গিয়ে তাঁর স্পর্শমাত্র লোকের চেতনা হ'য়েছে, তার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়েছে সে এক নতুন মানুষ হ'য়ে ফিরেছে, তাকে পাগল বলা যায় কোন্ যুক্তিতে? আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাঁর কথা নিয়ে পণ্ডিতের দল মাথা ঘামাচ্ছেন, যাঁর জীবন একটা অদ্ভুত জিনিস বলে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মেনে নিয়েছেন, তাঁকে ফ্রয়েডের মত একজন লোক পাগল বল্লেই কি তিনি পাগল হবেন? তাঁর এ অনধিকার চর্চাই বা কেন? তিনি একজন Mental hospital-এর ডাক্তার, স্বপ্নতত্ত্ববিদ্—ধর্মের আদি পাঠও তাঁর কখনও হয় নাই অথচ ঐ সম্বন্ধে একটা মত চালিয়ে দেওয়া তাঁর অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কি? সৎলোক হ'লে তাঁর বলা উচিত ছিল—অনেক বৈজ্ঞানিক যেমন বলে থাকেন—ওটা আমার sphere নয়, আমি ও সম্বন্ধে কখনও কোনও আলোচনা করি নাই, কাজেই ও বিষয়ে আমি কোনও মত দিতে পারি না—কিন্তু নির্বোধের নাই প্রমাদের ভয়; বিশেষ তাঁর স্বপ্ন-তত্ত্বের গবেষণাগুলি পড়লে তাঁর নিজেরই মনের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না—আমরা বলি নিজে পাগল না হ'লে এমন পাগলামিপূর্ণ কথা কেউ বলে না।

প্রশ্ন: শ্রীঠাকুরকে অবতার বলবো কেন?

শ্রীঠাকুর: ইংরাজীতে একটা কথা আছে, এটা আমি প্রায় বলে থাকি—The proof of the pudding is in the eating there of—কাজেই তাঁর কথা যে আধ্যাত্মবোধে ঘোর সংশয়বাদী, পশ্চিমের মনীষীরাও নিচ্ছেন,

এর থেকেই তাঁর অবতারত্ব বিষয় সপ্রমাণিত হয়—হল্যাণ্ডের জনৈক মনীষী বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে চেনা না দিলে তাঁকে চেনা যায় না।

পাশ্চাত্ত্যের লোক যে এই কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে Man-God বলেছেন এইটাই কি একটা বড় প্রমাণ নয় এর স্বপক্ষে—বিচার, তর্ক, বুদ্ধি দ্বারা জানতে গেলে কি এর কিনারা করতে পারা যায়?

Intellect দিয়ে কোন দিন এ-জিনিস ধরা যায় না, বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়—হে ঠাকুর! তুমিই জানিয়ে দাও, তিনি যদি কৃপা ক'রে জানান তবেই জানা যায়, নইলে মানুষের সাধ্য কি তাঁকে জানে? অহঙ্কার ছেড়ে, তর্কবুদ্ধি ছেড়ে, বিচার বাদ দিয়ে তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করাই আমাদের উপায়, নিরক্ষর এই জ্ঞানসিন্ধু ঠাকুর, তাঁর সন্তানেরা যে পাশ্চাত্ত্য দেশ জয় করে আসবেন একথা কত আগে বলেছেন—যার অর্থ তখন বোঝা যায় নাই, পরে বোঝা গেছে। একবার বলেছিলেন—একটা দেশে গিয়েছিলাম ভাবে, সেখানে সব লোকদের নীল নীল চোখ, ধবধবে রঙ— তাঁর সন্তানেরা যাবেন তাই কত আগে গিয়ে সেখানকার লোকদের দর্শন দিয়ে জানিয়ে এসেছিলেন যা এপারে প্রকাশ পেয়েছে—Frank Dorac নামে একজন বিদেশী আর্টিষ্ট তাঁর দর্শন পেয়ে তাঁর ছবি এঁকেছিলেন—যে ছবি আজও কলকাতা বেদান্ত মঠে বর্তমান আছে। মহাপ্রভুর সময় থেকে ঠাকুরের সময় পর্যন্ত এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ভারতের মত জায়গায় ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ, সিদ্ধ পুরুষতো বহু বহু জন্মে গেছেন, তাঁদের তো কেউ অবতার বলে গ্রহণ করেনি, ঠাকুরকেই বা নিল কেন? ঠাকুরের লীলাকালেই কেশব সেন, যাঁর খ্যাতি ইউরোপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, যাঁকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব'লে লোকে জানতো বা বলতো, রামমোহন রায় যিনি একটা নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতী যাঁর পাণ্ডিত্যে সমস্ত ভারত মুগ্ধ যাঁর এক একটা সভায় লক্ষ লোকের সমাগম হতো, একটা সম্প্রদায়ে'র যিনি স্রষ্টা—ত্রৈলঙ্গ স্বামী যাঁকে কাশীর সচল বিশ্বনাথ ব'লে লোকে পূজা করতো এবং ঘড়াঘড়া গঙ্গা জল মাথায় ঢালতে দ্বিধা বোধ করতো না, স্বামী ভাস্করানন্দ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলে যাঁর খ্যাতি ছিল—এমন কি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অদ্বৈত সাধনার গুরু তোতাপুরী এঁদের কাকেও তো অবতার বলে কেউ গ্রহণ করে নাই, তবে একজন নিরক্ষর কলকাতার কোনও জমিদারের দেয়ারামের একজন বেতনভোগী পূজক তাঁকেই বা গ্রহণ করলো কেন? একদল আছেন, যাঁরা বলেন স্বামীজির গুরু, তাই স্বামীজির চেষ্টায় তিনি

অবতার হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁকে কোনও দিন অবতার বানাবার চেষ্টা করেন নি, বরং উল্টোটাই বলতেন—আমি চাইনা ঠাকুরকে অবতার বানিয়ে ঘণ্টা নেড়ে তাঁর পূজা হোক ও আবার একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হোক। তিনি মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে ও আদর্শে বেদান্তবাদের প্রচার ও প্রসার ও সনাতন হিন্দুধর্মের সংরক্ষণের চেষ্টা আর বিরাট কর্মবাদের মধ্যে দিয়ে বেদান্ত ধর্মের প্রচলন ক'রে গেছেন। অবতার আসেন mass-এর তারণের জন্য। দেখ এই থেকে আমার মনে হয়, যে দেশের লোক যে ভাবাপন্ন তারা সেই ভাবেই তাদের তারণের জন্য তাঁকে আকুল আগ্রহে ডাকে এবং তিনি সেই ভাবেই সেখানে আসেন। ভারতবর্ষ চিরকাল আধ্যাত্মিকতার রাজ্য বলে খ্যাত, সেখানে লোকে আধ্যাত্মিকতার গ্লানি হ'তে মুক্তি পাবার জন্য তাঁকে ডাকে, তাই সেখানে তিনি হ'য়ে আসেন ধর্মরাজ্যের অবতার। আবার ইউরোপ তাঁকে তাদের চাহিদা অনুসারেই পেয়েছে হিটলার, মুসোলিনী, ষ্টালিনের রূপে, আবার আমেরিকা পেয়েছে হেন্‌রিফোর্ড, রকৃচাইল্ডরূপে। আবার বর্তমানে ভারত রাজনৈতিক মতবাদের প্রাবাল্যের জন্য তাঁর ঐ ভাবের বিকাশ প্রার্থনা করেছিল, ফলে গান্ধীজির মত একজন মহাশক্তিধর ধর্মপুষ্ট রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব। "এবারের অবতার—বিশ্বের অবতার, সমস্ত বিশ্ব বৃংহন মুখে চলেছে—এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স। ব্রহ্মের অর্থই বৃংহন। অবতার তত্ত্ব তাই বেড়ে চলেছে। পূর্বে যিনি রাম রূপে এসেছিলেন, কৃষ্ণরূপে এসেছিলেন, তিনিই এবার ঠাকুর হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে শ্রীঠাকুর পড়েছেন ছড়িয়ে সে দেশের ঠাকুর হ'য়ে ভারতের তো কথাই নাই। যাই হোক বিশ্বের কণ্ঠে তখন তাঁর অবতরণের জন্য কি করুণ ডাক উঠেছিল জেগে, সে কথা বিশ্বের ইতিহাসেই রয়েছে ধরা"—

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিস্ বাণী

দীক্ষার পর মনে একটা অস্থিরতা আসতে পারে। এখন উপায় হ'চ্ছে দৃঢ়তার সঙ্গে জপাদি করা। মন না বসলেও জপ ক'রবে। ধ্যান না ক'রলেও চলবে। ক্রমাগত জপ ক'রবে, যেন জপে ডুবে থাকবে, আর কাতর হ'য়ে প্রার্থনা ক'রবে যেন তাঁর কৃপা হয়—জীবন ধন্য হয়। গ্রন্থপাঠ যেন রেখো। সৎ বই পড়া একান্ত প্রয়োজন। আর পাঠ ও গীতার এক-একটি শ্লোক মুখস্থ ক'রবে। নিজেকে গ'ড়ে তুলতে হবে ধীরে ধীরে। সমস্ত আসক্তি নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে। বাসনা-কামনা মন থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। এই পথে শুষ্কতা, অশান্তি খুব বেড়ে উঠবে, জ্বালায় জ্বলে তবে মন খাঁটি হয়, শ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করবার উপযুক্ত হয়। ত্যাগ ও তপস্যা জীবনের মূলমন্ত্র ক'রে নেবে। "শ্রীমার কথা" বইটি এনে পড়বে। তাঁর কথাগুলি বেশ ক'রে মনে গেঁথে নেবে। শক্তিমতী হ'তে হবে। সংসারচক্র যদি কাটাতে চাও তবে ভয় পেয়ো না। দুঃখকে বরণ ক'রে উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে চলে যেতে হবে। কাউকেও বিশ্বাস ক'রবে না, কারও ওপর আশা-ভরসা রাখবে না। প্রভুই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হোক।

প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপালাভ কর। জীবন ধন্য হোক। আশিস্ নিও।

* * * *

সকলে শান্তিতে থাকবে। মনে রেখো জগতে কোথাও শান্তি নেই। যতক্ষণ না নিজের মধ্যে শান্তি পাবে জগতের কেউ কোন শান্তি দিতে পারে না। শান্ত ও ধীর হ'য়ে যাও—ঠাকুরের চরণে এই আমার একান্ত প্রার্থনা। সংসারে যেটুকু করা প্রয়োজন সেটুকু ক'রবে আর বাকী সময় শ্রীঠাকুরের নাম ও ধ্যান যতদূর পারবে ক'রে যাও। কেবল জপ ও ধ্যান ক'রে যাও অন্য পথ নাই।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না।

শান্ত হও, সমস্ত সহ্য করিয়া চলিবে। নামটি সকল অবস্থায় করিয়া যাইবে। গীতাটি পড়িও। ওর ভিতর ভাল শ্লোকগুলি দাগ দিয়া লইও। সেগুলি বার বার পড়িয়া মনে রাখিতে হইবে। আশিস্ নিও।

* * *

এই প্রথম বৈশাখের কথায় মনে হচ্ছে যে মহাকাল দাঁড়িয়ে আছেন—হ'য়ে রুদ্র ভয়াল···আর সমস্ত বিশ্ব তাঁর চরণের তলায় স্রোতের মতন সব এক-এক

ক'রে তাঁর চরণে যেয়ে মিশছে—এই যে বিরাট এক মহাকাল দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রতি আমাদের যেন দৃষ্টি থাকে।

সংসারে হাসি আছে, আনন্দ আছে, সব আছে, ফুল আছে, গান আছে; কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে—ঠাকুর একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন;—যে একটি মাতাল মা দুর্গাগে দেখে বলছে,—মা যত না কেন সাজোগোজো ওই দশমীতে টেনে ফেলে দেবে। ঠাকুরের রহস্যের তো তুলনা নেই···তা যাই হোক আমরা যেন মনে রাখতে পারি যে আমাদের বছর এরকম ক'রে চ'লে যাচ্ছে—পেরিয়ে যাচ্ছে—মহাকালের চরণে গিয়ে সেগুলি পৌছোচ্ছে...

ভালো জিনিসটা আমরা যেন দিতে পারি, শুভ জিনিসটি আমরা যেন দিতে পারি—'যত্তে কল্যাণতম রূপং'- উপনিষদের কল্যাণতম রূপটি যেন আমাদের ঐ মহাকালের চরণে গিয়ে পৌছায়। দিনে দিনান্তে মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা যেন এই রকম দিতে পারি—বছরের প্রথম দিনে আমাদের এই প্রার্থনা ঠাকুরের চরণে····· কল্যাণতম যা কিছু, তা যেন আমরা তাঁর চরণে দিতে পারি, আর আমাদের প্রার্থনা Do not lead us into temptations—হে প্রভু আমাদের গোলমালে ফেলে দিও না। আর একটি কথা হচ্ছে যে, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণা মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্।' হে প্রভু তোমার রুদ্র রূপ আছে; বিরাট রুদ্ররূপ···কোথায় মহাবীর অর্জুন কোথায় এঁরা সব, কোথায়—স্যামসন, ওখানে ওদেশে হারকিউলিস; বড় বড় সব শক্তিমান পুরুষ মহাকালের চরণে তাঁরা গিয়ে মিশে গেছেন—তা আমাদের এইটুকু ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা যে; রুদ্ররূপ ঠাকুর তোমার কাছে; কিন্তু তোমার দক্ষিণা মুখ; তোমার কল্যাণতম মুখ,—তোমার শান্তি এবং তোমার স্বস্তির যে রূপ—সেটি যেন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়।

আগামী বছরে আমরা যেন তোমার চরণায়িত হয়ে তোমার পায়ে মাথা নীচু করে থাকতে পারি সর্বস্থায়—শান্তি মঙ্গলে···

ধর্মে নূতন খাতা

ধর্মের খাতায় জমা-খরচ দেখা চাই। সারা বছরের হিসাব-নিকাশ, দক্ষ হিসাব পরিদর্শকের হাতে করিয়ে নিতে হয়। গুরুই এর অডিটার। লাভ ক্ষতির হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর হওয়া দরকার আর তারই উপর নববর্ষে নূতন খাতা যেন আমরা খুলতে পারি—পুণ্য মনে, পুণ্য স্থানে, ইষ্টকে সাক্ষী করে। আমাদের ধর্ম জীবনের নূতন খাতায় প্রথম পাতায় অঙ্ক যেন লাভের কোঠায় থাকে। যেন নববর্ষে আমরা ধর্মের কারবারে দেউলিয়া না হ'য়ে যাই—যেন আমাদের কারবার জয়লাভের হয় এই প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে যেন আমরা করতে পারি ইষ্টের চরণে—যেন মনে রাখি ধর্মের কারবার সব কারবারের উপর। এই কারবার অনন্তকালে বিধৃত। ইহ-পর-কাল বিস্তৃত।

শ্রীঠাকুরের অবতারত্ব

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের কয়েকদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেন মনে মনেই…এখন যদি বলতে পার তুমি অবতার তবেই মানব এই কথা।

শ্রীঠাকুর অন্তর্যামী। তখনই বলেন;—যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণ রূপে এসেছে; তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়। পরলোকের আত্মারাও শ্রীঠাকুরের অবতারত্ব স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। বীরভূমের এস. ডি. ও. শ্রীযুক্ত ভূপেন অধিকারী মহাশয়ের শিশু পুত্র মৃত্যুর পর পিতার কাছে প্রকাশিত হ'য়ে বলে যে—সে শ্রীঠাকুরের দর্শন পেয়েছে। তাকে তার পিতামাতা আর ডাকলেও পাবে না। বলা বাহুল্য, পিতামাতারা প্রেতচক্রে ছেলেটিকে প্রায় ডাকলেন। আরো, ঐ শিশুটি বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিল। ভূপেন বাবু একথা আশ্রমের সকলের সম্মুখে প্রকাশিত করেন।…১৯৪৭ সালের এই ঘটনা। পরলোকতত্ত্ব ঠাকুরের সম্পর্কে আরো আছে।

শ্রীঠাকুরের কোষ্ঠী বিচার অনুসারেও আমরা শ্রীঠাকুরের অবতার তত্ত্বের প্রমাণ পাই।

দীনের আর্তি

১৯৪০ সালের একটি ঘটনা। মধুপুরে একটি বাড়ী। মধুপুরের বাড়ী-গুলির এক একটি নাম আছে, অনেকে জানেন। যেমন—'শান্তিনিকেতন' 'শুভ্রা'·· বাড়ীটি বিশেষ বড়লোকের। একদিন ভোরবেলা এক সন্ন্যাসী ভজন ক'রতে ক'রতে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ইষ্টের সেবার জন্য কিছু ভিক্ষার প্রয়োজন ছিল। কণ্ঠে হরিগুঞ্জন, কিন্তু দারোয়ান দেয় তাড়া, গালমন্দও থাকে তার সঙ্গে। বাবুরাও দেন সায়। ব্যাপারটি একটু বেশীরকম ঘোরাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সাধু হাত তুলে অভিসম্পাত দেন! ভগবানের রোষে নির্বংশ হবে। সাধু যান চ'লে। কিছুদিন পরে বংশের একটি ছেলে বিলেত থেকে পাশ ক'রে ফিরে এসেছে। হঠাৎ দেখা গেল তার সমস্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেকে দেখেছে ছেলেটিকে একটা ঠেলাগাড়ী ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর বড়ভাই ঐ রোগে পড়ে এবং সব ছেলেরাই ঐ রোগে মারা যায়।

বিশেষ নামী বাড়ী, বাড়ীর একটি কিংবদন্তী আছে। বাড়ীতে পৈত্রিক শালগ্রাম ছিল। গৃহকর্তা যখন ব্রাহ্মধর্ম নিলেন তখন এই শিলাটী ছেলেদের ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। কেউ রাজী হ'ল না শেষে সেজছেলে এই কাজে এগিয়ে যান। কিন্তু অন্য ভাইরা এই শিলা গঙ্গায় বিসর্জন দিতে দেন নি। সে বাড়ীতে এই শিলা পূজিত হচ্ছেন অনেকেই জানেন। সেই ছেলেটি এই মূর্তি ফেলার পর একবার জমিদারী দেখতে যান এবং সেখানে হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ। সেই থেকে নাকি তাঁর বংশে ৪০।৪৪ বৎসরের বেশী কেউ বাঁচে না।

ছোট্ট একটি শহর নাম করা একটি বর্ধিষ্ণু ঘরের কথা। গৃহকর্তা আইন ব্যবসায়ী। একদিন দুপুরবেলা কি কারণে উত্তেজিত হ'য়ে ঘরে ফিরছেন। সহসা দেখেন গৃহের ব্রাহ্মণঠাকুর খেতে বসেছেন। উদ্ধত রোষে মারেন লাথি। বুভুক্ষিতের সমস্ত অন্ন ছড়িয়ে পড়ে। আর্ত নিরুদ্ধ বুক থেকে এক অভিশাপ বেরিয়েছিল। গৃহকর্তার এরপর থেকে অন্নাহার চিরদিনের মত বন্ধ হ'য়ে যায়।

বর্তমান বৎসরের আর একটি ঘটনা···কোন অবস্থাপন্ন ঘরের কথা সে বাড়ীতে ভিক্ষুক এসে পায় না ভিক্ষা, প্রাসাদোপম গৃহ। পাথরের মেঝে ঝকঝকে তকতকে; এরা বুভুক্ষিতের কথা বুঝতেও পারে না। যাই হোক

সেদিন এক সাধু এসেছেন দুয়ারে, সাত্বিক মানুষ বুঝতে পারেন না যে এখানে তাদের আসা অনুচিত—তাদের আসায় যে গৃহ ধূলায় মলিন হ'য়ে যাবে একথা তারা ভাবতেই পারেন না। সহজভাবেই এসে দাঁড়ান গৃহ-প্রাঙ্গনে। হয়ত মনে হয়েছিল সাধুর কল্যাণে এ গৃহের কল্যাণই হবে। কিন্তু হিতে বিপরীত। গৃহকর্তা সাধুকে করে লাঞ্ছনা তখন সাধু তার দেবতাকে স্পর্শ ক'রে দেন অভিসম্পাত। অচিরে এই দুষ্কর্মের ফল যায় ফলে। গৃহকর্তা হয়ে পড়েন অতিশয় রুগ্ন।

আরো অনেক আগের কথা এমনি এক উপবাসী সাধু এসে দাঁড়ালো ফৈজাবাদে এক হালুইকরের দোকানে। রামজীর পারণকল্পে চান সামান্য কিছু ভিক্ষা। দোকানী রাগত হয়ে করে গালাগালি। সাধুর পারণের সময় চলে যায় ভেবে অনুনয় করে দোকানীকে। তারা তখন দুইজনে তাঁকে করে প্রহার। সাধু বিপন্ন হ'য়ে চলে যান শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—হায়রে রামজী! ফিরতি পথে দেখেন গুরু ছুটে আসছেন। বলেন তুমি কি করেছ রামজীকে জানালে। দু'জনে এসে দেখেন দোকানীর ছেলেকে সাপে কামড়িয়েছে। আর তার দোকানে লেগে গেছে আগুন। দরিদ্রের আর্তি ভগবানের আসনও টলিয়ে দেয়।

টালিগঞ্জে এটি। ঘটনা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। ওখানকার মণ্ডলেরা খুব ধনী ছিল। জাগ্রত ঠাকুর শালগ্রাম শিলা গৃহে নিত্য পূজিত হ'তেন। কিন্তু অর্থ হ'লে যেমন হয়। ধীরেধীরে পূজা যেন কথার কথা হয়ে যায়। একদিন পুরোহিতও তাড়াতাড়ি সময় বুঝে কোনরকমে পূজা সারতে থাকেন। খানিকটা গরম দুধ ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেই চলে যান। শ্রীঠাকুর স্বপ্নে জানান,—এমন অবজ্ঞার পূজা আর নেওয়া হবে না। ঠাকুরের অপ্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও পুত্রাদি সবই ক্রমে অন্তর্ধান করল।

কলকাতার হরিশ মুখার্জির রোডের দেওয়ান গোবিন্দরাম নেপাল থেকে নিয়ে আসেন শালগ্রাম শিলা। কণ্ঠে বেঁধে পায়ে হেঁটেই আসেন তিনি। প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এক সময় এঁদের বংশে ভায়ে ভায়ে বিরোধ বাধে। যখন সম্পত্তি ভাগ হয় তখন এক সরিক রাত্রে শালগ্রাম শিলাটিতে মাথা ঘসতে থাকেন—প্রার্থনা এই যেন বখরায় বেশী পান। এই স্বার্থপরতায় ঠাকুরের অভিশাপে বখরা কম তো পেলেনই আরো অন্য সব কারণে নির্বংশ হয়ে যান। ঐ বংশের চারটি শিব প্রতিষ্ঠিত। আজো প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিত্য দুধ, মধু এসব পঞ্চগব্যে স্নান হয় ঠাকুরের। একদিন বিরক্ত পুরোহিত শিবমূর্তির অঙ্গে

নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ঘসে। রাত্রে ত্রিশূল নিয়ে শিব সংহার মূর্তিতে দেন দেখা। তখন বিশেষ পূজাদি করে চারদিকে গাঁথনি দিয়ে কয়েকদিন শিবের শাস্তি বিধান হয়।

এলাহাবাদে নাম করা একটি বংশ। এদের মধ্যে পদস্থ কর্মচারীও ছিলেন। একদিন যেন বজ্র বিদ্যুতের মত জনৈক সাধু এলেন গৃহে কিছু ভিক্ষার আশায়। অর্থ বেশী হলে যা হয়। অহঙ্কারের বশে গালাগালি দিয়ে দেন তাড়িয়ে। হয়ত সাধুজী যাবার সময় কিছু বলেছিলেন। ছেলেরা সে কথা বাবাকে দেয় বলে। তিনি সাধুকে ডাকিয়ে দেন প্রহার। সাধুর অভিশাপে তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। অর্থ সম্পত্তিও কর্পূরের মত গেছে উবে।

আগষ্ট মাসের যাত্রা আর অগস্ত্যযাত্রার নামে অনেকটা মিল আছে, তবে ভক্তের পিছনে ভগবানের বরাভয় হস্ত সব সময়েই থাকে। অগস্ত্যযাত্রা তাঁর কাছে বিফল।—সল্লম্

ভক্ত কবিরাজ কর্ম ব্যাপদেশে চলেছেন রিক্সায়। ধানবাদের ষ্টেশনের রাস্তায়। গড়ানো রাস্তা—তীরবেগে রিক্সা নামছে। সহসা উল্টে যায় গাড়ী। ঠিকরে পড়ে ভক্ত। ওদিকে ছুটে আসছে একটি ট্রাক। ভক্তের হাতে তখন জপমালা—অশরণের শরণ ভগবানে স্মৃতি ভেসে ওঠে। জ্ঞান হলে চেয়ে দেখে চারদিকে লোক। দু'হাতের কাছে ট্রাকটি দাঁড়িয়ে। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি দোকানে। ভক্তটি সংজ্ঞা পেয়ে করে শ্রীঠাকুরের জয়গান।

সমবেতদের মনেও জাগে তাঁর জয়—।

মানবজীবনে ভগবৎ স্মরণ—মনন অব্যাহত রাখতে কয়েকটা স্মরণীয় কথা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কাজেই তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য করা উচিত তাঁকে লাভ ক'রবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংসারে চলা উচিত। তাঁকে লাভ করলেই সব লাভ করা যাবে। আর তাঁকে ছাড়লেই কোন জিনিসই দাঁড়াবে না। জগৎটা তাঁতেই বিধৃত।

মনের ভূমার সাধনের অভাবই মনের ক্ষুদ্রতা হয়। প্রত্যেকে নিজের চশমা নিয়েই দেখে। কিন্তু যদি অন্যের চশমা নেওয়া যায় তবে উদারতা বেড়ে যায়।

সবার চশমা যদি পরা যায়, ভূমার চশমা পরতে পারলে, প্রেমের চশমা পরতে পারলে ভগবৎ লাভ হয়। "বাসুদেব-সর্বম্" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

মনকে-ঊর্ধ্বমুখী করতে হ'লে বিষয়ের ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। সব জিনিসের মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে চেষ্টা ক'রতে হবে। ঝগড়া, গোলমাল, হিজিবিজি সবেরি মধ্যে ঠাকুর আছেন মনে ক'রতে হবে। আর যা কিছু উঁচু জিনিস, যা কিছু ভালো জিনিস, যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর তাতেই মন রাখতে হবে।

এজন্যে প্রয়োজন নিত্য অভ্যাসের। আবার অভ্যাস যোগ বজায় রেখে নানা গোলমালের মধ্যে তাকে ফেলে দিতে হয়, অভ্যাসটাকে স্থির রাখবার জন্য। ধর, ফুটবল খেলতে গিয়েছো—ঠাকুরকে দলে নিয়ে খেলবে। প'ড়ছো, ঠাকুরকে সামনে রেখে প'ড়বে, ঠাকুরকে শোনাচ্ছো মনে ক'রে। ক্রিকেট খেলছো —মনে মনে তাঁকে সঙ্গী ক'রে নিতে হবে, বেড়াতে যাচ্ছো, মনে মনে সেখানেও তাঁকে সঙ্গী ক'রে নেবে তাহলে গোলমালেও আর অভ্যাসের বিচ্যুতি হবে না, জোর বাড়বে।

আবার আছে, নিত্য ঠাকুরের সঙ্গ ক'রতে চেষ্টা ক'রতে হবে। চারদিকে ঠাকুরের মূর্তি রেখে, তাঁর নাম অঙ্গে লিখে, তাঁর মূর্তি বুকে মাথায় রেখে যেমন ক'রে হোক তাঁর সঙ্গ ক'রতে চেষ্টা ক'রতে হবে। তাঁর নিত্য সাথী হবে। এক কথায় কায়মনোবাক্যে তাঁকে রাখতে হবে।

ভগবৎ আস্বাদনের জন্য প্রার্থনা, নাম, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি সহায়ে ইন্দ্রিয়াদির শুদ্ধতার প্রয়োজন। ভগবৎ মহিমা শুদ্ধ মনের গোচর। তাই মনকে ক'রতে হবে শুদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনের তিনটি বৃত্তি—চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতি। এদের মাঝে যেমন রয়েছে নিবিড় সখ্য আবার তেমনি আছে বৈরতা। এই যে এদের মধ্যে সখ্য এবং বৈরতার খেলা চলেছে এতে আমাদের মনে আসছে অসাম্য। সাধন রাজ্যে মনকে আনতে হবে সাম্যে। তার উপায় হচ্ছে এই বৃত্তিত্রয়ের মূল স্বভাব দু'টিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে তাহলে আমাদের মনেও আসবে সমতা। এই সম মন শুদ্ধমন এবং এই শুদ্ধমনেই তিনি প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধমনই তাঁর স্বরূপ। "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যে যু আত্মা।" মনোবিজ্ঞানে একটা মতবাদ আছে যে, কোন একটি যন্ত্র যথা একটি কলম—যতক্ষণ সেটি আমাদের মনের মতন কাজ দেয় ততক্ষণ সেটি আমাদের মরদেহ মনের নিজস্ব হ'য়ে-যায়। তার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকি না। কিন্তু যেই তার এই কাজ দেওয়ার বিচ্যুতি ঘটে, অমনি আমাদের

মন তার সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসে বিরক্তি। জগতে এমনি প্রতিটি জিনিস যতক্ষণ আমার তালে তাল মিলিয়ে চলছে ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকি। এতটুক তাল কাটলেই ভাব যায় ভেঙ্গে, মন হ'য়ে উঠে ক্ষুব্ধ। আমাদের এই ভাবটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যে যেমন ছন্দে চলছে চলুক, আমি আমার ছন্দে তাকে মিলিয়ে নেব এই হবে আমাদের সাধনা। কারণ আমাদের জগৎটা হচ্ছে ভাবের জগৎ এর ভালো মন্দের কোন চিন্তাই স্থান দেব না, তাহলে জগতের সুখ-দুঃখ আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। এই উদাসীন মনে তখন সবই ভগবত লাভের ছন্দে ছন্দিত হ'তে থাকবে এবং আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ ব্যাপারের সব কিছুই ভগবত লাভের সহায়ক বলে প্রতীয়মান হবে। তখনই উপনিষদের ঋষিদের মত বলতে পারব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

পরিণত ধীশক্তি সম্পন্ন শান্ত মনের বহিঃপ্রকাশ কমই হ'য়ে থাকে। যোগী ঋষিরা সর্বকালে ও সর্বদেশেই অপ্রকাশশীল। আবার বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞান যে বিশ্ব-মনের কথা বলেছে তাও আমাদের মত মুখর নয়। হিন্দু দর্শনের ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েছেন মৌন-নামে। 'মৌনং ইত্যাচক্ষতে।' তাই আমাদের দেহ মনকে চেষ্টা করে অচঞ্চল ক'রতে হবে, দেহ মনের পরস্পর পরস্পরের প্রতি চঞ্চল প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে হবে, তখন জগৎও অচঞ্চল রূপে প্রতিভাত হবে—কারণ ভাবময় জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বা প্রতীতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভাব নির্ভর করে। স্থিতধীর শান্ত সমাহীত দৃষ্টিতে মন দেহ জগৎ এক অখণ্ড শান্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ। আর সেই পূর্ণ পরিণত অচঞ্চল শুদ্ধ দেহ মনে জগতে এই স্বধর্মের সাথে ব্রহ্মের প্রকাশ খুব সহজ হবে।

প্রকাশ চৈতন্যকে অভিভূত করেছে এক অপ্রকাশ চৈতন্য, একে কেউ বলেছেন অবচেতন, কেউ বলেছেন সংস্কার, আবার কেউ বলেছেন সহজাত প্রবৃত্তি। মনুষ্যত্ব লাভ ক'রতে হ'লে এদের দমন করা, এদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রার্থনায়, নামে, ধ্যানে, ব্রহ্মচর্যে, মনঃশক্তিতে এদের জয় ক'রতে হবে, কল্যাণমুখী ক'রে তুলতে হবে। এবং সেইখানেই আমাদের মনুষ্যত্ব। অবচেতনকে অবচেতনের দ্বারা জয় ক'রতে হবে। স্বপ্ন, স্খলন, প্রবৃত্তি এই অবচেতনের প্রকাশগুলির জয় দ্বারাই অবচেতনকে জয় ক'রতে হবে। অবচেতনের কিছু প্রকাশ হয় স্বপ্নে, তন্দ্রায়, প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা। নিদ্রার পূর্বে সৎ চিন্তার দ্বারা, জপাদির দ্বারা এর মোড় ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি নিদ্রার ভেতরেও ইভ্ বা পশুত্বকে জয় করতে বা মদ-

যৎ বিচারকে প্রহরী স্বরূপ রেখে জপ এবং ধ্যান জাগ্রত রেখে অবচেতনের কিছুটা ক'রে তুলতে হবে চৈতন্যময়। এই অবচেতনের আর একটা দিক অখণ্ড স্মৃতি। তাই অবচেতনকে জয় ক'রতে হলে আমাদের স্মৃতি-শক্তিকে গড়ে তুলতে হবে প্রখর। সেই প্রখর স্মৃতির উজ্জ্বল আলোকপাতে আমরা দেখতে পাব অবচেতনে কি জমা আছে। উজ্জ্বল স্মৃতি সহায়ে, মনের দৃঢ়তা সহায়ে অবচেতন মনের সম্মোহন শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের চেতন সত্তা জাগ্রত রাখতে পারলে অবচেতনের উপর কিছু ক্ষমতা আসতে পারে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মতে দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ ইত্যাদি বিভূতি এই অবচেতনের শক্তিতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রথম এগুলির সাধনা রাখতে হবে সাধকদের, শুধু অবচেতনকে চেতন করার উদ্দেশ্য নিয়েই। তারপর সংস্কার—এই সংস্কারের মধ্যে মন্দ সংস্কার যেগুলি, সেগুলিকে সৎ-সুন্দর সংস্কারের সৃষ্টি ক'রে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে বা মুছে ফেলতে হবে। পাতঞ্জল এর জন্য সূত্র করেছেন "বিতর্ক সাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্"। সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে ভয়, ক্রোধ, লোভ ও ভালবাসা। প্রথমতঃ ভয়, মানুষ নিজেকে ভালবাসে বলেই সে নিজে চায় সর্বদা রক্ষা করতে, তাই এই ভয়ের সৃষ্টি। এই নিজেকে রক্ষা করার ভাবনা ভেঙ্গে ফেলা খুবই প্রয়োজন। এর একটা উপায় নিজের মৃত্যু চিন্তা করা। লোভকে ত্যাগ করতে হবে। এবং ভালবাসতে হবে যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর তাকেই আর যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর তাদের আমাদের স্বল্পচেতন, অর্ধচেতন ও ঊর্ধ্বচেতনাতে ধ'রে রাখতে হবে যাতে এগুলি অবচেতনায় যেয়ে জমতে পারে ও অবচেতনকে দিব্যতায় ভরে দিতে পারে। আরও কয়েকটা দিক আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—যেমন অল্প কিছু উত্তেজনায় উত্তেজিত না হওয়া। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে যেগুলিতে আমরা অল্পে উত্তেজিত হই সেগুলি সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

নববর্ষে

মাস, বার, এগুলির নাম, সূর্যাদি নক্ষত্রের নামের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। এদেশে ওদেশে দিনের নামগুলি রবি বা Sun, সোম বা Mon প্রভৃতি নামের সঙ্গে যুক্ত। সূর্যমাস, চান্দ্রমাসও এদেশে ওদেশে প্রচলিত। উপনিষদে আছে মহৎ ভয় নিয়ে, উদ্যত বজ্র নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (কঠ. ২।৩।২)

পাশ্চাত্ত্য মতে এই ভয় থেকেই সব ধর্মেরও উদ্ভব, এই ভয় থেকে সব কিছু উদ্ভূত। সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা, এগুলির পূজা ভয় থেকেই। মনে হয় ভয় থেকেই নক্ষত্রদের নামে মাস দিনগুলি নামিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে এই সব নামের সম্বন্ধ এর বহু পরে। ভয়ই আদি, ভয়ই মধ্য, ভয়ই অন্ত।

বৎসরের প্রথমদিনে সর্বকালের অধিশ্বরী মহাকালীকে আমরা প্রণতি জানাই, একান্ত দৈন্যে—যেন তিনি তাঁর দক্ষিণা মুখে আমাদের কল্যাণ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডিকারূপে তিনি যেন আমাদের অসুরযোধে রক্ষা করেন আর সমস্ত দোষ ও দৈন্যের অন্তে আমরা যেন বলতে পারি,—

"দেবি! প্রপন্নার্তি! হরে! প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।"

দেবতার ঠাকুরালী

ছোট্ট একটি ছেলে—ঠাকুমার অসুখ ক'রেছে দেখতে যাবে। গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা ক'রছে ;—ঠাকুর শোনো, আমার বাবাকে কেউ গাড়ী দিচ্ছে না—বাবাকে একটা গাড়ী দাও—মাগো-মাকে দেখতে যাবো। আধ ঘণ্টার ভেতরে তাদের একজন আত্মীয় যেচে একটি গাড়ী এনেছে। সহজ বিশ্বাসের প্রার্থনা শ্রীঠাকুর বলতেন, ভগবান শোনেই শোনেন। বালিগঞ্জের ১৩ :-এর এই ঘটনা। ছেলেটির বয়স আড়াই বছর।

* * *

১৯ -সালের অক্টোবরের আগে। জনৈকা সাধু চলেছেন কলিকাপুর আশ্রমে রিক্সায় ক'রে। পিচঢালা রাস্তা চকচক ক'রছে। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে

গেছে। হঠাৎ দুটিবাসে ধাক্কা লাগে। একটি এসে রিক্সার চাকায় ধাক্কা দেয়। পাশেই খাল কাটা হ'য়েছে। প্রায় ১৫।২০ ফুট গর্ত। রিক্সাটি একেবারে গর্তের ধারে এসে প'ড়েছে, আর একটু হ'লেই গর্তে পড়ে যাবে। সাধুটি তারস্বরে ঠাকুরের নাম ক'রছেন। অঘটনের এমনি খেলা, মনে হয় কে যেন নীচের থেকে রিক্সাটিকে ঠেলে সরিয়ে দিল—আর ঠাকুরের কৃপায় সাধুটিও এ যাত্রা রক্ষা পেলেন।

* * * *

রামচন্দ্র রাও—ছেলেটি ভক্ত। ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। মায়ের পূজা তো খুব নিষ্ঠা। Factoryতে কাজ ক'রছে। কোন কারণে দু'এক মিনিটের মধ্যে স'রে যেতে হ'য়েছে। সহসা সেখানে একটি রাসায়নিক বিস্ফোরণ হয়। যদি সে সেখানে থাকতো জীবন বিপর্যয় হতো। কেবল মার কৃপাতে রক্ষা পেয়েছে।

রুক্মিণী রাও—জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা—বিশাখাপত্তমের। উনুন থেকে গরম খাবার নামাতে গিয়ে ফুটন্ত সেই খাবার পায়ে পড়ে, কিন্তু ঠাকুরের নাম নিয়ে সব কাজ করে ব'লে কিছুই হয়নি।

* * * *

সন ১৯৷ সাল। পূজা আসন্ন। পথিক ফিরছে সোনামুখী থেকে; কলকাতার বাসায়। সোনামুখী বাঁকুড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপীঠের কাছেই।

নীড়ে ফেরা পাখীর মত মনে একটা বিষণ্ণ অস্থিরতা—সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে ভীরু পাখায়। বাড়ী থেকে হেঁটে আসতে হ'য়ে গেছে দেরী। ট্রেনেও আবার সেই বিভ্রাট। ত্রস্ত পায়ে এসে দেখে দামোদারের তীর জনশূন্য। একে বর্ষার পর—জলোচ্ছ্বাস—দামোদরের পার দেখা যায় না। অশান্ত ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ে কি এক ইঙ্গিত। নিরুপায় চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে পথিক দেখে কালো ডানা ঝাপটে নেমে আসছে ভয়ের রাত্রি। খেয়া পারাপার তখন হ'য়ে গেছে বন্ধ। এপারে আশ্রয়ের কোন উপায়ই নেই। পারঘাটটি একটি গঞ্জ। লোক বিরল সে স্থান। শেষ চেষ্টা দেখে যদি কোন নৌকা যায় পাওয়া, কিন্তু এই অবেলায় একজনের জন্য কোন পারানীই হয় না রাজি। নিরুপায়ের উপায় শ্রীভগবানের নাম নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে ভাবে পথিক কি এখন করা যায়।

স্থানটির একটু সুনাম আছে। শরের জঙ্গলে ভরা এই স্থানে ডাকাতিও হ'য়ে গেছে এর আগে। টাকাও সঙ্গে আছে। ডেকে যায় ভক্ত অনাথকে—

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে। অন্ধকারে সহসা যেন বিদ্যুৎ বিলাসের মত এসে দাঁড়ান একটি ভদ্রলোক। মাঝিরা অতি সম্ভ্রমেই তাঁকে জানায় অভিবাদন। তিনি এসেই নৌকা ক'রে ফেলেন ঠিক। আর কি যেন ভেবে ভক্তটির সামনে এসে দাঁড়ান। প্রশ্ন করেন 'পারে যাবেন নাকি'? কুণ্ঠিত আনন্দে ভক্ত জানান সম্মতি। আগন্তুক বলেন "তবে এসে উঠুন নৌকায়"। পাতা পড়বার তর সয় না। ভক্তটি পেলেন অকূলে কূল। নৌকায় এসে কথা হয়। ভদ্রলোকটি স্থানীয় সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি আরো বলেন যে এখানে রাত্রে থাকলে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। আর আজ তাঁর আসাও অতর্কিত।

* * *

১৯২০ সালের সে এক আনন্দ বেদনার দিন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের এক ছাত্র অনান্তি শয়নে পড়েছে শুয়ে ময়মনসিং-এর সেন বাড়ীর ছেলে সে। এমন আঘাত জীবনে পায়নি। প্রচুর অর্থ আসে গৃহ হ'তে আর অকুণ্ঠে তার ব্যবহার করে বয়স্যদের আনুকুল্যে। আজ সে রিক্ত, সহপাঠিরাও মুখ সরিয়ে গেছে চ'লে। সামান্য অর্থের প্রয়োজন। নিদ্রামোহে দেখে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের কাছে সে দাঁড়িয়ে সহসা এসে দাঁড়ায় এক কালো মেয়ে, পরণে লাল পাড় শাড়ী মূর্তি—সে মূর্তির কাছে সারা বিশ্ব যেন দুলে ওঠে।

দুষ্টু ছেলে সিনেমা দেখবে—পয়সা নেই—বলেন তিনি,—এই নাও পয়সা। কান পেতে সে শোনে মার মুখে, শ্রীবাণী ··· কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে সারা তনুমন —আজো সে তরঙ্গ তার শরীরে বয়ে যায় শিহরিত করে জীবনকে।···নিদ্রার জাল যায় ছিঁড়ে। আস্তে ওঠে জেগে, আর ভীত সন্ত্রস্ত চোখে দেখে হাতে তার একটি আটআনি চকৃচক্ করছে যেন মূর্ত দেবানুগ্রহ—বিশ্বাস হয় না ঘুমন্ত চোখকে। হাত থেকে ঠক করে আধুলিটি পড়ে লুটিয়ে। হতচকিতের মত ছেলেটি উঠে বসে—সিনেমার মোহ তার আর নাই। সে ছুটে যায় হ্যারিসন রোডের এক দোকানে—দেবীর এক দিব্য—মূর্তি নেয় কিনে সেই আট আনার বিনিময়ে। আজো সেই মূর্তি তার গৃহে রয়েছে দীপ্ত হয়ে।

পরিচয় তাঁর, স্বনামধন্য বেতারশিল্পী শ্রীনিখীল সেন। বেতারের সঙ্গে প্রথম অঙ্ক থেকেই তাঁর পরিচয়। তাঁর আরো বৈশিষ্ট্য বেতারে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গীতের পরিবেশনের ভার তিনি তুলে নিয়েছেন নিজে।

* * *

ভক্ত একটি ছেলে, ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের নাম নিতে অভ্যস্ত। সেদিন সহসা পেটের ব্যথা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে

যাওয়া হয়। অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাবে। ভয়ে জপও খুব করছে। বাড়ীর আত্মীয়স্বজন বলতে তখনও কেউ পৌঁছয়নি। ঠাকুরের কৃপায় অপারেশন ভাল ভাবেই হ'ল। অজ্ঞান করা হ'য়েছিল। কিছুটা ঘোর যখন তার কেটে এল তখন দেখে বেডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মা ভবতারিণী; ঠিক যেন নিজের মায়ের মতন—আদর করেই গেলেন চলে। পরদিন যখন তার মা এল তখন তার মাকেও এই কথা বলে। ছেলেটির নিজের কথা—এমন আদর যদি পাই তো অসুখ ভাল হয়ে কাজ নেই। অন্তর নিংড়েই সে বলে,—এমন শান্তি আর কখনও পাইনি। মনে হয় এ জগতে আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। একটা বিপদ কাটে তো আর একটা বিপদ আসে। ছেলেটির পেটে বায়ু জমতে থাকে, কোন ওষুধেই সারে না। কাছে ছিল আশ্রম থেকে পাওয়া হোমের ভস্ম। নার্সকে বলে,—যখন প্রয়োজন হবে ডাকবো আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন এবং সেই সুযোগে হোমের ভস্ম একটু মুখে ফেলে দেয়। পরদিন থেকে উপসম সুরু হয়। এই ছেলেটি ছোটবেলাতে মার এক দিব্য স্বপ্নে অমৃতায়িত হ'য়েছিল।

* * *

তিরুমালা পাহাড়ে সন্ন্যাসী একজন একমাসের জপধ্যান ব্রত নিয়ে আছে; ওষুধ এসব গ্রহণ করবে না এই প্রতিজ্ঞা। ডিসেম্বরের শেষের দিকে বৈকালে, সহসা খুব ব্যথা সুরু হয় পেটে—শ্রীঠাকুরের চরণে একমাত্র প্রার্থনা জাগে এই অজ্ঞাত স্থানে রক্ষা ক'রতে। পরের দিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব মেঘ কেটে যায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রকৃত সাধুর নিত্য সঙ্গী। আরেক দিনের ঘটনা—পরিব্রাজক হ'য়ে তীর্থ দর্শনের পালা ১৯ : সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে……দাক্ষিণাত্যের ত্রিচীর শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির দর্শনে এসেছেন সন্ন্যাসী—ধর্মশালায় একেবারেই স্থানে নেই—শ্রীঠাকুরের কাছেই একান্ত প্রার্থনা জাগে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আর কোথায় যাব; তোমারই শরণ নিলাম।…… সহসা জনৈক জানায় একটি প্রাইভেট ধর্মশালা সিন্ধিদরবার। শুধু জাতি বিশেষের জন্যে এই স্থান—ধর্মশালা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু এমনি প্রভুর করুণা…জনৈক রাস্তার লোক খোলার ব্যবস্থা করে দেয়—সুরম্য সেই বাসস্থান; যেন স্বর্গরাজ্যের স্থান মনে হয়।

* * *

এই সেদিনের কথা দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের এক বাড়ীতে গেছে দুটি কলকাতার ভক্ত অভেদানন্দ কলেজের জন্যে চাঁদা তুলতে; তাদের একজন

সন্ন্যাসী। অক্টোবরের দশ তারিখে হঠাৎ দেখা গেল একজন নাই। প্রায় বৈকাল ৫টা থেকে সে নিখোঁজ। সকলে সন্ত্রস্ত অজানা স্থান কি, বিপদই যে ঘটায় পুলিশে সংবাদ দিতে হবে। সহসা সঙ্গী ভক্তটির মনে আসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা তো করা হয়নি। বসলেন পূজার আসনে। শ্রীঠাকুরকে জানিয়ে বলেন,—যেখানেই থাক শীঘ্র চলে এস। আসন থেকে উঠে বললেন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে—দশ মিনিটেই সে আসছে। ঠিক ৯।২০ মিনিটে এই কথা ৯।৪০ এ সঙ্গী এসে হাজির, এসে বলে যে বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের উপর বসে সে ধ্যান করছিল। জায়গাটি বড়ই মনোরম। সহসা মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে আর ধ্যানে তার সঙ্গীরমুখ ভেসে ওঠে, সেই সঙ্গী যেন একান্ত বিব্রত হয়ে উঠেছে। তাই তাড়াতাড়ি একটা স্কুটারে চড়ে সে চলে আসে। লীলা নিত্য এ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

*　　　*　　　*

ধোরী কলিয়ারীতে সেদিন ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। সংবাদপত্রের একথা অনেকের জানা আছে। বহু লোক মারা যায়। এত আগুন জ্বলে উঠেছিল যে স্থানীয় কর্মীদের বাসায় এসে পড়ে সে আগুন। ভক্ত ছেলে এক, সেখানকার কর্মী একজন। তার বাসাতেও আগুন এসে পড়ে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কোন ক্ষতি হয়নি। চাকরীর স্থানেও তার কোন ক্ষতি হয় নি।

ভক্ত ছেলেটির জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে। শ্বশুরের মৃত্যুতে সে কলিয়ারীর বাসা থেকে বিহারের আমজোড়া গ্রামে যায়। সঙ্গে পুত্র ছিল। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু লোকের রন্ধনাদি হয়। হঠাৎ সেই বৃহৎ চুল্লীতে দেড় বছরের খোকাটি যায় পড়ে। সকলে তো ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। ছেলের বাপ তাকে পায়ে ধ'রে তুলে ফেলে। সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে আর ফোস্কা হ'য়ে যায়। সকলের ধারণা ছেলেটি সদ্যই মারা যাবে। কিন্তু ছেলেটির কোন ক্ষতি হয় নি এমনকি বেশী ফোস্কাও পড়েনি—পিতা বলে, এমনি হরির অহেতুক করুণা রক্ষাকারী ঠাকুর কি ভাবে যে এটি করলেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

যারা ভগবানের কৃপার কথা গল্প মনে করে তাদের যদি দেখাতে পারা যেত···! বলা বাহুল্য ছেলেটি আবাল্য ভক্ত।

আর একটি ঘটনা, ২১শে আগষ্টের কথা এটি। একটি মিলের বড় কর্মী চলেছে তার নিজের গাড়ীতে। যাবার সময় কি জানি কেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্ম ইত্যাদি যে জামায় আছে সেটি বেছে নেয়। গড়িয়াহাটের মোড়ে হঠাৎ

একটি ঠেলাগাড়ির সঙ্গে গাড়ীর সংঘর্ষ হয় আর তার ফলে গাড়ীটি বিশেষ জখম হয়। ডানদিকের দরজা যেখানে Steering-wheel ধরে বসে ছিল ছেলেটি সেখানেই বেশ আঘাত লাগে। কিন্তু শ্রীঠাকুরের কৃপায় কোন আঘাতই তার লাগেনি।

····· অভেদ মহাবিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক আশ্রমে ফিরছে একটি জীপে সাঁইথিয়ার রাস্তায়। এ'ও ২৩শে আগষ্টের কথা। সহসা একটি বাসকে পাশ্ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি থামে। কিন্তু শ্রীঠাকুরের কর্মীর গায়ে একটুও লাগেনি। একসঙ্গে এতগুলি ঠাকুরের কৃপার কথা আমরা না লিখে পারলাম না।···

* * *

আষাঢ়-শ্রাবণের দিন—এবারের শ্রাবণ যেন রোদে ভেজা শরতের শিউলি।

ভক্ত সরকারী কর্মচারী—গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে ভগবৎ স্মরণ করা তার সহজ মনের গতি। জুলাই-এর বাজেট যাবে হেড আপিসে। সব ঠিকঠাক করা হ'য়েছে, দিনটা ছিল শনিবার। শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে এসেছে ভক্ত ছেলেটি। খট্‌কা লাগে একটা মারাত্মক রকম ভুল থেকে গেছে হিসাবে। কি সর্বনাশ! চাকরিতে একটা কাল দাগ থেকে যাবে যে। পরদিন রবিবার, আপিস বন্ধ। শ্রীঠাকুরকে ডাকা ছাড়া উপায় আর কি হতে পারে। সোমবার কর্মস্থলে গিয়ে দেখে কাগজ ডেসপ্যাচ হয় নি! জয়ঠাকুর বলে সে সব ঠিক ক'রে দেয়।

আর একদিনের কথা। পূজা হ'য়ে গেছে। ভক্তটি ঘরে ফিরছে দেশ থেকে। শীতের আমেজ এসে পড়েছে কার্তিকী সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা গাড়ীতে সকলে ফিরছে—তন্দ্রাতুর কোণে। এক্সপ্রেস—বর্ধমান স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সহসা জনৈক মাড়োয়ারী ছুটে আসে। ভক্তটির ছাতা তখন বহ্নিমান। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ছাতাটির আগুন নিভিয়ে ফেলা হোল। জানা গেল ওপরের বাঙ্ক থেকে একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলা হ'য়েছিল গাড়ীর বাইরে, সেটা বাইরে না প'ড়ে ছাতার মধ্যে পড়ে। ভক্তটি সে সময় ভগবানের নাম জপে মগ্ন ছিল, তাই দেখতে পায়নি। কেউ হয়তো কাকতালীয় বলবেন। আমাদের কবিগুরুর কথায় বলি।—

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব

শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীপাদগণ ও রামকৃষ্ণ ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে রামকৃষ্ণ ভাবালোক। শুধু Hydrozen বা শুধু অক্সিজেন এর মধ্যে পাওয়া যাবে না জলের প্রকৃত প্রকৃতি। তেমনি শুধুমাত্র ঠাকুর বা শুধু স্বামীপাদদের মধ্যে পাওয়া যাবে না রামকৃষ্ণ তত্ত্ব। Evolution-এর Emergence বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। তেমনি মানস রাজ্যে বা ধর্মরাজ্যে emergence বা কৃপা। আর ভক্ত ভগবান ও ভাগবৎ মিলেই হবে নূতন emergence বা সত্ত্বা প্রকাশ আর আর ভক্তদেরও যোগ্যতম হ'তে হবে এই রামকৃষ্ণ ভাব নূতন পথে emerge বা চালনা করতে।

মনস্বী য়ুঙ্গের Anima ও Persona মনোবিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব Anima আমাদের ব্যক্তিত্বের অচেতন সত্ত্বা। দুটি মিলে আমাদের ব্যক্তিত্ব। সজ্ঞানে যেটি শক্তিশালী অবচেতনে সেটি অপটু সাধারণতঃ এই আমাদের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু য়ুঙ্গের এই কথা মহাপুরুষদের বেলা সত্য নয়। এদের Persona ও Anima-র মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই।

এদের অবচেতনে আর সচেতনে বিশেষ বিভেদ নাই। এ দুটি অখণ্ড মানস সত্ত্বায় পরিণত হয়। য়ুঙ্গের মতে গোষ্ঠীগত অবচেতন মনে Race instinct থাকে। Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি ও Archtype বা চিন্তার আদিরূপ, এইগুলিই আমাদের কর্ম পদ্ধতির নিয়ামক। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ ও অবতার কল্প পুরুষদের গোষ্ঠী হ'চ্ছে বিরাটের গোষ্ঠী। বিরাটের মনের ধারা এঁরা বংশানুক্রমে লাভ করেন। তাই এঁদের Archtype ও Instinct ও বিরাট ও সত্য-শিব-সুন্দরের মনের গঠনানুসারে এই instinct ও Archtype প্রকাশিত হয় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাই মহাপুরুষদের স্বপ্ন—ভূমার স্বপ্ন, দিব্য স্বপ্ন, অতি মানবীয় স্বপ্ন।

য়ুঙ্গ প্রভৃতি মনীষীগণ মানবের বিরাট জৈব অস্তিত্বের সংস্কারের কথা বলেন নাই। এই অস্তিত্ব পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রায় অর্দ্ধেক কাল ব্যাপী ১২০০ লক্ষ বৎসর ব'লে নির্দিষ্ট হ'য়েছে। এইসব সংস্কারও আমাদের Archtype ও ও Instinct সৃষ্টি করে।

এই চেতন অবচেতন ও গোষ্ঠীর মনের প্রভাব এড়ানো মানবের সাধ্যাতীত কেবল বিরাট মনের শক্তির সহায়তায় সম্ভব। য়ুঙ্গের মতে মনের ভারসাম্য

বজায় রাখতে দেবতা, পুরাণ কাহিনী আলোচনা, এইসব প্রয়োজন। মনে হয় দেবস্বরূপ পুরুষ ও তাদের জীবনবেদ আলোচনারও প্রয়োজন মানতে হয়। কারণ মহাপুরুষদের Leadershipও যুগে যুগে প্রেরণা স্বরূপ হ'য়েছে।

বিরাট মনের Anima-তে বিরাট বিশ্বের প্রয়োজনে স্পন্দিত হয়, যেমন আমাদের ক্ষুদ্র Anima স্পন্দিত হ'চ্ছে ক্ষুদ্র প্রয়োজনে। আর এই বিরাটের Animaর Archtypeগুলি যুগের দিশারীদের বংশগত সম্পদ। তাই লোকোত্তর পুরুষদের মনে বিশ্বের কল্যাণ চেষ্টা স্বতঃই দেখা দেয়। বাইরে এরা নিরক্ষর অক্ষম দেখা গেলেও বিরাট শক্তির ভাণ্ডার যে অবচেতনে থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ অবতার কল্প পুরুষেরা যাকে এত বড় ক'রে গেছেন, মহাকালী ব'লে গেছেন সেই দিব্য অবচেতনের বলে এঁরা জগদ্ধিতায় কর্ম ক'রে যান আর—সে কর্মে সত্যকার জগদ্ধিত হয় কারণ বিরাট Persona ও Anima-র সঙ্গে তাদের যোগযুক্ততা।

দক্ষিণেশ্বর লীলায় শ্রীঠাকুরও একই ভাব ও অভাবমুখ চৈতন্য, চিৎ ও অচিৎ বলে স্বীকার ক'রেছেন। এই কি Conscious unconscious তত্ত্ব।

ন্যায় মতে মনকে অচেতন বলা হয়েছে। এরই ক্ষণ প্রকাশ চৈতন্যময় সত্ত্বা।

গীতামতে অক্ষর বা অপ্রকাশ যিনি তিনিই ব্রহ্ম আর প্রকাশিত জগত বা ক্ষরভাব অধিভূত। এও মনে হয় সেই অবচেতন ও চেতনের শ্রেণীবিভাগ অবশ্য বিরাটের দিক থেকে যোগমায়া সমাবৃত হ'য়ে লোকের কাছে ইনি অপ্রকাশ। তবে ক্ষর বা প্রকাশিত জগত অক্ষর বা অপ্রকাশিত জগতের পারেও এক সত্ত্বা আছেন একথা গীতায় পাই, এই দৃষ্টিতে চেতন অবচেতনের চেয়ে গীতার প্রকাশ-অপ্রকাশতত্ত্ব আরও অর্থপূর্ণ মনে হয়। এটি পুরুষোত্তম তত্ত্ব। Russel, Neutralstaff ব'লে এর দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন কিনা চিন্তার বিষয়। শ্রীঠাকুরও বলেন "যিনি সৎ তিনিই অসৎ আবার আরো কত কি"। বিজ্ঞানের বর্তমান Indeterminacy তত্ত্বটি কত আগেই ঠাকুর ব'লে গেছেন।

পরিশিষ্ট (ক)

(জীবন গড়ো)

সহজ দৃষ্টিতে চাঁদে নামার কথা

একটি ছোট্ট ছেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—চাঁদে যাবি? সে নাচতে নাচতে ম'ার কাছে গিয়ে ব'লল,—"মা চাঁদে যাবো।" মা বললেন,—"নামবি কি ক'রে?" সে বললে,—"কেন লেজে ক'রে। সে আগেই একটি প্লাষ্টিকের লেজ জোগাড় ক'রে রেখেছে।

আরো দু'টি ছেলেমানুষ। তারা দু'জনে বলাবলি ক'রছে, "চল চাঁদে যাই কুমড়োটা সঙ্গে নিয়ে যাবি না—ওখানে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে না?" বলা বাহুল্য ছেলেটি ভালো রাঁধতে পারে। তারা যেই শুনলো যে নভোচারীরা চাঁদে নেমেছে—অমনি ব'লে উঠলো,—"বাঃরে ওরা না মরেই স্বর্গে গেলো রে।" আর একজন বলছে—"এই বিয়ে হোচ্ছে না, আবার চাঁদে যেছে।"

আর একটি ছোট ছেলে দৌড়ে স্পীড বাড়াচ্ছে—দৌড়ে যাবে তাই। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল—"অত দৌড়াচ্ছিস্ কেন—?" সে বললে "আমার দাঁড়ালে চলবে না। স্পীড বাড়াতে হবে না? চাঁদে দৌড়ে যাবো।"

আরও কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে জড়ো হয়েছে একজন বলছে—"ইন্দিরা গান্ধী চাঁদে লোক পাঠাবে কেমন করে? অনেক খরচ তো! তাই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলো নিয়ে নিয়েছে—টাকা চাই তো?"

তত্ত্বান্তরে ব্রহ্ম

তত্ত্বই ব্রহ্ম···

তাই এক তত্ত্বের তত্ত্বান্তরে রূপায়ণ সম্ভব···

সাধনক্রমে রূপাদি তত্ত্বে···

অন্য তত্ত্বের উপলব্ধি হয়···

Religious Compression···

Compress করিলে সত্তা সূক্ষ্ম হয়, শক্তিমান হয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে জপ, ধ্যান, সুর বা ছন্দ ব্রহ্মকে এইভাবে সূক্ষ্ম করিলে, শক্তিমান করিলে ইষ্ট গতি সহজ হয়···

গুরু ও ভাগবত এক

গুরু + কৃষ্ণ + বৈষ্ণব = ১ = ভাগবৎ + ভক্ত + ভগবান

গুরু + বৈষ্ণব = ভাগবত + ভক্ত — কৃষ্ণ + ভগবান

গুরু = ভাগবৎ + ভক্ত — বৈষ্ণব

∴ গুরু = ভাগবৎ

গুরু + কৃষ্ণ = ভাগবত + ভক্ত — বৈষ্ণব + ভগবান

গুরু + কৃষ্ণ = ভাগবত + ভগবান

গুরু = ভাগবত + ভগবান — কৃষ্ণ

∴ গুরু = ভাগবত

পরিশিষ্ট (খ) বেদছন্দা

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের বাণী
নিত্য স্মরণীয় ও পালনীয়

১। ঠাকুরকে ঠিক মর্যাদা দিতে হ'লে, জানতে হ'লে ঠাকুরের স্বরূপ হ'তে হবে।

২। ব্রহ্মচারীদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে, তোমরা জীবনকে কখনও ভালোবেসো না। ঠাকুরের দাস হ'তে হ'লে ঠাকুরকে পেতে হ'লে মৃত্যুপণ করতে হবে, মরণকেই ভালোবাসতে হবে।

৩। বড় হ'তে হ'লে একজন বড় শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। তাহ'লে সহজে হয়।

৪। সর্বদা ভোগের মধ্যে থাকা, তাই একজন অগ্নিস্বরূপের কাছে থাকলে সুবিধা হয়।

৫। এটা ঠাকুরের যুগ। সর্বভাবে তাঁর আর্দশই আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে। ঠাকুরের আলোতে আমরা চারপাশ দেখবার চেষ্টা করবো।

৬। ফুল নিয়ে একটা সাধনা আছে। সারাজীবনটা এই ফুলের মত গড়ে তুলে, যেদিন যাত্রা ক'রব সেদিন এই ফুলের মতই ঠাকুরের চরণে ঝরে প'ড়ব।

৭। ব্রহ্মচর্য পালনের চেষ্টা—এটিও ঠাকুরের কাজই করা হ'চ্ছে।

৮। গুরুর আদেশে কাজ করাই তপস্যা। প্রথম গুহায় বসে কি জপ-ধ্যান ক'রতে পারা যায়—তাই কাজ ও জপ-ধ্যান দুই-ই চাই। তৈরী হ'লে তবে শ্রীঠাকুরই কাজ কমিয়ে দেন।

৯। ঠাকুর সূক্ষ্ম, তাই স্থূল মন তাঁকে চায় না। পায়ও না। ঠাকুর যদি সন্দেশ হ'তেন তাহ'লে চাহিদা দেখতে। আমাদের মন স্থূল কিনা, তাই সূক্ষ্ম ভাব দ্বারা ঠাকুরকে চাওয়া হয় না।

১০। ঠাকুরের কাজ যা ক'রছ উত্তম তপস্যা। ঠাকুরের মনে যদি একবার হয় যে ছেলেটা আমার জন্য খেটে খেটে গেল তাহ'লে তোমার চৌদ্দ জন্ম ধন্য হবে।

১১। ঠাকুরই শ্রেয় আর ঠাকুরই প্রেয় হোক, এই চেষ্টা করো এই প্রার্থনা করো। শ্রেয় আর প্রেয়র মাঝে যে দ্বন্দ্ব আমরা নিত্য অনুভব করি সেটি তাহ'লে মিটে যাবে।

১২। নানা গোলমালের মধ্যে ঠাকুরকে মনে রাখা চাই, এইখানেই মনের পরীক্ষা।

১৩। ঠাকুরকে যত-আনা মন দিতে চাও তত-আনা মন সংসার থেকে সরিয়ে আনতে হবে। এক কথায় কায়মনোবাক্যে তাকে রাখো।

১৪। এযুগের কথা পবিত্রতা। পবিত্রতা লাভ ক'রলেই সব হবে।

১৫। যুগাবতারের শরণাগতিই যুগধর্ম, যুগমানবের স্বধর্ম।

১৬। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। জগৎ যে তাঁতেই বিধৃত।

১৭। তাকে লাভ ক'রলেই সব লাভ করা হবে। আর তাঁকে ছাড়লে কোন জিনিসই দাঁড়াবে না।

১৮। "তুম জ্যায়্সা রাম পর তুম পর ওইসা রাম"।

১৯। সবার চশমা যদি পরা যায়, ভূমার চশমা প'রতে পারলে, প্রেমের চশমা প'রতে পারলে ভগবৎ লাভ হয়।

২০। সকলের ভেতর ঈশ্বর আছেন জেনে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এর নাম সর্বযোগ।

২১। একটা ক্ষুদ্র তৃণকে যদি পূর্ণভাবে ঠিক ঠিক জানতে পারা যায় তাহলে ভগবানকেও জানতে পারা যায়। আর ভগবানকে জানলেতো সব জানা যাবেই।

২২। দেখ যদি সব জিনিসের উপরে উঠতে চাও তবে সব বিষয়ের ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ না করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও। সব জিনিসের মধ্যে

ঠাকুরকে দেখতে চেষ্টা করো। আর যা কিছু উঁচু জিনিস, যা কিছু ভালো জিনিস, যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর, তাতেই মন দাও।

২৩। সর্বরূপে তাঁর প্রিয় হবার চেষ্টা ক'রবে।

২৪। দায় তাঁরি মা যখন প্রসব ক'রেছেন, সৃষ্টি ক'রেছেন তখন দায় তাঁরি বেশী। দেখ, সব সময় ভগবান ব্যাকুল হ'য়ে আছেন ভক্তকে টানবার জন্য। আবার আমাদের দায় কারণ আমাদেরও তো তাঁকে না হ'লে পিপাসা মিটবে না—প্রাণ বাঁচে না। নদী তো সাগরে না গেলে বাঁচবে না।

২৫। সৎ অসতের মাপকাঠি তো ঠিক ক'রে কিছু বলা যায় না। এ যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলেও যদি স্বার্থহীন প্রাণ থেকে কোন স্পন্দন ছাড়া যায় তাহলে তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। আর সেই স্পন্দন চারদিক থেকে আরও Similar waves পাবে multiply ক'রবে। আর তাতেই জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই জগতের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ স্পন্দনের সৃষ্টি ক'রতে হয়।

২৬। পরকালে সূক্ষ্মের রাজত্ব, কাজেই যাদের স্থূল মন তারা পরকালে গিয়ে শান্তি পায় না। কিন্তু যারা ধ্যান জপাদি দ্বারা মনের সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে তারা পরকালে কতকটা সুবিধা করতে পারে। ইন্দ্রিয়জ ভোগ ক'রে ক'রে আমরা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েছি, মন হ'য়ে গেছে ভারি—পরকালে তাই অস্বস্তি হয়। ধ্যান জপাদি করে এই মনকে ক'রতে হয় সূক্ষ্ম।

২৭। নিত্য ঠাকুরের সঙ্গ ক'রতে চেষ্টা কর। চারদিকে ঠাকুরের মূর্তি রেখে তাঁর নাম অঙ্গে লিখে, তাঁর মূর্তি বুকে মাথায় রেখে যেমন ক'রে হোক তাঁর সঙ্গ করতে চেষ্টা করো। তাঁর কথা নিত্য সঙ্গী হোক।

গীতি-আলেখ্য

শিব-মহিমা

এক

হে বীরেশ্বর—শিব শম্ভু—জয় হোক তোমার।
চতুর্দশীর এই লগ্নে তোমাকে স্মরণ করি।
হে আদি দেবতা— বেদশীর্ষ রুদ্র··
স্বমহিমায় তুমি দীপ্ত।
হে বীরস্বামী ত্রিপুরারী—হে ধূম্ররূপী ধূর্জ্জটি,
পশুদের অধিপতি পশুপতি,
দেব-অসুর-মনুষ্যের সকলেরই তুমি দেবতা—
তোমায় প্রণাম করি।
বিকলাঙ্গ রাগ-রাগিণীদের সুস্থ করতে তুমি
সঙ্গীতের উদ্গাতা· ····
রাগ-রাগিণী তোমার প্রশস্তিতে মুখর হয়ে ওঠে
দেবলোকে :—

দুই

কৈলাস কন্দরে গুম্ফিত
জাগো মহাদেব জাগো।
বেদমন্থিত সঙ্গীত সুরে
সুস্থ কর ছয় রাগ।
বিষ্ণু বিগলিত গঙ্গারে
মুক্ত কর আজি ছন্দিয়ে
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি
ধরণীর দূর কর পাপ॥
সঙ্গীত নন্দিত ধরণীরে
সপ্ত স্বরে কর চঞ্চর
স্বর্ণ শিহরিত গৈরিকে
মুক্ত কর দুখ তাপ॥

তিন

শিবের আর এক রূপ আছে,—
প্রলয় রূপ··· দক্ষ যজ্ঞে শিব-অপমানে
যোগাগ্নিতে সতী করলেন তনুত্যাগ—
সতীহারা শিবের জাগে মৃত্যু তাণ্ডব। ।

চার

অটল অচল টলমল
নটরাজ আজ নাচে
জটার গঙ্গা উচ্ছল
ধরণী প্রলয় যাচে ॥
নয়নে নাচিছে বাড়ব বহ্নি
চরণে ধরণী মূর্ছিতা
দিক-দেশ-কাল ঘূর্ণিয়া
জাগে বিদ্যুৎ সাজে ॥
বিয়োগ বিধুর উন্মাদ
ধূর্জ্জটি শূলি শম্ভু
দে সতী—দে সতীরে
বজ্র কণ্ঠে বাজে ॥

পাঁচ

শিব হলেন সমাধিস্থ ·······
কৈলাস শিখর নিথর—নিস্পন্দ·········
রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেবতারা নিরীক্ষণ করেন
সে সমাধি।
সৃষ্টির গতি যেন থেমে গেছে।
দেবতার প্রয়োজনে জাগাতে হবে শিবে—
আর জাগাবেন উমা মহেশ্বরী ········

লীলা যে নিত্য,—শ্রীঠাকুরেরও কথা
সতী জন্ম নিলেন হিমালয় গৃহে, ললিত
কুন্দ সে রূপ।
কামনার দেবতা মদন এলেন শিবকে জাগাতে,
কিন্তু কামনা দিয়ে দেবতাকে জাগানো যায় না,
তাঁকে জাগাতে হলে চাই তপস্যা ······
তাই উমা মরণ তপস্যায় হলেন রত।
এবার শিবের যোগ ভঙ্গের পালা—
তিনি এসে দাঁড়ান·········
উমার তখন উপল ভাঙ্গা নদীর মত,—
ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা······
মদনিকা ধরে গান :—

ছয়

ধরণীর রিক্ত বুকে
গৌরী হয় রূপ
ঝরা পাতা মঞ্জরিত
বসন্ত উন্মুখ।
তপ শান্ত গৌরী মেয়ে
ক্ষীণ-চন্দ্র লেখা
চন্দ্রমৌলী দাঁড়িয়েছে তার
পাশেই ভরা বুক॥
আধো ফণী আধো বেণী
অর্দ্ধ নারীশ্বর
রূপ রূপান্তর দেখে যে
মিটলো সকল দুখ॥

সাত

শুভ চতুর্দ্দশীতে বিবাহের দিন—
দীনের ঠাকুর—ধূলি ভস্ম ভূষিত তাঁর তনু।
চন্দ্রমৌলীর সেই বেশই তো বর বেশ।

মণিময় তনুতে, কি মণি সাজবে…… ?
কিন্তু বিবাহ বাসরে হল মুস্কিল—
বরণডালার সর্বৌষধির গন্ধে নাগের পাশ
গেল খসে……
লজ্জায় এয়ো স্ত্রীদের মুখ লাল হয়ে ওঠে—।
তারা বলে :—

আট

আই আই আই লো
এ কি উমার বর লো
এয়ো মাঝে এমন করে
হইল দিগম্বর লো ॥
চাঁদের কণা উমা মোদের
সাতাশ তারার তারা
কপাল পোড়া মহেশ্বরের সাথেই
করবে ঘর লো ॥
রূপ ঢাকিতে ছাই মেখেছে
রূপ কি ঢাকা যায় লো
রাজার মেয়ে আজকে হবে
কোন্ দুখেতে পর লো ॥

নয়

সহসা অন্তঃপুরচারিণীরা দেখেন,—
একি ! এতো শ্মশানচারী ভোলানাথ নয়
এযে শিব মহেশ্বর !!!
ভালে অর্ধচন্দ্র বিকশিত—
নীলকান্ত বরবপু মুক্তা সন্ধ্যা বিলসিত—
ত্রিনয়নে মৃদু বিদ্যুৎ বিলাস……
রূপে রূপময়—উমা মহেশ্বর……
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রকাশিত হ'য়ে স্তব করছেন :—

দশ

ক্ষর প্রধান অক্ষর হর
তুমি যে পার সব সীমায়
ডমরু ত্রিশূল ধৃত ও কর
সর্বনাশ করে আবার ॥
রুদ্র তুমি গিরিশন্ত
অপাপকাশিনী তনু ধর
ভুবন ভবন বেষ্টন কারী
ত্রিপাদবৃৎ হে সারাৎসার ॥
সর্বভূতে গূঢ় তুমি যে
সহস্রশীর্ষা পুরুষ হে
সহস্র অক্ষি সহস্র মুখ
সহস্র দিকে পদ বিথার ॥

এগার

তবু তিনি যে দীনের ঠাকুর।
চতুর্দশীর আঁধার ছাওয়া আর এক রাত্রি,—
দীন দরিদ্র এক ব্যাধ, শিকারে অসমর্থ—
আশ্রয় নিয়েছে একটি বিল্ববৃক্ষের শাখায়।
জানে না—নীচে এক শিবশিলা প্রতিষ্ঠিত।
সারাদিনের অক্ষমতায়
দুচোখে তার জল ঝরছে,—
সহসা চন্দ্রমৌলী শিব এসে দাঁড়ান……
গভীর গম্ভীর সে রূপ,—
বলেন,—কে রে ভক্ত ?—
আমায় চোখের জলে আর বিল্বদলে
পূজা করলি ?
কি চাস……… ?
নেমে আসে ব্যাধ—ভূলুণ্ঠে প্রণাম করে

তার দুচোখে মুক্তাধারা,—
বলে,—প্রভু তোমাকেই চাই……
প্রভাতে সবাই ছুটে আসে, শোনে সেই কথা।
তাদের মুখে তখন শিব মহিম্নস্তোত্র,—

বার

ঠাকুর তুমি সবার ঠাকুর
দয়ার তোমার নাইতো শেষ
চাইনা কিছু পূজায় তোমার
বিল্বদল আর অশ্রু লেশ॥
হিমালয়ের মত যে বুক
উচ্চ হতেও উচ্চ শির
দেবাদিদেব তাইতো বলি
সবার দুখে রিক্ত বেশ॥
ভালবাসো ধরার ধূলি
লুটিয়ে মায়ের চরণতলী
উমা মহেশ্বরে পূজি
গর্বে ভরা হৃদয় দেশ॥

শ্রীপঞ্চমী

হে বেদময়ি ভারতি—তোমায় নমস্কার। বার বার নমস্কার। বনান্তের প্রথম মুকুলের এই আবাহনী এ যে তোমারই আহ্বান জননি! জগতের প্রথম ঊষা তুমিই তো এনেছ দেবি!

উপনিষদে কথিত প্রখর স্রোতযুক্ত অবিদ্যার যে নদী সে নদীতে তুমিই তো পঞ্চতরণী স্বরূপা। হে মাতঃ—এই মুকুলিত বনের মত প্রাণকে করো জাগ্রত। হে কুন্দকনককান্তিকান্ত দেবি! সব আঁধারের পারে আমাদের নিয়ে চল।—

নমো বেদময়ী নমো নমো
মাধবী মুকুলে তব আবাহনী
প্রথম ঊষসী চির সনাতনী
পঞ্চ স্রোতের অম্বুতে তুমি এনেছো পঞ্চ তরণী॥
প্রাণের মুকুলে মোহ হিম হরা
উন্মোচি এই কুহেলীর ধরা
সব তমসার পারে নিয়ে চলো মাগো কুন্দ কনক বরণী॥

কুয়াশার জাল গেছে ছিন্ন হয়ে। বসন্ত এনেছে পূজার ফুল আয়োজন। শ্রীপঞ্চমীর এই তীর্থ তিথিতে মার করুণাঘন দিঠি উঠেছে ফুটে। প্রথম যেদিন জেগেছিল কবি বাল্মীকির কণ্ঠে—'মা নিষাদ' ছন্দ—সেই অনুষ্টুপ মন্ত্রেই তো জাগিয়েছিলে তার মোহমূক-হৃদয়।

কুজ্ঝটি ভেদি এসো গো জননী দুখের রাতি গভীর
দুটি আঁখির পলকে ঝলকিত আলো স্পর্শ মধু অধীর॥
তমসার তীরে কত যে কথা না বলা কত যে বাণী
তুমি নিলে তুলে আলোক তীর্থে তারি সাথে আঁখি নীর॥
বল্মীক গুহা গুণ্ঠিত কত 'মা নিষাদ' ছন্দ
চুপে বসে রয় হে বাণি ভারতি নিবেদন স্রক গন্ধ,
বন বসন্তে পূজা আয়োজন পঞ্চমী চাঁদে মীড়
চরণে জড়ায়ে প্রাণ ঊষসী উন্মন উষীর॥

মা আমার বেদমাতা। তিনি অপরা জ্ঞানদাত্রী আবার পরাজ্ঞানও তাঁর

দান। হৃদয় পদ্মে অনাহত নাদ যে তাঁরই আবাহনী। তাঁরি অভয় চরণ যুগে যুগেই কাম্য।

বেদোজ্জ্বল অমল বরণে
এস বেদমাতা রাখিতে শরণে
এস মা সারদে। এস মা শুভদে!
জ্ঞান বিজ্ঞান দানিতে মরমে ॥
শুচিস্মিতা শুভ কিরণ স্নাতা
জাগিয়ো জননী মরমে রাতা
জাগায়ো মরম শতদল মাগো রাখিতে অভয় চরণে ॥

মা আমার ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবি। সপ্তস্বরা বীণা তাই তার হাতে। শুধু ফুলেই বসন্ত আসে না, ধরণী—সেও 'বাঙময়ী', প্রাণের পরশ যে তার চাই, প্রাণ বীণাতে যে ঝঙ্কার দেবে সেতো মায়ের বীণার ঝঙ্কার। প্রাণের প্রদীপ জ্বালিতে হলে—চাই যে আর এক প্রাণ।

ফুলেই শুধু বসন্ত নয় না এলে মা তুমি
হাজার দিনের আনন্দতেই বসন্ত পঞ্চমী ॥
ফোটে কি কমল শুধু না পেলে চরণ মধু
শ্যামার শিষ দেওয়া নয় মুকুলে যায় চুমি ॥
ফাগুনের প্রথম নিহার মধু যে বনে বনে
এলে গো সারদা মা প্রাণের যে প্রাণ টানে
রাগে আর রাগিণীতে বীণা কি উঠবে মেতে
সাজে কি ধরণী গো না পেলে চরণ ভূমি ॥

দিকে দিকে যে শঙ্খ বেজে উঠেছে, সে শঙ্খের সুরেই মার আবাহন। শিশির ভরা মঙ্গল কলস ঝরে পড়ছে দূর গগনে, শ্বেত শতদল বাসিনী মা এসেছেন, আমরা শক্তি ও ভক্তি নিয়ে হৃদয়ের ধূপ দেব জেলে রাঙা চরণ নিকষে।

দিক শঙ্খ মুখরিত আনন্দ গানে
মঙ্গল কলস ঝরে দূর গগনে ॥
শান্তির চুমা দোলে ব্যথিত বুকে
সিত সুন্দর রূপে এলে আলোক লোকে
কল কাঁদনী জাগে শুভ আবাহনে ॥
এস শক্তি রূপে এস ভক্তি বুকে
এস হৃদয় ধূপে এস গহিন প্রাণে ॥

সৃষ্টি যেদিন প্রথম কমলের মত উঠেছিল জেগে সেদিন সে ত' মার মুখের হাসি নিয়েই উঠেছিল ফুটে। সৃষ্টির কম্পনে যে সুর জেগেছিল সে সুর অসৃষ্টির ব্যথার বুকেই ত' রাঙা। আমাদের পূজা যেন আঁধারের পূজা—এ পূজা দুঃখের আঁধারে দীপ জ্বালা এক টুকরো আলো।

সৃজনের এই কমল ফোটায় ফোটে মা বেদ হাসি
ওঠে ভাসি আলোর বাঁশী
ধীরে এই ঢেউয়ের দোলায়
সুরে মীড় টোল খেয়ে যায়
ব্যথার বেলায় রেঙে ওঠে এই দুরাশী
ছুটে যেতে বলে আসি ॥
ওমা তোর অরূপ রূপে আজি মোর দহন ধূপে
মিশে যায় চুপে চুপে পূজার দুখ বিলাসী ॥

সিন্ধু-শতদ্রু-তীরে ঋষিকণ্ঠে শুনি দেবী সরস্বতীর স্তুতি। তিনি শুধু প্রজ্ঞালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন তা নয়—একাধারে তিনি লক্ষ্মীও। যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর—মা আমাদের সবেরই প্রেরণাদাত্রী—তিনিই যে যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবী নারায়ণী। চণ্ডী গাথায়—বিদ্যা···পরমা ॥

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০ ॥
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥ ১২ ॥

অন্নবতী সরস্বতী হৃদয় কর সুপূত।
যজ্ঞ সে ও বিষ্ণু গো মা সেথায় থাক নিয়ত ॥
সুনৃত যে সত্য সে ও প্রেরণা যে তোমারি
সুমতি সজ্জন হৃদে তুমি সদা রাজিও ॥
অর্ণব রূপ পরম দেবের তোমা হতেই প্রকাশ
বিশ্বহৃদি-তলবাসী প্রজ্ঞা সে ও তুমিই ত' ॥

সারদাশ্রী (ছায়া নটন)

প্রথম দৃশ্য

[মা-র বাড়ীর একাংশের দৃশ্য, মরাই-এর পাশে ক্ষুদিরাম দণ্ডায়মান, সম্মুখে ভুখারী জনতা! মা'র প্রবেশ]।

মা—(পিতার প্রতি) দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী একি গ্রাসিয়াছে জয়রাম ভূমি। দেহ পিতা দেহ অন্ন, মরায়ের দ্বার খুলি বাঁচাতে হবে যে দীন ভুখারী সন্তানে। অন্নদান অন্নদার নিত্য-ব্রত সে যে। (সবাই ভোজনরত—মা পরিবেশন করিতেছেন।)

মা—অন্নথালি আমারও যে চাই, পুত্র এরা, আমি নাহি দিলে পূর্ণ কি হবে সাধ সবাকার! আঁচলের বায়ে জুড়াইয়া দিব পরমান্ন যত। পূর্ণ হবে—সব আশা, মম সাধ যত। ভুখারী সন্তানে ফেলি শিবাণী রহিবারে পারে? (বরাভয়া রূপে মা দণ্ডায়মানা)।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মা-র বাড়ীর ভিতরের অংশ (মা গমনোদ্যতা)]

শ্যামাসুন্দরী—কোথা যাবি সারু মা!

মা—আমি যাই তুলা ক্ষেতে, তুলিবারে তুলা তব সনে।

শ্যামা—না-না, কাজ নাই গিয়ে, পায়ে তোর বাজিবে ব্যথা।

মা—বড় তো হ'য়েছি। দেখনা আঁচল ভরিয়া নেব শুভ্রমেঘ সম তুলাগুলি, যতনে আনিব ধরি।

শ্যামা—কাজ আছে মোর, তবে সারু যাও তুমি একা। (তুলাক্ষেতে মা-র প্রবেশ।)

মা—আহা নবনীর মত তুলাগুলি, একাই পারিব তুলে নিতে যেতে মা-র কাছে। (সহসা পশ্চাতে দেখিয়া)

একি! সমবয়সিনী বালা মোর সাথে আসে! হাসি হাসি কচি মুখখানি —ঢলঢল শতদল যেন—কে গো তুমি? চিনিতে তোমা নাহি চিনি?

মহামায়া—এক অঙ্গে বাঁধা তোমা সনে। সাথে সাথে ফিরি তব। কঙ্করিত পথে চরণে আঘাত লাগে তার ভার নিতে, আমিও যে সাথী তব। জীবনের মরুপথ নিয়েছ যে, ছাড়িয়া এসেছ দেবভূমি। আমি কি রহিতে পারি? জীবনসঙ্গিনী তব। এক আত্মা, এক দেহে মোরা! চিনিবে না—ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যাবে। চিনা দিতে আজি করি ভয় পাছে দেহ ছাড়িবারে চাই। চল দোঁহে কুড়াইব তুলা আঁচল ভরিয়া। (উভয়ে তুলা কুড়াইতে লাগিলেন।) (যবনিকা পতন)

তৃতীয় দৃশ্য

[হালদার দীঘির পথে মা কলসী কাঁখে (কলসীর মুখে গামছা) চলিতে চলিতে হঠাৎ দণ্ডায়মানা হইলেন]।

মা—নহে দ্বিপ্রহর রজনী তমিস্রা। মধ্যাহ্নের দিনে হেরি যেন অসহায়ের ঘোর অন্ধকার। কে নিবে পারায়ে! কাহারেও নাহি দেখি—(থমকিয়া দণ্ডায়মানা দিব্যবেশে, কলসী কাঁখে সখীদের প্রবেশ)

মা—ওকি কান্ত কুমারী আটঙ্গনা, হেথা কেবা আসে ধীরে ধীরে নূপুরিত পায়ে? নৃত্যে যেন উষর ভূমিতে মঞ্জুশ্রী উঠিল জাগিয়া।

অষ্টসখী—আহা, মরি! মরি! শ্যামার ঝিয়ারী অসময়ে শুষ্ক যেন পদ্মমুখ। যেন অসহায় পথহারা! একি! চিনিতে পারো না বুঝি? (গালে হাত) চিরচেনা জনে? যাই তবে—আপনার জন যদি নিজ জনে দেয় ফেলি, কাজ নাই চল সখী—মোরা সবে যাই চলি।

(সকলে গমনোদ্যতা হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন)

সখীগণ—একি! ছলছল আঁখি কেন? এত ছলাকলা জানো সখী? চিনিয়া না চেনো। অভিনয় ভালো জানো। চলো তবে, নূপুরিত পায়ে আমরা দেখাবো পথ, বিপরীত হবে সে তো জানি। কাঁকনে কলসে তার রিনিঝিনি বাজাইয়া আমরা যে গাঁয়ে যাবো এবারে দিশারী যে মোরা। অবলা বালিকা তুমি। চল সখী চল সিনানের ঘাটে। আঁচলে দখিনা তোলা তুমি গিয়াছ তো ভুলি। ভুলি নাই অমৃত সে লোক, মোরা ভুলি নাই নৃত্যগীত পুরানো সে কথা—নূতন করিয়া সখী আনি দিব আজি—চল সখী। (মাকে সঙ্গে লইয়া সকলে স্নানের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন)।

(যবনিকা পতন)

বাংলা মাটির মা

বাংলার নীল আকাশে মেঘ আসে—স'রেও যায়। বার বার শ্যামা মেয়ের মুখে আঁধার এসেছে ঘনিয়ে, বার বার সে আঁধার গেছে সরে। এমনি দুর্দিন এসেছিল বারশো একাত্তর সালে। বাঁকুড়ায় সোনার ক্ষেতে সেদিন মূর্ত রাহুর মত নেমে এসেছিল অজস্র পঙ্গপালের দল। চাষীদের চোখের সামনে সহসা নেমে এল মন্বন্তর। এমনি দুঃখ গহন দিনগুলির কথা আমরা পল্লীমায়ের কণ্ঠে পাই ছেলে ভুলানো ছড়ায়—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
পঙ্গপালে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।
আয় রে ঘুম আয় রে ঘুম জেলে পাড়া দিয়ে
জেলেদের ছেলে তোরা জাল মুড়ি দিসে।
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যা
আর বাটা ভরা পান দেবো গাল ভরে খে'সে॥

দীন নারায়ণদের দুঃখের যেন শেষ হয় না, অভাবের ওপর অভাব। তাদের মুখের গ্রাস অন্ন আজ চোখের সামনে হয়ে গেছে শেষ। তারা বলে,—

ও আমার—বর্ষা কালের ছাতা, ও আমার—জাড় কালের কাঁথা
ওরে ধান ধান ধান রে॥
ও আমার-চুল বাঁধন দড়ি, ও আমার—হুড়কো দেবার লড়ি
ওরে ধান ধান ধান রে॥
সোনা-রুপো নাই দূর্গে আকালে বিচে খাবো
আর রাঙা রুলী শঙ্খ প'রে কোন স্বর্গে যাবো
ওরে ধান ধান ধান রে॥
আমার পেতে শুতে বিছানা নাই আমার-ভাঙ্গা ঘরের ছাঁদন নাই
ওরে ধান ধান ধান রে
ও ধান হ'ল আপন পুত, রুপার পৈঁছে শাড়ী
ধান গেল ধন গেল, না খেয়ে মরি
ওরে ধান ধান ধান রে॥

ঘরে ঘরে জাগে ক্রন্দসী নিশি। তবু চোখ মুছে তারা ধানের অবশিষ্টটুকু কুড়িয়ে আনতে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নেয় সঙ্গ। বাঁকুড়ালক্ষ্মী সারদা মাও চলেন—নাহ'লে লোকেরা খাবে কি, একটুকরো মেয়ে বসতে জানে না। পরে যেমন বলেছেন, 'কাজ লক্ষ্মী'।

এপার গঙ্গা ওপার যমুনা আমোদরের জলে
তারি কোণে মা সারদা লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে॥
সাধ ক'রে মা ঘরটি নিকোয় সাধ ক'রে মা রাঁধে
তুলার ক্ষেতে তুলতে তুলা সঙ্গে কে ও চলে॥
ল' ল' করে দল ঘাস গাইয়ের মুখে দিও
ধান খুঁটিতে যাও মা 'সারু' দিতে সবার থালে॥

কান্না ছড়ানো মাঠ থেকে খুঁটে খুঁটে সবাই নিয়ে আসে সেই ধান,—মাও আনেন। এদিকে ভুখারী নারায়ণদের দলে জেগেছে হাহাকার। সারদার পিতা খুলে দেন ধানের মড়াই। দীন হ'লেও বাংলার বুক কোন দিনই দীন নয়। হাঁড়িতে হাঁড়িতে খিচুড়ী রান্না হয়, কোমরে কাপড় বেঁধে মা এসে দাঁড়ান অন্নপূর্ণা রূপে। তপ্ত অন্ন বাতাসে দেন জুড়িয়ে। ভুখারী নারায়ণদের মুখে জাগে—

সারদা মা এনেছে রে 'শালী' ধানের অন্ন
কোথা গেলে পাবো ওরে এমন অন্নপূন্নো॥
লক্ষ্মী মায়ের হাতে খাই হাতে হাতে সগ্যো
তাড়াতাড়ি জুড়াতে চাই হাতটি কমল 'বন্ন'॥
সবাই মিলে পায়ের পায়ে আয় রে করি গড়
টঙ্কা পেলে শঙ্খ দিতাম মায়ের হাতে স্বন্ন॥

ভুখারী ছেলেরা ডাকে; আবার আসবে কি মা মূর্তিমতী হ'য়ে করুণায় গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দিতে। পায়ে পায়ে আবার রচনা হোক মুক্তির তীর্থ—বাংলার ঘরে ঘরে তোমার মতই ছেলেমেয়েরাধনে ধানে কল্যাণে উঠুক ভ'রে—

বাংলা মাটির মাগো আমার দে চরণে 'থান'।
ঘরে ঘরে সোনা যাচন মরাই এ ধান পান॥
রাখিস মাগো দুধে-ভাতে ঘরে ঘরে ক'ন্নে পুতে
জিয়ল মাছের বড় পুকুর ভরা কানে কান॥

পৌষ লক্ষ্মী মাগো কোথা 'করে' সোনার ঝাঁপি
'ছেরো' দিনের মাগো পায়ে ধান দূর্বা রাখি।
চৌদ্দ ডিঙ্গা আসুক ফিরে 'চাঁদের' মধুকর
রাঙা পায়ে 'গড়ি' দিতে মন করে আনচান।

বেদশীর্ষ অভেদানন্দ

জগতের সমন্বয়বাণী এনেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তাঁর সঙ্গে তাঁর বাণী বার্তাবহ যাঁরা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁদের অন্যতম। দেশে দেশে বিশেষ ক'রে মার্কিনে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধ'রে তিনি বিলিয়ে গেছেন সাম্যের মন্ত্র —অভেদ মন্ত্র—মানুষ হবার মন্ত্র··· ··· ···

অপগত হোক সকল গ্লানি হানাহানি আর বিদ্বেষ
জাগ্রত হও জগতের নাথ রক্ষা করিতে দেশ॥
সত্য-শিব-সুন্দরের হোক হে অভ্যুদয়
অন্ধকারের যত কথা আজ হোক না নিরুদ্দেশ॥
ভুলাইয়া দাও সকল শঙ্কা সব দ্বিধা আর দন্দ্ব
মন্থর দুর যাত্রীক তার মিলিবে পথের শেষ॥

পিতামাতার বক্ষ হতে কক্ষ্যচ্যুত তারার মত ছুটে গেছে কিশোর কালীপ্রসাদ —দক্ষিণেশ্বরে অজানা পথে···মাত্র সতের বছরের জীবন। এরি ভেতর এসে গেছে বৈরাগ্যের রিক্ততা···গীতার ত্যাগ মন্ত্র···দুরু দুরু বুকে জাগে শুধু দুটি কথা—কোথা তুমি নারায়ণ—মুক্তির দিশারী··· ··

ঘনায় রাত্রি তমসার তীরে পঞ্চবটী যে স্পন্দমান
কম্পিত হিয়া দুরু দুরু করে জাগো হে ভগবান॥
অনাগত কত ছায়া ফেলে যায় জীবনের এই নাটে
বুঝিতে পারিনা কত আছে পথ কোথা তার অবসান॥
ব'লে গেছ জানি প্রথম পন্থে বিষের পাত্র রয়
মরুপথে তার অমৃত আসে করে যারা সন্ধান॥
অর্গল আজ মুক্ত কর হে জাগৃহি-হৃদিবর্তে
যুগে যুগে তুমি জেগেছ হে প্রভু শুনেছ হে আহ্বান॥

শ্রীঠাকুর দেন দীক্ষা—অভেদ মন্ত্রের দীক্ষা—এই দীক্ষা নিয়ে ছুটে গেছেন প্রমিথাসের অগ্নি নিয়ে হিমালয় থেকে কুমারিকা—ছুটে গেছেন ইংলণ্ড, আমেরিকায়—রিক্ততার পূর্ণতা নিয়ে। তিনি আনেননি ধর্মান্তরের বাণী—তিনি দিয়েছেন দিকে দিকে মানুষ হবার মন্ত্র—নিজের নিজের পথে—অন্ধকারে দিতে চেয়েছেন আলো—অভেদজ্ঞানের আলো···মনীষায় আর প্রেমে যেমন পেয়েছেন বন্ধু হিসাবে প্রফেসর পার্কার, ল্যানমান, জেম্‌স্ প্রভৃতিকে···তেমনি পেয়েছেন মজুর, ড্রাইভার এদের আপন করে—প্রেম যে সর্বজয়ী···তারা পেয়েছে তাদের আপনজন।

পরশমণি আমরা খুঁজি সোনা হতেই আমরা চাই
প্রেমের পরশ কোথায় ওগো এমন মানুষ কোথায় পাই ॥
বুকের কোণে লুকিয়ে থাকা—সন্ধান তার আজ
পেয়েছি যে ক্লান্ত পথিক জীয়ন কাঠির ছোঁয়ানটাই ॥
ঘরে ঘরে জ্বালতে হবে অভেদ দীপক অনির্বাণ
মানুষ হবার মন্ত্র নিয়ে ভায়ের সাথে মিলবে ভাই ॥

আল্পসের হিমচূড়ায় উঠেছিলেন অভেদস্বামী পাহাড়চারীদের সঙ্গে—সুন্দরের সীমানা খুঁজে ফিরছে সবাই, তার মধ্যে সব রকম লোকই তো রয়েছে···তারা প্রশ্ন করে অভেদপাদকে,—আপনাদের হিমালয় কেমন·· গৈরিক ঢলের মতই উত্তর আসে—"হিমালয়ের সানুদেশে যদি এই গিরিশ্রেণীকে বসিয়ে দাও, খুঁজেই পাওয়া যাবে না আর তাকে"—বিস্ময় জাগে মার্কিনবাসীদের, বলেছেন তাদের, —"ভারতেই জেগেছে প্রথম জ্ঞানের আলো"! —গণিতে, সঙ্গীতে, ধ্যানে, ধর্মে—অজস্র লেখনীতে তিনি করেছেন ভারতের জয়গান। প্রথম রাষ্ট্রদূতরূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন এদেশের যা কিছু সত্য, যা কিছু শিব যা কিছু সুন্দর..

ধন্য ভারত পুণ্য ভারত যুগে যুগেই
তুমি মহান দীপ্ত জ্ঞানের অগ্নি জ্বেলেছো।
অন্ধপথেই মুক্তপ্রাণ ॥
দেব আত্মা হিমাদ্রী শির আজো দীপ্ত মহিমায়
চন্দ্র তারা তীর্থ পথেও গৌরব যে হয়নি ম্লান ॥
বুকের রক্তে গড়েছি যে তোমার তীর্থ তোমার জয়
দুর্বার তব সন্তান দল রেখেই চলে তোমার মান ॥

বোধন

আজ শরতের রূপ দীপালী…ঘরে ঘরে মঙ্গলাচার…আনন্দ আর আনন্দ —খুশির বাঁশী বেজে উঠেছে গগনে ভুবনে—পূজার আনন্দ আজ ঘরে ঘরে—

পথিক শরৎ অতিথ শরৎ থমকে দাঁড়াও দেখি
বটের মূলে ছায়ার আসন আজ কি যাবে লেখি॥
মেঘে মেঘে রঙ ধরেছে সাত সায়রের রঙ
গোপাল বলে প'ড়বো আমি রাখালীয়া রাখী॥
পূজার বাঁশী ললিত রঙে প্রাণের প্রবাল খোঁজে
জীবন নদী খুশিতে আজ চাইলো অনিমেখি॥

জানবাজারের রাণী রাসমণির ঘরে আজ মহামহোৎসব। শ্রীঠাকুরকে তারা নিয়ে এসেছে। 'বাবা' না হ'লে তাদের পূজা হবে মিথ্যে—কিন্তু 'বাবা'কে যায় না পাওয়া—কোথায় তিনি? জগদম্বা দাসী খুঁজে বার করে বাবাকে—বাবা তুমি একলা ব'সে এখানে, তোমায় খুঁজে ফিরছি কত, আজ সপ্তমী—মার পূজা চামর করবে না মাকে……? চল তোমায় সাজিয়ে দিগে বেশ ভাল ক'রে মার সখীবেশে—চল চামর ক'রবে।……ঠাকুর এসে দাঁড়ান সখীবেশে—মথুর দেখে আর দেখে, চিনতে আর পারে না—ঠাকুর গান ধরেন,—

পাগলি মেয়ে দাঁড়ালি কি দালান আলো ক'রে
আমিও কি রইবো হেথা একলা কোনে প'ড়ে॥
সাত সাগরের শঙ্খ নেবো মঙ্গলাচার করি
আকাশ হ'তে মেঘের চামর আজকে নেব কেড়ে॥
অষ্ট সখী—আসবে—ঘিরে অষ্ট কলস নিয়ে
তাদের সাথে আমিও নি' আঁখির কলস ভ'রে॥

পূজার তিনটি দিন দীয়তাং ভূজ্যতাংএ চলে কেটে। পূজার বাঁশীতে আর শিশুদের অকারণের হাসিতে আকাশ হয়ে ওঠে আরো নীল। রাণী রাসমণির পূজা—দীন দরিদ্র সবারই আজ নিমন্ত্রণ। তবু আনন্দের হাট-বাজারেও যেন জাগে বিষাদ মধুর বিজয়ার একটি রেশ—মথুরের এখন থেকেই ভাবনা—

মা যে আমার নিত্যময়ী কত সাধের মা আমার
মুখ দেখে যে বুক ভ'রে যায় মানিক সে যে সাত রাজার॥

একলা ঘরে রইবো কেন নিত্য পূজার মন্ত্রে
মাকে আমার রাখবো ঘিরে আলো হবে সব আঁধার ॥
তিনটি দিনে সাধ পুরে না সকল দিনের এই পূজা
মা যে আমার বিজয়িনী বিজয়া নাই দুখ ব্যথার ॥

ঠাকুর বলেন,—মাকে কেউ হারায় নাকি, মার কি বিসর্জন আছে রে? চোদ্দ ভুবন জুড়েই যে মা, কোন সাগরে তাকে বিসর্জন দিবি? দেখ দিকি তোর হৃদয়কন্দরে মা যে সদাই বিরাজ ক'রছেন—আয় বুকে হাত বুলিয়ে দিই—

মাকে কোথায় হারাবি রে কোথায় আছে কোথায় নাই
গগন ভুবন জুড়ে যে মা ঘটে ঘটে তারেই পাই ॥
সাকার তিনি নিরাকারও আরো কি যে ব'লবে কে
মাকে আমার চিনতে গিয়ে বিশ্বনাথের নাই দিশাই ॥
মায়ের কথা ব'লতে গিয়ে আগম নিগম হ'ল হারা
বুকের কাছে তবু তারে আপন ক'রে পাই সদাই ॥

মথুর বলে—আহা! আহা! এই তো আমার মা, সত্যিকারের মা—হৃদবিলাসী মাকে পেলে আর কি চাইবো—রূপ তো নয়, ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী—মা—মা—দয়াময়ী এত দয়া তোর......ওরে বাজা বাজা, নিত্যি আবাহনের বাদ্যি বাজা—ছেলের কাছে মায়ের বিসর্জন নাই। মাকে আমার হৃদয় মন্দিরে নিত্যি রাখবো—কোথাও বিরহ-বিচ্ছেদ নাই।

আয় রে পূজি মাকে মোদের আয় রে সব ছেলেমেয়ে
মন্দিরে নয় পাষাণ রূপে মা যে আছে বুকটা ছেয়ে ॥
সুখে দুখে খুঁজবি কোথা দূরে অন্তিকে
খুঁজবি কোথা আপন মাকে এমন ধারা পাগল হ'য়ে ॥
নাচ রে সবাই ঘুরে ফিরে মন্ত্র তন্ত্র নাই
বিশ্বনাথ যে পাগল হ'ল পাগল করা চরণ পেয়ে ॥

আয় মা উমা

ভরা ভাদর পার হ'য়ে এসেছে শারদীয়া—মা'র মহা-মহোৎসব। দিকে দিকে পড়ে গেছে সাড়া—আনন্দে যেন রঙ্গীন হয়ে ওঠে আকাশখানা। আগল ভাঙ্গা খুশীতে ঘাট মাঠ আজ ভরা। আলোর পাখী সে যেন কোথা থেকে পেয়েছে ছাড়া, আর সুরের পাগল বাউল সে ধরেছে একতারা।—

মন মানে না সয় না তর আয় মা উমা 'ঘরকে' আয়
বুকটা আসে 'আনচানিয়ে' কথায় কি আর 'তি'ষে' যায়॥
শাওন শেষের আউশ ধানের 'খুসবো' করে মন উদাস
থৈ লাগেনা 'আমোদরে' শিরশিরিয়ে বইছে 'বায়'॥
'ভিয়েন' ক'রে রেখেছি মা মুড়কী মোয়া খৈ
চাঁদ কপালী আয় মা ধেয়ে পথ 'ভেলে' যে রই।
সাতটি তিথি পারিয়ে এল সাতটি চাঁদের কোনা
চন্দ্রমুখী তুই না এলে ঘরে যে আর 'টেকা' দায়॥

শতাধিক বছর আগেকার কথা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যুষিত কামারপুকুরের উত্তরে ছিল ভুরসুবো গ্রাম। মাণিকরাজা ছিলেন সেখানকার জমিদার। সেবার মাণিক রাজার বাড়ীর পূজা মণ্ডপে বসেছে মহামায়ার বোধন—শঙ্খে ঘণ্টায় মুখর হয়ে উঠেছে পূজাবাড়ী—লক্ষ্মীর মত একটুকরো মেয়ে, মাণিকরাজার কন্যা—মা'র পূজার আয়োজন করতে তন্ময় হয়েই সে গায়—

গৌরী মেয়ে পড়বে এবার কাশফুলেরি মালা
আঁচল পেতে ভরেছি যে শিউলি হাসির ডালা॥
দোয়েল শ্যামার শিসে ডাক পড়েছে ঐ
সুখ সায়রের আঁচল হ'ল জলেতে থৈ থৈ
রবির কিরণ ঢালা॥
সোনার থালে ভরব মায়ের ভোগ যে থরেথরে
সোনার দীপে মুখে যে মার হাসিটি না ধরে—
আলোয় মাণিক আলা॥

মাণিকরাজার আমের বন—পূজার বাড়ীর কাছেই, শিউলি আলোয় সে আজ হেসে উঠেছে। সেখানে খেলতে গেছেন ঠাকুর গদাধর, সঙ্গে আছে

দীন-নারায়ণদের ছেলেরা। ঠাকুর যে ছিলেন তাদের রাজা—তারা গেয়ে চলে—

মাকে আবার এনেছি যে শাওন পারের দিনে
মেঘের কোলে আলোর নাচন মাকে নিল চিনে ॥
কুন্দ হেসে রোদ বলে গো আমি এলাম ফিরে—
ভিজে ভিজে সোঁদা হাওয়া নবীন তৃণে তৃণে ॥
প্রজাপতির পিছে ছুটে রামধনু তার রঙই লুটে
নদী আঁকে আল্পনা গো নাচন শুধু তুলে
মাকে পেয়ে নূতন সুরে বাঁধব ভাঙ্গা বীণে ॥

খেলতে খেলতে তাদের পায় ক্ষুধা, ঠাকুর পারেন না থাকতে। রাজবাড়ীতে যাতায়াত আগে থেকেই। যেতে যেতে সুরময়ের কণ্ঠে জাগে গান—

দীনের ও দীন দয়াময়ী কি এনেছো বলো।
দেখ্‌না ওমা ছেলের কত নয়ন ছলো ছলো ॥
অন্ন দিবি 'অন্নদে' গো তাইতো ডাকে তোরে
কেঁদেই ঢলো ঢলো ॥
দুয়ারে আজ এসেছে মা মেলে করুণ মুঠি
কমল নয়ন মেলো ॥

রাজার মেয়ে সাজাচ্ছিলেন নৈবেদ্য। করুণাময়ী আর কি পারে সইতে? মার নৈবেদ্য পূজার আগেই দেয় ঢেলে দীন নারায়ণদের হাতে, তাদের ভেতরেও যে জেগেছেন 'মা'ই। কিন্তু পিতা করেন রাগ। অকল্যাণ ভেবে ছুটে যান প্রতিমার পাশে। অবুঝ মেয়ের জন্য চাই যে ক্ষমা—কিন্তু একি! অন্নবতী মা আজ চিন্ময় হাসিতে দলমল করেছেন—আর দশহাতে নিচ্ছেন ভোগ। তাঁর দীন ছেলেরা আজ পেয়েছে পেট ভরে খেতে—স্তব করেন মুগ্ধ রাজা—

প্রপন্ন জনে রাখো নারায়ণী রাখো নারায়ণী রাখো
মহিষাসুর নির্ণাশে জাগো মা দুর্গে জাগো ॥
কল্যাণী তুমি মঙ্গলা তুমি সর্বাণী তুমি শিবে
যুগে যুগে মাগো আরতি তোমার প্রাণের পঞ্চদীপে
দশভুজে তব দশ প্রহরণ দুশ দিশ ভরি থাকো ॥

মাণিকরাজার পূজার আঙ্গিনায় সেদিন দীন কণ্ঠে জাগে আনন্দ-মন্থন গান। তার কাছে হার মানে হাজার সুরের জলসা—এই পূজাই তো সার্থক পূজা—

মার দীন ছেলেমেয়েদের মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে সে তো মার মুখেরই হাসি। ঘরে ঘরে এমনি পূজাই আবার নিয়ে আয় মা অন্নদে—

আমরা হাসি আমরা খুশি—ভরা যে আঁচল
আনন্দিনী মা এসেছে মোছ্‌রে চোখের জল ॥
অনেক দুখের গাঙ পারিয়ে পেয়েছি এই কূল
ভরা ঘাটে ঘট ভরা গো জল করে ছল ছল ॥
মা যে মোদের আপন মা ভাবনা যে আর নাই
তাইতো মোরা নেচে চলি সব পেয়েছির দল।

গৌরী মেয়ে

শরৎ এসেছে মেঘহারা নীল হাসি হেসে—মা'র নীলচোখে যে তার মিল! এতদিন আমাদের ছেড়ে মা'র আসাই হয় না, মা যে আমাদের বাংলা ঘরের মেয়ে। এখানে যে মার কৌশিকী রূপ—পাষাণের ঘরে পাষাণী সে তো নয়···

ও গিরির মেয়ে হিমের ঘরে কেমন করে ছিলি মাঈ
শুনি নাকি পাষাণ করে পাষাণ সাথে হিয়াটাই ॥
এলিয়ে পড়া ফুলের মতন কঠিন শিলায় রাঙা চরণ
ফেলতে মরি দেয় কি কখন মানা কি তার নাই ॥
ডালিম ফুলী তুষার হাসি গৌরী মুখেই থাকনা ভাসি
কার বালাই নিয়ে কৌশিকী রূপ ধরলি ভাবি তাই ॥
মেঘ হারানো গগন নীলে লাজ দিয়েছিস নয়ন মিলে
আলতা তুধী আঙুল ছুঁয়ে গোলাপ লাজে ঝরে নাই ॥

বাংলা ছাড়া মাকে এমন করে কে ডাকে গো? নাই বা রইলো রোডন ফুল আর গোলাপ কুঁচির ডালা—পাহাড় আলো নাই বা হ'ল পাহাড়ী ঝরণার নেচে চলায়—? শ্যামল মাঠে তো আছে ভরা ঘাস—ভরা গঙ্গার কূল—বন আলো করা ফুল···কাশের গুচির চামর আর পদ্মদীঘির টলটলে জল···বাংলার কুমারী গৌরীদের উলু আর শাঁখে আগমনী—

পাষাণের বুক ভাঙ্গা গো কুঁচি ফুল না যুঁই
একটি মুঠো অভ্র আবীর গিরির মেয়ে তুই ॥

খেলিস যেন গিরি নদী পাহাড় পথে মাঈ
বাংলা মাঠের শ্যামল মায়া সেথায় যে গো নাই
গঙ্গাজলী ভুঁই ॥
তুষার আঁচল ভরায় নাকি রোডন ফুলের ডালা
গোলাপ ফোটা পায়ে যেন রাখিস জবার মালা
বুক চিরে যে থুই ॥
কোথায় পাবি কাশের গুছি পদ্মদীঘি আলো
শাঁখের ফুঁয়ে মাটির ঘরে মঙ্গল দীপ জ্বালো
বোধন ঘট চোখের জলে ধুই ॥

কালো মেঘের এলো চুলে কাজল টানা চোখ, এতো গিরি মেয়ে নয়—শান বাঁধানো পদ্মদীঘির ঘাটে বসেই তো শাঁখা পরেছে আমার গৌরী মেয়ে! রামপ্রসাদের ভাঙ্গা বেড়া কে বেঁধেছে? দাক্ষিণেশ্বরের ফড়িং ধরা খেলা কে খেলেছে গো? ভরা ঘাটে বোধন ঘট ভরে কোন দেশের ছেলেমেয়েরা বুক ভাঙ্গা ডাকে…!

কে বলেছে গিরির মেয়ে আমরা কি তোর পর
শ্যাম ধরণীর শ্যামলা মেয়ে গঙ্গাজলী ঘর ॥
আষাঢ় কালো এলোচুলে এক ফালি চাঁদ দেয় কে তুলে
ত্রিনয়নে কাজল দেখেই ভুললো মহেশ্বর ॥
কোথায় দীঘি পদ্ম আঁকা পরবি বসে রাঙা শাঁখা
ভাঙ্গা বেড়া বাঁধবি কোথা ফড়িং ধরার দিগন্তর ॥
ভরা ঘাটে ঘট ভরা আর প্রাণভরা মা ডাক
ঘরে ঘরে কোথায় পাবি আগমনীর শাঁখ
খুঁজলে দেশান্তর ॥

হৈমবতী মা আমার ডাগর দুটি চোখ মেলে সাগর মেখলা বাংলার দিকে কি একবারও চায়না—? না হলে কৃপার ঢল গঙ্গা মেঘনা কি বইতো? দূর অলকা থেকেও মা যে আমাদেরই মা—ছেলের ব্যথায় না ব্যথিয়ে পারে কি?

চেয়েছিস কি ডাগর চোখে
সাগর চাওয়া মন একি নয়
পাষাণ ভাঙ্গা করুণা মা গিরিনদী হয়েই যে বয় ॥
তুষার ঘরে হিমের বাসে একমুঠো রোদ সোনাই হাসে

হালকা মেঘের ওড়না টেনেও
গৌরী উমা পর সে কি হয় ॥
হয়তো হাতের আলতো ছোঁয়ায় বৃন্তখসা ফুলের ভেলায়
তুষার গলা নদীর স্রোতে আসতো ভেসে মার পরিচয় ॥
হয়তো কঠিন শিলা জলে ডুবিয়ে চরণ শতদলে
বসেই বুঝি কাটতো বেলা
ছেলের ব্যথায় সে কি গো নয় ॥

অন্নপূর্ণা রাজার মেয়ে—কিন্তু ভিক্ষু শিব যে পায়ের তলায় ধূলার বাউল··· আর আমরা—আমাদের পূজা মাটির দীপে মেঠো ফুলে। আমাদের গরব মায়ের রাঙা পায়ের একমুঠো ধূলো··· !

শিব সেজেছে ধূলার বাউল
ও তুই রাজার মেয়ে কোন লাজে
চাঁদ পরেছিস কপালে মা চন্দ্রচূড় যে পায় সাজে ॥
আমরা সাজাই মেঠো ফুলে মাটির দীপে মন বাঁচে
বল দেখি মা মনের কথা হেথায় কি তোর মন আছে ॥
শিব যে আমার সর্বহারা অন্নপূর্ণা তুই মা যে
কণ্ঠ বিষে বাঁচায় কিসে দৃষ্টি প্রসাদ তাই যাচে ॥
ধূলি তো নেই স্বর্গপুরে বল্ মা সেথা কি আছে
রাঙা পায়ে লাগবে বলেই ধূলা হওয়ার সুখ আছে ॥

তুই যদি গিরির মেয়ে, তবে গিরি নদীর মত কথা কইছিস্ না কেন? ছেলের গরবই তো মায়ের গরব! কমলরাতা চোখ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র, আর বুকের রক্ত দিয়ে সমাধি বৈশ্য আর কোথায় তোকে ডাকে মা? তোরেই চেয়ে গিরিরাজ আমাদের মত বুক ভাঙ্গা কান্না কাঁদুক দেখি—

গিরির মেয়ে কইবি কথা গিরি নদীর মত
চুপ করেছিস কোন্ গরবে মাটির শিবের আদর এত ॥
উপল ভাঙ্গা নাচনে মাঙ্গ
শিব গড়া নয় বুকটি ভাঙ্গাই
গঙ্গাজলী ভুঁয়েই মা গো আদর তোমার যত ॥
আনবে কে আর বুকে বেঁধে সমাধির কাঁদন সেধে
পলাশ লোচন চিরে চিরে কাঁদন রাঙা কমল শত ॥

কাঁদুক গিরি সর্বহারা কেঁদেই যেমন ছেলে সারা
পঞ্চদীপের ধূলা ঝেড়ে সাজাক দেখি মনের মত ॥

না হয় উপল কাঁদায় কাঁদে পাহাড়পুর—তবু এমন করে সেখানে কি তোকে কেউ সাজায় মা বুকের রাঙা আবীর দিয়ে? কেই বা রাঙাবে ঐ চরণ—সেই পাহাড়তলীতে? এই বাংলার ধূলাতেই তো শিবের মাথার চাঁদ খসেছিল প্রণাম হয়ে তোর পায়ে! বাংলার কবিই তো পারে গগন ছিঁড়ে তারার মালা দুলিয়ে দিতে—

সাজাবে কে বল মা সে যে পাহাড়তলী ঘর
বুক চিরে যে রক্ত দিতে সয় কি বুকের তর ॥
শ্যামল মেঘের ছায়ায় না হয় শ্যামা রূপই ধর
একফালি চাঁদ উমার পায়ে বুঝি শিব করে গো গড় ॥
গিরির মেয়ে গৌরী মা তুই সাজাবো কি ধূলার এ ভুঁই
বুক ভরে না কোথায় মা থুই রাঙা চরণ বুকেই ধর ॥
গগন ছিঁড়ে তারার মালা
ভাঙ্গা ঘরেই সপ্তমী চাঁদ থাকুক জ্বালা
ক্ষীরের সায়র সেঁচেই আনি দুধ কমলের সর ॥

গিরির মেয়ে হয়ে না হয় রইবি মা—তবে বাংলা মায়ের বুকের দরদ বল্ তো কোথায় পাবি? টিপ দেওয়া চাঁদ, সাঁঝ সেঁজুতির প্রদীপ, চোখের কাজল—এ তো বাংলা মা-ই দিতে জানে। প্রসাদের গান, পদ্মপাতার আসন, —বিশ্বের কোথাও তো নেই মা। আর ভিখারী শিবকে অন্ন দিতে তোর তো অন্নদার বেশ এদেশেই—

চাঁদ টিপ টিপ টিপ দিয়ে যা হিমের ঘরে মাকি ডাকে মা ॥
কুন্দ ধোওয়া কপালে এই মেঘে ফোটা চাঁদই জাগে না ॥
প্রসাদেরি গান আছে মা কঠিন শিলা নাই
ঢল ঢল পদ্মদীঘি এমন চরণ রাখার ঠাঁই
হেথায় মন কি টানে না ॥
সাঁঝ সেঁজুতির মাটির প্রদীপ নড়ে চড়ে না
কাজল চোখে কাজল দিয়ে মা কি জড়িয়ে ধরে মা ॥
ভ্রমর কালো চরণ বিনা শিব শতদল ফুটবে কি-মা
ভিক্ষু শিবে অন্ন দিতে সেথায় অন্নদা যে জানে না ॥

মা গো! এ যে রামকৃষ্ণের প্রাণের বাংলা, এ যে কমলাকান্তের গানের বাংলা, রামপ্রসাদের সাধনার বাংলা—রঘু, চিতে ডাকাতের ডাকাতপড়া ভক্তিও তো তুই পায়ে ঠেলতে পারিসনে! বাংলার বাঘ আর সাপ সেও যে তোর বড় আপন—

মা গো পাষাণ ঘরে রইবি কেন
এমন মাটির দেউল রয় অচল
আদরেতে গরগর (দেখ) গদাধরের হৃদমহল ॥
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে রাতে কোথায় কান্ত কবি ডাকছে তোমায়
বাড়ায় কি গো রাতের আঁধার কালো চোখের রূপ কাজল ॥
ভাঙ্গা বুকের বেড়া বেঁধে বেড়াবি গো কোথায় সেধে
ফিরে চা' মা শুনবি কোথা ফিরে গাওয়া সে যে গো ছল ॥
বাঘের আসন কোথায় আছে নাগের হারে চরণ সাজে
ডাকাতপড়া ভক্তি ফোটায় ডাকাত দীঘির অগাধ জল ॥

ছেলের ব্যথা বুকে বুঝি বেজেছে মা, তাই এবার শ্যামার মেয়ে সারদা—আর শিব বটের ধূলায় আপনহারা! আমরাও যে ভিক্ষু শিবের ছেলেমেয়ে—তাই তো মাটির মূর্তি গড়ে, দীন উপচারে বুকের জ্বালা জুড়াই—

গৌরী মেয়ে আমরি গো শ্যামা হ'লি কোন্ সাধে
এড়িয়ে তুষার শঙ্খ ধবল শ্যামার ঘরে ঘর বাঁধে ॥
দুধকলি পা ধুইয়ে দিতে দুধগঙ্গা নাই
শিব সেজেছে গৈরিকে যে যোগিনী তুই তাই
ছেলের মন কি না কাঁদে ॥
কোথায় পাবি স্বর্ণছড়া পাষাণ দেউল মাঈ
অশ্রু দিয়ে গড়ি যে গো মাটির প্রতিমাই ॥
জবার ফুলে নাই কাঁটা ছেলের মনে নাই বাধা
মাটির ঘরেই আলপনা দি পদ্মদীঘি ঘট পাতে ॥

মা! বাংলার চাঁদসদাগর, শ্রীমন্ত তোর যে বড় আপনার ছেলে! ব্যাসের মত, শ্রীশঙ্করের মত আমাদের যেন আর ছলনা করিসনে—ভুলো ছেলের জন্ত তো মা'র আদর নিত্য দিনই বেশী—

ওগো শঙ্করী গো মা
বাংলা মাটির ঘরে জিয়াও লখিন্দরে
তারি তরে ভাসাই আমার চাঁদ মধুকর না' ॥

শ্রীমন্ত যে মশানে রয় ফুল্লরা রয় বনে
দুখের বারোমাসী আজকে কে আর শোনে
করতে ছলনা ॥
ব্যাসের কাশী রচবো না গো সোনার কাশীর পরে
জরতী বেশ আর কেন গো
আছিই যে গো জ্বরে
বুক জুড়িয়ে যা ॥
শবর শিবের সঙ্গী হতে
আয় মা মণিকর্ণিকাতে
শঙ্করে আর ফিরাস্‌নে গো
ফিরেই না হয় চা' ॥

শারদীয়া-মহোৎসব

আমি সুরধুনী :—মায়ের মঙ্গল ঘট আমিই ভ'রবো। এ যে চোখের জলে ভরা ঘট। কান্না আমার সার্থক এতদিনে।

হাজার ঢেউয়ে নেচে চলি
ভরা বুকে গো
মা এসেছে দুখের কথা
গেছে মুছে গো ॥
আলোর মত শিউলি বুঝি
বুকের তলে আজ
ঢেউয়ের শত শতদলে
জাগাই সুখে গো ॥
আজকে আমার পাহাড়তলী
নাচই ফিরে পাই
গিরির মেয়ে আসবে ফিরে
মরি সুখে গো ॥

আমরা সাদা কাশেরগুচ্ছি—মায়ের পায়ে আমরা মঞ্জির বেঁধে দেবো, হাওয়ায় হাওয়ায় বাজবে, মা যে আসে—আসে—

কাশের গুচ্ছি বেঁধে দেবো
গৌরী মেয়ের পায়,
নাচ্‌বো আমি তারি সাথে
নেচেই যদি যায়।
মেঠো হাওয়ার দোলাই প'রে
দোদুল দোল আজ
সারা হিয়ায় কাঁপন লাগে
হিয়ায় জাগে সায়॥
বুনো সুরে গান ধ'রেছি
আগমনী গান
শৈলরাণী আসবে আবার
ভরা মেঘের নায়॥

আমি প্রজাপতি রঙ ছড়াই কেন জানো কি :—মা যে আসবে—মেঘের কালো আঁচল সরিয়ে তাইতো আমরা এসেছি।

হাজার ফুলের রঙ নিয়ে যে
জড়ানো এই ডানা
বাদল গেছে শরৎ ভোরে
মানি না যে মানা॥
কার পথে আজ রঙ ছড়াতে
আলপনা কার মন রাঙাতে
জানো, আনা গোনা॥
আমার চোখে নাই তো আঁধার,
আমি আনি খুশীর জোয়ার।
হালকা হাসি হেসেই চ'লি
ফুল পশারি মনের গলি
দুটি গানই আনা॥

আমরা বলাকা, মার বরণ মালা আমরাই গাঁথি। এই প্রথম মালাই মা তো গলায় পরেন। এই মালাই তো ঠাকুর দেখেছিলেন মার গলায় সমাধি নিথর দেহে।

বলাকা গো আমরা মায়ের
বরণ মালা গাঁথি
গগন নীলা হ'তেই আনি
ধূলায় বোধন পাতি ॥
চন্দ্র তারার চাঁদ মালাটি
মায়ের কণ্ঠ শোভা
আমরা প্রথম মাকে আনি
নীল গগনের সাথী ॥
আকুল চোখে কে র'য়েছে
নিথর সারা হিয়া
মাণিক বনের চন্দ্রা চাঁদ সে
নয়ন মুক্তা পাঁতি ॥

সকলে :—এস আমরা সকলে মাকে বরণ ক'রে নিই। বৎসরান্তে মা আসছেন এই ধরার ধূলায়!

আয়রে সবাই মায়ের পূজায়
যোগ দিবিরে আয়
মা এসেছে সারদা মা
মুক্তা ফোটা পায় ॥
নীল সাগরের তুলি দিয়ে
গগন নীল করি
দেবতারা আসছে ওরে
মেঘের সাদা নায় ॥
সাতটি তারা, সাতটি তিথি
আজ এসেছে সাজি
জোড় ক'রে হাত দেখনা চেয়ে
সপ্ত ঋষি গায় ॥

———

দুখের ঘরে উমা এলো

শরৎকালে শারদা দুর্গার পূজা—বাংলার নিজস্ব পূজা। এই মহাপূজার দিন গুনে, যেন সারা বছরই থাকে বাংলার ছেলেমেয়ে। সকাল থেকে জল-সইতে যায় গ্রামের গৌরী মেয়েরা উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে। ছেলেরা সাজায় দোলা, ছাতা ধরে পুকুর কি নদীর থেকে বরণ করে আনবে মাকে। এদিকে বিল্বমূলে বসে বোধন। ধানের গুছি, বিল্বফল, মানের পাতা, সর্বজয়ার মূল —এই সব দিয়ে হয় কলাবধূর নবপত্রিকা, মা আসেন—সঙ্গে আসেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ছেলেমেয়েরা—মা যে বাংলার মেয়ে।

দুখের ঘরে উমা এলো রূপেই আলা করে ॥
ধানে ধানে 'আলছে' গৌরী মরাই যাবে ভরে ॥
দোলায় করি আনবো মায়ে সোনার ছাতা ধরি
ভোর না হতে জল সইতে যাবো নদীর ধারে ॥
নোতুন ধানের গুছি দেবো সর্বজয়ার মূল
বিল্ব মূলে পাতবো মায়ের বসবে বোধন ঘরে ॥
সিদ্ধিদাতা গণেশ আসেন কার্তিক তারি সাথে
লক্ষ্মী আসেন সরস্বতী সর্ব দেবের বরে ॥

চতুর্থীতে মার বিশেষ পূজা সুরু—আমলা বাসাল ধূপ দীপ মায়ের প্রথম বরণ। আর ষষ্ঠীকৃত্যে; মার প্রথম পূজা, সন্ধ্যার শুভ লগ্নেই অধিবাসের আয়োজন। সপ্তমীর মহাক্ষণে মাকে অষ্ট কলসে স্নান করান হয় আর সুরু হয়ে যায় পূজা নানা উপচারে। অষ্টমীতে "তাঁবি" পাতা আজো আছে। জলের ভিতর সছিদ্র একটি পাত্র রেখে পুরোহিত ঠিক ক্ষণটির নির্দেশ দেন। সতী সীমন্তিনীরা এই অষ্টমীতে পরস্পরের সিঁথায় দেন অক্ষয় সিন্দুর অক্ষয় এয়োতির জন্য। নবমীর বাসরে রামায়ণের পালা গান আজো অনেক স্থানেই হয়। অকালবোধন তো শ্রীরামচন্দ্রেরই পূজা। দশমীর মিষ্টিমুখ আর ছোট বড় নির্বিশেষে আনন্দ কোলাকুলি—দুনিয়ার কোথাও তো এ আনন্দের জুড়ি মেলে না।

চতুর্থীতে আমলা বাসাল ধান দুব্বো সাজ
ষষ্ঠীতে লই বরণ ডালা অধিবাসের সাঁঝ ॥

সপ্তমীতে অষ্ট কলস অষ্টমীর খেনে
পূজায় বুক দুরু দুরু তাঁবি পাতার কাজ ॥
অষ্ট মঙ্গলার মাগো অক্ষয় সিন্দুর
এয়োতির সিঁথায় ধরি রেখো সবার লাজ ॥
নবমীতে রামের পালা কাঁদন নিয়ে মরি
আর দশমীতে কোলাকুলি সর্বজনা মাঝ ॥

মা যে সত্যি আসেন সে কাহিনী অনেক আছে। কিরীটেশ্বরীর স্থানে রণজিৎ রায়ের দিঘীতে এমনি বেজেছে আগমনীর শঙ্খ। কুমারী গৌরীর বেশে মা বসেছেন দীঘির ঘাটে—লাল চেলী পরে—আর আলতা ধোয়া পা দিয়েছেন মেলে। বেসাত নিয়ে এসেছে শঙ্খ বণিক—মা সেধে পরেন তাঁর শাঁখা। বণিক বলে—

শঙ্খ পরাই শঙ্খ পরাই রাঙা হাতে রুলি
মাগো আমার গৌরী মেয়ে ঘর হ'তে কার 'আলি' ॥
পদ্ম দিঘীর ঘাটে ওমা পদ্ম চরণ আঁকা
কোথা হতে সোনার কমল আসিস 'আলি পালি' ॥
মেঘ বরণ চুলেই ওমা ডাগর দুটি আঁখি
সাধ করে মা বুকটি চিরে সেথায় তোরে রাখি ॥
দুধ কমলের রঙ মেখেছিস 'পদ্মো' রাঙ্গা ভুঁই
পণের কড়ি থাকুক পড়ে মাথায় হাত থুলি।

মা কিন্তু কড়ি না দিয়ে শাঁখা প'রবেন না। বলে দেন পিতা রণজিৎ রায়ের কথা—ও দেশের জমিদার তিনি। ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে টাকা যে রাখা আছে। গৌরী মেয়ে বলে—

মায়ে কও রে বাপে কও শঙ্খ নিলাম প'রি
লক্ষ্মী ঝাঁপি সেথায় পাবে গুণে গেঁথে কড়ি ॥
দুখ্যু তোমার দূর হবে গো সেথায় গিয়া কও
কন্যে তোমার শঙ্খ নিল অনেক সাধ করি ॥
'পেত্যয়' না যায় যদি এথায় এসে ডেকো
শঙ্খ পরা হস্ত দুটি তুলবো তুমি দেখো ॥
রাঙ্গা রুলি শঙ্খ শাড়ি বড়ই ভালবাসি
যে দেয় তার ঘরে ঘরে অন্ন বসন ভরি ॥

কিন্তু রণজিৎ রায়ের ঘরে পড়ে যায় কান্নাকাটি—মাকে সবাই খুঁজতে দীঘির ধারে আসে। শঙ্খ বণিকও এসে কেঁদে পড়ে। মা কথা রাখো—দেখা দাও। কমলে কামিনীর কথাও মনে পড়ে যায়। শ্রীমন্তও যে রাজাকে দেখাতে পারেনি মার সেই রূপ। সবাই কেঁদে বলে :

কোথায় গেলি মাগো আমার কথা রাখো এসে
ঘাটে বাটে তলাস করি কোথা গেলি মিশে ॥
সোনার বরণ কন্যে মা তুই আগুন বরণ আঁখি
এমন করে লুকাস যদি হারাই যে মা দিশে ॥
অভাগিয়া ললাট আমার পেয়ে হারাই তোয়
আয় মা ফিরে দেনা সাড়া চোখে যে জল ভাসে ॥
কমলে কামিনী হলি শ্রীমন্তেরে ছ'লি
দেখ মা কাঁদে ছেলে মেয়ে যাব বা কোন দেশে ॥

কাতর কান্নায় মা পারেন না থাকতে। পদ্ম দীঘিতে ফুটে ওঠে পদ্মকলির মতো নিটোল ছুটি হাত। কৈলাসের মা যে মূর্ত হ'য়ে এসেছিলেন। আনন্দে আর চোখের জলে ঘট ঘাট যায় ভ'রে।

রণজিৎ রায়ের দীঘির কথা ভগবান রামকৃষ্ণও বলে গেছেন। সেখানে আজো নাকি মেলা বসে মা'র আবির্ভাব লগ্নে—ছেলে মেয়েদের কণ্ঠে জাগে—

শঙ্খ বাজাই উলু পাড়ি (মায়ে) বরণ ক'রে লই
পদ্ম কলি হস্ত ছুটি শঙ্খ নিটোল ঐ ॥
'সগ্য ডুবো' হলো রে আজ রণজিতের দীঘি
শঙ্খ পরার চেহ্ন লয়ে জল করে থৈ থৈ ॥
আগবাড়ায়ে নে গো মায়ে মায়ের নামে 'দয়'
কৈলাসেরি মা এসেছে মাটি কারে কই ॥
ছুখের ছেলে ছুখের মেয়ে মা এসেছে ঘরে
ফুল বাতাসা ছড়াই ওরে আয়রে ছড়াই থৈ ॥*

* বীরভূমের পল্লীকথায় গানগুলি লিখিত। পূজায় কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।

আগমনী

আজি পূজার আনন্দে তোরা যোগ দিবি আয়
ডাক প'ড়েছে তপন তারা চন্দ্রে ॥
শরতের ঐ সোনালিমায় আদরে কে হাতছানি দেয়
জলে থলে কে ডেকে যায় গানে এ গন্ধে ॥
এস সবে তারি সুরে আনন্দের এই সুর পুরে
বরণ ডালায় অর্ঘ্য সাজাই উছল ছন্দে ॥

এবার মেঘের পালা ফুরিয়ে এল কান্নায় মুক্তো মালা ছড়ানো অভিমানীনি বাদল মেঘের মুখে সোনার শরৎ ছুঁইয়ে দিল ছোট্ট একটি রূপকাঠি। অমনি সে উঠলো হেসে। ধরার ছেলেমেয়ের কণ্ঠে সুরু হল শরতের রূপকথা,—

বাদল বলে যাই শরৎ এলো হাসি
কালো মেঘের কোলে আবছা আলোরাশি ॥
কেয়ার মধু ভোলা মৌমাছি গুন গুন
আগুন ভরে ডাকে ভোর শেফালির চুম
মানস সরিৎ তলে মরাল চলে ভাসি ॥
কালো তমাল বনে কলাপ মুদে কেকা।
স্মৃতির বাসর রচি জাগছে বুঝিন একা।
আলোর পরাগ মাখা প্রজাপতির পাখা
চাঁপার বনে হাওয়া চন্দন বাস মাখা
কান্নাহাসির মেলায় আগমনীর বাঁশী॥

—(অর্চ্চনাপুরী)

সোনার শরৎ যে দুয়ারে :—

আজ ঋতু সালোনী আঈ আয়ে শুভ লগনকে দিন
আঈ শুভ শরণ কী রাত দিস দিসমে খুশিয়াঁ ছাঈ
কুকে শ্যামা কোয়েলিয়া চঞ্চল পবন বাবরিয়া
আঈ আগুন কী ধূম শুনাঈ ॥
আঈ সারদা মাঈ হমারী মূরত মধু জ্যোত কুঁয়ারী
প্রেম মন্ত্রসে সবকো জগাঈ সোনেকা শরৎ লাঈ ॥

হাথোঁমে সোহে বরদান চরণোঁমে সোহে শরণ কী শান
নৈনোমে লাঈ কৃপাকে তুফান দুখী দুনিয়াকো ডুবাঈ ॥
—(অর্চ্চনাপুরী)

মাঠে মাঠে আজ আলো দুয়ার ঘর ভোলানো খেলা বাউল বাতাস আকুলি বিকুলি করছে রূপালী ধানের মিতালী চেয়ে :—

আকাশে আজ কাশের ফুলের উছাস লেগেছে
বুকের তলে সুরধুনী তাইতো জেগেছে ॥
শিহর জাগা উত্তর বায় উতরোলে ডাক দিয়ে যায়
কোন উদাসীর খুশীর বাঁশী আপনি বেজেছে ॥
দিকের রেখায় যায় কি দেখা অলক্তাকের রাঙারেখা
কার সোহাগ মাখা চরণ বাঁকা বক্ষে এঁকেছে ॥

তারাও অথৈ ছুটির দিশাহারা বুকে চায় ঐ দূর আকাশের পানে, চায় বলাকার পালকখসা কাশের বনে—ভাব সাগরে থই মেলেনা……তাই বলে :—

আজ কাশের দোলা কে দোলালো বল
আকাশ গাঙে কে ভাসালো মেঘ বলাকার দল ॥
আজ নীল ঝরোকার কোণে কার সুনীল দিঠি জলে
কার আগমনী তুললো রুণি সুরধুনীর ঢল ॥
আজ কে যাবি রে পরবাসী আপন ঘরে ফিরে
আজ ডাক দিয়েছে মা জননী হৃদয় তীর্থ তীরে ॥
গেয়ে যা আজ গান নীল সাগরের গান
ভরে নে তোর মঙ্গল ঘট দিয়ে আঁখির জল ॥

প্রকৃতিও তো বসে নাই :—

ওগো মা তোমার সোনার শরৎ ঐ তো হেসেছে—
আজ আকাশে তোর রাঙা হাসির ঝিলিক লেগেছে ॥
মন যে আমার উধাও ডাকে প্রজাপতির স্বপন মাখে
আমায় শিউলি বনের ব্যাকুল বাঁশী আজকে ডেকেছে ॥
ঐ আলোয় ছাওয়া কমল দীঘি সোনায় সোনায় ঝিকিমিকি
ঐ চরণের পরাগ সেকি
অঙ্গে মেখেছে ॥

পরাণ ভ্রমর বেড়ায় বুলে সোহাগ রাঙা ফুলে ফুলে
আমার দুখের নিশি তোমার রূপের
আলোয় ভেসেছে ॥
—(অর্চ্চনা পুরী)

উধাও সবুজের হাতছানি ডেকে নিয়ে যায় উধাও নীলের দেশে। থল কমলের মুখে উদয় উষার স্বপ্ন। শিউলি রাণীর চোখে আদর কাড়া হাসি—কে রয় গো মনে মন মিশিয়ে, সে ধরতে চায় মেঘের কোলে থমকে আঁকা দুটি পদ্ম চরণ :—

আজ নীল আকাশে ছড়িয়ে যে যায় মন
আজ নীলার বুকে থমক আকে কার সে ফুল চরণ ॥
থল কমল দুটি বাড়ায় মুঠি
ধরতে দুটি পায়
শিউলি রাশি হাসির শুচি ছড়ানো ধূলায়
দিয়ে সারা তন ॥
কচি ধানের ঝিরি ঝিরি ঐ যে মধু বায়
শ্যাম দুলালী এল বুঝি আদুল দুটি পায়
ধূলার ঘরের ছেলেমেয়ে
আয়রে ছুটে আয় এলো শরৎ স্বপন।

কার আলতা রাঙা পায়ের দাগ দিগন্তীকায়। শঙ্খচিলের সোনার ডানায় ঝলক আনলো কিসের শুভ সূচনা? ফুলে নিঙড়ানো ধরার বুকে কি আর আলপনা পড়লো?—

মার আলতা রাঙা পায়ের পাজে
দিক যে রাঙানো
গগন ঘট ভরা ভরা পায়ে পায়ে ফুলের ছড়া
পথ যে ভিজানো ॥

দু'টি বাহু জোড় করিতে নয়ন দুটি যায় যে তিতে
সকল ব্যথা ভুলাতে সার
আঁচল বিছানো ॥

শঙ্খচিলের ডাক পড়েছে গগন মিনারে
শিউলি ঝরা আল্‌পনা আজ
গঙ্গা কিনারে
ফুলেই নিকানো ॥

গৌরী গিরির মেয়ে সোনার রূপে এসে দাঁড়ালো—তার রূপোলী মেঘের কোলে ফুটলো সোনা ঝলা কমল হাসি :—

গৌরী গিরির মেয়ে
এল ঐ দেখ রে চেয়ে
চেয়ে দেখ সোনার ক্ষেতে
দখিনা ফিরছে মেতে
চেয়ে দেখ শরত প্রাতে
যায় কে দুয়ার বেয়ে ॥
রূপোলী মেঘের কোলে
হাসি কার সোনা ফলে
ফুটেছে আলোর কমল
সোহাগীর পায়ে পায়ে ॥
নূপুরের রুনুঝুনি শুনিসনি কি আনমনে
সুরের সুরধুনী
বয়ে যায় মনে বনে।
মেতেছে বনকোয়েলা
সুরে তার কণ্ঠ মেলা
আদরে নে রে ধ'রে
ঘরে এলো ঘরের মেয়ে ॥

কেমন রূপে সে এলো?—বাণীবনের হংসবলাকা তার কিছু সন্ধান দ কি—

গৌরী নৈহর আয়ী
চরণ মে শরত কা ঝুমর
রুণক ঝুনক বজায়ী ॥
হাওয়ামে উড়ে লাল চুনরীয়া
ভালপে চক্‌মক্ চাঁদ কী বিঁদিয়া

কানোমে তারোঁ কি কলিয়া
চমক চমক সুহাই ।
পী পী জিনকা রূপকা প্যালা
ভোলানাথ নিত ভোলা ভোলা
আনন্দ সে ডগমগ ও গৌরী
ধূরপে ধূম মচায়ী ।
আয়ী শ্যাম কুয়ঁারী প্যারকী লালী
ধরতী লায়ী জ্যোত কী থালি
পূজাকা সমান লে আয়ে
স্বাগত ভেটকো সহায়ী ॥

—(অর্চ্চনা পুরী)

সারদা লক্ষ্মী—সব শরতেরই শোভা····· সাত রঙের ঝিলিক দিয়ে ওঠে শরৎ রূপের ইন্দ্রধনু, বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ—জয় মঙ্গলার বরণ বৈজয়ন্তী নিয়ে—আসে পল্লী-লক্ষ্মী কনকচূড়ের কনকাঞ্জলি,—

শরৎ কী শোভা কহু না যায়—
শরৎ সুহানী আঈ রে
মঙ্গল শঙ্খ পুকারে
সাজে সংসার সারে
ভোর গগন মুস্কাই রে ॥
চমকে জ্যোতকী গঙ্গাজী
জ্যোত কুঁয়ারী আঈরী
কোয়েল উনকো বুলাই রে ॥
ঘর ঘরমে মঙ্গলঘট রে
আজ খোল মনকা ঘুঙ্ঘট রে
লাও প্রেমফুল চন্দন রে
স্বাগত করলে মাঈকে
দুখ পঞ্চবটকী মাঈকে ॥

—(অর্চ্চনাপুরী)

ভোরাই আকাশে—বাউলী বাতাসে এসে দাঁড়ায় আকাশ আলোর বৈরাগী ······হাতে তার সোনার খঞ্জনী ।—আনন্দে নুয়ে নুয়ে পড়ে তার অঙ্গ আনন্দ ধরে না ।

ঐ আকাশ আলোর বৈরাগী আজ
বাজায় সোনার খঞ্জনী
আর ধরার বাউল তার সাথে গায়
মায়ের আগমনী ॥

গৌরী এল আলতা পায়ে মাটীর মায়ের ঘরে
তার মুক্তাবলীর মুক্তা ঘাসে শিশির হ'য়ে ঝরে ;
তার মঞ্জু মরাল নূপুর ঘিরে ভ্রমর ওঠে গুন্‌গুনি ॥
তার মৃণাল ভুজ দিক—বালিকা সোনার শাঁখায় বাঁধে
তার চন্দ্রহারে চন্দ্রনাথের সপ্তমী চাঁদ কাঁদে
তার আঁচল খসা শিউলি ফুলের
মহক ওঠে আনমনি ॥
তার ভিজে কেশের গন্ধে ভাসে
আমলা বাসাল বাসে
তার বরণ ডালায় কর্পূর দীপ
ভোর গগনে হাসে
আজ কাঁদন বীণার তারে তারে
আনন্দেরি জয়ধ্বনি ॥

—(অর্চ্চনাপুরী)

এ ডাক যেন মায়েরি ডাক। হারা মনের মাণিক পাওয়ার স্বপ্ন ডাক দিয়ে যায় সর্বহারা বুকে,—

মার ডাকে আয় দিই সাড়া
আয় কে আছিস রে মা-হারা ॥
চল ছুটে চল চঞ্চলি
পথ জাগা দুই পায়ে দলি
পথের বাধা চল দলি
মা বুলি বল প্রাণ কাড়া ॥
ফিরাবো আজ আপন মাকে
মা ছেড়ে মন কদিন থাকে
মায়ের আশীষ ঠিঁক্‌রে পড়ে
অরুণ আলোয় দিকহারা ॥

সর্বমঙ্গলার আগমনীতে আজ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে শান্তি, মঙ্গলের বন্দন গীত···মার কল্যাণ আশীষ :—

বধৈয়া গায়ে চলে নরনার
জগমে পূজন কে আনন্দ গুঞ্জার ॥
শরৎ রাণী কে অঙ্গন মে আয়ী হ্যায় কোন
কাঞ্চন কী বুঁদিয়া বরসে গগন
আসমান কী যুঁহী খিলে বট কে কিনার
মহক রহী য়ে দুনিয়া সংসার ॥
বকুল কে কুঞ্জন মেঁ মৃদুল চরণ
পৈর বিছুয়া মে চমকেরী তরুণ তপন
নজরোঁমে ডোলে ভুবন
ভাতি ভাতি কে কঙ্গন ঝন্‌কার।
সুখ সহনাই বাজী বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝ
ছিটক রহে শেফালী কে ফুল লাজ
শ্যাম কুঁয়ারী সাজি য়ে অনুঠা সাজ
খুলে অচানক মন মন্দির কে দ্বার ॥—(অর্চনাপুরী)

আয় ধরার ছেলেমেয়ে, তোদের দুখের বেশ ছেড়ে শুচি সুন্দরের সাজ পরতে হবে আজ—রাজ রাজেশ্বরী মা যে আজ আপনি এসে দাঁড়িয়েছে!

পরলে ফুলনকে হার
করলে ঝাঁঝন কী ঝংকার
মায়ী কী পূজা মে জগমগ উঠা সংসার ॥
লাও কেশর কী প্যালী
গুলাব যুঁহি কী থালী
গাও মঙ্গল গীত
রহো উমঙ্গ মে নরনার ॥
সবসে করলো প্রীত প্যার
ঘর ঘরমে ধূপ দিউয়ার
রৈণ অধেঁরী কাটি হ্যায়
মন কী মৈনা করে পুকার
আয়ী নৈ বহার ॥

দরদী ঠাকুর

সোনার অঙ্গ বারবারই ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর—কি কালো যমুনার নীরে—কি নীল সরযূর তীরে·····বারবার কেঁদেছেন,—কাঁদিয়েওছেন। গৌররূপে শুধু প্রেমে নয় চোখের জলেও যে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। দক্ষিণেশ্বরেও এলেন দীনের বেশে—দীনের ব্যথা বুকে নিয়ে শুধু কাঁদতে—মাথাকাটা তপস্যা ক'রে গেছেন ধরার অক্ষম ছেলেমেয়েদের জন্যই তো। আজ দিকচক্রবালে দেখি দীন নারায়ণ—আর্ত নারায়ণদের পুঞ্জীভূত ব্যথা কুড়িয়ে নিচ্ছেন দুহাতে—জীব হয়ে গেছে শিব···

তুমি ধরার দুখে এলে ঠাকুর কত না ছলে
তুমি রাম হ'য়েছ শ্যাম হয়েছ আবার রামকৃষ্ণ যে হলে॥
হরিতে ধরার বালাই হ'য়েছ নদের কানাই
মুড়ায়ে কেশ সেজেছ বেশ কেঁদে কাঁদাবে বলে॥
ছায়া বুনন ঐ পঞ্চবটে মিলালে সব একই ঘটে
ধরার ধূলে থাকতে ভুলে মা মা মা বলে
পড় গো ঢলে॥

ছায়া ছড়ান পঞ্চবটীর তলায় সুরধুনীর ভাঙ্গা কূলে কূলে দক্ষিণেশ্বরীর মন্দিরে মাথা কুটে কেঁদে ফেরেন ঠাকুর। কি তাঁর ব্যথা—আজ আমরা হয়তো কিছু বুঝি হয়তো অনেকটাই বুঝিনা। পাগল হ'য়ে চেয়েছেন মা'র দর্শন। আর মার কৃপা। আমাদের জন্য ক্ষুধায় এক মুঠি অন্ন, পরণের এক টুকরো কাপড়—এরি জন্য কি এত হাসা কাঁদা—?

কেনই ওগো হাসো কাঁদো কি যে তোমার মন
তমসার তীরে কেন আলোর আয়োজন॥
অনেক ডাকে ভেঙ্গেছে কি ধ্যানের নিবিড়তা
সাগরে কি আয় রে বলে দখিণ সমিরণ॥
ভাঙ্গা বীণায় আজ এনেছে ভ্রমর সমারোহ
সীমার কূলে ভেঙ্গে পড়ে অসীমেরই মোহ॥
রাতের আঁধার সায় হয়েছে উদয় অচল তীরে
আজ এলে কি পথিক সখা দোসর হিয়ার জন॥

সেদিনের একটি কথা—রাজ ঐশ্বর্য্যে মথুর চলেছেন তীর্থে—আর সঙ্গে চলেছেন ঠাকুর রাজগুরুর অভিষেকে। সহসা চোখে পড়ে দেওঘরের পথে ভুখারী শিবের দল শুষ্ক পঞ্জরিত দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে, ঠাকুরের পথ পানে। ঠাকুর বলেন,—মথুর তুমি মার খাজাঞ্চি—এদের দিতে হবে অন্ন, দিতে হবে বস্ত্র। মথুর হন না রাজী। দয়াল ঠাকুর বলেন,—দেখ এদের আমি ছাড়া আর কেউ নাই। থাক আমার কাশী যাওয়া। বসে পড়েন তাদের মাঝে। নর-নারায়ণের সঙ্গম তীর্থ হ'ল সৃষ্টি। ভেসে গেলেন মথুর—ভেসে গেল তাঁর ঐশ্বর্য্যের বাঁধ। আকুল হয়ে মথুর সব ব্যবস্থাই দেন কোরে। দীন নারায়ণদের কণ্ঠে তখন আকুল হয়ে ওঠে—

পথের ধূলে এলে ভুলে দয়াল ঠাকুর কে তুমি
মউল হেসে বাউল বেশে হঠাৎ জাগা কে তুমি ॥
ধূলার ছাঁদে ঢাকতে কি চাও রাজার অধিরাজ
ব্যথায় গ'লে জুড়িয়ে দিলে ব্যথাহারী কে তুমি ॥
পাশেই এসে বসা তো নয় হিয়ায় নিলে ঠাঁই
এমন ক'রে আপন করা কাঁদন গড়া কে তুমি ॥

স্বামিজী যেদিন মুক্তির ভিখারী হ'য়ে দাঁড়ালেন ঠাকুরের দ্বারে সেদিনও সেই কথা,—আমি তোকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নামিয়ে এনেছি—কালে তুই বটবৃক্ষের মত ছায়া দিবি। তা না হ'য়ে আজ কিনা তুই নিজের মুক্তি ভিক্ষা করছিস? তুই যে নররূপী নারায়ণ—জীবের দুঃখে দেহ ধারণ করে এসেছিস। তাইতো তোকে সব দিয়ে ফকির হতে চাই। দেখ দেখি কত ব্যথা নিয়ে ঊর্দ্ধশিখায় সব জ্বলছে।

সাত মহলের ঋষি ওরে সাত সাগরের ধন
তোরি তরে ফকির হ'তে আমার সকল পণ ॥
শাঙনেরই ছায়ার মত জুড়াবি রে তুই
তাইতো আমার জীবন ভ'রে মরণ সাধন ॥
বিশ্বজোড়া বুকেই সবায় আঁকড়ে নিবি তাই
ব্যথায় নিবি নীল কণ্ঠ ধূলার আবেদন ॥
সহস্রদল কমল আজ সূর্য্য মুখে চায়
বিদায় চাঁদের চোখেই তবু অনেকই স্বপন ॥

শঙ্করের মুক্তির মোহ যায় ভেঙ্গে। কি যাদুর মায়াকাঠি যে ঠাকুর দিলেন ছুঁইয়ে। চিন্ময়ীকে চিনালেন—তারই সঙ্গে চিনালেন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা

মাটীর মাঝে—শ্যামামেয়ে যে দুজনেই। স্বামিজী হ'লেন দীন নারায়ণদের পূজারী—বল্লেন,—যতদিন দেশের একটি কুক্কুরও অভুক্ত থাকছে ততদিন তাকে অন্ন দেওয়াই আমার ধর্ম—দেশ মাতৃকাই আমার একমাত্র উপাস্য। নরেনের এই মোহভঙ্গে ঠাকুর সেদিন যেন নিজেকে আর সামলাতে পারেন নি॥ আজ যে শতদলের স্বপ্নভঙ্গের দিন! ঠাকুর বলেন—

আকুল কুন্তলা শ্যামা নরেন যে এল ফিরে
গঙ্গাধারা হল হারা সুনীল জলধি নীরে॥
গরল মথনে কি গো অমৃত উছল হ'ল
ধ্রুবতারা নেমেছে মা উদয় অচল তীরে॥
নীল ঢালা আঁখি পুটে আরো কত লীলা আছে
শিবেরে জাগালি ওমা বটের এ ছায়া ঘিরে॥

ঠাকুরের বাণীবহ হ'য়ে স্বামীজী ছুটে গেছেন দেশ হ'তে দেশান্তরে। গঙ্গাধারার মত দুকূলে ছড়িয়ে দিয়েছেন যোগ আর ক্ষেম। আলোর দুলাল মেঘভাঙ্গা বিদ্যুতের মত বর্ষণ করে গেছেন কল্যাণ, তমসার এই উপলতীর্থে—তাইতো দেশে দেশে দিশে দিশে শুনি অমৃতের পুত্রদের মুখে জয়গান—

চাঁদ বলেছে আর আকাশে মিলবে না গো ঠাঁই
দেখনা চেয়ে ধুলা হ'ল আলোর অনেকটাই॥
শিশির চোখে হাসেই যে বন
ভাঙ্গা কূলের নদী আপন
কমল বলে আর তো আমার কাঁটার বালাই নাই॥
ধরার ছেলে ধরার মেয়ে আয়রে উঠি আজকে গেয়ে
মাটীর ডাকে স্বর্গ এলো মাটী তো আর নাই।

ঠাকুর ও স্বামীজী

যুগে যুগে নেমে এসেছেন ভগবান,—আর সঙ্গে এসেছেন পার্ষদেরা। তাইতো দেখি, পার্থসারথির সঙ্গে পার্থ ;—শ্রীরামচন্দ্রের সংগে লক্ষণ ;—গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দ ;—আর এ'যুগে ঠাকুরের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ।

আমার নবীন গোরা রায়
খেনে কাঁদে খেনে হাসে খেনে আপনা হারায়॥
দেখেছিস্ কি বটের মূলে রাধা ব'লে লুটায় ধূলে
আবার সরযুর ঐ শ্যামল কূলে নব দুর্বাদল কায়॥
মুড়ায়ে চাঁচর চিকুর
ব্রজ বঁধূর শোধা হয়নি মানের দায়
তাই গৌর-নিতাই হ'লো একঠাঁই ঐ পঞ্চটের ছায়॥

কিন্তু গীতার অর্জুন বল্লেন,—'ন যোৎস্যে'—যুদ্ধ ক'রব না। এ যুগে স্বামীপাদও বসলেন বেঁকে,—যে 'আমি ওসব পারব না।' আমি কেবল সমাধিতে ডুবে থাকবো। ঠাকুর দেখলেন যে যুগচক্রের জন্যে এনেছেন বিবেকানন্দকে নামিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে, সে বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই করলেন শক্তি সঞ্চার। দেখিয়ে দিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। বল্লেন,—

সাতমহলার বাউল রে তুই ভুললি কেনই আসা
এই বটেরই ছাঁচ তলাতে বাঁধবে সবাই বাসা॥
(ও তোর) ধ্যানের বালাই নিয়ে মরি
জীয়ন কাঠি লে না ধরি
জ্বলে পুড়ে থাক্ হবে কি তার লেগে সে আসা॥
ফকির হতে এসেছি যে রাজা রে তুই রাজা
ধূলার মাণিক করতে তোরে আমার নি' তিয়াসা॥

নম্রশিরে স্বামিপাদ মেনে নিলেন গুরুর আশীর্বাদ—। গীতার অর্জুনের মতই বল্লেন,—'করিষ্যে বচনং তব!'—

ও বাউল রাজা রে—
ও গদাই রাজা রে—
তুইনি জানিস্ কিসেই আমার মরা বাঁচা রে॥
ধ্যানের মালা কেড়েই নিলি মনের মালা তুই
ভাবের ডিঙ্গে উজান নিয়ে সাথেই ভাসা রে॥
ঘরে ঘরে পাতবো তোরে ভাবের গোঁসাই
পঞ্ছি নরেন বন্দী হ'ল সোনার খাঁচাতে॥

ঠাকুরের দৃষ্টি তখন দূর অলকার দিকে—লীলাতীর্থের শেষ পৈঠায় নেমে এসেছে তাঁর মন। "দ্বাদশসূর্য্যের" হাতে সব ভার দিয়ে তিনি এবার নেবেন বিদায়। নেমীচক্রে হাসে ক্ষীণ দ্বিতীয়ার চন্দ্র। ঠাকুর বলেন,—

তোর লেগে রে ফতুর হলাম দিলাম তোরে ভার
চাঁদের এখন ডুবার পালা, সুয্যি হবেন সার॥
সাগরে যে গঙ্গা মিলায় গেয়ে সারি গান
অগম নগর পাড়ি দেবে এক ফালি এই 'চাঁন'
পাটে বসার খেন এসেছে রইবে না আর আড়॥

স্বামিজী বললেন,- আমার পিপাসা শুকদেবের মত নিত্যসমাধি সাগরে থাক। আমায় যদি লোককল্যাণ কাজে নামালে তবে হে ঠাকুর, তুমি যেন সারথি হ'য়ে আমার রথঅগ্রে থেকো। আজ আমি পেয়েছি আমার জীবনবেদ। হে দিশারী নরনারায়ণের সেবায় দূরে যাক্ আমার নিজের মুক্তি।

আমার মন বাউলে আগল দিতে
কোথায় যাব কও
এই নরেনটারে কও॥
ও প্রেমের ঠাকুর ও চাঁদের ঠাকুর এ কি দেখি মরি
ধূলার নূপুর বাজন করি আগু পাছু যাও।
ওরে সাত দরিয়ার পারে যাব সাত মধুকর না'
তোরই বেসাত ক'রব হরি কাড়িস তোরই রা'॥
ধূলার বুকে দিয়ে গড়ি সবারে নি কই
কলিজাটা ভরে না ভাই তফাৎ কেন রও॥

ধূলায় নরনারীর কণ্ঠে আজ জেগেছে জয়গান। লক্ষ লক্ষ আর্তনারায়ণ, আজ বুঝেছে ঠাকুরের মহিমা লক্ষ সগর সন্তানকে বাঁচাতে প্রেমের মন্দাকিনী —সে তো এই ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

কোথা থেকে এলি রে তুই কুন্ বটেরি সাঁই
বাউল দলে সঙ্গে নিলি বাউল রাজা তাই॥
আউল বাউল সাঁই এর পরে আর নাই
সগ্ গো ডুবো ঠাকুর আমার গদাই গোঁসাই॥
চাঁদ সুরযের মিতালী তোর তুই নি যাদুকর
সোনার কাঠি ছোঁয়াতে এলি রে গদাই॥

অমর-বল্লী

কয়েকটি কথা

উমা রায়

স্বামী সত্যানন্দ—ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ। কিন্তু তিনি হিমালয়ের গহন গুহায় আত্মগোপন ক'রে ভগবৎ সাধনা করেন নি। গঙ্গোত্রীর তুহিন-শীতল গুহামুখ থেকে তাঁর সাধনার নির্ঝর নেমে এসেছে লোকালয়ের উপর সমতলে,—শ্যামল ক'রেছে সে মাটি। আজ তাতে ফসল ফলছে সাধারণ মানুষের জন্য। এমনি ক'রেই অসাধারণ সাধারণের কাছে নেমে আসেন—সূর্যালোক যেমন নেমে আসে ধরণীর ধূলায়, পৃথিবীকে করে বর্ণস্নাত, উজ্জ্বল ও বিচিত্র।

মহাপুরুষ চরিত্রই এই। জ্ঞান-প্রেম-কর্মের ত্রি-ধারা ত্রিবেণী তীর্থ সৃষ্টি ক'রে যান তাপিত লোকের অবগাহনের জন্য—সমস্ত গ্লানি মুছে আবার উজ্জ্বল ক'রে তোলবার জন্য। কর্ম তাঁর আশ্রমের জীবনধারা সৃষ্টিতে, জ্ঞান তাঁর বহুমুখী শাস্ত্র আলোচনার গ্রন্থে, প্রেম তাঁর ঈশ্বরে তথা মানবে। ঈশ্বর পরম সুন্দর, তাঁর সৃষ্টিও পরম সুন্দর, সেই পরম সুন্দরের অনুভাবনা সাহিত্য-শিল্পও পরম সুন্দর।

এমনই একটি সুন্দর কবিতার পুষ্পগুচ্ছ হাতে এল। কবিতা রচিত হয় প্রাণের আনন্দে আপনাকে প্রকাশ ক'রবার লীলায়। সেই লীলার সুরটি ভক্তমনেও এসে লাগে—সেখানেও গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে কবিত্বের শত নির্ঝরের কলকলধ্বনি। স্বামী সত্যানন্দের কবিতার কলকলধ্বনি কূলে বসে শোনার নয়—তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে শোনার। ১৩৬১ থেকে ১৩৭৮ সালের মধ্যে লিখিত এই কবিতাগুলি পড়লে নিশ্চিতরূপেই অনুভব করা যায় যে সাধকহৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলিতে এই জগৎপ্রকৃতি ও জীবন-প্রকৃতি কত সূক্ষ্ম অঙ্গুলিচালনা করে রাগ-রাগিণী বাজিয়ে গেছে। "চৈত্র সন্ধ্যায়", "প্রথম বৈশাখে", "রাতের ছায়ায়", "শরৎ গাঙে", "আবছা আলোয়", "বর্ষশেষ", "কুহু আর কুজ্ঝটি", মেঘ-বাদলের সন্ধ্যা", "চৈতী হাওয়ার দুপুর" প্রভৃতি কবিতা প্রাকৃতিক কবিতা ঠিক নয়—তবে এই প্রকৃতির অন্তস্থলে যে পরমপুরুষ জাগ্রত আছেন—তাঁরই উদ্দীপনা শক্তি। অথচ কত সরল-সহজ তার আবেদন।

কবিতার আদর্শ যুগে যুগে বদলায় না—বদলায় তার রূপ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই রূপের ভঙ্গীটি বড় তীব্র, বিচিত্র। এমন কি কোনো কোনো

কবির লেখায় "সর্বস্ব"। সাহিত্যের অভিব্যক্তি এই রূপের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে —এমন মতও শোনা যায়। কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে—বাদানুবাদের অবকাশ সৃষ্টি বা গ্রহণ করার প্রশ্ন না তুলেই বলা যায়—হৃদয়ের উপলব্ধি যেখানে ছন্দিত বাণীর মধ্যে প্রকাশ চায়—সেখানে রসের সৃষ্টি হয়েছে কিনা—সেইটেই দেখবার কথা। সে রস যদি গতানুগতিকতাকে প্রত্যাহার করে তবে নিশ্চিতরূপেই তা বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের প্রত্যাশা করে। স্বামী সত্যানন্দের কবিতার আবেদন এই অধিকারের দাবী করে।

এই কবিতাগুলি একটি বিশিষ্ট স্বাদের কবিতা। যে অধ্যাত্ম চেতনা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটি আনন্দ চেতনসত্তাকে সাক্ষাৎকার করে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, সাক্ষাৎকার না ক'রতে পারলে বিষণ্ণ হয় সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই কবিতাগুলির রসাস্বাদনে একটি বৈশিষ্ট্য সংস্কারের অপেক্ষা রাখে।

তাঁর—"বাউলের দল" কবিতার কয়েকটি পংক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

"ঝুমিছে গোলাপ
শান্ত সুষমায়—
ধরণীর স্নিগ্ধ আঁখি পটে
যুগে যুগে জেগেছিল বুঝি
দূরাগত পদধ্বনি—
সরযূর শ্যাম সরণিতে
শ্যাম দূর্বাদল
পেয়েছে কি সাড়া
পেয়েছে কি পলাশিত নয়নের শ্যাম স্নেহাঞ্জনে,
শ্যামায়িত করেছে কি কিশোর কিংশুকে—
কজ্জলিত যমুনায় কূলসম জেগেছে কি
শ্যাম স্নেহ কাঁতি
বেথ্‌লেমে রক্তরাঙা পদচিহ্ন
খুঁজেছে কি মেষশিশু বিষন্ন পিয়াসে।"

মহাপুরুষ স্বামী সত্যানন্দ সাধক ও সিদ্ধ কবি। জীবনকে তিনি গ্রহণ ক'রেছেন সত্যস্বরূপে। সেই সত্যের আলোক তাঁর কবিতার ছত্রেছত্রে। তাঁর পরিবেশিত ছন্দিত সত্যের আলো ভক্তজনের হৃদয় ও রসিকজনের অন্তর আলোকিত করার শক্তি রাখে।

আগাথা কবিতা

তিনিই আদিকবি—আর তাঁর ছায়ায় আমরাও কবি। তারই এই প্রকৃতি, সেও তো কবি। তাই প্রকৃতির কবিতা পেতে হ'লে আমাদের প্রকৃতির হাতে কলম ধরে দিতে হবে। এই কবিতাগুলি সেই ভাবের চেষ্টা—কতকগুলি টুকরো কাগজে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কথা লিখে ছড়িয়ে দেওয়া সেগুলি আপনি গুছিয়ে যে ভাবে গাথা হবে তাতে আমাদের বুঝবার সুবিধা ক'রে নেবার জন্যে কিছু কিছু যোগসূত্র দিয়ে নেওয়া মাত্র। সামান্য একার ওকার দিয়ে যা দাঁড়ায় সেইটি হবে প্রকৃতির আপন হাতে কবিতা। এগুলি আমাদের গাথা নয় তাই এর নাম আগাথা কবিতা।

(১)

তুমি শ্যামলশ্রী, পথের দিশা, মোর ঝিঙ্গুমঝড়ে
কাজল কালোয় কুসুমিত ;
অরুণিমায় ঝরাপাতা যেন দূরের মায়া।
চৈতালীর ভাটার টানে যেন উদাস হাওয়ায়,
ঝিকিমিকি তপ্ত মরুর অতলতলে
ধূপ ছায়ার মলিন হাসি
নিথবিত মৌনমুখে, ক্রন্দসী উষসী যেন
পূবালীর বিকচ কমল ;
রাকা চাঁদ স্মৃতির তীরে—
অফুট কিশলয় যেন কুন্তল ঘনঘোর,
বিদায় বেলায় কুন্দকমল,
দোদুল দোলের জাগরণী
অলক্তরক্ত দক্ষিণ পবন, বুঝি নীপবনের মরীচিকা,
ভাঙ্গা গড়ার বকুল বেলা,
যেন সিঁদুরে মেঘ বিগত বেলা
রোদ্রময়ী রাতির অচিন পাখী, দিগন্তে ঝ'রে যায়ওা সে য
লুকোচুরীর হাসির নূপুর,
ভাঙ্গা ডাঙ্গার আভাস ;

চিকন কালো, চুপে ডাকা, সুরেলা ঘুমন্ত দুপুর যেন
নিদালীর নীহারিকা, পলাশ ঝরা ;
দুরন্ত বক, ক্ষণপ্রভা যেন, কাঁদন কাঁপা ক্লান্ত দিনে
নিরন্ধ্র নিশিথিনী
ফিরে পাওয়া চাঁদের ব্যথা নিঝুম ঘুমে
এলায়িত শিশির হাওয়া
প্রদোষমুখে কুলহারা রক্তিমরাগে বাসন্তিকা
নিকষকালো, স্রোতেরি ফুল, বিজুরী সে কীচকবনে।

(২)

নিরজ শয়ন অমর-বল্লী শিশিরধোয়া ললিত রাগে
আচম্বিতে পুষ্পদলে মর্মপথে চপল ধূপে
চম্পাবনে মর্মপথে আচম্বিতে সারদশ্রী
অস্তগামী—শিশির ছোঁওয়া সন্ধ্যাকাশে মধুর নূপুর ॥

(৩)

বনলক্ষ্মী কাঁকন কেয়ূর হাতছানি দেয়
চোখ জুড়ান
দ্বন্দ্ব-দোলা অথৈ মনের শৈলচূড়া অম্বর তলে।

প্রথম প্রণাম

বরষের প্রথম পাতায় তব পদরেখা
চেয়ে চেয়ে বসে রই ছেয়ে মেঘ লেখা ॥
প্রথম জীবন দিনে যা আছে বা ভিন্
যাক্ তার লেখা জোকা, যাক্ তার চিন্ ॥
কত কাঁদা, কত হাসা কত জীর্ণ বাসে
ভ'রে গেছে জীর্ণ দেহ হতবাকে, শ্বাসে ॥
ফিরে তো চাহিনা কিছু, যাক্ যাক্ মুছি
অশব্দের তীরে, আর অনাগতে খুঁজি ॥

ভুলে যাই সব দৈন্য, ব্যর্থতার গ্লানি
আজ শুধু ভ'রে তুলি নবাগত খানি ॥
নব মাল্য রচিবারে নব নব আশা
নব গীতে আজি দাও নবতম ভাষা ॥
নব পূজা করি, আর মাঙ্গলিক নব
আজি নব আশীর্বাদ পদে মাগি লব ॥
ধরার ধূলায় যেন নব রূপ রাগে
তব পদচিহ্ন দুটি চিরদিন জাগে ॥
শরণের মাঝে দাও বরণীয় প্রাণ
জীবনের পথে দাও অমলিন দান ॥
তব 'বটমূলে' থাক্ চির নতি মোর
তব 'লোকে' হোক্ প্রভু মোর নিশা ভোর ॥

প্রথম প্রভাতে

জননী——

প্রথম প্রভাতে এই হোম শিখা সম
কর অমলিন মম ধরা মনোরম
থাক্ সুখ থাক্ দুখ থাক্ যত বাধা
তোমার বাঁশীর সুর হয় যেন সাধা।
সুরধুনী ধারাসম বহে যাক্ প্রাণ
শত দোলা মাঝে নাহি হই শতখান।
দেবতা ভিখারী দ্বারে ভুলিতে না চাই
সবার তিয়াসা যেন পায় বুকে ঠাঁই।
মরণ অমৃত দিও চরণ-নিকষে—
করুণা নয়নে মাগো রাখো চির দাসে।

প্রথম বৈশাখে

বরষের প্রথম প্রভাতে,
দাঁড়ায়েছি রুদ্ধ দ্বারে—
মুক্তির দেউলে—জুড়ি দু'টি পাণি
—নতনেত্রে অতন্দ্র স্মরণে ;
শতবাধা শত ত্রস্ত বাহুর অর্গলে-রুদ্ধ বর পথ ;
নাহি আশা তবু আছে ভাষাহীন মূক আকুতির হৃদি মন্থন বাণী ;
স্বার্থের জগতে নাহি দয়া নিষ্ঠুর নিরন্ধ্র প্রাণে
—তবু চেয়ে রই— তৃষিত নয়নে,
ক্ষণিকের উছলিত রূপে,
কৃপার বিলাসে যদি সরে বাধা চকিতের চাহনীতে
ক্ষীণকণ্ঠে দেয় আশা—
ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে স্নেহের বিভঙ্গে জাগে কারো বাণী—
যদি খোলে কৃপার দেহলি,
রুদ্র বৈশাখের চোখে যদি জাগে করুণার ক্ষণ অভিসার—
অমৃতের সেতু ঐ আলোক লতায়—
মর্ত্যের ভয়ার্ত বন্ধন নেয় বিজড়িয়া
প্রতি ধূলি প্রতি অণু প্রতি পরমাণু তারে
কভু ত' নন্দিতে নারে যোগ্য কোন দানে—
অর্গলিত দেউলের দ্বারে—শুধু কি
চাহিয়া রব—শুধু কি
ফিরিয়া যাব নিরুদ্ধ নিশ্বাসে—নয়নের জলে,
বৎসরের অনাগত ভয়াকীর্ণ দীর্ণ পথবাহি—
মুক্তপথে সহসা যে জেগেছ জননী
কৃপাঘন মূর্তি তব পেয়েছে নয়ন
জীবনের অমৃতের খনি ।
সুরছন্দে মিশে যায় পিছনের অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস—
মেঘমুক্ত বরষের উদ্বেলিত দিনে
শান্ত আর প্রসন্ন নয়নে ;

স্নিগ্ধতায় গেছে ভ'রে দাবদগ্ধ হিয়া—
পেয়েছি যে জীবনের পরতে পরতে
ভয় কিংবা অভয়ার চির বরাভয়—
সবি বুঝি মিশে যায় সমাপ্তি উষায়।

শুভ বৈশাখে

চলতে গিয়ে থমকে জাগে মন্দাক্রান্তা তালে
বিশেষত্ব এইবা হবে একালে সেকালে।
নিথর ঘন আঁধার রাতে চৈতালীর শেষ
দখিনপুরীর পথেও তখন আঁধার জমা বেশ।
অনেক বাঁধন দিয়েও যেমন অনেক থাকে বাকি
বজ্র আঁটার মাঝেও থাকে ফস্কা গেরোর ফাঁকি।
উকিলের ত' অনেক কথা, শেষ হুজুরের হাতে
ভরে ভয়ে দিন ত' কাটে আধো জাগা রাতে,
Propose তা সে যতই করি Disposal-এর মাল
কৃপার দরে বিকায় সবি বলি যে 'কপাল'।
উঠেই দেখি প্রথম চমক তিনটে বেজেই গেছে
ছুটো ছুটির ধুম লেগে যায় জোগাড় করার পাছে।
প্রথম হোঁচট গাড়ী অচল উল্টা বোঝার পালা
ঘোড়া যখন কাঁধেই চড়ে কাঁধ বোঝে সে জ্বালা।
চলি চলি পায়ে যখন গাড়ীর পদক্ষেপ
অন্যগুলির বয়স ত নয় ফেলার প্রথম Step,
পথের শেষে আবার অচল গাড়ীর কৃপাও চাই
হেঁটে যাওয়া ছাড়া তখন অন্য গতি নাই।
দখিনাপুর মায়েরি দেশ নির্বাধ সে পুরী
গিয়েই দেখে বাঁশের আগর বেবাক আছে জুড়ি
বাঁশের গোলকধামের মাঝে হারায় যদি কূল
চারিদিকেই ডাক পড়ে আর লোকেরও চুলবুল।

ফিরেই না হয় এবার চলি দুয়ারে ক'রি গড়
মা ত' আছে হৃদয় গুহায় সয়না ভীড়ের তর।
হাতটি জুড়ি কেউ বা কয়—পূজারী মহাশয়
একটু না হয় সবুর ধর দেখাও বারেক মায়—
কৃপাময়ীর চরণতলে প্রথম দিনের ঠাঁই
যো সো ক'রে মিলেই গেল দণ্ডবতেই পাই।
বছরের সাধ মিটল এবার কৃপার একটি কণা
সারা বছর সবার কুশল চরণে থাক জমা।

হে মহাকাল

উধাও তোমার অভয় শ্রীকর তুলি
আশ্বাসিলে অশান্ত অধীরে,
বুলাইলে অমৃতের তুলি।
বরষের রুক্ষ দিনশেষে
দুরু দুরু কম্প্র বক্ষচাপি
চেয়ে থাকি অতন্দ্র নিমেষে।
ফিরে চাই, চাই বারে বারে
ফেলে আসা দহনে ভূমি
ভুল দোষ ছাওয়া অন্ধকারে।
শত আশা বক্ষেতে নিথরি
মৌন নব প্রভাতে প্রণমি
রৌদ্ররূপ রাখিও আবরি।
শ্লথ শ্রান্ত চরণ নিক্ষেপে
দাঁড়াইয়া তোরণ রুদ্ধ দ্বারে
আপনারে লুটাই নিঃশেষে।
ভীরু দুই অঞ্জলি বাঁধিয়া
মাগি আজি কৃপা কণা তব
দীনতম সবার লাগিয়া।

হে কালবৈশাখী

হে কালবৈশাখী—
তব গৈরিকের নব-উত্তরিয়ে
কি এনেছ মোর লাগি ?
এনেছ কি বজ্র জ্বালা ?
প্রলয়ের বক্ষ সোহাগিয়া,
জড়াইবে বেদনার মালা।
ভীত তরাসিত বুকে—
জোড় হাতে চেয়ে থাকা দুই আঁখি পাতে
আরো অশ্রু ভরিবে কি চুপে।
নিথরিত শৃঙ্খলিত পায়ে
চকিতে দেবে কি আনি মুক্তিমন্ত্র
দূরাগত কল্যাণের বায়ে।
রুক্ষ রুদ্র মুখে—
আছে ক্ষেম আছে প্রেম সান্ত্বনার বাণী
পিতার অসীম স্নেহে জননীর দুঃখে।
হে বট বৈরাগী
শরণের নত শিরে কল্যাণের শতধারা
সর্বহারা বুকে তাই শতবার মাগি।

৫ই বৈশাখ

অকাল সন্ধ্যা মেঘের পাখায় নেমে আসে ;
সব কথা একি সায়
জীবনের পথে হাসে মরীচিকা
ধরিতেও ধরা হয় না।
নারিকেল বনে নেবুফুলী হাওয়া—
থেমে যায়, কত কথা নিয়ে
আনমনে আসা বরষায়।

তুমি আছ প্রভু কোথা—
শাপলা দীঘি কেঁপে কেঁপে মন্থরী কারে চায়
নদী বয়ে যায় জানেনা কোথায়
দূর দূর হতে শৈল সানুতে
পেয়েছে আলেয়া ডাক।
সুবাস সুন্দর শুধু কবি পথে
দখিনার আসা যাওয়া—
মিল পাওয়া শুধু দুটি চরণের মাঝে ?
মেঘের সোনায় মেটেনাত' হায়
ভুখারী প্রাণের তৃষা ?
আঁধার সুন্দর তুমি কেন এত
আপনার মাঝে গোপন মধুর
দূরের পথিক দূরের কণ্টক
না নিলে হয় না চলা।

সে চির অচিনে

বৈশাখের কজ্জলিত আঁখি-পত্রপুটে
অশান্ত আবেশে নির্নিমেষ আঁখি দুটি আজি মরে লুটে,
পূর্বাহ্ণের কথা কেন অপরাহ্ণে আসে
আশা-নিরাশার আলোছায়ে কণ্টকিয়া কেন তারা হাসে ;
কুহুলিত বনভূমি শত সুরে সাধি
কানন কুন্তলে যেন আজ প্রত্যাসন্নে নিতে চায় বাঁধি,
খুঁজেছি কি পদ-চিহ্ন অবসন্ন দিনে
চেয়েছি কি আজ চির চাওয়া মনে প্রাণে সে চির অচিনে
থমকিত বারি সম বক্ষে ব্যথা চাপি
ঘনায়িত সাঁঝে দেখি চুপে আরো দূর আরো কত বাকি
অজানিতে ঝরা এই দুটি ফোঁটা জল
ভিজাইয়া দেছে পুঞ্জে জমা স্বাতি সম বেদন অতল।

মধু বৈশাখী

সারাদিনে রুদ্রতাপে জর্জ্জর এই মন—
সন্ধ্যা যখন আসে আসে—
বিদ্যুতেরই ঝলক এল, ভ'রল সারা তন ॥
গঙ্গা যদি তুলে ওঠে ঢেউয়ের মাতামাতি
চন্দ্র তারা ডুবিয়ে দিয়ে, আকাশ চেরা বিদ্যুতেরি পাঁতি
ওপার হতে ছুটে আসে বাদল হাওয়ার রাশ
করুণ যেন একটি পরশ জুড়ায় সকল আশ।
আপনি দুটি হাতে যেন বাঁধন গেল খুলি
প্রণাম জানাই মগ্ন মনে তৃপ্ত নয়ন তুলি।
ওপারেতে ছায়ার কেকা স্বপ্ন মাখা দিক
মন্দাক্রান্তা ছন্দে নয় চায় যে অনিমিখ।
করুণারি বর্ষণেতে ছড়িয়ে গেছে মন
দীপনেভা এই বুকে তখন সজল আকিঞ্চন ॥

আসন্ন বৈশাখে

আসন্ন বৈশাখে—মাধবীর বুকে দখিনার
নূতন জাগানর দোলা, গঙ্গার বুকও রোমাঞ্চিত।
একটা পুরানো মাছের নৌকা নূতন ক'রে পাড়ি জমাতে তৈরি হ'চ্ছে-
কাছে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে একটা কুকুর।
মাঠের ধারে কে যেন নূতন কুঁড়ির আশায়
আঘাত ক'রছে মাটির বুকে।
টুক্‌রো টুক্‌রো সাদা মেঘ আকাশের
একঘেয়েমিকে ভুলাতে চায় নূতন বর্ণলেপে!
দূর দিগ্বলয়ে কিন্তু একটা শান্তির পটভূমি—
আবছা হ'য়ে গেছে দিশান্তর—বোঝা যায়
ছায়া ছায়াতে শান্তির একটা ছোঁওয়া—
প্রথম দিনের উপর রেখে যেতে চায় চুপি একটা রঙ।
মনে হয় জগৎটা যদি হ'ত রেনল্ডসের আঁকা একটি শিশু—
যুঁই ফোটা দুটি চোখে চেয়ে আছে দূর দূরান্তরে
সর্বাঙ্গে উপনিষদের শান্তম্ উপাসিতমের মন্ত্র—
যা ভুলতে গিয়েও আমরা পারছি না ভুলতে।

হে মৌন বৈশাখ

মগ্ন শৈল মুখে
কি কথা যে কও—
হে মৌন বৈশাখ।
ঊর্দ্ধমুখে তব গতি
সুপ্তরাত্রি বহি আনে
কমল প্রভাত—
সেও আনে
বজ্রাহত দিনে যা মিলায়।
অন্তরের জাতিস্মর—
কজ্জলিত চোখে
কত স্বপ্ন ভাসে
কে বা খোঁজ রাখে তায়।
হাসির পিছনে কান্না
ক্রন্দসি সে রাত
জীবনের পদক্ষেপে—
মুখ চাহি দাঁড়াইয়া থাকো
হে অচিন হে ধ্যান নিসন্ন
নির্বাত

সেদিন অসময়ের মেঘ

সেদিন অসময়ের মেঘ,—
বৈশাখী আকাশটা একটু ছায়া মেখে
উদাস হ'য়ে চেয়ে আছে।
নারিকেল কুঞ্জে দেখতে পাচ্ছি না মুহুকম্পিত দেবদারু-
আর পাচ্ছি না যক্ষশ্চক্রে জনক-তনয়া স্নানপুণ্য…

গঙ্গা হৃদি বঙ্গভূমি,—
এই কোণে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টিরা গৌড় সারঙ্গ ধ'রেছে—
আকাশে তখন প্রাবৃট্ পন্থী ধ্রুপদের গুরুগুরু।
... ...
ছোট ছোট মাছগুলো কি জানি কেন জলের তলায়,—
সবুজ গাছের ফাঁক্ দিয়ে নিস্তরঙ্গ গঙ্গা দেখা যায়।
মাছের নৌকাগুলো তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছে
আকাশের ফাটলে নরম রঙ ছড়ানো···
গঙ্গার বুকেও যেন এক একটা তুলির টান দেওয়া স্রোত··
দূর থেকে স্টীমারের ফগহর্ণ ভেসে আসে—
মনে হয় যেন,—"গাঙ মোরে বুলায়।"
... ...
ভিজে ভিজে আকাশটা—
একটা তুলট কাগজে লেখা কবিতার মত দেখাচ্ছিল।
ঝাপসা হ'য়ে গেছে দূর গঙ্গার বাঁকটা···
'ঈ ভরা বাদর—শূন্য মন্দির মোর'—বলতেও ইচ্ছে করে না।
আবার—**I pass but never die**—বলতেও ইচ্ছে করে না,—
না—শুধু দুফোঁটা চোখে জল এলেই ভাল হ'ত।

তা'কে বুকে ধ'রে কাঁদি

পূর্ণিমা স'রে গেছে সন্থ—
সারা আকাশটা বিরহী-যক্ষের কান্না কাঁদছে।
তার বুকটা থেকে থেকে বিদ্যুৎ নিঙড়ে দিচ্ছে ···
এপার কাঁদে—ওপারের গলায় জড়িয়ে ধ'রতে অবুঝ ব্যথায়
গঙ্গার বুকটা নিথর—পাথর হ'য়ে গিয়েছে·····
দুখের একটা নিকষিত রূপ আছে—
এর কান্না তাই বড় নিবিড়—
তাই বড় দুখেই তো পাই আমার ঠাকুরকে—

"ঈ ভরা বাদর শূন্য মন্দির" বলতে গিয়ে
শুধু মন্দির তো নয় জগৎটাই শূন্য মনে হয়,
সে যে গহিন বুকের বড আদরের ধন।
অকালে এই বর্ষণ—তাই সে এত স্পর্শলোল
মনে হয় তা'কে বুকে ধ'রে কাঁদি।

আষাঢ়ের প্রথম দিবস

নভ-নীরদিয়া তোমারে জানাই স্বাগত
ক্লান্ত দগ্ধ-জীবনের তুমি নক্ত ব্রত।
সাগর মেখলা ভূমি ঊর্দ্ধ পানে চাহি
অভ্যর্থিত করে তোমা বন্দনাতে গাহি।
যা কিছু মলিন আর যাহা অগ্নিময়
ধুয়ে দাও মুছে দাও হ'ক তার ক্ষয়।
অগ্নিশুদ্ধ জানকীরে বরণীয়া লহ
স্বর্ণ সীতা নাহি চাই নির্বাক বিরহ।
শ্যাম সমারোহে আজ তালিবন তলে
বনমালী আসুক হে ধারা স্নান জলে।
যমুনা জাগুক—কুহু কুঞ্জ আন্দোলিত
গৈরিক জলোচ্ছলে বট মর্ম্মরিত।
ঋত্বিকের সামছন্দে দেবতার দল
ভাবনা করুক পরস্পরেতে কেবল।
মর্ত্তের মঞ্জুল গানে স্বর্গের সুষমা
ঝরিয়া পড়ুক স্বস্তি—শান্তি মনোরমা।

প্রথম প্রকাশ

আজি বরষার প্রথম প্রকাশ
উচ্ছলতায় ভরা—
হৃদয় দুয়ারে আছাড়িয়া পড়ে
ঝর ঝর ধারে ঝরা।

ময়ূরীর মত আকাশের পানে
মন ছিল কত চাহি—
ভাঙ্গা 'না' খানি সযতনে কত
চলিয়াছিলাম বাহি।
দুকুল ভাঙ্গিয়া সহসা এসেছে
অঝোর ঝরণ সহি—
মত্ত মদিরা ভাঙ্গিয়া পড়িতে
পড়ে যে পেয়ালা বহি।
উপরে গঙ্গা নীচে যে গঙ্গা
হ'য়ে গেছে একাকার
এমনি করিয়া তরণী আমার
পাইবে কি পারাবার ?

প্রথম বর্ষায়

প্রথম বর্ষায় আকাশে চুপি চুপি শরৎ দাঁড়িয়েছে।
ভাই-এর আসার কথা নয়—
তবু একবার যেন এসেছে বোনের কাছে।
ভিজে ভিজে নারকেলের পাতায়
যেন 'Lyre of the wind' এর ছবি।
কৃষ্ণচূড়ার একটা ডাল
সন্নত হ'য়ে ছুঁই ছুঁই ক'রছে ভরা গঙ্গাকে।
মাধবীর গাছটায় ফুলের একটা সেজ—
চাঁপার গাছটা একটি ফুল নিয়ে
যেন প্রতীক্ষারত—তার কর্ণেষু যোগ্যং নব কর্ণিকারং।
নরম হাওয়ায় সূর্যমুখীদের জেগেছে জীপসী নাচ।
চেরী মঞ্জরীরা প্রোষিতভর্তৃকার মত
এলিয়ে দিয়েছে ফুলময় তনু—
ঘসা ঘসা চাঁদের চোখে বেণু বন নিঃস্বন।
দুটো শাপলা ফুটেছে যেন একটা চাপা ব্যথা নিয়ে,—
—সে আসে—সে আসে।

মেঘ বাদলের সন্ধ্যা

মেঘ বাদলের সন্ধ্যা— দূর থেকে ভেসে আসা
জীবনের বহুদিন পারিয়ে,—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে—
মন্দিরের ঘণ্টা কাঁসরে সেই পুরানো দিনের· ·
······গঙ্গার কালিন্দী রূপ।
সেই ছেলেদের মাথা বাঁচিয়ে মন্দিরে একটা প্রণাম জানানো—
এই পুরানো ব্যাক গ্রাউণ্ডে নূতন ল্যাণ্ডস্কেপ—
আজো আঁকা র'য়েছে।
তৃষাতুর সূর্যমুখীরা তেমনি আছড়ে প'ড়ে জানায় প্রণতি—
একটা পাখীর ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসে—
ছেলেরা ঝড়ের ফুল কুড়োয়—।
... ...
মহাকালের চক্রের যেন এরা উর্ধ্বে—
আকর্ণ পিপাসা নিয়ে আজো আবার সেই
বেসুরো বেতালে চীৎকার করে বুকের ভেতর
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে·········।

কথাহীন শ্রাবণের রাত্রি

কথা-হীন শ্রাবণের রাত্রি—
ঘড়ির কাঁটা দুটো ঢ'লে প'ড়েছে মাঝখান ছেড়ে।
ঘুম কেড়ে নেওয়া রূপ সহেলী আঁধার
আর কতকগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তা।
বাইরে নারকেলের পাতায়
আলোর সঙ্গে চলে আঁখ-মিচৌলী খেলা।
ওমরের শেষ পেয়ালার মত ভরা আকাশের বুকটা।
মনে মনে এক পশলা বৃষ্টির স্বপ্ন দেখি—

গঙ্গাজলী বুকেও অচ্ছোদের স্বপ্ন—
বাগানের গোলাপগুলোও গুলমার্গের স্বপ্ন দেখে,
দূরে জেলেডিঙ্গীতেও এক একটা আলোর তন্দ্রা ;
একটা পাখীও জেগে নেই।
ঘুম না আসা চোখে শুধু চেয়ে থাকি—
জীবনের পারিয়ে আসা সিঁড়িগুলো
যেন আর ভাঙ্গতে ইচ্ছা করে না।
ঘুম পাড়ানি গানের কথা কি মনে পড়ে—
না দুষ্টু ছেলের চোখে সেই জাগার স্বপ্ন ?

আবছা শরতে

শরৎ সেদিন দুয়ার খুলি দাঁড়াল মোর দ্বারে—
হৃদয় বীণার নান্দী কেন বাজল ব্যথার তারে।
মেদুর মেঘের মিঠে আলোয় আকাশ ভাঙ্গাভাঙ্গা
শরৎ সোনায় গগন কোণা অরূপ রঙে রাঙা।
গুমরে ওঠা হিয়ার আগল যায়নি সেদিন খুলি
অবাক্ চোখে চায়নি পরাণ নয়ন দুটি তুলি।
বাঁধভাঙ্গা সে রূপের জোয়ার উথল দোলাই দিল
সেই অজানার সোনার কাঠি হয়ত ছোঁয়া ছিল,
হয়ত আমার অজানিতে হাসল চকিত হাসি
হয়ত আমার হিয়ার দ্বারে বাজল বোধন বাঁশী,
উদয় ঊষার করুণ নিশাস হয়ত দিল চুমো
কাশের কোলে দোল জাগাল হয়ত নিরূপম।
মানসসরের ফিরতি অতিথ—ডানার পাখা খসি
হিয়ার হিয়ায় নিশান মিলায় বটের বনেশ্বসি
বহুদিনের চেনা অতিথ আবছাতে দাও চিনা
তাইতো আমার গান জাগানো দখিণা আজ দীনা

শরৎ গাঙ্গে

শরৎ গাঙ্গে জাগল যখন মেঘ শাপলার দল
থই হারানো বর্ষা চোখে ফিরে চাওয়ার ছল ॥
প্রজাপতির সঙ্গে নাচে হাল্কা পাখার মন
কলার পাতায় একতারাতে বাউল নাচন ॥
গঙ্গাজলী শাড়ীতে কার চাঁদের চমকানি
আকাশ জুড়ে আলোছায়া খেলছে আনিমানি ॥
ছোট্ট ডোবা কাকচক্ষু জলটি নড়ে না,
কমল ফোটা মুখের ছায়া বুক যে ভরে না ॥
শিউলী ঝরে টুপটুপিয়ে কলকে ফুলের বাঁশী,
মনে পড়ে পুরোনো দিন, মায়ের মুখে হাসি ॥
অনেক দিনের পরে হেথায় চরণ চিহ্ন রাখি
বোঝাপড়া চায় যে অনেক জমা এবং বাকী ॥
স্বপ্ন নিয়ে সন্ধ্যা যখন আসবে মায়ের মত
আবছা ছোঁয়ায় এমনি করে ভুলিয়ে দিতে ক্ষত ॥
সোনার আলো বুলিয়ে দিতে ক্লান্ত দুটি চোখে
মা হারানো বুকে আমার একটি চুমা এঁকে ॥

শরতে

নির্গলিত বেদনার মত, মেঘমুক্ত শরতের প্রাতে
চেয়ে রই, ভেসে যাই স্বর্ণলেখ মেঘের ভেলাতে,
লুকোচুরী করে রোদ ঝিলিমিলি কৃষ্ণচূড়া শিরে, ফিরে যাই চুপে
দূরছায়া পথে জীবনের প্রথম খেলার—শাল তাল বুকে
শ্যামা মেয়ে দেয় হাতছানি—অফুট হাসিতে আজো ছড়াইয়া পড়ে
. সেই অনাবিল খুসীর ঝলক অলখিতে অলকারে সেই যেন গড়ে—
সেই সুরধুনী কুলে সোনা গলা জলে আধো নিমর্জ্জন
অহেতুক সবটুকু ; ডুবু ডুবু হয়েছি যে, তবু স্নান নহে সমাপন

চন্দনিত ভালে আর অলকের দোলে লাগে অলকার সেই সে পুলক
সহসা এসেছে ফিরে চিরসাথী হে গোপাল, হে চির বালক
রঞ্জিতে নয়ন দেখি খুসীতে গিয়েছে ভরি—অরুণিম ভালে
গোলাপিয়া করি গাল, ঝরা শেফালীর তলে
কুড়াইতে আসা ফুল চেনা চেনা লাগে তবু, হোক বহুদূর—
বাঁশী তবু বাজাইয়া যাও—বাজাও সে পুরানো নূপুর
যে ফুল ঝরেনি প্রাতে—শত দোলা শত ঝাঁকি সহি
পরশে তোমার বুঝি অশ্রু সম ঝরে রহি রহি ॥

ডাকে অচিন সে সাথী

একখানা সাদা মেঘ আর প্রান্তিকের আলো
শরতের নিরাজনা বেলা
মন নিয়ে এলোমেলো খেলা
অজানিতে কেন যেন লাগে স্বস্তি লাগে ভালো।
মন্দিরের শীর্ষ হ'তে দোয়েল মুক্ত বেগে নামা
নাহি ভয় নাহি দ্বিধা কোন
জীবনের গতি শুধু যেন
আর সব প্রকৃতির চঞ্চলতা চিরচুপ চির যেন মানা।
যেন কোন ঊর্ধ্ব অভিসার চলা
মনের সে চোরা বালি
নীচে টেনে নেয় খালি
মূক ক'রে, শান্ত ক'রে নেওয়া তারে এই শুধু বলা।
ঊর্ধ্বে অধে পরিপূর্ণ শান্তির মঙ্গল ঘট ভরা
জীবনের পূর্ণ পাত্রখানি
কণ্ঠে আজ নিয়েছি যে টানি
আর কিছু নাহি চাই তার কিছু ধরা কি অধরা।
ঝরা শিউলীর দিন আর হাস্য কাঁদা রাতি
শিশিরে ক্রন্দসী শুধু
হাহাকার মরু বালু ধু-ধু
ক্লান্ত পথ ডাকে, ডাকে অচিন সে সাথী।

বিজয়া বাসরে

সন্ধ্যার বিষণ্ণ মেঘ আরক্ত নয়ন
আনমনে আমি চেয়ে থাকি,
শিশিরেই কাঁদে যেন কেউ
না হারাতে সে ত' হারানই।
দুইটি সজল আঁখি দুইটি তারা,
থমথমি রয় দূর নভ,
অকারণ বায়ু আছাড়িয়া
প্রদীপের করে নীরাজন।
বেদন থমক এই নিশি
পাষাণ স্তূপের মত জমা
ভাঙ্গা বাঁশী আঁধারেতে যেন
ক্রন্দসী স্বরে রয় জাগি।
ঝরা ফুল নিয়ে আজ কাঁদি
কুঁড়ির কি কথা ছিল বুকে ?
বিজয়া বাসরে আজি মাগো
সোয়াথ যে এক তিল নাহি।

হেমন্তের অলস মন্থর দুপুর

হেমন্তের অলস মন্থর দুপুর
শিরিষ গাছে ব'সেছে
নাম না জানা পাখীদের জলসা—
হরবোলা পাখীরা কি যে বলে—আমার মনের মত।
মেঘহারা নীলকান্ত আকাশ—আর নীচে
ঘুম ঘুম হাওয়ায় দুলছে গুছো গুছো 'বগেন' ফুল

ফোয়ারা থেকে ভেসে আসে জলমঞ্জির
হলদে ডালিয়া ফুটে রয়েছে,—তারি মাঝে
হে সুন্দরের দেবতা তুমিও তো র'য়েছ।—
দুটিকে এক ক'রে নাও—
অন্তরের এই এক প্রার্থনা।

শীতের গোধূলি

শীতের গোধূলি
ধনুকের মত সাতরঙে রাঙা আকাশটা—
নু'য়ে প'ড়েছে গঙ্গার ওপর।
কি জানি কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছি এই আকাশটাকে।
ক্ষণে ক্ষণে রঙে রঙে যেন সাতটি সুরের বেসাত—
একদিকে গঙ্গাতে টুকরো টুকরো সোনালী মেঘের ধূপছায়া—
আর অন্যদিকে নেমে আসছে সন্ধ্যার মর্মর।
ঈষৎ কাঁপা নারকেলের পাতাগুলোর ওপরে
ক্ষণিকে হেলে পড়ে লাল মেঘের শ্যাম ছায়া।
পাখীরা বাসায় ফিরছে দলে দলে······
যাবার সময় দিয়ে যাচ্ছে পূরবীর শীষ।
খাঁচায় বন্দী মনটাও চাইছে বাতায়ন খুলে উধাও হ'য়ে যেতে
নীড়ের নীল আশ্রয়ে······
একটা হাল্‌কা সবুজ রং এর টিয়া
গাছে এসে বসেছে;
ঘরের জানালাতে একটা টিয়া······
ছবিতে সেটা আঁকা।
তবু তাকে দেখে সে আকুল হ'য়ে ডাকছে······
আমি যেন আঁকা পাখী না হই।
হে "পরমে ব্যোমন্"—কালীর আঁচড়ে তোমায় ধরে রাখতে চাই না।
তোমার ডাকে উধাও হারানোয় হারিয়ে যাক এ মন।

শীতের সায়াহ্ন

নীল আকাশে সোনা সোনা মেঘ
নিস্তব্ধ তাদের থাকা—
সবুজ কলাগাছের ত্ব'একটি পাতা রোদ পোয়াচ্ছে,
আর তার সঙ্গে মিতালী ক'রছে চন্দ্রমল্লিকা।
ঝরণার টুপ টুপ শব্দ—
আর শালিকদের একে একে ডানা ঝাপটে স্নান।
যেন মনে হয় জীবনে কোথাও এদের অমিল নেই।
নিমগাছের তুতিয়ালী নীল আকাশের সঙ্গে ;
লীলার কপোত অজস্র আনন্দে ছুটে চলে।
এই গতি এই আনন্দ যেন—
নদীর চির স্রোত।
সবুজে কঙ্করিত জীবনের সঙ্গে
এর মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
মানুষ যেন প্রকৃতির থেকে
এক ছন্নছাড়া সৃষ্টি—
যেন দেবাসুরের সংগ্রাম ভূমি।
প্রকৃতির পটভূমিপর' তার এই চরিত্র, এই সংগ্রাম
এর অর্থ খুঁজে পাওয়া ভার।

চৈতী হাওয়ার দুপুর

চৈতী হাওয়ার দুপুরে মাধবী ফুলেরা যেন
উদাস পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়
কৃষ্ণচূড়ায় শুখনো শাখায় হাওয়া লাগে
যেন ঘুম না ভাঙ্গা একটা স্বপ্ন······
খোলা হাওয়ায় গঙ্গার বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে
ছায়া ছায়া দূর দিগ্বলয়ে চাপা
একটা কথা······

একটা ষ্টিমার ধুঁকছে—বার্ধক্যের জীর্ণতা ঢাকতে গিয়ে।
দূরের মিলগুলো মাঝে মাঝে যেন
ডুকরে কেঁদে ওঠে—
অনেক মানুষের পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যথার সে কান্না।
ধূসর আকাশেও যেন একটা কান্নার ছোপ
হাওয়ায় হাওয়ায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস… … …
দুপুরের ছবিটা যেন—
ওয়াট্সের আঁকা চোখ বাঁধা আশা… … …
একমনে বাজিয়ে চ'লেছে করুণ একটা সুর।

বিশীর্ণ চৈত্রের কথা

গোধূলির ঝরা পাতা লগ্নে
চেয়ে চেয়ে বসে আছি মগ্নে।
সুরধুনী ব'য়ে যায়—সাত রঙ্গে রাঙ্গা
এ যেন জীবনের আশা নিয়ে, আশা শত ভাঙ্গা।
বছরের দিনগুলি একে একে গিয়েছে যে স'রে
কত তার রঙ কান্না ও হাসির—ফেলে আসা ভোরে
কদমের ডাল থেকে একে একে ঝ'ড়ে পড়ে পত্র
তার গায়ে লিখা যেন হাসি আর ক্রন্দন সত্র।
সকল পারায়ে তুমি র'য়েছো যে প্রভু
শত দুঃখ জর্জর ভুলে যাই তবু।
দীর্ঘ এ পথ রেখা কত ভুল দোষ
ভুলে যেও ক্ষমাময় করিওনা রোষ।
ক্রন্দসী রজনীর যত খেদ দ্বন্দ্ব
তোমার চরণে প্রভু তারা পায় যেন ছন্দ।

চৈত্র নিবেদন

শেষের কথা শেষের ব্যথা
অশেষ তোমার পায়েই রাখি
ভ্রান্তি ভুলের জমা বাকী
রয়না যেন পায়েই মাগি।

আলোর চেয়ে আঁধার যেথা
নিত্য দিনই দিচ্ছে হানা
মাথা তুলে ব'লবো কি আর
সকল কথাই ব'লতে মানা।

খ'সে পড়া তারার মত
যে দিনগুলি গেছে স'রে
ক্ষমা ক'রে তাদের যেন
ঐ চরণেই নিও ধ'রে।

মহাকালের সাগর তীরে
ঢেউয়ের খেলা নিত্য আছে
চরণ ঘিরে র'চলো নাকি
ক্ষণিকের এই মালা সাজে।

কান্না-হাসির-ঝরা ফুলে
আমরা যখন গাঁথি মালা
দ্রষ্টা তুমি সাক্ষী তুমি
চেয়েই দেখ মিছের ডালা

ভুলিয়ে দিও পিছের যত
মিছে ব্যথার দুঃখ শোক
অনাগত দিনের পুঁজি
আরো পুণ্য ধন্য হোক।

নূতন দিনের নূতন আলোয়
কর আশীষ-নেত্র পাত
তোমার পায়ে প্রণাম জানাই
গদাধর হে জগন্নাথ।

চৈত্র সন্ধ্যায়

ঝরা চৈত্র ঝ'রে যায় অনন্তের পথে,
হে জননী, ক্লান্ত নত নেত্রে আজ
বসে রই—নিভৃতে নিস্তব্ধে—
কত কথা ভেসে আসে মহাসাগরের বিলুপ্তির তীরে ;
ভেসে আসে কাঁদা হাসা, ভেসে আসে স্মৃতি সিক্ত সুর,
ভুলে যাওয়া চৈতালীর পুলক পুষ্পল চন্দ্র-চমকিত রাতি,
ভেসে আসে ভয়কম্প্র রজনীর অব্যক্ত অলজ্ঘ্য
—নির্দেশ ; মন্থনের অমৃতের পাত্র সম
সব ছাপাইয়া ভেসে যেন আসে
মহাকাল মন্দিরের রোল, যেন চির চেনা,
যেন স্মৃতি কণ্টকিত আধোভয়ে আধোসুখে
জাগা অস্ফুট কাহিনী—চলার ইঙ্গিত ভরা অচল
চরণে—চঞ্চলিত উচ্ছলিত বুকে—
হয়ত বা ব্যহত উচ্ছ্বাসে, স্তিমিত প্রদীপে তৃপ্ত শেষ আহুতির
নিবাত বেদনে নির্বাণের বাণী ;
............পূজা শুধু হয় নাই—পুষ্পদামে কুসুমে
চন্দনে—পূজা নয় আনন্দ নন্দনে—পূজা আরো
আছে অশান্ত ভঙ্গীতে অশ্রুল নিরন্ধ্র প্রাণের
নিভৃত আকুতি—আজি এই চৈত্র শেষ সন্ধ্যা তীরে।
জীবনের পূজা—শুষ্ক হোক, রিক্ত হোক, থাক ঐ প্রভুর চরণে।
প্রতিপত্রে জেগেছে যে গান—থমকিত তার ভাষা
কভু ফুটে কভু বা অফুটে, সব খানি
থাক তবু ধরা অশান্তির—স্তিমিত উচ্ছাসে।

চৈত্রের সন্ধ্যা

চৈত্রের সন্ধ্যা কেন এত ভালো
আমার এ মনে নাই
নাই এত আলো ॥
ভাঙ্গাবুক ভাঙ্গা কুল
যত দুখ যত ভুল
ব'য়ে যেতে ওগো নদী
কেন রঙ ঢালো।
ভরা চাঁদ নীল মেঘে
যেন নিশিগন্ধা
কুসুমিত রাতি যেন
সহসা অতন্দ্রা।
সাধা গান সাধা সুর
তবু দূর কত দূর
ওগো প্রভু প্রদীপের
বুকে কত কালো ॥

বর্ষ শেষ

হে গোপাল,—বর্ষ শেষ আজি—
তৃষাতুর কপোতের মত প'ড়ে আছি ঊর্ধ্ব মুখে—
অজস্র তারা স্নিগ্ধ নীল চোখে চেয়ে আছে—
কি তারা বলে আজি, এই দিনে……
গত দিনের শত কথা,—না অনাগত
শত সুখ দুঃখের পুঞ্জ লিখা……
নারিকেল কুঞ্জে জেগেছে তৃষ্ণার্ত চঞ্চলতা—
গঙ্গার বুকে লেগেছে কত ঢেউ,
তার চঞ্চল ফেনিল উচ্ছ্বাসে তৃষ্ণা কি মেটে—এই বুকের ?

আজি এই হোমশিখা আহুতির বুকে—
সব ব্যথা সব জ্বালা ; গত জীবনের সব—
অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল।
মৌন প্রাণের এই নিবেদন—হে দেবতা
লুণ্ঠিত হোক ঐ চরণে······
এই মোদের আকিঞ্চন······ !

দুধেল দাঁতে

মুক্তা দিয়ে বাঁধান' নয় তবু দুটি দাঁতের তরে
পাগলা হওয়া এতই কিবা, মুক্তধারা জীবন-সরে।
মা যশোদা দেখল জগৎ চিন্তামণির দাঁতের সাথে,
কাক-ভুষুণ্ডী দেখেছিল বিশ্ব সারা রামের দাঁতে,
সুরদাসের সুরেই দেখি কানুর দু'টি দুধাই দাঁতই,
ব্রজের রণছোড়জী হাসে, মীরার প্রেমা মিঠাই নাকি !
করমেতীর ক্ষীরের বাটী ঝুটা না হয় দুধেল দাঁতে,
ভুখা নামদেবের তরে মধুই জমে প্রসাদ পাতে।
জটাধারীর জটার আড়ে লুকায় না যে মিষ্টি হাসি
মুখটি টিপে আড়ালে কি, প্রেমের বেসাত সর্বনাশী।
আজো দেখি দু'টি দাঁতে মিঠাই কণার মুক্তা জমে
চাঁপার কলি হাত পাতা নয় প্রাণেই চাওয়া তারই সনে।
ভক্ত ভাবে কোন্‌টা লব হাসির প্রসাদ সুধায় দ্রব
ফেলাও না যায় প্রসাদ কণা অমৃত সেও "ফেলালব"।

বিঃ দ্রঃ—কাক ভুষুণ্ডীর উপাখ্যান রাম অবতারের কাহিনী।

সুরদাসের পদে "মা যশোদা গোপালজীর কবে দুধ দাঁতগুলি বার হবে ?" এই কামনা আছে। নামদেব শ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার পর তাঁর অদর্শনে প্রায়োপবেশন করেন। পরে শ্রীঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে ও তিনি সেই প্রসাদ পান। জটাধারীর সঙ্গে রামলালা বিগ্রহ বহু লীলা ক'রে গেছেন এই দক্ষিণেশ্বর লীলায়।

করমেতী বাঈ এক হাতে দাঁতন ক'রতেন অন্য হাতে ক্ষীর প্রস্তুত ক'রতেন গোপালের, পাছে ভোগের দেরী হয়।

শিখান' সে কথা

কাল ছু'টি আঁখি, কাজল আড়ালে
কথা নয় কথা কাড়া
পাপড়ি ভাঙ্গিয়া স্থরভি যেন গো
দখিনারে দেয় সাড়া ॥
পূরবী সন্ধ্যা স্থরভিত করি
সেদিন যে শিশু হরি
ধ্যানের দেউলে ব'সে ব'সে থেকে
আকুলি উঠেছে মরি ॥
কম-মণ্ডিত ছোট ছু'টি পায়ে
ত্রিপাদ ভূমিরে চাহি
চলিবার যত সাধ কি গো মেটে
কোলে উঠে পথ বাহি ॥
আরতি আসরে গানের জলসা
জমে নাই বুঝি মোটে
ভক্তের হিয়া বেদনা মথিয়া
অভিমান জাগে ঠোঁটে ॥
কোলে চাপা নয় বেড়ানোর ছলে
নালিশের কথা মরি
শুনে মনে রাখা, জানাতেই বুঝি
ঠোঁটে জমা ছুরু ছুরি ॥
শিখান' সে কথা ফল্গুর ধারা
ঢুল নামা ছু'টি আঁখি
প্রেমের জোয়ার ভাসাতেই যেন
হাসি হয় মাখা মাখি ॥
যুগে যুগে ঐ হাসি কুড়াইয়া
বিকান' কি দূর এত
অধরের পাড়ে রবে না ত' জানা
ছুকুল ভাসাবে সেত' ॥

ভক্ত আর ভগবানে ল'য়ে ভাগবৎ রচি লব

ফাগুনের এক স্নিগ্ধ সকাল
প্রভুর শিঙার সারা
ভোগ নিবেদন নিমিলিত প্রাণ
হরির চরণে হারা ॥
সহসা গোপাল বিমুখ বিরূপ
ভোগেতে পড়িল বাধা
ভক্তের হৃদে অর্গল যেন
খুলিতে খোলে না আধা ॥
বাহির দুয়ারে কে দাঁড়ায়ে আছে—
উপচার নিয়ে হাতে
তাড়া প'ড়ে যায় আনিবার তরে
দেবতা যে চেয়ে পথে ॥
ভক্ত জনেক ভোগ নিবেদনে
আকুলি দাঁড়ায়ে আছে
মানসিক তার পূর্ণ করিতে
দেরী করা নাহি সাজে ॥
হিসাবের গোলে লোকসান হ'তে
বাঁচাল' গোপাল তায়
তারি লাগি তার মানসিক ছিল
আজি তা পূর্ণ প্রায় ॥
পুরানো সে কথা বলিতে বলিতে
ভকতের হিয়া দ্রব
ভক্ত আর ভগবানে ল'য়ে
ভাগবত রচি লব ॥

মোদের গোপাল

সরাই বলে আমার ছেলের
দেশান্তরে রাজ্যি পাটে
আমরা বলি মোদের গোপাল
রাজা সে যে হৃদয়নাটে ।

ওরা বলে দৌলতে যে
ভরা আমার দুনিয়া খানা
আমারা বলি সোনা গোপাল
গোপালেরি প্রেম দুনিয়া মালিকানা ॥
প্রাসাদপুরী ওদের থাকুক
পালঙ্কেরি ঘুম
প্রহর জেগে মোদের থাকুক
হরি নামের ধূম ॥
বক্ষ চিরে আমরা ডাকি
নয়ন প্রসাদ লাগি
পশরা থাক সবার ঘরে
পূর্ণ হিয়ায় মাগি ॥
হরির প্রসাদ আমরা বাঁটি
মাধুকরীর দায়
কুবেরেরি ভাণ্ডারেতে
ওদের থাকুক সায় ॥
গ্যাগারিণের গৌরবেতে
আকাশ হেথায় ভুল
হরির দু'টি তুলসী পাতায়
মোদের জগৎ ভুল ॥

"আরো কিছু লাগলো"

বহু আর্তির বিনিময়ে গড়া
সাধ ছিল দেখিবার,
অশ্রুলি ফিরে ভক্ত পরাণি
গড়া ত' হয়নি হার।
ভাল যেন হয়—মিনতি জানায়
বার বার সেই কথা,
আরো যদি লাগে দিব্ব তাও সুখে
না হ'লে পাব যে ব্যথা

গৃহে ফিরে তবু ঝিকি মিকি মনে
বার বার তাই স্মরি,
থেকে থেকে যেন চমকিয়া ওঠে
গোপন মণি সে মরি।
নবরত্নের হার হ'য়ে এল
হেথা আশ্রম পুটে,
নবগ্রহের অঙ্গ লাবনী
হরির অঙ্গে লুটে।
কিছু বেশী হ'ল, কহিল সেবিকা
গোপাল সোনাই চাবে,
জানায়ে আসিবে পাওনা তারি ত'
জানাবে তাগিদ আগে।

... ...

এদিকে ভক্ত নিথর ধ্যানের দুয়ার সহসা খুলে
চেয়ে দেখে একি গোপালিয়া বুকে আভরণ এক দুলে।
ভোরের দেউল আলো ক'রে রাজে
নবরত্নের হার,
মৃদু মন্থরে কহিল দেবতা
সেজেছি দেখনা আর।
"লেগেছে কিন্তু আরো কিছু জেনো"—
চমকিয়া ওঠে প্রাণ,
এতকি ভাগ্য সত্যই তুমি
এসেছ কি ভগবান!
তারপর-হায় অবিশ্বাসের
চাওয়া চাই কিছু চিন্,
সত্যই এল সংবাদ পরে
তিল নহে তার ভিন্।
মনে পড়ে যায় গোস্বামী প্রভু
এমনি একটি ক্ষণে,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝেই দেখেন
মুকুট অন্বেষণে।

শ্যাম সুন্দর গৃহ অলিন্দে
মধুরে আসিয়া কন,
মুকুট একটি গড়ায়ে দিবে না
তুমি যে আপনজন।

** ** **

লালা যে নিত্য হরিও নিত্য—
আমরাই শুধু হারি,
অবিশ্বাসের বিষ জর্জর
বোঝা যে বিষম ভারি।

একটি মিষ্টি চুমা

অনেক বেলা হ'য়ে গেছে
সূর্য্যি মাথার প'র
ভোর হ'তে যে হয় না ওগো
সয় না যে আর তর।
কি যে খাবে গোপাল সোনা
মুখ ফুটে কে বলে
হায় রে ভাগ্য-জানতে গিয়ে
বেলাই পড়ে ঢ'লে॥
ঝুটা হ'লেও মিঠা সে ত'
শবরীর সে দান
কোথায় পাবে দরদীরে
বনবাসী রাম॥
চাঁদের সুধা সেঁচেই আনা
মনের যেথা সাথ
আকুল হ'য়ে ব'সেই থাকা
নয় কি অপরাধ॥

তোমার আঁখি নিদ্রাহারা
আমার অশ্রুলোর
ভক্তি ধনে কাঙ্গাল মোরা
তুমি ভক্তি চোর ॥
মিষ্টি সে ত' অনেক আছে
দোকানেও যায় কেনা
একটি মিষ্টি চুমা নিয়েই
মিটল' পাওনা দেনা ॥
তোমার লীলার নীল কাজলে
চোখ ভরাতে রাজী
রঙ্গনাথের রঙ্গনাটে
ব'সেই নিতি আছি ॥

হাত পাতা না আহা মরি

ডাহুক উদাস বেলা সে এক
দলমেলা একদিন
প্রজাপতির পাখায় নাচে খুশীর
রিমঝিম ॥
কে নাচাল এমন ক'রে, গোপাল মণির
রঙ্গ কেন অঙ্গে এত, বাজল যেন
বনের মঞ্জীর
খুশীর আঁচল ছড়িয়ে যেন নাচল স্বরধুনী
ব'সে ব'সেই কেন এমন বাঁধনহারা ছন্দ যায় বুনি ॥
চাইতে যে ক্রিম থির থাকে না
মাখাই সারা গায়
শীতল ভোগের এতই কি স্বাদ এতই মধু তায়।

হাত পাতা নয় আহা মরি পাতল হাতের ছাঁদে
অপটু এক প্রজাপতি শূন্য শুধুই সাধে।
মিঠানি মন বড়ই নাকি মিঠাই বড় আজ
হঠাৎ পাওয়ার ক্ষুদ সে যে গো
বিদুরেরই লাজ।

পূজোর জামা

পূজা আসা, আসাই ভাল, এলেই সব শেষ।
এমনি ক'রে সকল আশাই জাগায় উন্মেষ।
এবার পূজার জামা-কাপড় সবই হয় করা—
গোপাল মণির জামার লাগি কথায় কথা কাড়া।
ভক্ত বলে গোপাল সোনার জামা করাই চাই
অন্যে বলে ক'রবে তুমি ভাল হবে তাই।
কথায় শুধু ভেজে না যে শুকো চিঁড়ার বুক
শেষরফা হয় শয়নেতে, ভুলায় সে সব দুখ।
ঘুমের মাঝে একি গো কার আঙ্গুর গুছি চুল
হামা দিয়ে এলই যেন দুধ আলতার 'বুল'।
এসেই বলে জামা হবে, হবেও সব সারা
এমনি কোরে তৈরি কোরো, মুক্তো বোনা ধড়া।
ঝকমকে মোর জামা হবে, সবুজ রঙেই কোরো
টুলটুলে সব মুক্তো এনে তারি সাথে ভোরো।
চাঁপার কলি দুটি আঙ্গুল, দেখায় চেপে ধোরে
ঘুমের মাঝে মিলিয়ে গেল আলোর পরী ভোরে।
ঘুমের শেষে সব কটি যে জোগাড় হ'য়েই যায়
পূজার জামা হ'য়েই গেল লীলার কোথায় সায়?

দুনিয়াটারে ওলট পালট করাই তোমার হরি

মুঠি ত' নয় এক মুঠো যুঁই

মুঠেই আনন্দ,

সেদিন শীতের সন্ধ্যা বেলায়

লাগল কেন দ্বন্দ্ব।

ছুঁয়েই দেখি যাদুর সে হাত

বরফ যেন হিম,

হয়ত জামায় শীত ভাঙেনি

ক'রছে ঝিম্ ঝিম্।

অপরাধের পালা মোদের

মার্জনা নাই তার,

সেবকের যে ঝুঁকি কত

বলাই হয় ভার॥

ভাবছি মনে এমন তর

যেন না আর হয়,

দরদীরে জানতে গিয়ে

দরদ যেন রয়॥

ফিরেই দেখি একি ব্যাপার

সোনার বরণ মুঠে,

বসন্ত বন নিঙড়ে যে হাত

তপ্ত হ'য়েই ওঠে॥

দুনিয়াটারে ওলট পালট

করাই তোমার হরি,

আমরা বেশী বুদ্ধি নিয়ে

'ওলাট' হয়েই মরি॥

পূজার মানসিক

শরতের কাশ শুভ্র মেঘে
আগমনী আজো জাগে নাকি
বলাকার বিভ্রান্ত পাখায়
অলক্তের অরুণিমা মাখি।
দূর তালীবন শিরে
মেঘবন্ধে তবু যেন কাঁদে
কাজরীর কজ্জলিত আঁখি
সিক্ত পত্রে ঝ'রে যায়
শেফালীর ক্ষীণ শুভ্র রাখী।
ঊর্ধ্ব নেত্র চেয়ে রয় প্রাণ
হে গোপাল জাগ্রত মহান্
করুণার্দ্র আঁখিমেলে দেখ ক্ষণোদয়ে
উৎসবের লগ্ন যায় বয়ে'
ধারাসারে ডুবাইয়া ধরা
কি সান্ত্বনা হবে প্রাণে ভরা।
মিঠা রোদে নাচাইয়া প্রাণ
দাও আশা দাও বরদান
মিষ্টান্নের পূর্ণ থালা সাজাইয়া রাখি
প্রসন্ন নয়নে দাও বাঁধি
বোধনের বাঁশী সনে নীলার দিগন্ত বাঁধা-রাখী
সারদীয়া হ'য়ে যাক সারা।
পূজার মণ্ডপে মাঙ্গলিক
জীবনের রিক্ততায় দিক পূর্ণ ক'রে
অনাহত সঙ্গীত শাব্দিক।
মিঠা হাসি হাসে হরি-মিঠা রোদ ফাঁকে
মিষ্টান্নের পূর্ণ পাত্র শুভাগত নিশান্তের হাঁকে।

অঘটনে নিত্য নটণীয়া

আলসের বেলা এক হেমন্ত তুপুর
নিথর ঘনান একপুর—
ভোগারতি হ'য়ে গেছে, সারা সব কাজই
শয়নে গোপাল নহে রাজি।
প্রণতি চুম্বন আঁকি ভক্ত আনমনে
চমকিয়া চাহে একখনে।
ভরা চাঁদ নামেনিত' নয়ন নিথরে—
কি যে ব্যথা আঁখির বিথারে
পুষ্প-অন্ন দিতে বুঝি ত্রুটি কিছু তার
চপলের তাই আঁখি ভার।
বাহান্ন পর্বতে নয় তৃপ্ত যাব হিয়া
অঘটনে নিত্য নটনীয়া
সাজাইয়া থরে থরে ভোগের সম্ভার ...
দায় মিটা বিরাট ক্ষুধার।
ক্ষুদ্র তু'টি গ্রাস দিয়া বিতুর লজ্জায়
জুড়ি কর অক্ষম দ্বিধার।

মিলন মালা

যুঁই ঝরান বৃষ্টি সেদিন রথযাত্রার পালা
ভক্ত আর ভগবানের গাথা মিলন মেলা।
মনে পড়ে পুরীর রাজায় কৃপা করার ছলে।
রথের আগে মহাপ্রভু ভাবেই পড়েন ঢলে
মনে পড়ে গোপালের মা কৃপা সিদ্ধা গোপী
জলে থলে রথের কোলে গোপাল দেখেন সবি।
মনে পড়ে গুরু নানক—মন্দিরে নাই ঠাঁই—
বিশ্বনাথের আরতিতে ভ'রল ভুবনটাই।

এমনি দিনে মন্দিরেতে বৈকালিকের বেলা,
ভোগের থালায় শ্রীগোপালের বৈরাগ্যেরি পালা।
উপচারের অনেক কিছু পায়না মনে থই
রোচেনা যে ছেলের মনে লুকানো ফল বই।
ছুটোছুটি প'ড়ে যে যায় কেইবা দেয় দিশ
মানত ক'রে ভুলেছে কে, জাগায় প্রভুর রিশ
কেউ ছুটেছে ঘরের পানে ভুল হ'য়েছে ঘটে
কেউ ছুটেছে বাজার পথে যা বটে তাই বটে
মৌন মুখে তাকিয়ে শুধু নামটি দেন ব'লে
মনে তবু পড়েনা যে লীলার পাথার দোলে,
চমক ভাঙ্গা মনে তখন বিজ্‌লী উঠে জাগি
আসার ক্ষণে আমের ভোগে পাঁচটি টাকা রাখি
মা যে তারে অনেক ক'রে বলেই ছিল মরি—
রথের দিনে প্রভুর আগে দিও যেন ধরি।

... ...

মোদের চাওয়া অনেক কিছু, অনেক ভুলেই গড়া।
তাইত হরি দুয়ার ধ'রেই রও যে শুধু খাড়া

কি যেন কে চায় বারে বারে

রাঙা দুটি হাত জুড়ি দ্বারে দ্বারে হানো কর
এত কি ভুখারী তুমি হরি
ধরণীরে সোনা মুড়ে চুপে চুপে গদাধর
আপনি দাঁড়ালে চীর পরি॥
সেদিন উমার গৃহে মন বড় উচাটন
কি যেন কে চায় বারে বারে
চরণের চঞ্চলে নূপুরের সিঞ্জনে—
পাছে পাছে বুঝি কেবা ফেরে॥

মিলে নাক' কোনদিশা নিশার নিগড় ঢাকি
সোনার গোপাল চুপে চায়
নিরালা একেলা রাতে কেন বা রয়েছে জাগি
আঁখিতে কি যেন কি ভায় ॥
পরম অন্ন খাবে হায়রে কপাল মোর
তারি লাগি কেন এত ব্যথা
দিনমানে কেন এসে বলিতে পার না চোর
রাতের আঁধারে কেন সাধা ॥
ভোগ, সে ত দূর পথে পাঠান হবে না মরি
'তার' পথে কথা হ'ল ধরা—
'গোপালের মুখে দিবে অন্ন পরম ধরি
ভেবোনা যেন এ মন গড়া ॥'
তবু ভুল হ'য়ে যায় ভুখারীর বেশে হরি
স্বপ্নের জাল পুন মেলে
দাঁড়াল যে হাসি হাসি দুটি বাহু মেলে ধরি
'পায়েস দিতে যে ভুলে গেলে' ॥
সংবাদ নিল ঠিক, হয়নি যে ভোগ ধরা
তাড়া পড়ে যায় তাই হেথা
লুচি আর পায়েসের থালি তাই হ'ল ভরা
দুখে আর সুখে বয় সোঁতা ॥

হাতছানি দেয় কত

এমনি সেদিন ছিল নাকি মেঘের কমল কুঁড়ি
কেয়ার বুক কণ্টকিয়া সুবাস যেত চুরী
এমনি সেদিন চাঁপার বনে মৌ-মিনতি আঁকি
চঞ্চরিয়া এসেছিলে বুকের সোহাগ ঢাকি।
মেঘের মালার বলাকারী কাশের গুচ্ছ গেঁথে
সেদিনও কি মানিক বনে গিয়েছিলে সেধে,

সেদিনও কি টাপুর টুপুর মেঘের জলে তিতে
মেঠল সুখে বেঁধেছিলে মনের পরভৃতে
সঙ্গী ছিল তেমন কে আর রাখাল চাষী ভাই
যুগে যুগে এদের সাথে ঝাপাই ঝোড়া চাই।
আমের বনের ছিল না কি খুঁজে খুঁজে নারি
যে পেয়েছে তারি জয়ে মনের কাড়াকাড়ি।
মাটির মিঠেল চুমা বুঝি সারা পায়ে আঁকা
চন্দ্রামণির চাঁদ থাকে কি মেঘে জল ঢাকা,
দস্যি ছেলের মন ছিল কি গাছ কোমরে বাঁধা
দাপাদাপির তলে ছিল প্রেমের আসন পাতা।
ভিজে হাওয়ায় দুলেছিলো যেনো ভিজে জুঁই
সাজের বালাই বাড়ন্ত যার সাজান সে ভুঁই।
আধখানি ফল হাতেই থাকে মুখে আধোবাণী
সীতার দুখের কথা বুঝি ঝ'রত হৃদয় ছানি।
অঙ্কে হরির ধাঁধাই লাগে কলঙ্ক তা নয়
সবার বড় বেহিসাবীর হিসাব কোথা রয়,
কোন পড়শীর মুছাতে জল কোথায় গেছ ঝাঁপি
কার ধূনী যে নিভে আসে দিয়েছ কাঠ চাপি।
মহাকালের মন্দিরে নয়, যুগীদেরি শিব
তার চাতালে শিব গড়া নয় মানুষ গড়াই ঠিক,
কার ঘরেতে লুকানো রয় নাড়ু মোয়া পুলি
চোরা চোখে চলেছ তাই দোলাই গেছে খুলি।
দুষ্টু ডাগর কালো চোখের গভীর অতল কথা
লুটে নিতেই লুটিয়ে পড়ে বুকের গহিন ব্যথা,
ধনী মায়ের ভাঙ্গা বুকের সজল কথাগুলি
কাঁটার মত ছিল গাঁথা নিলেই বুঝি তুলি।
মঞ্চ দেবের সেদিন ছিল মঞ্চখানি মাঠে
আজ দেখি নাচ নটরাজের বিশ্বজোড়া নাটে।
আষাঢ় দিনে মনে পড়ে চড়ক তলার বাঁশী
মনে পড়ে কান্ত করুণ অনেক দিনের হাসি।

ঝরেই গেছে সবি নাকি মহাকালের বুকে
মন বলে না হয় নাত' তা জেগেই আছে চুপে,
মানিক বনের তোরণ তলে সাঁঝ বলাকার মত
ঘন মেঘের বাতায়নে হাতছানি দেয় কত।

এরি তরে ব্যাথা যত

আহুতির শিখা সম্ভূতি বুকে
হারায়ে রাখে কি দাগ
কজ্জল অনুরাগ।
মুক্তি মাগিছে তূণের যে শর
সে কি শুনে পিছু ডাক
থাক থাক ওরে থাক।
উৎসব সূচি শেষ হ'য়ে গেছে
জের টানা তবু চলে
চক্র গতির ছলে।
যাত্রীর দল কলরবে রয়
ভাঙ্গা কি চটীরে চলে
নাম রসে রয় গ'লে।
দেউল এদিকে কলরব হীন
ভোগেতে বিরত হরি
নাহি জানি কেন মরি
সহসা পুকারে রাওল প্রধান
প্রভুর আদেশ ধরি
অভিমানী জনে স্মরি।

তারি কাছে কিছু মাগি লবে নাকি
না চাহিলে দেবে না ত'
ফিরে এল হেন কত।
ভক্তের হিয়া অশ্রু মথিয়া
বলে ঠিক কথা সে ত'
এরি তরে ব্যথা যত।

বিশ্বজোড়া চোখ মেলেছো

বিশ্বজোড়া চোখ মেলেছো
ফাঁকি দেওয়া হয় কি—
লুকাতে কি সকল কথাই
চোখের কোণে রয় কি।
ভক্ত গৃহের একটি কথা
বাদাম দেওয়া মিষ্টি
সাঁঝের পথে আনলো সেদিন
পড়লে ভোগে তুষ্টি।
পাঠিয়ে দিতে আদেশ হ'ল
পরের দিনে চাই ত'
রাত হ'য়েছে আজকে গোপাল
ভোগের বেলা নাই ত'।
ভুলেই গেছে অনেক কাজে
মনের অনেক আঁধা
দেবতার ত' ভুল হবে না
'এক পায়ে সাত সাধা॥'
বৈকালীতে মিটেনা সাধ
আরো কিছু চাই যে
কাশীপুরেই আটকে বাঁধা
লোক পাঠানো তাই তে।

সেথায় লাগে গোল আরো যে
ভোগের রকম ফের
বাদাম দেওয়া মিষ্টি ত' নয়
রয় যে চাওয়ার জের।
শিশুর ভোগে হঠাৎ চাওয়া
মিলেই বাইরে এসে
মনের মত মিষ্টি দিয়ে
মিটালো যে আশ শেষে।
চেয়েই দেখি উতল চোখে
কৌতুহলীর দৃষ্টি—
অনেক দিনের কথা ত' নয়
মিছে কি হয় মিষ্টি।

চার যুগের চোর

অপবাদ ত' হয় না হরি চোর তোমারে বলা
চার যুগেরি দাগ রয়েছে মিছেই ছলাকলা।
রাজার ঘরেও চুরি তোমার রূপ সনাতন..রঘু
সাজা তোমায় কে আর দেবে মুখটি মিষ্টি মধু।
হাতে নাতেই পড়লে ধরা এই ত' সেদিন জানি
যার যা স্বভাব যায় কি ছাড়া গীতারই ত' বাণী।
লুকিয়ে রাখা আচার কিছু, মুড়ির তলে মিঠা
খুঁজেই ফেরা আছে তোমার বলাই আমার বৃথা।
ঝুটাকাঁটা, দই কি ভাজা, বিচার বালাই নাই
চন্দ্র মুখের হাসি দিয়ে ঢাকা যে তাও চাই।
সবই চুরি করতে পার একটি যে রয় বাকী
একটু প্রীতি বুকের তলে দেখতে পেলে নাকি।

দীনের ঠাকুর

আষাঢ়েতে ছাওয়া সে এক দিব্য দিন
ছায়ার বুকেতে আলোকের পদচিহ্ণ।
শেষ মুকুলিত ঘন পল্লব মাঝে
কেমনে না জানি একটি রসাল আছে।
দীন যে বালক চুপে চুপে আনি কয়
বুকের বেদন শুধু কি বুকেই রয়?
আঁখির দুকূলে অধরা কি দেয় ধরা
নূপুর ছন্দ শ্রবণেতে মনোহরা—
নহে মহার্ঘ্য মণি কাঞ্চন ধন
সামান্য সাধ সামান্য আকিঞ্চন।
যদি ধ'রে দি চরণেতে একমনা
ধ'রে কি লবেন একরতি এককণা।
রাজা মহারাজা পায় না যাহার দিশা
দিন নিবেদন ব্যর্থ বেদন মিশা।
বিজ্ঞজনের আশ্বাসে দিল তুলি
নিবেদনে কেহ ধরে দিতে গেল ভুলি;
উপচার মাঝে পূজা হ'য়ে যায় সারা
তবু নারায়ণ বারেক না দেন সাড়া।
অকুল আকুল চিন্তার রেখা মাখি
ভক্ত ভাবেন আর কিবা আছে বাকী?
অসীমের তৃষা মিটান কঠিন ভারি
কোন অমৃত রাখিয়াছে কেহ কাড়ি।
সহসা যে ফল মিলেছে একটি ধারে
দীন বালকের রসাল র'য়েছে প'ড়ে—
দীনের আর্ত্তি গ্রহণ ক'রেছো কিশোর জগন্নাথ
একটি ফলের আর্ত্তিতে তাই বাড়ালে-কমল হাত

ক্ষুধিত দেবতা

শরতের শুভ পুণ্য তিথির রম্য একটি দিন
মেঘ আঁকা নীল আকাশের গায়ে র'য়েছে ব্যথার চিন্ ।।
পূজার পূজ্য শিশু নারায়ণ লাগি
নিবেদন নত পূজা আয়োজনে পূজারিণী রহে জাগি ।।
শত আকুতিতে নত নিবেদন মাঝে
কি যেন বা কোন ব্যথা একখানি কাঁটার মতন বাজে ।।
নিবেদনে যেন দেবতা নহেন তৃপ্ত
উপচার থালি শত উপহারে প'ড়ে রহে যেন রিক্ত ।।
ছুটাছুটি পড়ে কেন হেন পরমাদ
কোন্ অপরাধে দেবতা বিরূপ নাই হয় পরসাদ ।।
চিন্তা ঘনায় ললাট কুটিল ক'রি
দেবতার কৃপা লভিতে বা দেব কোন উপচার ধরি ।।
উধাও নয়নে সহসা দিয়াছে ধরা
বহুদূর হ'তে সমাগত এক তাপসীর থালি ভরা ।।
জপময় হ'য়ে গড়া সে সুধার দান
তার লাগি বুঝি শিশু নারায়ণ করেছেন আনচান্
গোপন প্রাণের সেই ত' সকল জানে ।
যাহার্ লাগিয়া ধরণীর থালি ভরা যে সকলখানে ।
তাঁহারি সৃজনে তাঁহারি লালসা দেখি
ভক্তের হিয়া নয়নের জলে পদচিন্ যায় লেখি ।।

সফল স্বপ্ন

ঝুলনের শুভলগ্ন এসেছে
হেসেছে পূর্ণ চাঁদিনী
ভক্ত প্রাণের গোপন্ কোণায়
বাজিছে প্রেমের রাগিনী

শয়ন নিথর নয়নের পাতে
সেদিনের শুভক্ষণে
নারায়ণ ও নরে লীলা যে উছলে
পূজা আর আয়োজনে।
ভক্ত জননী স্বপনেতে যেন
উপচার হয় হারা
ভোগের থালাটি পূর্ণ করিতে
ঘরে ঘরে নাই সাড়া।
চকিতে দেখে কি সরণি বাহিয়া
ছুটে আসে প্রিয় জনা
হস্তে তাহার পূজার বেসাতি
ধরে দেয় এক মনা।
সুখের রজনী স্মৃতির বুকেতে
ভেঙ্গে যায় ঘুমঘোর
চেয়ে দেখে রাত ফুরায়ে গিয়েছে
রজনী হ'য়েছে ভোর,
সন্ধানী দিঠি মেলিয়া সেদিন
দেখিল সত্য বটে
শিশু নারায়ণ সেবার লাগিয়া
ভোগ কিছু নাহি ঘটে।
মনে পড়ে যায় স্বপ্নের কথা
মুছেও যায় না মোছা
লীলার বারতা মিথ্যা ত' নয়
সত্য হ'তেও সাঁচা।
জানাইল সবে লীলার বারতা
নিরারণ করে সবে
আপনার ভোগ আপনি না এলে
লীলা যে মিথ্যা হবে।
'রাখালের' ক্ষুধা মিটাতে 'ঠাকুর'
ডেকেছ' গঙ্গা কূলে

ভক্তের ব্যথা পুরাতে কি তাই
ডাকিলে দেউটি খুলে।
'করমা'র দেওয়া সুধার লাগিয়া
উপবাসী যুগে যুগে
বিরাট এ ক্ষুধা কেমনে মিটিবে
দীন ক্ষুদ্র বুকে।
ওদিকে একি এ একই স্বপ্ন
দেখিছে সেই সে নারী
শিশু নারায়ণ হাসি হাসি মুখে
কি যেন চাহিছে মরি।
জেগে উঠে ভাবে এ কি এ স্বপ্ন
কতদিন আশা করি
ডেকেও পাইনি চাওনিত' কিছু
এতদিনে এলে হরি।
ছুটে আসে যেথা নারায়ণ ব'সে
নয়নে মাধুরী রচি
ভুখারী সে যে গো যুগে যুগে মরি
প্রেমের সায়র সেঁচি।

কৃপা

শেষ-বর্ষণ হ'য়েছে সেদিন
শ্রাবণের শেষ খেলা
নিঝুম আঁধার ঘনিয়ে এসেছে
বৈকালিকের বেলা।
যথা উপচারে সাজানো হ'য়েছে
দেবতার পূজা থালি
ব্যথাভরা আর আরাধনা নত
পূজার প্রদীপ জ্বালি।

তবু নারায়ণ নিবেদন মাঝে
তৃপ্ত নহে কি জানি
গৃহ সজ্জিত সব উপচারে
সাজান হ'য়েছে মানি।
বিপনী সেদিন বন্ধ র'য়েছে
নাহি আর কোন আশা
পূজার পূজ্য শিশু নারায়ণ
নয়নে কি যেন ভাষা।
দেখি কচি হাত পাতিয়া র'য়েছে
মরি মরি কিবা লাগি
হায় অভাগ্য কিবা দিব আনি
যার তরে অনুরাগী।
ফিরে ফিরে চায় সামান্য সে ফল
মরি মরি একি খেলা
অসময়ে হায় পসার বন্ধ—
ব'য়ে যায় পূজা বেলা।

-জানি কেমনে এসে গেছে হায়
দেবতার উপাচার—
সামান্য সে ধন পরম রতনে
কৃপা কণা শুধু সার—

লীলা যে নিত্য

তোমার লীলার বিরাম ত' নাই
লীলা যে নিত্য তোমারি কথা
মোদের প্রদীপ শুখায়ে গিয়াছে
বুকের কোণেতে নাই সে ব্যথা।
ধরণীর ধূলা থেকে থেকে তবু
উজল হয় যে কৃপায় তোমার
জীবন মোদের অমৃত হয়
সোনা হ'য়ে যায় হৃদয় লোহার।

ভক্তের দেওয়া মিঠাই এসেছে
সেদিন রম্য দুপুর বেলায়
যতনেতে গড়া ভকতি মাখান
রেখে দেয় কেহ হয়ত' হেলায়।
হোম শেষে বেলা বৈকালিক ক্ষণে
ভুলে যাওয়া এই প্রমাদ ল'য়ে
লীলার সায়রে জোয়ার উছলে
পূজায় বেলাটি যায় যে ব'য়ে।
সবে খুঁজে ফিরে কিবা আছে কোথা
দেবতা ভুখারী র'ন যে বসি
বন্ধ দুয়ার দেন যে খুলিয়া
আঁখির আঁধার যায় যে খ'সি।
ঠিক বটে ঠিক মনে পড়ে যায়
আছে আছে বটে প্রসাদ মধু
দেবতা নিয়েছে আপনি সে সুধা
ভুলেও সে ভুল হয় না কভু।
ধরে দেয় সবে অপরাধ মানি
শিশু নারায়ণ নিয়েছে মাগি
দেবতার লীলা আজিও অচল
অন্ধ আঁখি যে রয় না জাগি।
সুদামার চিঁড়া যতনে খেয়েছ'
নিয়েছো যে যেচে 'তলার পিঠা।'
দরদীর দেওয়া সামান্য ধন
দীন দয়াময়ে লাগে যে মিঠা।

মরুর তৃষ্ণা

হরির করুণা বড় কিবা বড় তপের কঠোর ধারা
দ্বিধা উঠে বুকে জাগি
শুষ্ক মরুর ধূ ধূ বালুচর হয় বুঝি দিশাহারা
করুণার কণা মাগি॥

ভক্তের বুকে আর্ত্তি কুড়াতে সেদিন গোধূলি ক্ষণে
শিশু নারায়ণ হরি
চেয়ে নিল কিছু পুণ্য প্রসাদ পরমানন্দ মনে
লীলা কিবা মরি মরি ॥

হরির প্রসাদে প্রসন্ন যবে সুধা কণা লয় মাগি
চরণ শরণ করি
হায় অভাগ্য বিরূপ হিয়ায় অভিমান উঠে জাগি
প্রসাদ রহিল পড়ি ॥
স্বপনের মাঝে গোপন সে ধন করে বুঝি আনাগোনা
ভকতে ধরিতে বুকে
শিশুনারায়ণ পরম যতনে সেই সে প্রসাদ কণা
আদরেতে ধরে মুখে ॥
শিহরিয়া উঠে ভকতের হিয়া অপরাধী মরু প্রাণ
নারায়ণে জুড়ে পাণি
ভোরে আঁখি মেলি কেবলি জেগেছে প্রসাদের বরদান
বুকে যায় শেল হানি ॥
সহসা এসেছে প্রসাদ পসরা—দেবতা ভিখারী দ্বারে
তড়িতে খুলিয়া দেখে
সেই সে প্রসাদ, ভক্তের ভুল বুঝি বা ভুলিতে নারে
জাগরণে তাই জাগে ॥
উছলিত চোখে মাগি নিল তার করুণার এক কণা
বাড়াতে ভক্ত মান
প্রসাস যাচিয়া মাগিয়া ফিরিছে দুয়ারেতে জনা জনা
বদ্ধ যে হিয়া খান ॥
'এপ্রিলের' এই প্রথম প্রভাতে 'এপ্রিল ফুল' ক'রি
ভক্তেরে নিলে বুকে
প্রসাদ করুণা·চিরদিন শিরে নিতে যেন পারি ধ'রি
সুধা করি সুখে দুখে ॥

ভুখারী দেবতা

প্রদোষের আঁধার ঘনায়,
শঙ্খঘণ্টা রোলে ধরণীর
বক্ষে নামে মাহেন্দ্র লগন
জীবনের দীর্ণ তীরে
নেমে আসে প্রসাদ প্রসন্ন
মহা-গম্ভীর আহ্বান—
হে অন্তর দেবতা
হে শিশুসুন্দর—একি ছল তব
—এত উপচারে এত
আকিঞ্চনে পূর্ণ নহে প্রাণ—
দীনতম বুকে আর
কিবা আছে আর কোন
উপচারে পূর্ণ হবে সাধ।
মন্দিরের নিঝুমে নিশ্চুপে
গাঢ় হ'য়ে আসে স্পন্দিত
শঙ্কিত অন্ধকার ছুটে যায় ত্রস্ত
পূজারিণী—ছুটে তার প্রাণ
আরো কোন অর্ঘ্যে পূর্ণ
হবে প্রাণ—তৃপ্ত হবে
শিশুভগবান—।
সহসা ফিরিয়া আসে
হস্তে পূর্ণ থালি—ঠিক বটে
ঠিক উপচারে উপহারে
ছিল কিছু ত্রুটি
হয়নি তা দেওয়া
রিক্ত করি প্রাণ, পূর্ণ উপচারে
সাজানত' হয় নাই
দেবতার দান॥

তাই কি অতৃপ্ত হিয়াখানি
হে গোপাল হে গদাধর ভগবান—
লহ তবে পূর্ণ করি রিক্ত
এই দান, লহ তবে শেষ করি জীবনের দান
ভ'রে যেন দিতে পারি দান
নিঃশেষে নিঙারিয়া হয়
যেন পূর্ণ মনস্কাম—
মোর দীন জীবনের কোন ব্যথা
কোন কথা কোন কিছু
বাকী যেন নাহি থাকে দিতে
ভ'রি পূজার সম্পূটে
হে প্রিয়—হে হরি স্নেহাতুর
শিশু ভগবান—
ধীরে নেমে আসে
সুরধুনী ম্লান বুকে, ধীরে কদমকীর্ণ পথে
ঝিল্লী ধরে মুখরিত গীতি,
ধীর যূথি যাতি—
মালঞ্চের বুকে ফুটে হাসি
শিহরিত মাধবীর বুকে—
জাগে দিনান্তের আরত্রিক গান।
হে শিশু সুন্দর
পূর্ণ হোক তব তৃষা
পূর্ণ হোক তব মনস্কাম
হে চির ভুখারী—
রুদ্ধ দুয়ারের হে চির বঞ্চিত
হে চির লাঞ্ছিত—
মোর জীবনের তুমি রথ—তুমি রথী
তুমি নাথ—জীবনের গান।

ভুখারী দেবতা

চন্দ্রবয়ানে পাটীর পুলীটি দিতে জাগে মনে আশা
কানে কানে দেওয়া প্রাণে প্রাণে দেওয়া ফুটিতে ফুটে না ভাষা।
স্মরণীয় কোন অতীতের ক্ষণে পুণ্য-প্রসাদ পেয়ে
পূজারিণী প্রাণে আধো মোছা রয় স্মৃতির স্বরভি বেয়ে।
ভক্তের ব্যথা মুক্তির মত কেমনে গড়িল মণি
স্বাতির একটু করুণা কণায় গড়ে যে হিয়ার খনি।
চুপে চুপে তাই আয়োজন করি ভক্ত আর এক নারী
হরির চরণ স্মরণ করিতে তন্দ্রা জড়াল' মরি।
ধীরে ব'য়ে যায় পূজার লগন, সুরধুনী কূল ছাপি
ম্লান হ'য়ে আসে প্রদোষের বেলা দীঘল ছায়াটি কাঁপি।
একি মায়া নাকি দেবতার লীলা ছায়া রচা লুকোচুরি
চোখ বেঁধে বুঝি টুকু দিয়ে যাওয়া ছোঁওয়া ছল মরিমরি।
নিদালীর বুকে চুপে চুপে জাগে মরিমরি একি রূপ
শিশু সুন্দর জেগেছে কি ধরি রসঘন রসকূপ।
'পুরীর' বুকেতে জাগায়ে যে তৃষা চোর হ'লে গোপীনাথ
মাখন চুরীর ছল ক'রে প্রভু বাঁধনে বাড়াও হাত।
চকিত চমকে জেগে ওঠে শুনি প্রেমের অমৃত বাণী
ওঠ ওরে ওঠ বেলা যে গো যায় পরসাদ দাও আনি
দুরু দুরু বুকে ছুটে চ'লে যায় বুকের আর্ত্তি নিয়া
যেথা নারায়ণ ভুখারীর বেশে বসে পথ নেহারিয়া।
যুগে যুগে এই লীলার পাথারে গলায়েছ' প্রভু প্রাণ
তব খেলা যেন না ফুরায় কভু যুগে যুগে দেহ দান।

ঝুটা

দুর্ল্লভ লোভ তোমার হরি
সবার বাড়া কি নয়!
কার কোন কোণে লুকানো কি আছে
দিঠির প্রদীপে রয়।
গোপ-বনিতার ননী মাখনের
হাঁড়িতে বাড়াও হাত

পূজানত আঁখি নিবেদন রত
বামুনের হয়ো পাত
কোথা নাড়ু আছে গোপালের মা'য়
ক্ষেতি কোথা রাখে মিঠা
দীন রাঁধুনীর, বলরাম গৃহে
তলায় রাখা সে পিঠা।
করমার ঝুটা মিঠা লাগে এত
বাহান্ন পদ ত্যজি
রঘুনাথ রয় সিংহ দুয়ারে
তারো ঝুটা লও যাচি।
বিদুরের ক্ষুদ সুদামার চিঁড়া
খুঁজে ফেরা দিন রাতি
সব লোভ বুঝি জড় ক'রে বুকে
করিছ পূর্ণ ক্ষতি।
—ভোর হ'তে খাওয়া সাধ নাহি মিটে
গড়াইয়া যায় বেলা,
ভোগ তো সেদিন হয়না যে সায়
পূজারীর বুকে জ্বালা।
হেথা ভক্তেরা সাজাইয়া রাখে
উপচার ভরা থালি
মধ্য প্রহরে পাঠাইতে সাধ
হেথা ব'সে বনমালী।
সহসা পুকারে কেহ যেন ওগো
ঠিক ঠিক মরি মরি
উপচার হেথা সাজান যে আছে
আন গিয়া ত্বরা করি
ছুটে আনে কেহ প্রসাদ পশরা
মিটিল হরির ক্ষুধা
যুগে যুগে জানি হে গোপাল চাহ
ভক্তের দেওয়া সুধা।।

ল'য়েছ যে ধরি

ছুনিয়ার রাজা হ'য়ে ল'য়েছ যে ধরি
সুদামার চিঁড়ামুঠি, প'ড়ে রয় রাজভোগ স্বর্ণ থালা ভরি।
আর্ত্তি তার তবু হরি পারনি হ'রিতে
রাজ বেশে, তাই বুঝি দীন হ'য়ে এসেছ ত্বরিতে
বুকে টেনে নিতে সব দীনের আকুতি,
'ক্ষেতি' 'ধনী' পেয়েছে যে তব কৃপা—সেবার সুকৃতি।
আজো সেই লীলা হরি—নব রূপায়ণে
জেগে আছে ; লীলা নিত্য—নিত্য নারায়ণে।
গাছের সঁপুরে ফল বেশী সেত' নয়
ক্ষুদ্র তাও একটি যে, ধ'রে দিতে আঁখি সিক্ত হয়।
দীনের ঠাকুর তুমি, তাই লও চেয়ে,
ক্ষীর নাড়ু পড়ে থাকে, মিঠা লাগে সেইটুকু পেয়ে।
মোহের অঞ্জন হরি জানিনা মুছিতে
জানিনা ত' ক্ষুদ কুঁড়া বিত্তরের প্রীতিতে ভরিতে।
প্রসাদ পশরা তাই যাও অবহেলি
তোমার পরশ লভি হয় না যে "অমৃতের কেলি।"

ব্রজমধু শুধু দ্বাপরে ত' নয়

কত আদরেতে বেজেছে বাঁশরী
কত আদরের সাড়া
গৃহকোণে কত আকুল অশ্রু
বুকের কাঁদন কাড়া।
বুক চিরে কত রুধিরের ধারা
কত না যামিনী ভোর
নিঙারিয়া আশা কত দিন যাপি
মিলে রে প্রেমের ডোর,

কি যেন হ'য়েছে হায় রে ভাগ্য,
ভোগেতে অরুচি হেন
কত সাধ সাধি ধ্যান তন্ময়ে,
প্রসাদ হয় না কেন ?
কি যেন কি হয়, শিশু নারায়ণ
দিন দিন একি খেলা
প্রসন্নতা নাই কমল বদনে
কজ্জল আঁখি মেলা।
সহসা সেদিন হদিশ মিলেছে
গমের একটি থলি
লুকানো ছিল যে তাহারি ভিতরে
মিষ্টি আচার গুলি।
বহুদূর হ'তে ভক্তের হিয়া
আমের আচার করি
পাঠাইতে মন কেহ নাহি আনে
পাঠালো লুকায়ে মরি।
লুকাইয়ে খাওয়া যুগে যুগে তব
জেনেও নাহি যে জানি
অন্তর্য্যামী! তুমি জান সব
ব্যাকুল হিয়ার বাণী।
তাই এতদিন আকুলিয়া হায়
চেয়েছো আচার সুধা
ব্রজমধু শুধু দ্বাপরে ত' নয়
আজো তাও হরে ক্ষুধা।

লীলা যে নিত্য হয়

ভক্ত জনেক চুপে চুপে ভাবে মনে
অঘটন যদি ঘটাও গোপাল'শুভদিনে শুভক্ষণে
তবে মানি বিস্ময়—

যদি কোন দিন কোন এক জনা
ভোগের পশরা বহি আনমনা
গাহে গো তোমারি জয়।
দিনে দিন যায়, পথ চেয়ে মরে
কাঁটার মতই বুকের পাঁজরে
সে কথা জাগিয়া রয়।
সহসা সেদিন কন্যা সে একজনা
সম্পুটে বহি ধরে দিল চিনি, ছানা
ধীরে ধীরে সবে কয়।
মাধাই তলায় জননী গিয়াছে চলি
সেথায় গোপাল কৃপার পাথারে ছলি
দিয়েছেন বরাভয়।
ললিত হাসিতে স্বপনের দ্বারে আসি
চেয়েছেন খেতে আপনি যে ভালবাসি
ক্ষুদ কুঁড়া সঞ্চয়।
তাহারি আদেশে বহিয়া এনেছি আজি
শিশু নারায়ণ হন যদি এবে রাজি
জীবন ধন্য হয়।
মনে পড়ে যায় ঠিক বটে নহে ভিন
সেই সে ভক্ত বলেছিল একদিন
চাহিতে ব্যথা কি হয়?
দূরের আকুতি এক সুরে যেন বাজি
গোপন ঠাকুরে করিয়াছে বুঝি রাজি
লীলা যে নিত্য হয়।

ঠাণ্ডা ক'রে সরবতটি হয়নি দেওয়া কেন

কোথা থেকে কত আনো
যোগক্ষেম যতই
আমরা শুধু চেয়েই মরি
ক্ষ্যাপা চাওয়া কতই ॥
ঘটে ঘটে মরুর পিয়াস
সেও তো তোমার মরি
সাক্ষী হওয়া তোমার না তো
আমরাই হে হরি ॥
মিঠা আমের সরবতে আজ
ভরে না যে মন
মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যেন
কতই আনজন ॥
বরফজমা বাক্সটী যে
তুমিই দিলে আনি
নাই তো মনে সেই কথাটি
অভাগিয়াই আমি ॥
অফুট দুটি কথার কলি
বাজলো কানে যেন
সরবৎটি ঠাণ্ডা ক'রে
হয়নি দেওয়া কেন ॥
তোমার সাধেই বাদ সেধেছি
এমনি ভুলো মন
তাইতো বলি তোমার কৃপা
শুধুই অকারণ ॥
অকারণের সৃষ্টি তোমার
তাতেই বুঝি আসা
কলের পুতুল তোমার হাতেই
কলের কাঁদা হাসা।

বৈশাখী রাত এক

বৈশাখী রাত এক থমথমে তনুমন
স্বপ্নের মন্দিরে ভক্ত যে উন্মন।
দয়াময়ী ভবানীর আঁখি দুটি চঞ্চল
কি যেন বলিবারে মৌনের শুধু ছল ॥
সহসার প্রকাশেতে প্রসাদের পাত্র
নাহি ভোগ নাহি কিছু পড়ে আছে মাত্র ॥
নিঙাড়িয়া ওঠে বুক কিবা এর অর্থ
কোথা কোন দেবারামে পূজা হয় ব্যর্থ ॥
চিন্তায় কাটে রাত প্রভাতের পর্য্যায়
ছুটে যায় আলু থালু দেবতার চর্চায় ॥
মিলে যায় সহসা যে রাতে দেখা মন্দির
সন্মুখে পুরোহিত সেও যেন নহে থির ॥
শুধাইতে বলে সেও আঁখি জলে অন্ধ
দেবতার ভোগ আজি হ'তে যায় বন্ধ ॥
দোকানেতে দেনা বহু ঘরে নাই কারবার
উপবাসে যাবে দেবী কেবা করে উদ্ধার ॥
সাথে সব অর্থ উজাড়িয়া থালিতেই
আঁখি জলে ভক্ত নমে মা'য় চলিতেই ॥
মানুষের চাপা কথা স্বপ্ন যে মন্ত্রে
এই কথা লিখা রয় ওদেশের গ্রন্থে।
ছটাকের বুদ্ধিতে সব কিছু ধরা দায়—
বিশ্বের আদিভূতা সীমা তার অসীমায় ॥

সাথে সাথে থাকা তব সে যে মণিমহনীয়া

কি জানি কি বন্ধন
জন্মান্তর সৌহৃদে
কি জনি কেন এ টান
দীন এ সম্পদে ॥

পরশ পাথর খোঁজে
ক্ষ্যাপা এ মনই জানি
পরশমণির টান
কেমন তা নাহি জানি ॥

প্রসাদ পসরা ফেলি
কেন চাও দ্বার পথে
ভক্তের কোন ব্যথা
জেগে আছে মনোরথে ॥

চাঁপার একটি কলি
নিঙাড়ি গুলের বাগ
আঙ্গুলে দেখাইয়ে দাও
কি কব তব অনুরাগ ॥

ক্ষুধাতুর মাধবেন্দ্রে
ঘটি ব'য়ে আনো দুধ
সুধা ক'রে তোলো দেখি
বিদুরের সব ক্ষুদ ॥

আপনি যাচিয়া প্রেম
প্রেমময় কর হিয়া
সাথে সাথে থাকা তব
সে যে মণি মহনীয়া ॥

খেলার হাতী

মেলায় তোমার চাই তো যাওয়া
মেলা সে তো তোমারই
খেলনা সেথায় অনেক কিছু
বেছেই নেবে হে হরি।
বেছেই নেওয়া হল'ই তবে
পড়েই থাকে মেলাতে
হয়না আনা মেলার জিনিষ
হায়গো কোন হেলাতে।
রাত হ'য়েছে ভোগের বেলা
হটাৎ অঘটন
ভোগের থালা পড়েই থাকে
গোপাল আনমন
জাগল' তখন খেলার হাতী
হয়নি কেন আনা
তাই নিয়ে যে সোনা ছেলের
ভ'রবে ভোগের কানা
এই ধরণীর খেলা ঘরে
ছোট বড় খেলায়
খেলছ তুমি ধন্য ক'রে
মোদের ধুলার মেলায়॥

যন্ত্রী

যন্ত্রী তুমি যন্ত্র তোমার
ভালই লাগে এতই হে
বুঝতে নারি তাইত' এমন
ভুলেই মরি কতই যে।

খেলার গাড়ী তাতেই চড়
গার্ড সাহেবের মতই গো
স্পুটনিকে চড়েই ঘোরো
লোকে লোকে কতই তো।
এতটুকু হাত যে হরি
ঘড়ি পরা তাও চাই
সরিয়ে নেওয়া অপরাধই
আমরা কি তা' বুঝি ছাই।
রেসিং গাড়ী চড়বে ব'লে
মোটর সেও গেরাজে
লীলায় থেকো এই মিনতি
উশ্রী ঝরুক ধরাতে।

———

ব্যথাহারী

কত কৃপা তোর পেয়েছি জননী
জানায় ভক্ত মেয়ে
শত সুখ বাধা স'য়েছি যে আজো
তোর মুখ পানে চেয়ে।
এইত' সেদিন তোর দেওয়া দুখ
নিয়েছি নয়ন পেতে
এত দহি কেন দিস্ মা জননী
লীলার আনন্দে মেতে।
বিষব্রণ দিলে অন্তর মাঝে
যাব বা কাহারি কাছে
তুই মা আমার আপনার জন
ব্যথাহারী তুই মা' যে।
সবে বলে চল ভিষকের কাছে
না হ'লে হবে যে কষ্ট
শেষে দুখ পাবে তাও বলে রাখি
বুঝে রাখা ভারী পষ্ট।

আনজন কাছে নাহি চাহি যেতে
নিদান জান যে তুমি
জুড়াইতে ব্যথা তোমা ছাড়া মাগো
কেবা আছে কত গুণী।
কি যে হ'ল রাতে অস্ত্র ক'রেছে
নিদালিতে করি মগ্ন।
জাগরণে দেখে নাই কোন দুখ
মা যেন ভিষক রত্ন।
সহসা কেমনে ব্যথাহারী মাতা
বেদনা নিয়েছে হ'রি
মোদের জ্বালায় তুমি জ্বল' মাগো
নামে রূপে বিষহরি।

তৈরী জামা ফেলে কি যায়

মুখ ফুটে কি বলতে মানা
এই অবেলায় আজ
ঘরে যেতে মন ওঠে না
নাই হেথায় কাজ॥
ভুলবে নাকি নাওনা ফুল
পাখীও ত' এই রয়॥
কত কথায় ভুলাতে চাই
কত মিষ্টি তাও
ভুলবে নাগো কেমন ছেলে
বলবে না কি চাও॥
বিজলী জাগে মেঘ মনেতে
হঠাৎ জানাও একি
তৈরী জামা ফেলেই কি যায়
আমি অবুঝ ঢেঁকি॥

কই গো জামা দাওনা এনে
মন ওঠে না যেতে
গোপাল সোনা মিষ্টি মুখে
খুদও যে চায় খেতে ॥
ভক্ত হাতের তৈরী জামা
নিয়েই এত খুশী
অমনি ওঠা তর না সয়
মিষ্টি বিদায় হাসি ॥

তুমি তো জননী চির জাগ্রতা

শেষ বৈশাখীর সন্ধ্যা সেদিন
আরতির মধু ছন্দা
ভক্ত হিয়ায় মাধুরী র'য়েছে
সুরের অলকানন্দা ।
কমলিনী প্রায় মুদিয়া এসেছে
ভক্তি নম্র হিয়া
আবেশিত সেই হিয়ার মাঝারে
জাগিল ভয়াল ছায়া ।
কাতর হিয়ায় জানাল তাপসী
জননী রাখগো রাখো
কল্যাণী রূপে দূর কর ভয়
মঙ্গলা আজি জাগো ।
ঘনাইয়ে আসে ঝড়ের রাত্রি
অবসাদ জাগা বুকে
এলাইয়া পড়া তাপসীর চোখে
নিদালী ঘনায় চুপে ।
সহসা একি এ বরাভয়া বুঝি
প্রাণের আকুতি পিয়া ।

মেদুর মেঘের আতুর বিলাসে
দাঁড়াল উছাস নিয়া।
ব'লে ওঠে 'ওঠ এমন করিয়া
প'ড়ে কেন মরি মরি'
জননীর বাণী সোহাগ পরশে
উঠে পড়ে ধড়মড়ি।
নহে ত' তন্দ্রা নিদ্রা ত' নয়
পরশ পাওয়া যে জেগে
ধূপ স্বরভিত সেই সে গন্ধ
আছে যে পরাণে লেগে।
মোহ মদির মোদের নয়নে
আলো আঁধি থাকে লাগি
তুমি ত' জননী চির জাগ্রতা
জেগে থেকো, এই মাগি।

মুক্তি ছড়ান হেথা

গৃহ বৈরাগী ব্রাহ্মণ এক
জপ নিষণ্ণ মনে
অর্দ্ধ চেতনে ইষ্ট স্মরণ
করিতেছে নিশিক্ষণে।
মনে পড়ে যায় শ্রীপ্রভুর কথা
মুক্তি ছড়ান হেথা
আমার কাছেই আছে আছে জেনো
সহজ সাধন সাধা।
এসেছিল দ্বিধা, কেমনে বা হবে
মুক্তি যে মহাধন
জনমে জনমে মরণ সাধনা
করিতে হয় যে পণ।

সহসা নিমিল নয়নে জাগিল
দখিণ দেউলপুরী
দাঁড়াল যেন সে তারি প্রাঙ্গণে
গুরুরে নমস্করী।
গর্ভ গৃহেতে এসেই দেখে কি
ভবানীর নাই দেখা
সারদা জননী আকুলিত কেশে
দাঁড়াল' করুণা মাথা।
ধীর ললিতে জাগিল অধরে
শোন্ শোন্ ওরে বাছা
ব'লেছি যে কথা সত্যই জেনো
তিল নহে তার মিছা।

কালাপাহাড়ি

কাঁদছো কেন বাদলি মেয়ে
মেঘের আঁচল টেনে
ধরার ব্যথায় নয়ন টোপায়
আকুল দিঠি হেনে।
ভুখারী কি দেবতা তোমার
হায় রে দেবের দেশ
অন্নদারি অন্ন খালি
নাই যে অন্ন লেশ।
যার-দেওয়া ফল জলের কণা
বিশ্ব ক্ষুধা নাশে
সেই দেবতা অন্ন মাগে
হাসতে নয়ন ভাসে।
দেব দেউলে প্রসাদ পারস
জিয়ায় হাজার জন
আজ সেখানে বন্ধ আগল
রিক্ত সিংহাসন।

ভোগের থালি ভরছে হেথা
হরে পূণ্য দান
অমরাতে ঝরছে আঁখি
দাতার পূণ্য প্রাণ।
আনন্দেরি বাজারে আজ
নিরানন্দ শোভা
কাশীপুরের অন্নসত্র
নাই নারায়ণ-সেবা।
কালাপাহাড় হানল আঘাত
মামুদ এল ফিরে
মহাকালের চক্র না এ
বজ্র ঘনায় শিরে

পুজোর জামা

মিঠে আলোয় বাজলো সেদিন
বোধনের বাঁশী
ভিজে হাওয়ায় ভেসে আসে
যুঁই শেফালির হাসি।
ভাবছে বসে তিনটি প্রাণী
এবার পূজার দিনে
দীন নারায়ণ শিশুর হাসি
কেমনে লব জিনে।
প্রতি বরষ এমন দিনে
জামা তাদের আসে
হাসতে গিয়ে সহসা যেন
নয়ন তাদের ভাসে।
দান পুণ্য যাদের হাতে
তাদের নাই সুখ
হয়তো এবার গেলই হবে
ভ'রতে তাদের বুক।

দিনের আলো নিভে আসে
আরতি দীপ জ্বালা
ভক্ত হিয়ায় দুলছে শুধু
ব্যথার কণ্ঠমালা।
হঠাৎ এল শূন্য পথে
সাগর পারের লিপি
খুলেই মেলে শ্রীঠাকুরের
কৃপার ঝিকিমিকি।
দয়াময়ী মার্কিন এক
দীন নারায়ণ তরে
পূজার কাপড় জামার লাগি
অর্থ দিল ভ'রে।
বুঝতে নারি হরির লীলা
না বলা সুর বাজে
না জানি কোন্ 'টেলিভিশন'
নিত্য সেথায় আছে।
অশ্রু ভেজা সকল কথায়
ব্যথায় যান গ'লে
মোদের 'পেটে সয়না' ব'লে
ফলতে নাহি ফলে।

*   *   *

তোমার লীলা বুঝতে হরি
আমরা শুধুই হারি
দীনের লাগি বস্ত্র জুটাও
ভাগ চাও যে তারি।
অন্ন বসন জোগাতে হায়
সব ছেলেদের তরে
না জানি হায় কতই কাঁদা
ঘরে এবং পরে।
ব্যস্ত সবাই আপন আঁপন
ভক্ত মেয়ে ক'টি

গোপাল তাদের মুখ চেয়ে রয়
পোষাক করে কাটি।
হয়তো ব্যথা বাজবে বুকে
পূজোর জামা বিনা
তাইতো এমন আগে আগেই
জামার কাপড় কিনা।
বোধন দিনে দেওয়া হবে
প্যাঁটরা বোঝাই ক'রে
ভক্ত জনেক কি ভেবে হায়
আগেই দেবে ধ'রে।
চাইতে গিয়ে বিমুখ হল
চায়না দিতে আগে
গোপালেরে বুকে নিয়ে
কেমন যেন লাগে।
ব'ললো হরি দেরী কি সয়
নাও তো চেয়ে আজি
দেখি কেমন তোমার কথায়
হয় না ওরা রাজী।
অবাক লাগে ভোরের বেলা
তাদেরি একজনা
স্বপ্ন দেখে সাত সাগরের
মাণিকের এক কণা।
কাজল পরে স্নানের শেষে
আদুল গায়ে মরি
উঠবেনা সে খাবেনাকো
মাথা নাড়ি নাড়ি।
জানায় ব্যথা নোতুন জামার
নইলে জানায় আড়ি
ভোর না হতেই হল জামা
শ্যাম ভেলভেট্ট পাড়ি।

ধরার ধূলায় একি খেলা
অধরারে নিয়ে
ঘরে ঘরে যে ব্যথা রয়
হরির ব্যথা কি-এ।

শুচি নয় মোটে

সাধু চলেছেন সাধুর সন্ধানে
মোতিনগরের পথে
গোপাল আছেন হৃদয় ঝুলাতে
রথী হয়ে হৃদি রথে॥
দ্বিধা আসে মনে অজানা দেশেতে
কোথা পাব ভাল ঠাঁই
গোপালের ভোগ হবে তো সেখানে
দিশাহারা মন তাই॥
হিমালয় হতে এসেছেন সাধু
ভাগ্যেতে মেলে দেখা
গোপালে দেখাতে নিতে হবে সাথে
রাজী নন হতে একা॥
গিয়ে দেখি একি চেনা পরিজনে
ভরে গেছে সেই ঠাঁই
আনন্দময়ীর আশ্রম সেটি
রয়েছেন সেথা মা-ই॥
ভোগের সকল জোগাড় হল যে
জল নিয়ে গোল ভারি
কেশবানন্দ নিয়ে এল ধীরে
করঙ্ক ভরা বারি॥
অন্তর্যামী বিরূপ কেন গো
রাজী নয় নিতে জল
তুফান জাগাল ভক্তের ব্যথা
আঁখি করে ছলছল॥

সাধু দলে ওঠে চাপা গুঞ্জন
রহস্যের হাসি মুখে
করঙ্কের জল শুচি নয় মোটে
দেওয়া হল কোন্ দুখে ॥
আন্‌জল এনে দিল আর জন
প্রসন্ন যে ভগবান
শ্রদ্ধার ক্ষুধা সুধা করে নিতে
দুয়ারেতে যাঁর স্থান ॥

একটি যে ফোটা ফুল শুধু

মালা নয় ওগো মন্দার শুচি
একটি যে ফোটা ফুল শুধু
এত করে তাই ধরে নিয়ে আসা
দিতে আসা হায় কোন্ মধু।
আলো আর আলসের ছায়ে
মনে মধু দোলা লাগে বুঝি
শাপলার বুকে মূক কথা
তারি মত কি ও মুখ জাগে।
ছুঁড়ে পূজা পুষ্পল ডোর
এত ছুটে কেন আসা আজ
একটি যে ফুল তাই হাতে
আধো মোছা আধো জাগা সাজ।
কণ্ঠের মালা বিনিময়ে
মাগি তায় যদি দাও ফেলি
হায় একি মুঠি নিষ্ঠুর
হাসি যেন যায় পাখা মেলি।
নিতি কত ফুল হয় ধরা
নিতি কত পূজা উপচার
হারে সবই ওগো এক ফুলে
কথা দিয়ে মন পাওয়া ভার।

স্বার্থের সন্ধানে থাকা
কেন আজ এত মোহমন্থ
বন্টি যে মধু অমৃতে
মধু বিষে হলে নীলকণ্ঠ।
হৃদয়ের বিনিময়ে দেওয়া
হৃদয়ই তো তুমি চাও জানি
হৃদি ভ'রে তবে রও প্রভু
পেয়ে ফুল ঐ পায় নমি।

আসি আসি মনই করে

আসি আসি মনই করে
আসাই কি আর হয়
নানান কাজে বাধাও নানা
নানান সংশয়।
গোপালমণির চন্দ্র মুখে
ধরেই কিছু দেওয়া
কথা ছিল কত দিনের
কবেই বা হয় যাওয়া।
ক্ষীরের পুর মানস ছিল
জিনিসও সব আনা
হায় রে কপাল যাওয়ার পথে
ঘন মসীই টানা।
মনের কথা মনেই চেপে
থাকা যে হয় দায়
হঠাৎ শুনি কে যেন কয়
মনের কথাই কয়।

'ডাল ভিজাবে—দাওনা তাই
যাবেই না হয় ফেলা
নাই যদি হয় যাওয়া তবে'
আর হল না বলা ।
কয় এ কথা—কে তুমি গো
গোপালমণি নাকি
জীবন চেয়ে চালাও বুঝি
হৃদয় মাঝে থাকি ।
যায় না ফেলা—যাওয়াও হল
শ্রীমুখ দেখাও সই
হাসির মঞ্জু গুঞ্জরণ
বুকেই চেপে লই ॥

কথা তুমি কতই শোন

কথা তুমি কতই শোন
তাই ত' জানাই আজ
তোমার ভোগের টাকা ক'টি
মিলাও রাজের রাজ ।
অনেক লোকের অনেক মেলা
কারেই বলি বলো
তাই বুকের কোণাই ওগো
দুখেই ছলো ছলো ।
সপ্তশতীর পাঠেই ছিলাম
সেও তোমার পাঠ
তোমার কাছেই দিশাহারা
রয় না যে গো আঁট ।

তোমার ভোগের মানস আছে
তোমায় চুপে স্মরি
কৃপাই তোমার ওগো গোপাল
ভব পারের তরী।
একি দেখি সেই একান্ন
টাকাই পড়ে আছে
হাজার খুঁজেও পাই নি সেটি
এত হাটের মাঝে।
তোমার কৃপার বাতাস প্রভু
পালে লেগেই থাকে
অহং লয়ে কাঁচা আমি
শুধুই কেন জাগে।
ভুলাও সবি হে দয়াময়,
আঁখি জলেই যাচি
এই দুনিয়ার রঙ্গশালে
বসলে আমি বাঁচি॥

গোপাল দিঘি

ছোট্ট বল ছোট্ট না তো গোপাল দিঘি এ
কজ্জলিত ছোট্ট চোখে বিশ্ব বিছিয়ে,
চঞ্চলিত চরণেই তো নূপুর বাজিয়ে
এরই পাড়ে গোপাল সোনা যায় যে নাচিয়ে।
শাপলা ফোটে রক্ত রাঙা জলটি রাঙিয়ে
মুখটি দ্যাখে সেই জলেতে ঘাড়টি বাড়িয়ে,
গল্প শোনা কাব্য কথা চায় যে শুনিতে
রাঙা দুটি চরণরেখা পথেই বুনিতে।
বাসলো ভালো আপন ক'রে দেয় যে জানিয়ে
আদর কাড়া ঠোঁটের কোণে ডালিম বাহিয়ে।

চলার সাথী

মেঘ নেমেছে বনে আরো মনেই
মনের দীপ একলা জ্বলে একলা শুধু জ্বলেই।
মন হারানো গঙ্গার কূল আকুল নয় তবু
তারি তীরে চলাই হয় শুধু।
চিরদিনের সাথী তারো নাই দেশ
একলা দিনের শেষ পৈঠায় শুধুই একা একা।
শিউরে ওঠা সন্ধ্যা যেন সন্ধ্যার এক কুহু
নীরব হবার আগেই জাগে বিষাদ মাতার মুহু।
ধীরেই নামে রাত্রি তার পায়ে পায়েই আসা
গোপাল সোনার শিঙার হল, ভোগেই এবার বসা।
ভোগ হ'তে যে হয় না মরি
কি যে বাধা বলবে কে আর বেদন চঞ্চরি।
সহসা যে মনেই পড়ে সাঁঝের পান্থ সাথী
হয়নি হওয়া, তাইতো নামে থমক জাগা অভিমানী রাতি
একটি চুমা একটি আদর তাতেই হাসি মুখ
দরদীরে বুকেই নেওয়া নিঙড়ে হিয়া নিঙড়ে সারা বুক।

শুনিলাম শুধু আঁধার শিবার ধ্বনী

মাধবপুরীর ক্ষীর চুরী কোরে নেওয়া নয় অপবাদ
গোপাল ভট্টের আশ পুরাইতে বাড়ানো তো নয় হাত।
ছোট এক গ্রাম বীরভূমেরি সেথায় কুটীর বাঁধি
বুড়া ব্রাহ্মণ চুপে চুপে একা গোপালেরে যায় সাধি।
মৃত্যুতীর্থে জপ নিষন্ন ধীরে বেলা যায় সরে
রাত্রি ঘনালো ঘিরিয়া আসিতে নির্জন পূর্ণ ঘরে।
এসে দেখে একি কুটীরের দ্বারে রোদনের ধ্বনী উঠে
ব্রাহ্মণী তার জানিনা কেন যে ডুকারিয়া কেঁদে লুটে।
অলিখা ভারতী শুনাল সেদিন, সাঁঝাল প্রদীপ দিতে
এসে শুনে গৃহে হরিগুঞ্জনে মৃদু মধু কাকলীতে।

চেয়ে দেখে গৃহ অর্গল দেওয়া, ভুলে কেহ দিল ভাবি
ত্বরিতে খুলিল কুটীর দুয়ার স্বামীর তলাস লাগি।
আহত পরাণে চেয়ে দেখে একি আঁধারেতে গৃহমাখা
দীপ জ্বলে নাই নাহি কোন প্রাণী দেবতা রয়েছে একা।
নয়নের জলে জ্বলে যাওয়া বুকে জানাল একটি কথা
শুষ্ক জপেই দিন চলে গেল বুঝিলে না হরি ব্যথা।
শুনালে না মোরে হে গোপাল তব বাঁশরী মিঠেল বাণী
আমি অভাজন শুনিলাম শুধু আঁধার শিবার ধ্বনী।

চণ্ডী মায়ের চণ্ডী পাহাড়ে

চণ্ডী মায়ের চণ্ডীপাহাড় নয় তো বহুত দূর
লীলাময়ীর লীলায় যে দেশ আজো সে ভরপুর।
শ্রীরামেরি স্বপ্নে পাওয়া শ্বেত পাথরেই গড়া
নির্জন বনে যেন ফোটা ফুলের স্বর্ণছড়া।
মায়ের নকীব বাঘ ফুকারে নিত্য রাতে আসি
পাহাড়ী সাপ সেও তো আসে মায়ের চরণ বাসি
সেই পাহাড়ে চড়তে মানা মায়ের আবাস ভূমী
নীচেই মায়ের পূজার দেউল ধূসর পাহাড় চুমি।
পুরুলিয়ার কিছু দূরেই জাগ্রত সেই পীঠে
তিন জনেতে দেখতে গেছে আশ যদি বা মিটে।
প্রহর খানেক গড়িয়ে গেছে দেউল তলে আসি
ভক্ত দেখে বন্ধ দুয়ার নয়ন জলেই ভাসি।
পূজারী রয় অনেক দূরেই কেই বা ডাকে তারে
নয়ন মুদেই বসে পড়ে বন্ধ দেউল দ্বারে।
সঙ্গী দুজন হঠাৎ দেখে আকুল কালো মেয়ে
এসেই দাঁড়ায় চাবী নিয়ে রূপেই ভুবন ছেয়ে।
পরনেতে রাঙা পেড়ে শাড়ীর আগুন জ্বেলে
শাঙন মেঘের সারাগায়ে বিজলী যেন খেলে।

বলল মেয়ে, হাত পেতে নাও দেউলের এই চাবী
দরদালানে ক্ষণেক থেমে চাঁদ কথা কয় নাকি।
এবার দেউল বন্ধ কর, কইল কিছু পরে
চলেই গেলো রেখেই শুধু বনের অন্ধকারে।
চাবি নিয়ে চলে গেল দূর বনপথ বেয়ে
সঙ্গী দু'জন দিশেহারা রয় যে শুধু চেয়ে।
বন্ধ করে নয়ন দুটি ভক্তেরও নাই দিশা
ফিরেই এল ভর দুপুরে নিয়েই অমানিশা।

দেবতার ঠাকুরালী

অমাতিথি তার যত ব্যথা ঘিরে
করেছে যে মুখ ভারী
ভৈঁরোর সাথে মিশে গেছে যেন
শ্রাবণের মল্লারী।
হোথা কল্যাণী ধূপ দীপ জ্বালি
বসেছে হোমের তরে
পুত্র যে তার মোটর আঘাতে
আসামাতে আছে পড়ে
উদ্ধার করো এ মিনতি রাখো
দেবতা হে দাও অভয়,
স্থান নেই তাই আকাশের তলে
ঠাঁই নিছি দয়াময়।
হরির এমনি করুণা মরি
নিভিতে নেভেনা দীপ
আধখানা হোম নিভে যায় তবু
আধেক রয়েছে ঠিক।
পূর্ণাহুতির লগনের পর
সহসা উতলা বায়
দেবতার আশি দিয়ে গেল যেন
শান্তির মেঘলায়॥

এই চেয়ে নেওয়া

মলয়জ চন্দন আদরে চাহি
মাধবেন্দ্র পথে প্রভু নিলে বাহি।
নদীস্রোতব্রতী যুগ যুগ সেঁচি
আজো চলে রাহী তব প্রেম যাচি।
এই দীপ্ত দিন করি স্নিগ্ধ শুচি
তব চেয়ে নেওয়া আজি হ'ল বুঝি।
ছুটে নিয়ে আসা এই মিঠা ঘন
জানো সেধে নিতে হ'য়ে হৃদিজন।
মম কুণ্ঠাক্ষতি প্রভু জানো কত
তাই রেখো কৃপা নিয়ে নতি শত।

অচিনে গাছের ফুল

সেদিন শ্রাবণী জল মঞ্জিরে নয়নে ঘুমের ঢল
অভিমানী মন জাগিয়া ঘুমায় মরমে অশ্রু জল
নিথর রজনী স্নেহ 'চাপড়ি'তে ঘুম পাড়াইতে রত,
অশান্ত বন মর্মরি ওঠে বুকে লয়ে ব্যথা ক্ষত ;
শিহরিয়া উঠে একি কার ছোঁওয়া চেনা চেনা লাগে যেন,
চরণছন্দ শুনিনি তো কাণে ডাকেনি তো কেহ হেন
হয় তো হারাল বায়ুর দাপটে চরণের রিনি ঠিনি
হয় তো দুয়ার বারেকের তরে করেছিল ঝিনি ঝিনি ;
দুরন্ত বায়ু পারেনি ছিনিতে অঙ্গেরি আঘ্রাণ
ভুলালেও জানি ভুলিতে পারেনা শত আঁখি মেলা প্রাণ।
কচি হাত ভরা সোহাগে জড়ায়ে আকুল কপোল দুটী
অভিমান যেন ভাঙ্গাইতে চায় নয়নের নিদ টুটি।
চকিত নয়নে জেগে উঠে ভাবে স্বপনের নয় ছল
চির নোচ জন পরশিয়া গেছে গহিন হৃদয় তল ;

মনে পড়ে যায় গতদিন কথা অভিমানে গেছি বলে ;
যারা নাহি চায় তাদের দুয়ারে যেতে পার বৃথা চলে।
যারা চেয়ে মরে শত ব্যথা ভরে তাদের শুধুই ভুল
রাতের গহিনে তাইতো এসেছ অচিনে গাছের ফুল।

জাগে নাই সাড়া প্রভু

কোরক কৌতুকে
চেয়েছিনু নীলারুণ রভসিত প্রাণে
আধো জাগা আধো মগ্ন মুখে।
রিক্ত নভোরেণু
তনুতীরে জড়ায়ে কি ছিলে যুক্ত করে
রৌদ্রদাহে গুহায়িত রাখালিয়া বেণু।

স্বাতীদীপে জাগেনি তো উছসি উচ্ছলি
সপ্তপর্ণে ডাকোনি ত' দ্বাদশ গাণ্ডীবী।
দূরাসন্ন ডাকে
জাগে নাই সাড়া প্রভু বসন্তে রভসে
জাগি নাই নিশান্ত কূজনে শ্মশান বৈরাগ্যে।
তিমির তৈর্থিক
ফিরে দেখি লুকোচুরি নর্ম লীলাঞ্চনে
দিয়ে গেছ অপাবৃত পরম বৈদিক
মরু যজ্ঞলেখ
জীবনের জীর্ণ পাত্রটীরে অনুত্তানে দেখি
হয়েছে কি সেই নীরবতা কৃষ্ণকান্ত পুষ্পলাবি মেঘ।
গুহায়িত প্রাণ
পেয়েছে কি আলিম্পিত হরিচন্দনেতে
উদধীর স্বপ্নাতুর সে মহা আহ্বান।

অন্তর্য্যামের ডাক

রাত্রির ঘন মন্থর বুকে মিলনে বিরহ কি যে
ধরণীর ভীরু পল্লব বুঝি জোছনায় গেছে ভিজে।
জপমালা হাতে নিদালীর দ্বারে ভক্ত নারীর প্রাণ,
নিঙারিয়া উঠে, কোথা যেন কার ছুটে আসে আহ্বান।
নিদহারা চোখে চেয়ে দেখে একি ছুটে গেছি কোন ঠাঁই
অচিন সে ভুঁয়ে অলিন্দ পাশে চেনা জনে যেন পাই।
কমলার রঙে রাঙা তার বাস রঙেনি তো তাতে মন
আলুথালু বেশে শুধু লিখা আছে পূজারীর আবেদন।
জপমালা হাতে জুড়াতে কি চায় চেপে রাখা তুটি কথা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্ষীণ তার হাসি পাণ্ডুর মেতুরতা।
সেথা তারো মনে আকুতি জেগেছে, প্রীতির এমনি ধারা
ছুটে কি পাবো না গঙ্গার তীর ভেঙ্গে দিয়ে এই কারা।
হরির চরণ জুড়াইয়া দেয় জুড়াতেও জানে হরিজন
তাই এ নিশিথে হরিময় প্রাণে মিলনের এই আয়োজন।

মরমী যে তুমি

দীপালীর রাতে নীচে যত আলো
উপরে ততই আঁধা
মহাকালিকার পূজার মন্ত্র
ভকতের প্রাণে সাধা।
শিশু নারায়ণ গোপাল আমার
বড়ই যে অভিমানী
পূজা শেষ হতে রাত হয়ে গেছে
ভোগের হয়েছে হানি।
কাজল আয়ত তুটি চোখে বুঝি
হিমেলা এসেছে নামি
ভোগের পশরা পড়ে থাকে শুধু
নেয়নি একটুখানি।

দরদীর কোল দোলা দেয় বুঝি
প্রেমগলা কচি মনে।
ছোট বুকটিতে কি যে তুলে উঠে,
বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কোলে তুলে নিয়ে গান গেয়ে গেছে
ভোগের গ্রাসটি সাধি,
অভিমান ভাঙ্গা হাসি ফুটে ওঠে
শ্রীমুখ বুকেতে বাঁধি।
যে গানের সাধ ছিল চুপি মনে
সে গানে নিয়েছ টানি
মরমী যে তুমি মরমের মাঝে
রাখিতে যে নাহি জানি ॥

আর কি আসবি ফিরে

আর কি আসিবি ফিরে
তারা ঝিম্ ঝিম্ পৌষালী রাতে
জননীর মত ঘিরে।
সাঁঝালো দীপেরে দেখি,
মনে পড়ে যায় জননী গো তোর
কুহেলী জড়ানো আঁখি।
মনে পড়ে যায় ওমা,
সন্তান তরে বুক ভাঙ্গা কত
দুঃখ বেদনা সোনা।
অলকার আঁখি মেলে,
মনে কি পড়ে না ক্ষণিকের তরে
সন্তানে গেছ ফেলে।
জীবনের এই পারে,
শতধারা আর জর্জর হিয়া
চেয়ে দেখা বারে বারে।

সীমা অসীমায় মিশা,
এঘর ওঘর কভু নয় ভুল
অকূলে মিলায় দিশা।
স্মৃতির সুরভি বায়ে,
ফিরে যাওয়া আর ফিরে আসা দেখি
চকিত চপল পায়ে।
পরম পাথেয় আনি,
নিতি নিতি কত দাঁড়ায়েছ ওমা
মৌন মিনতি খানি।
ঘুম ভাঙ্গা দুই চোখে
কত চুমা দিলে সান্ত্বনা মাখা
জেগে ওঠা ধ্যানলোকে।
স্বপনের চুমা আঁকি,
জাগরণে যেন দাঁড়ায়ো জননী
তেমনি সোহাগ মাখি।
জীবন তীর্থ-তীরে,
মরণ পাত্রে অমিয়া উছসি
এস গো জননী ফিরে।
করুণা গঙ্গা উছসি,
ভরে দিও এই রিক্ত পাত্র
ফিরে চাওয়া কৃপা বরষি॥

প্রশ্ন

হে ঠাকুর

স্বষ্টির প্রথম উষায়, নির্বিকল্প গহিন ধ্যানেতে
কেমনে জাগিলে প্রভু, জাগাইলে স্বজন কমল ?
লীলার বিলাসে বিলোলিত বক্ষ কিগো
জেগেছিল বেদনায় আনন্দ বিহ্বল।
প্রভাতের শুকতারা সম আঁধারের অনন্ত গহ্বরে
চকিতে কি জেগেছিলে অরূপের রূপের মন্তরে ?

আমরা জাগিয়া দেখি,
আমরা হাসিয়া পাই জীবনের নবীন বন্ধন
অমর্তের বিজন বিলাসে, তুমিও কি
দেখেছিলে পেয়েছিলে হাসি ও ক্রন্দন ?

স্বামীজির প্রেরণা

নয়নজলে ডেকে প্রভু কন্
ওরে নরেন, ওরে নারায়ণ
কেমন করে আমায় আজ
এমন কথা বললি খেয়ে লজ্জা লাজ
ঋষি যে তুই সপ্ত লোকের ধন
এনেছি যে ক'রে আরাধন
আপন মাঝে আপনি থেকে ওরে
ঋষি যে তুই থাকবি কেমন করে ?
ওগো ঠাকুর ওগো দরদীয়া
তোমার কথায় কাঁপে আমার হিয়া
এমন করে তোমার নরেন নিয়ে
খেলতে চাও মরণ খেলা কি এ ?
শুকের মত সমাধি সাধ যার
লাগে ভাল সাত সায়রের পার।
খেলা ঘরের ভাঙ্গা পুতুল ধ'রে
ঘুমের কাজল দেবে নয়ন ভ'রে।
শাঁখের ধ্বনি বাজে ডাইনে বামে।
প্রভুর বাণী উঠল ধীরে বাজি
ওরে নরেন, ওরে সাবাস মাঝি,
আধার বড় এইতো ছিল মনে
এসেছিস কি রইতে আঁধার কোণে,
আর্ত্তজনে রাখতে বুকে ধরে
স্বর্গ হতে এনেছি যে তোরে।

নম্র মাথা ফনীর মত হয়ে
বলল নরেন ধীরে রয়ে রয়ে—
মাথা পেতে নিলাম তোমার বাণী
মাথার মনি তোমার ব্যথা খানি।
তেমন সন্ধ্যা নামেনি আর কভু
সে যে প্রভাত সকল রাতের তবু।
ধরার ধূলা ধন্য হ'ল যে রে
পার্থ কৃষ্ণে নূতন রূপ হেরে॥

গীতি কাহিনী

আবির্ভাব

ফুকারে ঠাকুর গঙ্গার কূলে
সন্ধ্যা এল যে ডুলে
ওরে তোরা আজো কোথায় রইলি আমায় ভুলে।
ব্যথিয়ে উঠে হৃদয় যমুনা
ধরার বেদনা দুকুল মানে না
উছসি উঠিছে কানায় কানায়
আয় আয় ওরে আয়।
ঐ সাত সায়রের পারে
কোন প্রাণে রইবি হাঁরে—
ধরার ব্যথায় বুক যে তিতে যায়।
যাই যাই যাই গো ছুটে
ঋষিরে বেড়িব বাহুর মুঠে
কানে কানে কব কলকলি
চল ঋষি চল চঞ্চলি।
জ্যোতির ঘন আবরণ নাশি
ব্যথার নারায়ণ দাঁড়ান হাসি।

নবারুণ রাগে করে ঢল ঢল
শ্রীমুখ মাধুরী বিকচ কমল
মৃণাল ভুজের বাঁধনে বাঁধি
ঋষিরে ঠাকুর কহিল সাধি।
সাধের সমাধি সায়রে পশি
আপন ভুলে কত রহিবে বসি ?
হের আঁখি মেলি
উঠিছে আকুলি,
কাঁদন কাতর ধরার অধর বাঁধুলি।
চল চঞ্চলি
চল নারায়ণ চল চলি।
সমাধি সায়র শতদল দলি
করুণা কিরণ উঠিল উছলি।
আধো খোলা ভোলা নয়ন মেলিয়া
শিব সুন্দর হাসি উঠিল দুলিয়া।
তখনো ভোরের অরুণ ছটায়
রঙের ধনুটি 'নাহিতো' মিলায়
হাতে হাত ধরি দাঁড়াল পুলকে
নরনারায়ণ ব্যথার দ্যুলোকে ॥

গহীন লীলা

নীল গগনের নয়ন কোনা আজকে ভরভর
কোন বেদনায় মর্মাহত হৃদয় গরগর।
রামধনুকের আশার সেতু মুছলো আঁধিয়ায়
কোন খেয়ালীর খেলার রসে বেদন না জড়ায়।
কালো মেঘের কেশ দুলেছে গগন ভুবন ভরি
রাতুল দুটি চরণ চেয়ে আজ যে প্রাণে মরি।
আপনহারা বটের হরি ডাকলো কারে সাধি
কাঁদন কূলে বুলে বুলে ডাকলো কাঁদন কাঁদি।
শিবের বুকে কালী হ'ল সেই বা কেমন ক'রে
(কার) সোহাগ সাধি অলখ আঁধি অরূপ রূপ ধরে।

কৃপার শাঙন নামল গহন গগন ভুবন বেয়ে
কালো রূপে আলো ক'রে কালের কালো মেয়ে।
শুকনো বটের মঞ্জরী আজ উঠবে নাকি জিয়ে
অলখ লীলার সঞ্জীবনী মনে প্রাণে পিয়ে।

সারদার দান

সেদিন শ্রীমার পূজার লগ্নে
সমারোহে নাই সীমা
পসারী বসেছে পসরা সাজায়ে—
জননী আপনি দীনা।
পণ্য বেসাতি সকলেই কিনে
আপন জনের তরে
মা'র লাগি হায় কেহ ত' ভাবে না
পর হন নিজ ঘরে।
পূজারিণী মেয়ে রুদ্ধ আবেগে
ভাবে আপনার মনে
যাহার লাগিয়া এত সমারোহ
তারে কেহ নাহি চিনে
বেদনার ভারে পুঞ্জিত হিয়া
রুদ্ধ নিশাস ফেলি
দেবতার পায়ে জানায় মিনতি
চেয়ে রয় আঁখি মেলি।
নিজ অগোচরে ব'লে ফেলে মাগো
কেহ ত' দিলে না মরি
যা আছে আমার ক্ষুদকুঁড়া ওমা
নিজ রূপে নিও ধরি।
পুরানো বসন পরাতে কাঁপিছে
হাত আর সারা দেহ
সহসা পুকারে দোকানী ধন্য
বসন নেবে কি কেহ।

বিনা পণে এই বসন দিব মা
সাজালে ধন্য মানি
বুক নিঙারিয়া সাজাল পুলকে
দিয়া সেই বাসখানি।
মৌন প্রাণের বেদন মিনতি
বেজেছে কি ঐ বুকে
দীন পসারীর প্রাণের অর্ঘ্য
জননী চেয়েছ চুপে।

ভক্ত-ভগবানে

সেদিন কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি
মাঘের পুণ্য দিন
বিবেক-স্বামীর পূজার লগ্নে
বেজেছে বরণ বীণ।
আয়োজনহীন পূজার দেউলে
দীন উপচার হেরি
ভক্তের প্রাণে বেদনা জেগেছে
উছল নয়ন ঘেরি
পুষ্প সম্ভার নাই ত' দেউলে
কে আর আনিবে ফুল
দেবতার পায়ে মিনতি জেগেছে
অকূলে মিলায় কূল
সহসা ভক্ত দীন নত শিরে
নিয়ে আসে ফুল রাশি
দীনের ঠাকুর জেগে রন নিতি
প্রাণের আকুতি নাশি।
ফুল সম্ভারে ভরে উঠে মরি
দেউল রম্যতর
ভক্তের নতি নিয়েছ ঠাকুর
পূজা কি পূজ্য বড়।

সন্ধ্যা ঘনায় দেউল দুয়ারে
ভরা যে সেবার থালি
সহসা ভক্ত দেবতারে ছলি
চায় কিছু ঠাকুরালি।
সরায়ে রাখিল পূজা উপচার
দেখি তাঁর আঁখিপুটে
পড়ে কি না পড়ে যতনেতে গড়া
"সিঙ্গাড়া" নেয় কি মুঠে।
বার বার হায় নিবেদন হল
মিটে না বিরাট ক্ষুধা
লুকানো ভোগের থালাটিতে
হায় রয়েছে ভক্ত সুধা।
ধরে দিল কেহ কর দুটি জুড়ি
হার মানা হরি কাছে
যুগে যুগে এই লীলার পাথারে
ভক্ত যে বাঁধা আছে।

দশবত্থু

ধর্মরাজ্যে অধর্মের কথা কেন হয়ে উঠে বড়,
সামান্য কথা বিশেষ হইয়া মিথ্যাকে করে জড়।
যুগে যুগে কেন 'মার' সংগ্রামে জ্ঞানী মানে পরাজয়,
ইতিহাসে তার কোন লেখা নাই কোথা হ'তে সঞ্চয়।
নির্বাণ পথযাত্রী সেদিন তথাগত মহামুনি,
ভেঙ্গে পড়েছিল সঙ্ঘারামের শীর্ষ—গগন চুমি।
দুঃখের সেই আঁধারের মাঝে সুভদ্রের শুনি বাণী,
বাঁচিলাম, কেউ কঠোর শাসনে বাঁধিবে না মোর প্রাণী।
এর পর সুরু দলাদলি আর ক্ষীর ছেড়ে ধরা নীর,
দশটি কথায় ভেঙ্গে গেল সব স্থৈর্য সঙ্গীতির।

নূন সঞ্চয়ে এই দলাদলি প্রথম সূত্রপাত,
লবণের লোভে প্রথম প্রকাশ "মারের অভিঘাত"।
দুপুরের আগে সমাধা করিবে আহার ভিক্ষুজন,
ছায়া দুআঙ্গুল সরিলেও খাবে এই মতে কারো মন।
ভিক্ষার স্থল একই গ্রামেতে, গ্রামান্তরেতে নয়,
বিবাদের এও হল এক কথা— লোভেই যে পাপ রয়।
মাসের মধ্যে তিনটি দিবস উপবাস তরে লেখা,
একস্থানে বসি 'পোষথের' দিন ধর্ম যে হবে শেখা।
লুকাইয়া খাওয়া হবে না ত' আর তাই সবে চায় মুক্তি,
একস্থানে জড় হইতে চাহে না—তথাগতে নাহি ভক্তি।
গুরুর পথটি বড় কিবা বড় তথাগত মহাবাণী,
এই নিয়ে সুরু হল কত কথা ঝগড়া ও কানাকানি।
দুই প্রহরের পরে খাওয়া চলে ফলের রস বা জল,
প্রশস্ত সেটি কিন্তু তাহাতে মাখন নিলে কি ফল।
ঝাঁঝলো জলেরে খাওয়া হল সুরু অবিদ্যার একি জাল
আসনের ছিলা কাটিতে হইবে এতেও যে জঞ্জাল।
সোনা বা রূপার গ্রহণ নিষেধ ছিল তথাগত বাণী
কাঁহাপন দেওয়া জলের পাত্রে লুব্ধ হইল প্রাণী।
বৈশালীর সেই বৌদ্ধসংঘ এই দশ লঙ্ঘনে
বিবাদের করে সূত্রপাত যে ছিঁড়িতে সে বন্ধনে।
ঔব্বাহিকায় মীমাংসা হোক, রেবত কহেন আসি
দুই দলের এই বিষম বিবাদে সব জ্ঞান যায় ভাসি।
তথাগত বাণী গ্রহণকারীরা থেরবাদীনামে খ্যাত
মহাসাঙ্ঘিক নাম তাহাদের 'মার' হাতে যারা ক্রীত
শ্রেয় আর প্রেয়ে যুগে যুগে হায় বেধেছে যে সংঘাত
যুগে যুগে কেন অধর্মের সাথে ধর্ম মিলাল হাত।

F. N. দশবত্থু—দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। পোষথ—**উপবাস**। **কাঁহাপন**—সেকালের চৌকা চৌকা তামার পয়সা। **ঔব্বাহিয়া**—**বৈশালীর** ৮ জন ভিক্ষু, যাঁহারা বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন এবং **দশবস্তুর বিচার করিয়াছিলেন।**

মিলিন্দের প্রশ্ন

নৃপতি মিলিন্দ বহু মিনতিতে সন্ন্যাসী পুরোভাগে
ক'ন মহাভাগ আজি এইক্ষণে প্রশ্ন এক মনে জাগে।
কিবা পরিচয়, কিবা তব নাম,—পূজ্য হে যতিবর—
কহেন সন্ন্যাসী নাগসেন নামে খ্যাতি এ ধরণী পর,
স্থায়ী আত্মার আত্মীয় তবু নহি আমি কোন কালে—
ডাকিয়া সবারে কহিলেন নৃপ—পড়িলাম মোহ জালে ;
নামের পিছনে নাহি কোন নামী এ যে বড় বিস্ময়
বিশ্বাস করা যায় কি কখন হয় না ত' প্রত্যয়।
নাগসেনে চাহি কহিলেন পুন দ্বিধা নিথরিত বাণী
কেবা দেয় তবে, তব পরিজনে, বসন ভূষণ আনি ;
আপনার দান কেবা করে ভোগ, শিব পথে কেবা চলে,
ধ্যান সুখে ভোলে সব দুঃখ শোক মৃত্যুরে পিছে ফেলে ;
পথশেষে কেবা লভে নির্ব্বাণ অমৃত যার স্বাদ,
হত্যাকারীর কলঙ্ক লাভে. তস্কর অপবাদ ;
বাসনার বসে কেবা তবে চলে মিথ্যা চারণ ছলে,
আসব মত্ত পঞ্চ পাপচারী লিখন নিয়েছে ভালে ;
ভাল বা মন্দ ব'লে কি হেথায় কিছু কি গো নাহি পাই,
শুভাশুভ কর্মে তবে কি কখনও সুফল কুফল নাই ;
তব বর দেহ করিলে খণ্ডিত নহে সে তো অপরাধী—
এই বিধানেতে মহাজন কেহ হবে না ত' তব সাথী ;
ভুল তদন্ত তব মতবাদ কিবা আছে তব নামে
বুঝায় কি লোম চর্ম কিবা নখ সবগুলি এক স্থানে
বাহ্যরূপ যাহা, তব অভিধেয়ে রয় কিগো মহাশয়,
সংজ্ঞা সংস্কারে, বেদনা বিজ্ঞানে, স্বরূপের পরিচয় ?
নহে তাহা নহে, কহে নাগসেন সস্মিত উত্তরে,
দেন মহাবাণী নৃপতিরে আনি মহাবোধী মন্তরে ;
স্কন্দগুলি মিলি হয় কি হে নাম পুরাও হে অভিলাষ
তাও নহে বৎস—নাগসেন মুখে জেগে উঠে মৃদু হাস।

স্কন্দ হতে তবে আরো কিছু আছে নাম বলে যারে বলি
তাও কভু নয় কহেন সন্ন্যাসী, বৃথা যাও নিজে ছলি।
নাগসেন নামে তবে কেহ নাই নাই কি গো কোন কালে
কথার কথা কি নাম রূপ সবি শূন্যের মায়াজালে ;
নাগসেন কয় আজি কি রাজন আসা তব জয়রথে ?
রথ বিনা আমি আসিব কেমনে ? নৃপতি কি চলে পদে।
রথ যার নাম দণ্ড সে কি শুধু কহ মোরে মহারাজ
তাও কভু নয় বিজ্ঞের মুখে শুনিতে মানি যে লাজ।
অক্ষ দণ্ড কিবা কিবা চক্রগুলি রথ নামে অভিহিত
রজ্জু গুচ্ছ কিবা জোয়াল নামেতে লোকে লোকে লক্ষিত
চক্রদণ্ড কিবা অঙ্কুশ বলিতে বুঝায় কি রথ খান
কহ নৃপবর কিবা বোঝ তুমি, রথ কহ যার নাম।
উত্তরে নৃপতি কন মহাযতি তাও কি গো কভু হয়
অংশগুলি মিলি রথ তারে বলি হয় কিবা কহ নয়।
রথ ছাড়া এতে বুঝায় কি অন্য কহ তবে নৃপবর
রথ নামে তবে নাহি কি কিছুই এই ধরণীর পর।
শূন্য শব্দ মাত্র রথ যারে বলি, আরোহী কিসে হ'লে
দণ্ড রজ্জু চক্র একসাথে মিলে রথ নাম যার বলে।
পঞ্চস্কন্দ মিলে আমি রূপ ধরে এই কথা জেনো সার
তথাগত আগে স্থবির ভগিরা এই বাণী দিল তার।

বুদ্ধি নিয়ে হই বুদ্ধিহারা

পাওনা দেনার চেনা পথে চঞ্চলিত গতি
জানি প্রভু, জেনেও তো বুঝিনা সে ক্ষতি।
তোমারেও যে লই টেনে মোর ক্ষুদ্র পথে
লাভ ক্ষতি হিসাবের জের টানি কোন মতে।
তোমারে ডাকিয়া সাধ পুরাইতে চাহি
যত পাই তবু ভাবি নাই কিছু নাহি জীবনের পথ বাহি।

অতৃপ্ত নয়নে লয়ে বাসনার জ্বালা ভক্তি প্রীতি সবে
যাচাইয়া লই অর্থ মূল্যে—জীবনের বহ্যুৎসবে।
জ্বলে যায় সবি, থাকে শুধু চিতাভস্ম পড়ে, জীবনের খেয়া শেষে
এসে দেখি বেদনার আছে জের টানা মেলা রেশে।
তুমি শুধু তৃপ্ত চোখে চেয়ে রও অনির্বাণ
নিয়ে যাও আমাদের অতৃপ্তির দান।
যেথা শুধু বিলাবারে চলে আত্মহারা
নিয়ে আসে দুটি কণা ক্ষুদ কুঁড়া কাঙ্গালের পারা।
ওজনের নাহি কথা শুধু আছে প্রীতির পরাগ
সেথা তব নিতি চলা, ছলা নাই আছে শুধু গূঢ় অনুরাগ।
হয়তো বলেছে কেউ ঝগড়াতে তুমি অনুরাগী
সে কথা শুনিতে যেন যুগে যুগে ছিলে প্রভু জাগি।
হয়তো 'বামণী' হোথা শুষ্ক নাড়ু ল'য়ে
সাধিতেছে তার তরে চিরশিশু হ'য়ে।
চুপি পায়ে গেছ আর নিয়েছ যে ধরি
ক্ষুদ্র আস্পদে হরি অমৃত সমান মনে করি।
লীলাতে তোমার হরি—বুদ্ধি নিয়ে হই বুদ্ধিহারা
"পাটোয়ারী মনে" কভু অধরাকে নাহি যায় ধরা॥

রাতের ছায়ায়

গহিন রাতে কেনই আঁখি ভোলা
দুয়ার কেনই খোলা।
হুতাশ হাওয়া শুধুই যে যায় বয়ে
কি সে ব্যথা কয়ে
বনের বাহুর নাচন কেন জাগে
এলোমেলো হাঁকে।
সবাই যখন যায় গো ছলে চলে
আঁধার শুধু মেলে
এলে তুমি সোনার ছায়া মাখি
হয় তো ছিলে জাগি

হয়তো ব্যথা নিলেই বুকে টেনে
আপন জনে জনে
শিখার মত যারাই গেল রাখি
আঁধারে মন ঢাকি
তখন হরি তোমায় বুকে ধরে
গেলই যে বুক ভরে
না চাওয়া এই অবুঝ পরাণ পুটে
পেলাম বাহুর মুঠে
চাঁদের হাসি এক রাশি এক মুঠি
যুগের আঁধার টুটি ॥

বাউলের দল

শারদ ফাল্গুনে সোনালী ঝলকে
ছুটে আসা কথা
নয়নে জাগায় তন্দ্রা—
লঘু মেঘ ভেসে যায় রোদ জাগা চরে
কুহুলিত বনবাট—ছায়ালীতে
ঝুমিছে গোলাপ
শান্ত সুষমায়—
ধরণীর স্নিগ্ধ আঁখি পটে
যুগে যুগে জেগেছিল বুঝি
দূরাগত পদধ্বনি
সরযূর শ্যাম সরণিতে
শ্যাম দূর্ব্বাদল পেয়েছে কি সাড়া—
পেয়েছে কি পলাশিত নয়নের
শ্যাম স্নেহাঞ্জন
শ্যামায়িত করেছে কি কিশোর কিংশুকে—
কজ্জলিত যমুনায় ফুলসম জেগেছে কি
শ্যাম স্নেহ কাঁতি—

বেথ্‌ল্‌হেমে রক্তরাঙা পদচিন
খুঁজেছে কি মেষ-শিশু—নিষণ্ন পিয়াসে—
নৈরঞ্জনা বনপথে ছাগশিশু
আজো কি খোঁজেনা তুই
করুণার্দ্র আঁখি—
প্রেমরাঙা নদীয়ার পথে আজো কি জাগিয়া আছে
মদমত্ত আঁখি
জুড়াইতে জীবনের জ্বালা—
মানিকের বনে শীর্ণছায়া
পল্লবিত হয়েছে কি পেয়ে শ্যামাঞ্চন—
চঞ্চলি উঠেছে কি—
বিধুনিত বলাকার
কাশমুগ্ধ পাখা—
বেদনার দিগ্ধ পদক্ষেপে
ধরণীর শ্যাম তৃণস্তর
আজো কি কাঁদিয়া মরে—
তুলে নিতে বুকে
আসেনাতো আজি কেহ—।
বারে বারে এসেছ কি
অনাহত অতিথির মত
অজানিতে দোলা দেওয়া দখিণার বায়ে—
বারে বারে নিয়েছ কি
কণ্টক মুকুটে রাজ নিরাজন—
দিকে দিকে জয়ধ্বনি মাঝে
আজো কি জাগেনা সেই
নয়নার্দ্র বাণী—
অচিনে বাউলের দল
এল আর গেল, জানিলনা কেহ,
জাগিলনা জরাতুর শবরী শর্বরি!

টাকা হারানো

টাকাটা যে বড়ই মিষ্টি
সবাই জানো জানি
হারিয়ে গেলে আরো মিষ্টি
নেবে নেহাৎ মানি।
ভুলো মনে একটি ছেলে
চলেছে পথ বেয়ে
কলকাতারি পথ সে, যেথায়
গঙ্গা চলেন ধেয়ে।
সঙ্গে ছিল পরের টাকা
কেমনে না জানি
হারিয়ে গেল পথের মাঝে
রইল কান্নাখানি।
হাপুস হুপুস দুচোখ বেয়ে
ঝরছে শুধুই জল
ফেরৎ দেবে পরের টাকা
নাই যে সম্বল।
কারেই বা কয় কেই বা আছে
গরীব ঘরের ছেলে
দুহাত জুড়ে গঙ্গা তীরে
রয় যে আঁখি মেলে।
হঠাৎ মনে পড়লো গো তার
দীনবন্ধুর কথা
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর যিনি
যিনি গুরু মিতা।
ইহকালের গতি তিনি
পরকালের প্রভু
ভুলেছিল আচমকা তাও
মনে পড়ে তবু।

কাতরেতে দুহাত জুড়ে
বল্‌ল দয়াময়
এত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া
সম্বল যে নয়।
অগতির গতি তুমি
দুখের রাতের সাথী
অসময়ে আজকে প্রভু
তাইতো তোমায় ডাকি।
পাইয়ে দাও গো টাকাগুলি
নইলে যে যাই মারা
দীনের ঠাকুর আর কি পারেন
না দিয়ে গো সাড়া!
গঙ্গা হতে উঠে আসেন
উছল আকুল রূপে
কাছে এসে হাতটি ধরে
বলেন চুপে চুপে।
অসাবধানে পরের টাকা
রাখতে যে গো নাই
পাথর চাপা রয়েছে দেখ
টাকার থলিটাই।
মিলিয়ে গেল দীনের ঠাকুর
পূর্ণ করে আশ
সরে গেল তেজচন্দ্রের
দুঃখ ব্যথার রাশ।

তুমি কেন লবে তুলে

ব্যথা জর্জর থাক এই দেহ
তুমি কেন লবে তুলে
যত ভারি হোক দুঃখের বোঝা
থাকো প্রভু সব ভুলে।

গম্ভীর রাতের কণ্টক কথা
জেনেছো অন্তরযামী
তাই কি প্রভাতে ছুটে এলে ওগো
আঁখি জল এত হানি।
জুড়াইতে মরি সব ব্যথা গ্লানি
শিয়রেতে এলে আজ
দাবদাহে এই জীবনের পথে
মেঘাগম শিশুরাজ।
জয়দেব দেহে যত বেত হানা
সবই নিলে নিজ গায়
ভৃগু পদাহত নও তুমি শুধু
'হালদার' পদ তায়।
ক্ষমাসুন্দর শুধু হাত জুড়ি
ভিখ মাগি তোমা স্মরি
অগ্নি শোধনে কর সোনা মোরে
শিয়রেতে থেকে হরি।

দুখের অধিরাজ

অসহায়েই বলি ঠাকুর, তুলেই নাহয় নাও
সজ্জা তোমার রচতে নারি, জানা কথা তাও।
আজকে রাসের পূণ্য দিনে, তোমার পানে চেয়ে
চোখের জলে রাখতে নারি, আঁধার আসে ছেয়ে।
সাজিয়ে দেব নূতন সাজে, হায় রে অভাগী
হবে না তো' জানি তবু, কেমনে বুক বাঁধি।
গিরিধারীর ডাক পড়েছে, রাসের রোশনাই
যেতেই হবে তবু যেন, এগুতে পিছাই।
আশ্রমেতে যাব নিয়ে, তাড়াতাড়ির লগ্ন
তবু কেন ভুল হল গো কিসেই ছিলাম মগ্ন।
চরণে আজ জানাই নতি, দোষ নিওনা হায়
আপনি যেন সেজেই নিও যেমন মন চায়।

অশ্রুতে হায় মিটেনা যে বুকের বেদনা
হৃদয়স্বামী সবই জান নও তো অচেনা।
গোপীনাথের কথা আজ পড়ছে বড় মনে
দাঁড়িয়েছিলে পড়লে বসে পূজার সেই ক্ষণে।
বৃদ্ধ সেবক কুব্জদেহ পায় না নাগালে
তাইতো তারি কথা প্রভু শুনলে যে ছলে।
বুকের কথা দুখের কথা শুনলে তাই আজ
'মনমানা' সাজ সাজলে দেখি দুখের অধিরাজ॥

ঝুলনের মেলা

ঝুলার মেলা নানা রঙে উঠে রাঙি
শাওনের কালো মেঘ হঠাৎ কেমনে গেছে ভাঙি,
দুই নয়নে—ছোটদের মেলা আর হাসি,
তারি মাঝে বাজে বাঁশী.........
রূপে আর রসে বছরে বছরে এই দিকে
চম্পক সুরভিতে যেন পথ চলে
প্রজাপতি রঙে যত শিশুদের আশা
জেগে ওঠে যেন শত কণ্ঠের ভাষা
যেন কোন মায়া-লোক-ধরণীতে সৃষ্টি
থেমে গেছে ঘন-ঘোর বৃষ্টি
মন্দিরে কেমনে যে থাকে
গোপাল সেও শিশু সেও চুপে মেলার মন নিয়ে জাগে।
মেলার কিছু যে তার চাই সেথা—
অবুঝ আমরা ভুলি বছরে বছরে তার কথা।
তাই আজি বিরসে সে ফিরাইয়া মুখ
বসে রয়, ভোগে তার নাই মন, আজি কোন দুখ
ক্ষমাসুন্দর তুমি আজি কর ক্ষমা,
ভুলে যাওয়া মন মোর
মেলার প্রসাদে হোক প্রসন্ন মুখচন্দ্র।

মা

ছোট্ট একটি কুঁড়ি—আর ছোট্ট একটি ঝরণা

ধীরে ধীরে কুঁড়িটী ওঠে ফুটে—ঝরণা বয়ে যায় নদী হ'য়ে।

প্রথম উষায় ফুটে ওঠে কবিতা রঙে রঙে সাতরঙা—

ধীরে ধীরে নেমে আসে শীত স্নিগ্ধ দিন।

হালকা রাঙা গোলাপের কুঁড়ি

ফুটে ওঠে আর ছড়িয়ে যায় তার সুবাসের আল্পনা।

শুক্তির বুকে তিলে তিলে জাগে মুক্তা,

কঙ্করিত হয়ে তার জাগা।

তেমনি ক'রেই কি জাগলেন মহামায়া—ধূলার বুকে বেদনার কঙ্করে।

এ জয়রামবাটীর সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

ভক্ত রামচন্দ্রের ভাঙ্গা ঘরে আঁধারে জাগা অরোরার মত

সেদিন সন্ধ্যালগনে জেগে উঠেছিল একটি কুঁড়ি মন—

লক্ষ্মীপূজার শঙ্খ জাগিয়ে দিয়েছিল তাকে—

না-কি মা-ই জাগিয়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীর শঙ্খ।

আজ দেখি আমেরিকার হর্ম্ম্যনগরীতে আল্পনা পড়ছে

মায়ের শুভ জন্মদিনে,

আজ দেখি বিলাস নগরী প্যারিস মন্দিরে মা'র আবাহনী শঙ্খ।

কেউ ব'লছে তুমি আমাদের কালী—কেউ পাচ্ছে নিরন্নের অন্ন।

সৃষ্টি চ'লেছে প্রসার মুখে—তার অসীম গতি পথে

জেগে উঠেছে নব নব আনন্দ—মায়ের বিলাস।

ফাল্গুনী দ্বিতীয়ায়

হে জগৎস্বামী

গগন গঙ্গার মত এসেছিলে নামি।

করুণায় কুলু কুলু দুই কূল ভেঙ্গে,

ধরণীর ধুলিগুলি উঠে তাই রেঙে।

রূপে রাগে গানে গন্ধে, আলোকের দিশা

ভ'রে উঠে তিলে তিলে, হাসে অমানিশা।

বুক ভাঙ্গা দুখে
কে ডেকেছে শিব সম নির্জনে নিশ্চুপে।
গহীন নিশিথ জাগা ক্লান্ত আঁখি পাতে
উষার আশার মত আলোক সম্পাতে,
ব্যথার গরল পিয়ে জর্জরিত ত্রাসে
এসেছ কি অমর্তের অমৃত বিলাসে।
ধরণীর ধুলে
বিকাইতে এসেছ কি বিনা পণে বিনা মূলে
সন্ধ্যাসম চুপে চুপে জুড়াইতে ব্যথা
জননীর মত আসি, নাহি বাণী নাহি কোন কথা
অবুঝ সন্তানে চির অশরণ জানি
ব্যথাহত হ'য়ে এলে, মানি তাই মানি
তুমি মাতা তুমি যে সর্বাণী।

"আঁখি জলে তাই এনেছি অর্ঘ্য"

নব ফাল্গুনে এসেছিলে তুমি ফল্গুধারার মত
বাজেনি শঙ্খ জাগেনি ঝঙ্ক মিলন মাল্য শত।
এসেছিলে চুপি পায়
নিদালীর ব্যথা প্রায়
আয়োজনহীন আভরণে দীন জননীর ভরা বুকে
ঋষি তপস্বী জনকের টানে অলকার রাকারূপে॥
ধনে জনে আর রূপার প্লাবনে এসেছিলে বারে বারে
এবার এসেছ রিক্ততা দিয়ে পূর্ণতা দানিবারে।
কৃপায় জুড়িয়া পাণি
এবার এসেছ জানি
সব-গরব গুঁড়াতে ধুলার সোনাতে মিলাবারে ভাই ভাই
ধূলি কোণে আর সিংহাসনে করে নেছ নিজ ঠাঁই।

নিঃস্বের বেশে গিয়েছ পুকারি দ্বারে দ্বারে কতদিন
শুনিনি সে কথা বুক ভাঙ্গা ব্যথা রাখিনি তো পদচিন্
হতে গেছ মা'র বলি
বেদন আর্ত্তি তুলি
তিল তিল করি বিলায়েছ নিজে বিশ্বের অধিরাজ
আঁখি জলে তাই এনেছি অর্ঘ্য রিক্তের ব্যথা লাজ।

কেন ?

নর নারায়ণ—
আজি শুভ জন্মদিনে আলোকের কোথা অভিসার
ক্রন্দসী ধরার চোখে আনন্দ উৎসব!
বেদনায় পঙ্গু পৃথ্বী জরায় জর্জ্জর
নাহি আশা নাহি ভাষা চরণ চঞ্চর।
'উষস্তির' শুষ্ক কণ্ঠে নাহি অন্ন পানি
মৌন মুখে চেয়ে রয় অন্তর পরাণী।
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা ক্ষণে ক্ষণে যদি হয় ক্ষীণ
তিলতিল সুধা ভরি উছলিত নয় চিরদিন।
সুন্দরের পরাজয় অসুরের হাতে যদি হয়
ধর্ম্মের পতনে ঘটে অধর্ম্মের চির অভ্যুদয়।
সত্য আর শিব যদি অপাঙক্তেয় ধরণী ধুলায়
ধূলির পরম দাবী স্বর্গে যদি নাহি প্রবেশায়।
সাহারার ধু-ধু কামনায় মরীচিকা জেগে যদি রয়
মর্ম্মরিত শুষ্ক পত্রে আষাঢ়ের আশা সেকি ভয়?
জাগ্রতে ঘুমায় যে জন চেতনার আশা তার নাহি
নোঙর ফেলিয়া দাঁড় কেন যায় বাহি।
মরণের দরিয়ায় যেই মাঝি চিরদিন হীন,
খেয়া তার পূর্ণ নাহি হয় কোনদিন।

দুঃখের প্রস্তুতি আছে, আছে জানি বেদন বিলাস,
বেদনার বন্ধনে আছে মুক্তি অনন্ত উছাস।
হালের ফলকে জানি স্বর্ণকান্তি শ্যামশস্য রাজে
অমলিন সরল হাসিতে রাজন্যের মণিপ্রভা লাজে।
জানি প্রভু তবু এই ক্ষীণ নত নয়নের কোণে
শুধু এক কথা শুধু এক ব্যথা তন্তুজাল বোনে।
নন্দনের আনন্দ বন্ধনে ধরণী সে কেন নাহি বাঁধা
অমৃত সায়র সেঁচি বিষকুম্ভ শিবে কেন সাধা।

কে তুমি

দীনের ব্যথা বুকেই আঁকা
লুকিয়ে এলে কে তুমি
আঁধার কাঁদা গগন চাঁদা
মা মা ব'লে কে তুমি।
পলক হারা নয়ন তারা
রাত দেউলে কে তুমি
সাতটি ঋষির একটি খ'সে
পড়ল কোলে কে তুমি।
ভিজিয়ে মাটি পঞ্চবটী
সোনার মানুষ রও ধূলে
আয় রে তোরা আছিস কোথা
বুকের জ্বালায় যাও বুলে
হাসির ঝুরি ঝরাও মরি
ভুবন ভোলে কে তুমি
বুকটি চিরে রাখতে ধরে
গেলাম ভুলে কে তুমি।

জন্মদিনে

শশ্বত এ জন্মদিন তব
স্বাগত হউক বারবার
ধরণীর ম্লান অভ্র কুঞ্জে
রূপ রঙে ভরুক আবার।
ধুয়ে যাক সব দৈন্য
সব দুখ গ্লানি
তোমার হাসির একটি লেখে
সুরভিত হোক সব প্রাণী

এসেছ কেন জানি

গোপনে এসেছ কেন জানি
অনেক আলোয় আঁখি চাপি ভয়ে
অনেক কথায় কথা যে হারায়
পথ চাওয়া বাড়ে শুধু
মন তো ভরে না তায়।
ক্ষণ ভিন্ন মধু ভরা চাঁদ
চমক লাগায় শুধু
ক্ষীণ দ্বিতীয়ার ফল্গু হাসিতে—
কেন যেন ভরে যায় বুক
লবমাত্র অমৃতের রহে প্রয়োজন।
দীনের বেশেতে আসা তাও—
জানি কেন ;
বেদনার বুক সে যে
অতল অ-তীর
কাছে পাই দুরদীরে দরদ মিটাতে
রাজবেশে দূরে রাখি ভয়ে
দেওয়া নেওয়া হয় না যে তাতে।

বৈখরীর তীক্ষ্ণ শরে—
বিদ্ধ হরিণীরে
বাঁচাতে এসেছ জানি চুপে
সহজ সরল বেশে সহজেই দিতে ধরা।
মনের মন্দিরে তাই
বাসি ভাল এত—
বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়া
শুধু কিগো
বিদুরের প্রেয়
তুমিও ত' বাসো ভালো তায়।

চন্দ্রানোটন

যুগের ঠাকুর যুগন্ধর আজকে ঠাকুর তুমি
এই ধরণী ধন্য হ'ল ধূসর চরণ চুমি।
তবু কেন মনেই পড়ে চন্দ্রা মায়ের কুঁড়ে
তুলসী তলায় দাঁড়াতে যে মায়ের কোল জুড়ে।
হয় তো মুঠি একটি র'ত আঁচলখানি চাপি
আধেক হাতে উঠতে চাওয়া মায়ের বুকে ঝাঁপি।
চন্দ্রামায়ের হাতে প্রদীপ উঠতো বুঝি কেঁপে
তুলসী তলার ঠাকুরটিকে অসামালই দেখে।
যুঁই নিকানো অঙ্গনে কি চরণ টলোমলো
মুছতে বুঝি হয়নি মোছা হাসির খলখল।
কোকিল ডাকা ভোরের সাথে নয়ন দুটি মুছি
চন্দ্রানোটন হাস তো বুঝি রক্তকমল রুচি।
ঝাঁপাই ঝোরা হালদার তাল আরো যে নীল হ'ত
মিছে রাগের সোহাগ মেশা কথাই ছিল কত।
শাঁখের ফুঁয়ে হেসে ওঠা চন্দ্রমুখের চুম
তারি সাথে চোখের কোণা একটু ঘুম ঘুম।
আসতো ছুটে বুনো হাওয়া নেবুর গন্ধ মেখে
গুছিয়ে দিত চুলের গুছি অগোছালো দেখে।

চে কিশালের সোঁদাল বাসে আসাই পায় পায়
অকারণের হাসি দেখে চলে যাওয়াই দায়।
সন্ধ্যাতারার চোখে রাখি নিঢাল নীল আঁখি
হারিয়ে কি গো যেতো যেন নীড় হারানো পাখী।
ঘুমের মাঝে স্বপন দেখা—আছে কি তার দিশ
কত আলোয় ভরবে ওগো কত অমানিশ।

দুখের অধিরাজ

অসহায়েই বলি ঠাকুর, তুলেই না হয় নাও
সজ্জা তোমার রচতে নারি, জানা কথা তাও!
আজকে রাসের পুণ্য দিনে তোমার পানে চেয়ে
চোখের জল রাখতে নারি আঁধার আসে ছেয়ে।
সাজিয়ে দেব নূতন সাজে, হায় রে অভাগী
হবে না ত' জানি তবু, কেমনে বুক বাঁধি।
গিরিধারীর ডাক পড়েছে, রাসের রোশনাই
যেতেই হবে তবু যেন, এগোতে পিছাই।
আশ্রমেতে যাব নিয়ে, তাড়াতাড়ি লগ্ন
তবু কেন ভুল হল গো কিসেই ছিলাম মগ্ন।
চরণে আজ জানাই নতি, দোষ নিওনা হায়
আপনি যেন সেজেই নিও যেমন মন চায়।
অশ্রুতে হায় মিটেনা যে বুকের বেদনা
হৃদয় স্বামী সবই জান নওতো অচেনা।
গোপীনাথের কথা আজ পড়ছে বড় মনে
দাঁড়িয়েছিলে পড়লে বসে পূজার সেই ক্ষণে।
বৃদ্ধ সেবক কুব্জ দেহ পায়না নাগালে
তাইতো তারি কথা প্রভু শুনলে যে ছলে।
বুকের কথা দুখের কথা শুনলে তাই আজ
'মনমানা' সাজ সাজলে দেখি দুখের অধিরাজ।

আবাহনী

বেদ নন্দিত হাসি আনন্দ অবিনাশী
হিমাদ্রি শিয়রে প্রথম অরুণ পাত
কর্ম্ম জ্ঞানের অসি ও বরুণা
হৃদি মন্দিরে অভিঘাত।
কজ্জল কালো কালের কপোলে
জ্বলেছে যে রূপশিখা
আজো জাগে সেই প্রেম হেম বাণী—
অরূপের রূপ লিখা
হে অভেদ স্বামী নাথ॥
সমাধির চির নিথর গুহাতে
চিরায়ত তুমি আঁধারে আলোতে
করুণা গঙ্গা আপনি উথলে বাড়াল আপন হাত॥

নব বোধন

বেদন প্রান্তে কত বসন্ত হল লীন হল শেষ
বর্ষণ শেষে কত শরতের থেমেছে সুরের রেশ।
উত্তর বায়ে উতরোল হল কাশের গুচ্ছ কত
চঞ্চল পায়ে ছুটে গেছি কত মন্দিরে হ'তে নত।
থেমেছে বোধন থেমেছে শঙ্খ মনের অন্ধকারে
দ্বিধা কম্পিত তুরু তুরু হিয়া তবু চলি বারে বারে।
বাসনা সোনায় রঞ্জিত হল করুণ সন্ধ্যাগুলি
দুহাত ভরায়ে রেখেছি জড়ায়ে বেদনার ধনে তুলি।
শত কাঁটা ক্ষত শত ব্যথা হত রিক্ত হে হিয়া তবু
ফিরে আসে আর ফিরে দিয়ে যায় থির নাহি মানে কভু।
ভাবি নাই মায়া মরীচিকা এই নন্দন সুর ছন্দ
ফিরায়ে ফিরায়ে নিতি যাবে ফিরে রেখে যাবে শুধু দ্বন্দ্ব।
নব জীবনের নব আগমনী বেজেছে জীবন দ্বারে
আজি নাহি আসা নাহি কাঁদা হাসা কণ্টক ফুলহারে।

রাশি রাশি কাশে আর না বিলাসে মর্ত্তে অমরাপুর
বুলবুল আর বসোরীর গুলে রচে না আকুল সুর।
পুরানো বীণাতে নূতনের সাধা নব গীত উঠে রণি
বন্ধনহীন নন্দন আজ নব রঙে উঠে রঙি।
বিশ্বের মাঝে গিয়াছে হারায়ে ছোট চাওয়া আর পাওয়া
ভাঙ্গা কুঁড়ে দিয়ে পেয়েছি ফিরায়ে আকাশ আকুল চাওয়া
আনন্দ ঘন দেব নিকেতন শাশ্বত শিব কান্ত
আজি নত শিরে নয়ন আবার লুটি তাঁর পদ প্রান্ত।
জুড়ি দুই কর বলি বার বার শরণের পথ বাহি
এসেছি ছুটিয়া ক্ষত ক্ষতি নিয়া তব শুভ নাম গাহি।
বোধনের বীণা থামিবে না আসিবে না নিরজনা
শারদ অম্বর বাদল আঁধারে হবে না ত' রূপ দীনা।
উৎসব রাতি হেথা চির সাথী চির সাথী ধ্যান ধন
হৃদি বটমূলে জেগেছ কি ছলে গদাধর নারায়ণ।

কালো তপস্বী

ওগো চিরশিশু—
অলকার আনন্দ আকুল
ধরণীর কঠিন ধূলিতে
এনেছে কে বেদনে বেভুল।
মন্দাকিনী আনন্দ সঞ্চারে
লীলায়িত অম্লান যে ফুল
বেদনার সুরধুনী কূলে
শৃঙ্খলিত করে কে বাউল
সমাধির সপ্তলোক পারে
প্রেমের দেউটী যদি জ্বলে
ধরণীর অন্ধকারা কোলে
সাজে কি গো কভু কোন ছলে।

বৈতরণীর এই দুখ তীরে
দেখি তোমা বারে বারে প্রভু
কাঁদায়ে কেঁদেছ নিতি নিতি
ফিরাইতে ফিরে এস তবু।
কলমি লতার দল
দলে দলে দিব্য শতদল
যুগে যুগে এসেছ যে
এনেছ যে আনন্দ মঙ্গল।
নারায়ণ নিত্য সাথী তুমি
চিরন্তনী নন্দনের ধন।
হে কালী তপস্বী—লহ
প্রাণের প্রণতি আর রিক্ত নিবেদন॥

অভেদ স্মরণে

শাওন দিনের কবিরা সব রেখে গেছেন মেঘলা কথার গান
বর্ষামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল রসেই থান থান।
এমন দিনেই তবু আমার—মনেই পড়ে যায়
ভাদর ভরা সন্ধ্যা যেদিন ধরার বুকে ছায়।
মেঘের কাঁটায় ভরা ছিল সারা দিনের দুখ
আবছা আঁধার চাপা কান্নায় ভরেই ছিল বুক।
বহু দূরের যাত্রী সেদিন ফিরেই এসে শুনি
বজ্র আগুন জ্বেলেই দেছে শ্রাবণ ক্রন্দনী।
গিয়েই দেখি ঝড়ের রাতে শৈল চূড়ার মত
শান্ত মধুর চিদানন্দে যেন তন্দ্রাগত।
অমৃত নয়, মন্থি ওগো ধরার বিষপাত্র
গিরিশস্ত আজ নিয়েছেন মায়ের কৃপা সত্র।
লুকিয়ে আনা প্রমিথাসের অগ্নি চয়ন শেষে
বন্ধন, আজ মুক্তি দিলো হরির চরণ দেশে।
হিমিশ গুহা কোথায় ওগো জ্ঞানেই লুকিয়ে রাখে
গঙ্গাধারা সেথায় গেছেন বুকের অনুরাগে।

কিশোর কমল চরণ দুটি উপলক্ষত মুখে,
নিথরি কি আজ পড়েছে সপ্ত সাগর সুখে।
চরৈবেতি মন্ত্র নিয়ে দিশাহারার দলে
চির দিনের হবি ছিলে হরির হোমানলে।
আজকে তোমায় স্মরণ করি প্রণাম করি আর
ক্রন্দসী এই শ্রাবণ দিনে অশ্রু উপহার।

বিদ্রোহী মৈনাক

খণ্ডের পারে অখণ্ডের বাণী
যেথায় শুনেছ—'জাগো হে বিবেক স্বামী'
সেথা হতে নামি হে বিদ্রোহী মৈনাক
বিশ্বেরে দিলে ডাক—"শৃন্বন্তু বিশ্বে"॥
ধূলাতে দেখেছ কত যে ক্রন্দসী
ত্রিযামা রজনী কত যে তামসী
আঁখি জলে ভাসি হে বিদ্রোহী মৈনাক
বিশ্বেরে দিলে ডাক—"শৃন্বন্তু বিশ্বে"॥
অগ্নি চয়নে বন্দি যে প্রমিথাস
নব ভগীরথ পরেছ বহ্নিবাস
প্রেমের উছাসে হে বিদ্রোহী মৈনাক
বিশ্বেরে দিলে ডাক—"শৃন্বন্তু বিশ্বে"॥

বিজয়া

জনারণ্যের অন্ধকারেতে
দীপ যারা জ্বালে নিতি
প্রীতির পাথেয়, নহে ক্ষুদ কুঁড়া
জাগায় প্রাণের গীতি।

ঈশাবাস্যং

(ভাবানুবাদ)

বিশ্বজগৎ আবৃত কর
পরমেশের ভাবে
তাঁহারি তরে ত্যাগেই জেনো
ভোগের পন্থা পাবে ॥
তিনিই সবের অধিকর্ত্তা—
ধন, আর বলো কার—
তাইতো তুমি ধনের গৃধ্ন,
কেনই আর বা রবে ॥
লিপ্ত নহ তো এমন কর্ম্মে
জনম যখন নরের ধর্ম্মে।
এমনি ভাব বিভোরে যদি—
কর্ম্ম তোমার রয়
শতবর্ষের পরমাণু চেয়েই
এমনি কর্ম্মী হবে।

মোদের কি আর দর বাড়ে

তোমরা যখন পণ্যশালায় সোনা রুপার দর কর
আমরা তখন রূপ দেউলে হরির পায়ে গড় করি
দৌলতেরি দুনিয়াতে তোমরা নিতি কারবারী,
আমরা তখন নিত্য লোকের শান্তি সুখের পথ ধরি।
স্পুটনিকের দৌড় নিয়ে চন্দ্রে তোমার ধায় মুঠি
আমরা তখন সপ্তভূমির মগ্ন মনের ধুম লুটি।
চাঁদনিচকে তোমাদেরি নিত্য চলে ঝিলমিলি
আমরা তখন নিমিল চোখে অন্ধমনের দোর ঠেলি।
সাত দেউলে তোমরা বসাও বিলাসের পায়স গো
আমরা রচি হরির তরে একটু মিঠে পায়স গো।
ভূষণেতে ছলকে ওঠে তোমাদেরি রূপ বিভা
চন্দন আর চুয়ায় দেখি আমার হরির রূপ কিবা।
আমরা পাগল আমরা বাউল শ্যামের বাজার দরবারে
তোমাদের ঐ শ্যাম-বাজারে আমাদের কি দর বাড়ে।

সত্য আর শিবের তরে

অনেক ইচ্ছা পারিয়ে যে আজ স্বাগত এই মেঘ
মেঘ এ তো নয়, এ যেন গো আশা আর উদ্বেগ।
'কালিদাসের' কাল এতো নয়, মেঘেরে দূত করা
কোথাও ভাঙ্গন কোথাও প্লাবন বর্ষার এই ধারা।
এই নগরীর রাস্তাতেও দামোদরের ঢল
হাসি আর অশ্রু মেশা চলাতে অচল।
"দক্ষিণের বারান্দাতে" এমনি মেঘের দিন
'বৃষ্টি এল টাপুর টুপুর' রেখে গেছে চিন।
'শেলি'র দিনও চলে গেছে সে 'cloud' তো নাই
আজকে শুধু মেঘলা মনে দুখ কাজরী গাই।
চারিদিকে কালোবাজার মেঘ নেমেছে কালো
অজন্মা আর অনটনে কোথায় পাবো আলো।
উল্টো পিঠে চাঁদের হাসি মেঘের মায়া টানা
তারি তরে স্পুটনিক আর তীর হলো যে হানা।
'ছন্দরাজা' গেয়ে গেলেন হেসে ভালো ভাই
ত্যাগের মন্ত্র বদলে নিলেম ভোগের মন্ত্রটাই।
পাল্টে গেছে দুনিয়াটা আজ উল্টো গাধায় চড়ে
হয়তো মোদের চলতে হবে মেঘের রাস্তা করে।
সেকেলে আর পুরোনোরা কোন বা পথ ধরি
সত্য আর শিবের তরে না হয় যাব মরি।

সজ্জিত সংসার

অনন্ত বন্ধন আর অনন্ত আনন্দে
ভেসে যাই নিরন্তর
নিরন্তর ঢেউএ ঢেউএ তৃণখণ্ডগতি
অশান্ত তৃষ্ণার বুকে আর্ত্ত পাত্র তুলি
চলিবার বেগে শুধু চলা পথ খুঁজি।

আলোর তৃষ্ণায় ছুটি নিরন্ধ্র আঁধারে
মূর্ছিয়া মরে রিক্ত অমাছন্দ
ভয়ার্ত্ত নয়নে জ্বালি কম্প্র দীপশিখা
পলাতকা রাতি আর সমাগত দিন
মাঝে শুধু জেগে থাকে ক্ষীণ চিনা পথ।
সেকি তুমি প্রভু, সেথা আমি নাই
সাগর সঙ্গম রচে মুক্ত ফেনলেখা
অতন্দ্র আনন্দে আর মুমূর্ষু ব্যথায়
মরুর ইঙ্গিতে আসা মূর্ত মরীচিকা
তবু ফিরে চাই মনে হয় দীপ্ত অমানিশা।
সুপ্তির রহস্য মাঝে পূর্ণ করি আছ
আছ তুমি ভ্রান্তি পথে অশব্দের সুরে
আছ তুমি শত শব্দে শত সূর্য্য সাজে।
নীহারির ছায়া মৌনে জাগাও জনতা
ভারতের চিতা রচে কুরুক্ষেত্র গীতা।

সাত ভাই বোনটির চম্পা

তুমি যেন সাতভাই বোনটির চম্পা
ক্রন্দসী হাস্নুর নিশিজাগা গন্ধা
'আনুড়ের' ভাঙ্গা পথে পথরাঙা ছায়াটি
চন্দার বুক ভাঙ্গা বৈরাগী কায়াটি
কলসের কঙ্কনে কাকলীর গাওয়া গান
পল্লীর বধূ সাজা শত ব্যথা ভাঙ্গা প্রাণ
কাকরীর ঝিরি ঝিরি বাঁশরীর রেশটি
যমুনার নীল জলে মিলনের আশ কি।
চিনু আর গয়া সখা বিষ্ণুর তারা ভাই
বিষ্ণুর বুক ভেঙ্গে নইলে কে নেবে বাঁই
হালদার নীল তালে নীলফুলে 'নলরাঙা'
বলাকার শাখা মেলে কালো মেঘে ধাওয়া চাই

হাতছানি দিয়ে গেছে পাঠশালা পড়া মনে
ছুটে গেছে পড়ুয়ারা 'রাজবনে' পথ ভুলে
তবু পাঠ নেওয়া চাই অঙ্কেরে ধাঁধা দেওয়া
কবিগান যাত্রাবে কচি মুখে ফিরে পাওয়া।
শালপাতা মোড়া কোথা ধনী মার সুধা প্রাণ
তার লাগি গৃহকোণে প্রাণ করে আনচান।
"বিশালীর" কালো আঁখি ছায়ালির ঘন বুকে
লুকোচুরী খেলেছ কি তারি সনে চুপে চুপে।
কোয়েলা কি গেছে ডেকে মেনে তার রাঙা আঁখি
তারি মনে গেয়েছে কি কুহুনিয়া বনশাখী।
ভোলেনি কি ব্রজবুলি ব্রজবঁধু শ্যামনাম
"রাজবনে" ক্ষণে ক্ষণে আকুলিয়া পড়া হার।
বসেছে যে রাঙা মেলা কত খেলা গান আর
কিশোরের কালো চোখে লেখা জোখা নাই তার।
নিঙারিয়া সব মধু পল্লীরে গেছে দলি
মধু হারা ব্রজ শুধু কাঁদনিতে আছে চলি।

আকাশের চোখে জল

আকাশের চোখে জল কেন—জানো?
মল্লারে সে কাঁদে—
সারা আকাশ ঘন হয়ে আসে
গুরু গুরু করে গুমরে ওঠে তার সারা হিয়া
আর ঝিরিঝিরি গলে পড়ে তার ব্যথা
সে কাঁদে·········
অজানা ব্যথায় আমরা কাঁদি
গভীর জল ঝরা রাতে······
সেও কাঁদে অসহায়ের কাঁদনি
রাত জাগা পাখীর মত
হঠাৎ সে কাঁদে······

নেশা ধরা রাতরাণীর বুক নিঙড়ে
গঙ্গাজলীর কান্না সে কাঁদে।
ঝড়ের রাতের কান্না এ নয়—এ কান্না
পাথর গলা দুটি ফোঁটা চোখের জল
চাপতে গিয়ে নিটোল মুক্তার মত
দুটি ফোঁটা—সে কান্না।

আকাশটা আজ নিটোল নীল

আকাশটা আজ নীটোল নীল
পাখীরা কথায় আকুল।
তবু—তবু মনটা ভরছিল না '
আছে ফুল—দু'চারটে দুলছে
দুটো শুকনো পাতা উড়ে পড়ছে
তবু মনটায় কোথায় যেন অতৃপ্তি।
চেয়ে দেখি—পাশেই মা'র দুটি নীল চোখে
সারা আকাশটা হারিয়ে গেল।
জীবনের দীর্ঘ দিনটিতে কি যেন ফিরে এলো
সে তো শরতের প্রভাত নয়—
সে তো বসন্তের দিন নয়
এ যেন এক পরস পাওয়া— অমৃত সেতু।

সারা আকাশটা আজ অকাব হ'য়ে উঠেছে

সারা আকাশটা আজ অকবি হ'য়ে উঠেছে—
ধূসর তার বেশ— ভাসা তার মুক।
কদম গাছটাও গানহারা—একটি মাত্র কদম সম্বল।
গঙ্গা নিঝুম—শুধু একটানা বইছে—
ভিজে কাকের জল ঝাড়ার শব্দ।

মরা কুল গাছটা আবার ঝাঁকরে উঠেছে
গঙ্গার ধারে।
সব ধারণাগুলো যেন তন্দ্রার মত
এলোমেলো হ'য়ে ওঠে।
শালিখগুলোর লুকানোর একান্ত চেষ্টা
কাঠবিড়ালিরা এলিয়ে পড়তে চায়।
কণ্টকে আর কমলের ভেদ চ'লে যায়।
হঠাৎ স'রে যায় মেঘ ;
কলকে ফুলের ডালে লাগে আলোর ছোপ
আবার রেঙে ওঠে মন···
দেখি শালিখেরা শিষ দিচ্ছে পরম আনন্দে,
শীতার্ত রাত্রে রুশো হারাতো সব—
আবার ভোরাই আলোয় ফিরে
পেত গান, আর
লুটিয়ে পড়া বিশ্বাস······
পাখীরাও কি তাই······ ?

আসার আশায়

বহুদিন পরে একটু উপরে উঠে দেখি,
শীতের আকাশ গঙ্গার বুকে রূপের একটা তুলির টানও দিতে পারেনি।
ভেবেছিলুম দুচোখ ভ'রে গঙ্গা আর আকাশের একটা রূপের Comedy
দেখবো,—
কিন্তু এত কষ্টে যেন একটা Tragedy হ'য়ে গেলো।

* * * *

আমরা যখন কবি হই,
প্রকৃতি তখন হঠাৎ অকবি হ'য়ে গেল—এমনিই ঘটে।

* * * * *

নেমে এসে আবার শস্য শ্যামল ফুল সুন্দর এই পৃথিবীর দিকে দেখি—
রঙে রূপে রসবন্তী ধরণী—
উপরে দেখা সবটুকুকে মনের রঙে নিয়েছে মণিময় ক'রে।

স্বর্গ হয়তো সুন্দর,—
কিন্তু স্বর্গের চেয়েও সুন্দর এই পৃথিবী—
এখানেই তো আমরা পাই সেই পুরুষোত্তমকে·········
তাই তো তিনি বারবার এই পৃথিবীতে ভালবেসে এঁকেছেন তাঁর
চরণ চিহ্ন·
তিনিই তো সবচেয়ে বড় কবি, শিল্পী।—
তাই তো দূর নভোচারী মানুষ দেখেছে পৃথিবীর মুক্ত রূপ—
মুক্তার মত টলটল ক'রছে তার মাধুরী।

* * * * *

তাই তো গীতা উপনিষদে বলেছেন—"পরস্তস্তু সঃ"।

দেউলের তলে

সন্ধ্যা নিথর হ'য়ে আসে,—
দেউলের তলে ব'সে আছি একান্ত—
একা মন নিয়ে· · ···
ধানের ক্ষেত থেকে
ঘরে ফেরা কপোতের গুঞ্জনে মুখর এ দেউল
পশ্চিমে তাকাই রঙহীন আকাশ—নিস্পন্দ নির্লেপ;
ধরণীর অসংলগ্ন দু' একটা কথা ভেসে আসে
পূবে একটা মুগ্ধ লালিমা ছড়িয়ে র'য়েছে মাত্র।
মনে পড়ে যায় কবীরের একটি পদ—
"সাঁঝ্‌কা তিরির গহেরা আবৈ—ছাবৈ তনমন মে
পশ্চিম দিশ্‌কী খিড়্‌কী খোলো ডুবই প্রেম গগনমে—
—হে পশ্চিমান্তশায়ী দেবতা,—
আজ আমার এই খিড়কী—এই পশ্চিমের খিড়কী—
তুমিই খোলো প্রভু—তুমিই খোলো।

আমার সোনার কানুর ডাক

আজ নারকেল কুঞ্জে নেবুফুলী গন্ধের
সহসা এত ডাকাডাকি কেন·········?
কে এল গো—মাতাল করা ভোরে....?
সে ডাক শুনে কোকিল বধূরা পাগল—
সহেলী পাখীরা জ্বেলেছে গানের দীপালী—
এই ডাকেই যে পাষাণ ভাঙ্গা সাগর বধূর নেমে আসা !
নীপ ভোর, সে ডাক শুনে কেঁদে আকুল
আর সুরধুনী—সাতভাঙ্গা তরঙ্গে আপন হারা !
এ ডাক—আমার সোণার কানুর ডাক—
এ ডাক শুনেছে শৈলাধিরাজ তনয়া—"ন যযৌ ন তস্থৌ" হয়ে· · ··
আর শুনেছিল ব্রজ বিপিনে—টলটলে ঢুঁকোটা
শিশিরের মত কেঁপে কেঁপে ওঠা ব্রজবধূর প্রিয় মুখচন্দা ।

কুহু আর কুজ্ঝটি

ভোরের আঙ্গিনায় আজ বড় ডাকাডাকি—
বছরের প্রথম-দিনে নারকেল কুঞ্জে কেন এত পঞ্চমে মঞ্জির·· ?
গঙ্গার ওপরে একটু একটু মেঘ নেমেছে—
তার ওপর দিয়ে আলো সাঁতরে আসছে দিশেহারা হ'য়ে—
Impressionism এর মস্ত বড় একটা ছবি ।
মনে পড়ে যায় **Carrot** এর **By no breeze stirred** ছবিখানা—
তার মূল কথা ছিল,—**first impression** আমরা
যেন হারিয়ে না ফেলি ।

... .

এই যে গঙ্গার অস্ফুট রোমাঞ্চ,
এই যে কোকিলের 'ডাকাডাকি—
প্রথম বছরকে মধুর ক'রে তোলা নাকি

এ্যাপোলো ও চাঁদ

চাঁদ চেয়ে চেয়ে দেখে ছোট্ট একটা জোনাকীর মতন
পৃথিবী থেকে উড়ে আসে
তার দৃষ্টিতে এক অখণ্ড বিস্ময়—।
জোনাকী পৃথিবীর সঙ্গে নানা কথা কয়—
নানা ছবি দেওয়া নেওয়া করে······
চাঁদ ভাবে কি এর প্রয়োজন—?
চার পাশে ছড়ান রয়েছে অনন্ত সৌন্দর্য্য ···
অসীমকে নিয়ে এই ছেলেখেলা—এর শেষ কোথায় ?
বলাকার মত চাঁদ হেসে যায়,—
স্নিগ্ধ করুণ সে হাসি····
ভাবে জোনাকীর চোখে কতটুকু ধরা দেবে অনন্ত জিজ্ঞাসা !
সুন্দরের সীমানা—আর জ্ঞানের সীমানা ;
কোনটাকে নিয়ে মানুস খুসী হবে······
মেঘ ঘনিয়ে আসে তার চোখে,—
অতন্দ্র চোখে চাঁদ শুধু দেখে—আর ভাবে ····

তাদেরও কি আছে কিছু বলার—?

দিনান্তের ছায়া বিধূনিত—
নারিকেল পুঞ্জে চেয়ে থাকা।
সায়াহ্নের অলস লিপি লেখা—
ধীরে নেমে আসে কত কথা
অনন্ত আঁধার পটে একমুঠো আলো
কোথা যেন হারাইয়া যায়।
বাতায়ন পাশে মাধবীর
চেয়ে থাকা গুচ্ছে গুচ্ছে ফোটা
তারা কি জানে—? —সন্ধ্যার অন্ধকারে
যে লিপি রয়েছে লিখা—

সুখে দুঃখে তাদের কি
আছে কিছু বলার— ?
তারাও কি স্বপ্ন দেখে
আলো-ছায়া—জীবন মরণ— ?
ত্রস্ত পক্ষে ঘরে ফেরা পাখী
যে কথা রাখিয়া যায়
সে কথা কি ক্ষণিকের লিখা ?
জীবন জাহ্নবী বয়ে যায়
গঙ্গার ধারা সম—
সেও কি জানে ? দূর চক্রবাল তলে
কি সঙ্কেত রয়েছে বিস্তৃত—
তারা ঝরা নভনীল হতে
কথা আর গান—
হাসি কান্নার দান সম
যায় নাকি মিলাইয়া— ?
কৃষ্ণচূড়ার শুকানো শাখায়
পুষ্পলাবী লাগি গুমরিয়া মরে নাকি
অন্তসংজ্ঞা ভাব···?

ছোট্ট একটা বুলবুলি

কত ছোট্ট একটা বুলবুলি
ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকায় ঘাড় বেঁকিয়ে
বোধহয় কাল মেঘের মত কাকগুলোকে ভয় পায়
মুখে কিন্তু একটা আনন্দের শীষ ;
কোলকে ফুলের করঙ্কে ভিখারী ঠোঁটটা তার
ডুবিয়ে নেবে একআধবার—এই তার আশা—
ওপরে শরতের কান্নাথামা সাদামেঘ
নীল আকাশের গায়ে ফুল কাটে।

পাশে একটা বুড়ো বেল গাছ
নীচে পড়ে আছে গতদিনের ঝরা ফুল…
উপনিষদের দ্বা-সুপর্ণা সযুজা—পাখী দুটির
আর একটি পাখীর মত আমি তাকিয়ে থাকি
অনাসক্ত চোখে—কিন্তু সে কতক্ষণ ?

'মুরের' একটা কথা

গাঢ় রঙের আর বড় রকমের একটা প্রজাপতি—
বার বার আসে আর যায়……..
বাতায়নে ছড়ানো মাধবীর কানে কি যেন বলে যায়।
বৃষ্টি ধোয়া কচি ধানী-রোদে আকাশটা ছেয়ে গেছে।
নারকেলের পাতাটা— টিয়ার মত নাচতে থাকে।
গঙ্গার জলে আলো খেলা ক'রছে ছোট ছেলের মত পৈঠা ধ'রে।
দূরে—বহুদূরে তাকাই—
তীরটা যেন স'রে গেছে বাস্তব থেকে
বসন্তর মত শরৎ শুধু কি টুকরো টুকরো রঙেরই বর্ণালী।
মুরের একটা কথা ;—
কাল থেকে বার বার ওই প্রজাপতিটার মতই আসা যাওয়া ক'রছে
"টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে জীবনটার দাম ঠিক করা যায় না"—
এর পাশে উইলিয়াম জেম্‌সের—
টুকরো টুকরো ক'রেই দেখাটাকে বড় করা চলে না।

সুখ সে শুধু একটা আশা—সেতো শুধু একটা আবেগ

মধু জড়ান চাঁদের মত,
দুটো লাল ফুল—কৃষ্ণচূড়ার ডালটায়—
যেন হঠাৎ একটা স্বপ্ন ভাঙ্গা সঙ্গীত ;
কার ছোঁয়া লাগে অফেরোর হাতের শুকনো ডালটায় ?
দেখি বৈশাখীর আকাশটা ছেয়ে গেছে নীলকান্ত মেঘে।

কিশোর কলি কলি পাতায় লেগেছে দোল—
নূতন জীবনের সে দোল।
দু' একটা ফোঁটা পড়ে মাথায়,
ছায়া-দানাৎ ক্ষণ-পরিচিত পুষ্পলাবী মুখে।
স'রে যেতে থেমে যায় মন।
বহুদিন বঞ্চিত—বহুদিন বাঞ্ছিত যুথির জ্বাল জাগান
মদিরমন্থ এ পরশ কোথায় ছিলো?
নীল সলিল বসনা মুক্তাজাল গ্রথিত অলকের গঙ্গা
তাকিয়ে দেখি, সে কৃষ্ণ চুম্বনে
তার সারা কপোল ছেয়ে গেছে কৃষ্ণ আবীরে—
শিহর লেগেছে সারা গায়ে।
গঙ্গার এরূপ অনেঅনেকদিনই দেখিনি—
পাখীটা বার বার শিষ দিয়ে গেছে
সুখী হও, সুখী হও আজই ভোরে—কিন্তু—
Man is never but always to be blessed
সুখ সে শুধু একটা আশা—সেতো শুধু একটা আবেগ।

একদিকে জীবন—অন্যদিকে মৃত্যু

ঊর্দ্ধে দেউল—চক্রনিক কপোতের দল
নীচে ঝরে প'ড়ছে শীতার্ত গাছটার পাতা
মধ্যে বামন বিশ্বে-দেবার উপাসনা রত
এই তো জীবন···
একদিকে জীবন অন্য দিকে মৃত্যু—মধ্যে দ্রষ্টা সাক্ষী....
জীবন মৃত্যু অতিক্রম করতে এই বামনকে পেতে হবে—
বাতায়নের বদ্ধ পথে মন চেয়ে রয়
নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে মনে হয় হে অবক্র—
হে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ
তোমায় যেন না ভুলি—নানা অনুসরণে।

বাঁশীর একটা সুর

বাঁশীর একটা সুর
তাই ধ'রে পথ বাওয়া
কত তুস্তর কঙ্করে
নর্ম্ম ললিতে গাওয়া।
প্রথম আলোয় ক্ষত আর ক্ষতি
রেঙে উঠে রামধনু
চেতনের তলে সে কি রয় প্রভু
বন্ধন হারা তনু।
হয়তো সে সব একাকার
শুধুই জাগায় নতি
প্রপন্ন প্রাণ শান্তি সুধায়
সত্য আর শিব ব্রতী।
একটি জীবন এক অনাহত
অধরা অনির্বাণ
মন্ত্র মন্থি জীবন জাগায়
মহতো মহীয়ান।
রেখে যায় জানি আরো কত দিক
পরিচয় নাহি মিলে
কিছুই তো ওগো হারায় না জানি
শত সুর যায় মিলে॥

জুডাসের হোক রূপান্তর

স্বর্গচ্যুত হরি চন্দনের মত
ফিরে দাও বসন্তের অকারণ কুহু সমারোহ।
আজো সেই লক্ষ্মীজলা স্বর্ণনেত্রে থাকে চাহি,
এক ফোঁটা স্নিগ্ধ শিশিরের মত হালদার দীঘি,
বুকে তার কালো এক মেয়ে—
গুণ্ঠিত চরণে যাক ছায়া শুধু ফেলে।

মাণিক রাজার বন
আজো থাক নর্মখেলা নিয়ে—
দিব্য আর নিত্য ছন্দ থাকুক আকুলি·
ধনী মার ছলো ছলো দুখদিগ্ধ আঁখি
নত নেত্রে পুন থাক জাগি।
চিরধন্য বৃন্দারণ্য থাক তন্দ্রাহীন
গতি হারা কালচক্র দিকে আর দেশে;
মহাকাল সমাধি নিথর—
শুধু জেগে রয় লীলা, নিত্য ব্রতী।
মরণের মোহ আছে, আছে প্রয়োজন
সে মরণ চরণের তলে অমরত্ব মাগে কেন—
কিবা আকিঞ্চন ? এ মহাবিস্ময়।
হে ঠাকুর তব আবির্ভাব
পুরানো হবার নয়, নিত্য সে যে পুণ্য পুরাতন—
নিত্য তুমি সৃষ্টিতে তোমার,
নিত্য তব লীলাঞ্চন ধরণীর শ্যাম সমারে :
নূপুরিত হালদার তীর—
দিক সাড়া আরবার
কীর্তন গরগর দখিণ সে পুর—
আবার জাগুক মাঙ্গলিকে ধরে নিতে সেই নৃত্য গান
আবার দাঁড়াও প্রভু ঊর্দ্ধবাহু ক্ষমা সুন্দরের রূপে:
ভুলে যাই সব দুঃখ মোহমত্ত হিয়া—
ভুলে যাই অশিবের যত কোলাহল।
জিয়াইয়া লহ তব সগর সন্তানে
বাহু পশারিয়া লহ ‘চাপাল গোপালে’
অমৃতের একবিন্দু অমর্ত্ত বিলাসে,
‘জুডাসে’র হোক রূপান্তর।

বড় ভাল লাগে

শরতের মুছে আসা বেলা
বড় ভাল লাগে, ক্লান্ত একফালি ছায়া নত মেলা।
দখিণার আতপ্ত নিঃশ্বাসে নেবুফুলী বায় দুয়ারে যায়নি হানি
পাঠায়নি ফুলময় বাণী
শিহরিত শীত সন্ধ্যা, দিকচক্র ভালে পাইনি তো কভু
আনন্দ হিল্লোল, শূন্য মাঝে তবু
চেয়েছিনু কি যে, কারে যেন আতপ্ত আবেগে
বুকে ক'রে নিতে চাই, সে তো নয় বর্ষা সান্দ্র মেঘে।
সদ্য ফোটা কমলের দলে
দুটি ফোঁটা শিশিরের মত স্মৃতির কজ্জলে
কৈশোরের হিঙ্গুলিত দিনগুলি
সম্বরিয়া গেছে শান্ত সে কুহেলী
রেখে গেছে পদচিন্ পূজার অঙ্গনে
বাঁশী আর হাসি যেন হৃদয় মন্থনে।
দিনে দিনে দিন গোনা, ভরা তিল তিল
আনন্দের কোলাহল, বসন সে নীল।
হেলা ফেলা নিয়ে যেন বাঁধা খেলা ঘর
শূন্য ঝুলি ভ'রে নেওয়া, রত্নাকর তীরে, রঙ্গীন পাথর।
নীল ধারা ছুটে চলে 'পাথরিল' বাঁকে
ফিরিবেনা জানে, তবু চলা পথে, রামধনু আঁকে ;
তবু তারি মাঝে পেয়েছি যে সব পাওয়া মোর—
হে জননী! বঞ্চিত জীবনের
শান্তি এক ফোঁটা, অমৃতে বিভোর ॥

হে মুক্তির দেবতা

হে মুক্তির দেবতা,—
তুমি মাটিকে কেমন করে ভালবেসে ফেললে ?
চেয়ে দেখি সন্ধ্যার আকাশে সাতটি তারা হাসে,-
হয়তো আমাদের কথায় তোমার ঐ অসীম
আতপ্ত বুক নিয়ে কেঁদে গেছ মাটির মানুষের জন্য
কাঁটা নিয়ে ফুল ফোটে জানি—
কিন্তু দেবতা তো কাঁটা ভালবাসে না ।
বেদনাতুর সব দেশের মানুষের জন্য
তুমি গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে গেছ
একটা ভুখা কুকুরও বাদ যায় নি ।
সবারে বেসেছো ভাল
মানুষ করার মন্ত্র নিয়ে চেয়েছো ভোরের আলো ;
হিমবানের মত তুলে উচ্চ শির
গেয়ে গেছ গান বেদের মন্ত্র-বীর ।
মানুষ হবার মন্ত্র দিলে—দিলে নয়ন ভরা প্রাণ—
শঙ্কর হে—বুদ্ধ হে—হে বিবেক অনির্বাণ···

সাগরোত্থিত মৈনাক ওগো

সাগরোত্থিত মৈনাক ওগো
কে দিলো পক্ষ ভাঙি
বলী বাসবের শত বজ্রেও
পরাজিত নহ স্বামী ।
সহজ পথের বিদ্রোহী তুমি
অগ্নিহোত্রী মন
প্রমিথিয়াসের দায়াদ তুমি যে
ভীরু জিহোবার যম ।
চলিতে চেয়েছো কণ্টক পথে
উপলে ডরোনি কভু
মন্দির আর মক্তব তব
সমান হয়েছে তবু ।

অঞ্জন ঘন কজ্জ্বল তুমি
নিয়েছো দু-চোখ ভরি
দিগদিগন্তে ছুটে গেছো তুমি
জ্ঞানের পন্থা ঢুঁড়ি।
কক্ষচ্যুত তারা চুম্বিত
তোমার পন্থ বাহি
টেলি মেকাসের গতি তুমি ওগো
নিত্য নিয়েছো চাহি।
পন্থবিহীন পান্থ তোমার
চরণ চিহ্ন লভি
আজি নত শিরে করুণার কণা
মাগিছে মর্ত্ত্য কবি।

আঁকা বন বীথি

আজকের ভোরটা কেমন জান—?
যেন এক আঁজলা মিঠে ঠাণ্ডা জল—
আর এর সঙ্গে মিশে আছে
নাম না জানা পাখীদের কত কথা···
পিউ কাঁহা, সুখী হও, কুহুব কান্না
আরো কতো কি···।
আর র'য়েছে যুঁই, চামেলি, বেলি,
গোলাপের—গন্ধ নিবেদন।
সারা বুকটা ভ'রে যায়—
রাত্রির যত ব্যথা, সব যেন মুছে যায়··
ফুটে ওঠে একটা ছবি—
Corot-এর আঁকা বনবীথি ·· ··
সারা জীবনটা জুড়িয়ে দেয়।

আজ ভোরে

এক ঝাঁক পাখীরা জেগে উঠেছে ;
আর নারকেলের পাতার ধারে ধারে
আলোর ছোঁওয়া লেগেছে,—মৃদু তার কম্পন……
আকাশে মিঠে আলোর একটা কাঁপন.
নীচে টকটকে লাল গোলাপগুলো আর হলদে গাঁদাগুলো
সুবাসের শিহর নিয়ে চেয়ে আছে মুক্তির দিশায়—
আলোই তো তাদের মুক্তি………।
গঙ্গার প্রশস্ত ঢেউয়ে একটা সুর,
সদ্যজাগা পৃথিবীর বুক থেকে অস্ফুট ভাষা জেগে উঠছে শিশুর মত,
যেন সদ্যজাগা শিশু—
কোথায় যেন একটা বেদনার তিমির কম্পিত হচ্ছে—
ক্রৌঞ্চ মিথুনের আচ্ছোদতীরে সেই আদি ব্যথায়……
মনে পড়ে উপনিষদের শাশ্বত সেই বাণী—
তদ্‌এজতি—তন্নৈজতি।
তাঁর স্পন্দিত রূপে এই জীবন ;
আবার অস্পন্দেই তো মৃত্যু।

আকাশের ইজেলে

দূর— বহু দূরে চেয়ে দেখি—
নীল আকাশের ইজেলে মেঘেরা স্কেচ করে যায়
অন্তহীন তার তুলির লেখ,
কত বাস্তব, কত অবাস্তব, সম্ভব অসম্ভব নিয়ে যেন
মনের মতন অজস্র তার আঁকি বুকি
মেঘ আর মন—দুই যেন সখীর মতন।

পাথর ভাঙ্গা কান্না

পাথরের চোখে জল কেন জানো
মহ্লারে সে কাঁদে—
সারা আকাশ ঘন হ'য়ে আসে
গুরু গুরু ক'রে গুমরে ওঠে তার সারা হিয়া
আর হঠাৎ ভাঙ্গনে—
গ'লে পড়ে তার ব্যথা—……
সে কাঁদে।
অজানা ব্যথায় আমরা কাঁদি
গভীর জল-ঝরা রাতে
সেও কাঁদে অসহায়ের কাঁদনি
রাত জাগা পাখীর মত……
হঠাৎ সে কাঁদে।
ভেঙ্গে পড়া রাতরাণীর বুক নিঙড়ে
তিস্তার বাঁধ ভাঙা কান্না সে কাঁদে
ঝড়ের রাতের কান্না এ নয়
এ কান্না—অনেক দিনের চেপে রাখা ব্যথার।
চাপতে গিয়ে ফুটে ওঠে মৃত্যুর কালো ছুটি চোখ॥

হিমালয়ের স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখে হিমালয়—নীল আকাশে একফালি রূপোর চাঁদ,
আর কান্নাহাসির মেঘে লুকোচুরি
নীচে গৌরীশঙ্কর, ত্রিশূল, কাঞ্চন জঙ্ঘায় রঙ পালটানো আলো.
মন্দাকিনীতে, বিরহীতে, ঘন সবুজের ছায়া।
চীর, পাইন, দেওদারের শাখায় শাখায় ঝিরঝিরে গান।
চারণ ভুমিতে রাখাল ছেলে বাঁশীতে দেয় ফুঁক,
পাহাড়ী তার সুর—বসেছে ঘাসের ঘন কার্পেটের ওপর।

বনভূমিতে নরম রোদের আমেজ
বড় বড় শিংএর ভেড়াগুলো চলে দুলে দুলে—
গলায় বাজে ঘন্টির একটানা রিনঠিন সুর।
ঝাঁপাই ঝোরা ছোট ছোট পাহাড়ী নদীতে লাগে রামধনুকের সাধ
টুকরো টুকরো পাথরগুলো আবার জেগে ওঠে রঙে রঙে।
গোলাপ, রোডন, আইরিশ ফুলের গুছিতে আগমনীর গান—
গৌরী মেয়ে আসবে নেমে উপলের পৈঠা ভেঙ্গে।

সুরের সুরধুনী

ভরা সুরধুনীর একটা সুরের পুলক জাগান রূপ আছে,
জীবনের বাদী পর্দাগুলো সে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
সেই কোন ভোরে ললিতের 'নি' 'রে' 'গা' 'মা'য়
ফেলে আসা স্মৃতির কূলে আজো দীপ দীপ করে তার রেশ।
দুপুরের গৈরিকে সে একটা বৃন্দাবনী সারং—
কোমল নি'তে 'পঞ্চমের' মীড়,
সুরে যেন এ পার ওপারে থৈ লাগেনা
ঘনিয়ে আসে মেঘ—কৃষ্ণকান্ত সে রূপ—
বড় বড় ফোঁটায় মহ্লারের চুমকি ছড়িয়ে পড়ে সারা গায়ে—
মিলে যায় দুটি 'নিখাদ'।
সন্ধ্যার পশারিণী—তার পূরবী নেমে আসে বেহাগের শুদ্ধ গান্ধারে।
আর রাতের ছায়ানটের সঙ্গে তারারা দেয় ত্রিতাল······
ফেনাম্বুময়ীর জটাহারা আর এক রূপ আছে,
তখন জাগে কাল ভৈরবের নাচ।
আগে পিছে তার ভয়ার্ত মানুষের চীৎকার—
বীর সন্ন্যাসী, দুই চোখ ভ'রে এই রূপই দেখেছিলেন,
কল্লোলিনী সুর তরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে, মস্তকে—
শিরায় শিরায়···········গর্জে গর্জে ডাকচেন,—
হর্ হর্ হর্ !!

আকাশটা আজ মায়ের মত

আকাশটা আজ মায়ের মত যেন চেয়ে আছে
মেঘ আসে আধো পায়
মালতীরে দোলাইয়া যায়
নারিকেল কুঞ্জ সব সেতারের মত যেন বাজে ॥
নূতন বৎসরের কথা অস্ফুট কাকলী
চুপে চুপে কি যে কয়
ধূসর আনন্দময়
না জানার শৈলাবাসে উঠিছে আকুলি ॥
সুন্দরের অজানিত আছে কত রূপ
অচিন সে অমলিন কত
সে তো নয় দুঃখ ব্যথা হত
মৌন শিব-সুন্দরের গুণ্ঠিত নিচুপ ॥
শুধু তারে বুকে ক'রে নিতে চাই
শুধু চেয়ে থেকে তারে
গেঁথে নিই অজানার হারে
শুধু যেন নীরবে নিভৃতে ভেসে নাহি যাই ॥

একটি সোনাটিনা

নেবুফুলি দুপুরের কথা শুনতে কান পেতেছি
হরবোলা পাখীরা শিস্ দিয়ে যায় নানান সুরে।
ছোট্ট একটা পাখী—মাধবীর ডালে
চঞ্চল হ'য়ে কি যেন ব'লে গেলো।
মৌনমুখে এক একটি পাতা ঝ'রে পড়ে
শিউরে ওঠে গাছটা
গঙ্গা থেকে একটানা একটা হাওয়া
অলস পায়ে আসে
মৌন কি তার কথা কে জানে।

দিনান্তের চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসে
পরম শান্তির কথা নিয়েই।
ঝিরঝিরে রোদ পড়েছে কদমের পাতায়
প্রবাহিনী গঙ্গায় ফুলের ঝলক
মন্দির শীর্ষে আলোর পাপড়ি খসে খসে পড়ে
ঝিমঝিম করে মাধব মধ্যাহ্ন।
দূরে কোথা থেকে একটানা একটা
যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসে
ষ্টিমারের শব্দতার সঙ্গে গলাগলি করে
সমস্তটা মিশে একটা 'সোনাটিনা' হয় যেন
উদাসীয়া মন চেয়ে থাকে বাতায়নে
প্রতীতি বিহীন চিন্তায়॥

আবছা আলোয়

চাঁদের আবছা আলোর একটা উদাসীয়া রূপ আছে—
উদার আকাশ আর প্রান্ত ছোঁওয়া মাঠ
কেমন যেন একটা আঁকড়ে না পাওয়া সুখ।
দূরে থেকে নীড় জাগা পাখী হঠাৎ ডেকে যায়—
কিসের জন্যে কে জানে।
ছন্দের একটা রূপ আছে—
কিন্তু অছন্দেরও কি সুর নেই?
এবড়ো খেবড়ো মাঠে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক
ছায়াফেলা নিস্তব্ধ গাছ
দূর হ'তে এঁকে যায় একটা ইমপ্রেসনিজ্‌মের ছবি।
রেলের গাড়ীটা যখন এই নিস্তরঙ্গে ঘড় ঘড় ক'রে ছুটে যায়
মনে হয় সে যেন অবাঞ্ছিত অতিথি।
সাজানো বাগানের পাশে এর একটা রূপহীন রূপ আছে।
এই ছায়া বোনা মাঠে সব যেন
বৈদান্তিকে এক হ'য়ে গেছে।

বধির যবনিকার ওপারে যে দেশ
সবাইকে নিয়ত যায় ডেকে
একি তারি একটা ছবি ?
একি তারি একটা মৌন আবেদন ?
কে জানে ! এই কি আধুনিক দর্শনের 'সেনসিবিলা।'
যাকে পারিয়ে প্লেটোর আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডের 'দি গুড।'
না আরও দূরে—হোয়াইট হেডের 'হায়েস্ট ইনডিটারমিনেসি-
উপনিষদের ধ্যানে পাওয়া—
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাষং
সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্ ॥

যে কথা সন্ধ্যার মুখে ছিল

অরুন্ধতি আলো ছড়িয়ে পড়ে
অতি অতর্কিতে
তেমনি কি জানিয়ে যাও
তোমার সব কথা
মৌন ধীর মুখে ॥
রাশ ঠেলে দেওয়া সব ঘটে
পর্ণপুটে দাও ভরে
লীলা তব অভিনব ॥
অতি উষ্ণ বাষ্প মাঝে
প্রাণপঙ্ক
কেমনে যে রাখো ধরে
জানিনা তো।
পূর্ণিমার চাঁদ
কেমনে যে ভরে দেয়
ধীরে অতি ধীরে
সুধার সম্ভারে—
ব্রততীরে।

কেহ কি তা জানে
আজ এই উষষির ক্ষণে
কেমনে জানালে তব বাণী—
যে কথা সন্ধ্যার মুখে ছিল
চুপে চুপে
সহসা কি সন্ত জাগা
বুলবুল সম
ভাষা পেল
পাখাগুলি তার ॥

তারে লইনু বরিয়া

উচকিত সন্ধ্যার বুকে চেয়ে দেখি
দিনান্তের সীমা কি যে গেছে লেখি
ক্লান্ত পক্ষ কপোতের মত—
ভেসে যায় মেঘ কত, ধীর কত, শান্ত নত।
বর্ণালির রেখা গুলি নিয়ে,
তন্দ্রাতারা রচিয়াছে কি এ
কি যেন নিঃশব্দ নীল কথা
বলিবারে এত মৌন এত ব্যাকুলতা।
নিরুদ্ধ বুকের তলে জেগে রয়
নীলাক্ষীর মত স্তব্ধ মৌন মনোময়,
তাই বুঝি নীলাভ্রের কোলে
দিনান্তের মুক্তি মাগি শত কথা দোলে।
দূরে হাম্বারব অফুট সে বাণী
করে কানাকানি
দূরান্তরে ছুটে যাওয়া মন
আরো কথা কয়
আরো যেন হয় উন্মন।

উতরোলি সিন্ধু যেন সীমান্ত ছাপায়ে
ছুটে যেতে চায় আরো দূরে আরো অসীম নিছায়ে।
হে অনাগত, হে অচিন, হে মোর ঠাকুর, তব অশব্দের তীরে
গুণ্ঠিত যে কথা, তারে লইনু বরিয়া—নত নেত্রে নতশিরে॥

জানাই নতি

সবুজ পাতার ঢেউ আর তার মাঝে
উঁকি দিচ্ছে এক মুঠো ফুল,
দূর আকাশের নীল টানায়
মেঘের সাদা পোড়েন।
মাঝে মাঝে আলো
মাঝে মাঝে ছায়া,
বৈশাখী হাওয়ায় কদম গাছটা কাঁপছে
নূতন দিনের কথা ভেবেই বোধ হয়।
ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে ভুলছে
কচি কচি ডালগুলো,
নানকের একটা গান ভেসে আসে
'নাম স্মরো নাম'।
নূতন অয়ন পথে সেই আকাশ
সেই সূর্য চন্দ্র কি থাকবে?
গ্যাগারিণের স্পুটনিকের রেখা
আর গত দিনের জীবন মরণ?
মনে হয় সেই দিন আর সেই রাতি
তেমনি আছে তাই কি,
এক নদীতে দু'বার নাওয়া যায় না
বলে গেছে হেরাক্লিটাস তাও কি।
উপনিষদের কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম
তাই বা কি……

হে অচিন, হে অনাগত, হে অনাহত
তোমার অনন্ত ডিউরী
তোমার অনন্ত গতির ইলান্ ভাইট্যাল
তোমার রেখায়িত কথায়……
অক্ষম চেষ্টায়
আজ জানাই নতি।

সেই সে স্বর্গ

জানো কি আমার স্বর্গ কোথায় কোথায় সপ্তলোক—
অমৃত মন্থ—মৃত্যুহীন—নাহিকো দুঃখ শোক।
নিস্তরঙ্গে বসেছি ধ্যানে…
মগ্ন হ'য়েছি অমৃতময়—
পিছনে ফিরিতে চাহেনি মন
সংহা সব হ'য়েছে ক্ষয়।
রহসে বসিয়া অন্ধকারে
পেয়েছি শান্তি নিবিড় পারে—
মরণ সিন্ধু তীরেতে বসিয়া
খেয়ার তরণী সহসা আসিয়া,
নিয়ে যাবে মোরে নিশান্ত ক্ষণে
তারি লাগি দিন গেছে একমনে।
কর্ণধারের পথ চেয়ে তাই
দিগন্ত আঁখিরে ফেরাতে না চাই—
উপল শান্ত জীবন আজিকে,
হে প্রভু! তোমার করুণা মাগি যে,
চরণ নিকষে জ্যোতির যে লোক
সেই সে স্বর্গ—বিত যে শোক।

শীতের দুপুর

ঝরনার তলে বসে আছি—
শান্ত স্নিগ্ধ শীতের দুপুর।
ঈষৎ বেগুনে রঙের ফুলগুলি চুপে চুপে দুলছে—
হলদে গাঁদাগুলি চুপেই ফুটে র'য়েছে—
ঝরনায় টুপ-টুপিয়ে জল পড়ছে।
আর পাখীদের সহজ স্বরের অর্কেষ্ট্রা বসেছে নিম
গাছটায়,
তালগাছটায় লেগেছে শীতের ছোঁওয়া—
পাখীরা দলে দলে ঝরনায় স্নান করে যাচ্ছে।
মনে পড়ে উপনিষদের বাণী—শান্তম্ উপাসিতম্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে পরম মিষ্টিক প্লটিনাসের কথা
Prayer is the silent yearning of the soul.
আমার এই মৌন মনে,—
হে মহামৌন—হে মহা মুনি—হে অন্তরযামী—
তোমার মৌন বাণী যেন শুনি—
অস্তি ইতি উপলব্ধব্য……।

দুরান্তরের যাত্রী আমরা

সাঁঝের ছোট্ট একটি তারা—
নীল আকাশের মিষ্টি একটি হাসির টিপ।
রোজ সন্ধ্যায় চেয়ে থাকি— নীচে মন্দিরে যাত্রীর মেলা—
শিশুদের অহেতুক কলরোল, সঙ্গীত,আলো, কত কি।
কতদিন পারিয়ে এসেছি—
মার কাছে পাওয়া—আয় চাঁদ আয় চাঁদ টিপ দিয়ে যা।
বড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে আনমনা আলসে চেয়ে দেখেছি—

গোপালের কচি কপালে টিপ দেওয়া, সেও কতদিন !
ভেবেছি, ওখানেও কি কেউ
চেয়ে থাকে এমনি উদাস পন্থহারা চাওয়ায়--
এই যে দুস্তর ব্যাবধান—
কাণ্টের ন্যুমেননের রাজ্য—এর পারাপারের খেয়া কি নাই ?
দুরান্তরের যাত্রী আমরা—কিন্তু কাণ্ডারী কই ?
সহজ পথে যাবার উপায় খুঁজি দিনে দিনান্তে।
কানে ভেসে আসে সহসা শ্রাবণ নিঙড়ানো একটা ডাক—বাপি…
সর্ব্বহারা এক শিশু ডাকে—মাটীর বাঁধন কি এতই বড়—
সে মাটিও যে কান্নাটাকে হাসি দিয়ে ঢাকতে চায়।
কৃষ্ণচূড়ার শুকনো ডালটায় জড়িয়ে যাওয়া মন ডুকরে ওঠে—
ভাঙ্গা তরীর কান্নাই সে কাঁদে—প্রমিথাসের মতই
শুধু কাঁদে…

রূপোলী আকাশের পর্দ্দা

ভায়োলেট ফুলঘেরা রূপোলী আকাশের পর্দ্দা—
নানান পাখীদের কথাচিত্র।
ভোরের আলোয় দুলছে সবুজ
কলাগাছের দীঘল পাতাগুলো।
ঝরণার জলের ফুলকীগুলো
উঠছে আবার ভেসে যাচ্ছে।
রেল গাড়ীটার বাঁশী শোনা যাচ্ছে দূর থেকে—
দিনে দিনে পলে পলে জীবনের
কথাচিত্রের রিলটা ঘুরে যায়
তার বিচিত্রতা নিয়ে—অসীম অনন্ত সত্তা নিয়ে…
এই কথাচিত্রের প্রযোজক
তোমায় প্রণাম জানাই বার বার—
আর প্রণাম করি—
তোমার এই নিত্য চ'লে চলা লীলাভিনয়কে ॥

ঘুম এসেছে

আজ ঘুম এসেছে দুটি চোখ ভ'রে
নিশুত নীল আকাশের পানে চাই
জ্বলজ্বলে তারার মালা প'রে—
সে যেন খুঁজছে একটা গভীর আলসের ঘুম
ক্লান্ত নিষণ্ণ ধরণীর চোখে ঘুম—
যেন দুষ্টু ছেলে সারাদিনের ক্লান্তিতে
অবশ হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়েছে,
মায়ের নিটোল একটি কোলে।
ঘুমিয়ে যেতে চায় মন।
কারো ফিরে আসার ডাক আর শুনবে না।
জ্যোৎস্না মদির রাত্রির কথা—
সে কথা সে ভুলেই যেন গেছে।
চাঁদের মুখর হাসির তরে
আর কোন খেদ নাই আজ—
আর কোন চাওয়া নাই যেন।
ভিক্ষুকের শেষ কাঁদনি
অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়তে চায়।
অবলম্বনহীন সারা মন
শুধু ছায়াময় শুধু অশ্রুল।
ভেসে আসে শুধু স্নিগ্ধনীল দুটি চোখ।

কালজয়ী সে প্রভু তোমার পূজায়

আনার-কলির কুঞ্জে
জল-সিঞ্চিত দেবদূত
ঊর্দ্ধনেত্রে চাহি কি কথা ভাবিছে—
সে কি এত অদ্ভুত!

দ্বিরেফ ফিরিছে দেখি মধুব্রতী-মন
দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণাতুরা ক্ষণ
গঙ্গা কলধ্বনি মিশে যায় ঝরণার সাথে
পাখীর বিরামকুঞ্জে কাকলী কি সাধে !
নির্ম্মিথ নিসীম উর্দ্ধে নাহি কোন ছায়া
জীবনের মধ্যপথে সে যেন
ক্লান্তি ভরা মায়া—
চৈত্রের ঝরা পাতা মাঝে
জীবনেব লুকানো সে দিন
ফিরিবেনা জানি তবু—তবু সেতো
হয় নাই ক্ষীণ—।
কালজয়ী সে প্রভু তোমার পূজায়—
অনন্ত অক্ষয় হ'য়ে ছিন্নমালা সম
পড়ে আছে চরণ ছোঁয়ায় ॥

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

মেঘ বাদলের সন্ধ্যা—
দূর থেকে ভেসে আসে—জীবনের বহু দিন পারিয়ে
"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে"······
মন্দিরের ঘণ্টা কাঁসরে সেই পুরানো দিন
গঙ্গার সেই কালিন্দী রূপ·········
সেই ছোট ছেলে-মেয়েদের মাথায় গামছা চাপিয়ে
মন্দিরে একটা প্রণাম জানান—
আর ঝড়ের ফল কুড়োনো।
সেই পুরানো ব্যাকগ্রাউণ্ডে নূতন ল্যাণ্ডস্কেপ আজো আঁকা রয়েছে।
তৃষাতুর সূর্য্যমুখীরা তেমনি আছড়ে পড়ে জানায় প্রণতি
একটা পাখীর ক্ষীণ কণ্ঠের প্রশস্তি—

মহাকালের চক্রের যেন এরা উর্দ্ধে.........
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে আসা—
আবার সেই বেস্থরো গান ধরি মনে মনে—
"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে".........

কবি বুক পেতে দেবে

সেদিন সকালে এক টুকরো ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে এসেছে,—
মণি মন্দিরের উঠোনটা ভিজিয়ে গেছে।
মনের আশা—সারা আকাশটা ভ'রে যাবে নীল জোয়ারে—
আর মুক্তাধারার মত নামবে এপারে ওপারে......
কচি কচি পল্লবে উঠবে নব নব ছন্দ,
যুঁইএর বুক ভ'রে উঠবে হালকা মধুপ গন্ধ,
বেণু বনে শন্‌শন্‌ ক'রে বাজবে কচি একটা গান—
আর কবি বুক পেতে দেবে—পেতে দেবে তার প্রাণ।

জগৎটা যেন একটা ব্যাঙের লাফ

পাগল হয়ে উঠেছে চৈতি রাতটা
একাদশীর চাঁদ যেন অবশ হয়ে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডালটায়।
একটা ধারে মাধবী মর্মরিত কোন ছুটো—
মরশুমী ফুলগুলো যেন চাঁদের নরম আলো শুষে নিচ্ছে,
নীল মন্দিরটা যেন সহেলী করতে চায় নীল আকাশের সঙ্গে।
গঙ্গার বুকে রূপের ফুলকি—আলো নিকানো উঠানে
ছায়ার কথাকলি বসেছে—মনে হয় 'অগর ফিরদৌস
বা জমিনোস্ত; হমিনোস্ত, হমিনোস্ত, হমিনোস্ত'।
সহসা কালোমাটীতে আরো কালো একটা ব্যাঙ
সব সরে যায়, থাকে শুধু একটা ব্যাঙের লাফ,
সারা জগৎটাই একটা ব্যাঙের লাফ।

দিনান্তের বাণী—ঠাকুর ও স্বামীজী

দখিণ দেউল ভাসে দূরে
প্রদোষের অস্ফুট আলোয়
মনে পড়ে পূততোয়া জাহ্নবীর ধারা
ভবতারিণীর পদ ছুঁয়ে ধীরে যায় বয়ে
আজি জীবনের দীপ নির্বাণ···মনে পড়ে
শত কথা—কত কাঁদা হাসা
জীবন জাহ্নবী গেছে বহি···
মনে পড়ে—প্রথম প্রভাতে
জননী চন্দ্রার অশ্রুধোওয়া চুমা কত
মনে পড়ে ছুটে যাওয়া মাণিক রাজার বনে
শ্রীমতীর বেশে কত যাত্রা, খেলা কত,
বনান্ত নিভৃতে—জল ভরিবার ছলে
রমণীর বেশে নম্রনত বাসে
চলে যাওয়া বঙ্কিম চরণে—
শরতের শারদ প্রভাতে মা'র পূজাপীঠে
ছুটে গেছি সখাজন সাথে
চেয়ে আনা মা'র তরে রাখা প্রসাদের থালি
রাজার নন্দিনী হাতে···
ভেঙ্গে গেছে সুখ স্বপ্ন—এসেছি দখিনপীঠে
গঙ্গা তীরে—
সাধনায় গেছে দিন। চলে গেছে পিতৃতুল্য
শ্রীরামকুমার অগ্রজ আমার···
মা'র পূজা নিতে হল তুলি—মা'র দুটি নয়ন পল্লবে
কত লীলা উঠেছে লহরি
দর্শন পিয়াসে মোর উন্মত্তের মত
গেছে দিন, গেছে কত রাতি—
আরতির ক্ষণে বিশ্রান্ত না জানি—গঙ্গাতটে
পড়ি কত যে ক্রন্দন—দিন গেল মাগো
আরো একদিন—দেখা কই দিলি··?

সেদিন সহসা উত্তাল তরঙ্গ সম জ্যোতির সায়রে
মা'র দেখা পেয়েছি সহসা—সম্বিৎ হারায়ে
লুটায়ে পড়েছি পথে ... ...
এর পর দর্শন রভসে
কত লীলা—কত মন্ত্র করেছি সাধন
মা'র মুখ চেয়ে।—যত মত, তত পথ বেয়ে আজি
দিনান্তে এসেছে সন্ধ্যা—
মার কাছে ফিরে যাবো—সর্ব্ব ভার
নিতে হবে তোরে—সপ্তর্ষির সপ্তলোক অধিরাজ
হে নরেন স্বামী—

স্বামিজী—পারিব না
পারিব না লইতে এ শিরে গুরু ভার
ক্ষমা কর মোরে—ঋষির সমাধি সুখে
বঞ্চিত কোরো না মোরে—নির্ব্বাণের বিলুপ্তি সায়রে
ভেসে যেতে মন, কেন অকারণ
কর্ম্মের অনন্ত জ্বালায় জড়াবে আমায় ?
আমি চাই সমাধির সপ্তলোক শুধু
বহু শ্রমে পেয়েছি যে তীর,
তারি তটে বিশ্রামের এই তো লগন।

ঠাকুর—সপ্তলোক হোতে তোরে আনি
ভাবি নাই এত হীন তুই—কালে কোথায়
বটছায়া সম মর্ত্য জীবে জুড়াইবার তরে
দিবি ছায়া শান্তি সুষমার—।
তোর মুখে এতো ক্ষুদ্র কথা
শুনিবার সাধ, হয়নি কখনও।
—বুদ্ধের নির্ব্বাণ আছে জানি—শঙ্করের জ্ঞান
—তুমি তাও লভিয়াছ। জ্ঞানের দ্বাদশ সূর্য্য
জ্বলে তোর মাঝে—তবু জানি,
জীব প্রেমে আসা তোর নিতি—
স্বার্থ আঁখি মেলি সমাধির সুখ স্বপ্ন যায় নাকি ভাসি

দ্যাখ্ চেয়ে কত দুঃখী ধরা—কত
আছে ক্রন্দসী হইয়া মুখপানে চাহি।

স্বামীজী—ব্রহ্মজ্ঞান দীপ্ত সূর্য সম
গলাইয়া দেয় নাকি ভক্তির সে হিমে—
শ্রীমুখে শুনেছি কত কথা—কত বেদান্তের
বাণী—মিথ্যে সেকি সব ··

ঠাকুর—নহে মিথ্যা ওরে—হর্ম্ম্য শিরে উঠি
হয় রে যে সবি একাকার
আমি গেলে ঘোচে ভেদাভেদ
রাজপুত্র যারা, সপ্তমহলের মাঝে গিতিবিধি তার
নাহি জানে বাধা—

স্বামিজী—তব দেহ প্রভু পতাকা তোমার—
যথাসাধ্য বহি লব তব কার্যভার।
আজি যেন দেখিবারে পাই ক্ষীণ তটরেখা
জীবনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আজি যেন মনে পড়ে
বহুরূপে সম্মুখে আমার নিত্য যিনি নিত্য বিরাজিত
তারে ছাড়ি কোথা খুঁজিব ঈশ্বরের ধ্যান মূর্ত্তি।
জীবে প্রেম শ্রেষ্ঠ ধন মম···

ঠাকুর—দিনান্তের সান্ধ্যসূর্য্য সম
চক্রবালে জীবন আমার—
আজি সর্বশক্তি তোকে দিয়ে ফিরে যাব
মা'র চরণ নিকষে—কর্ম্ম অন্তে
রামকৃষ্ণ লোকে মিলিব আবার—
শতদল সম গন্ধ বিলাসে। দিকে দিকে দিন শেষে
তুমিও আসিবে ফিরে—
অনন্ত বিশ্রাম নিতে
কর্মভার মুক্ত আমি আজ···
মা'র কর্মচারী মা'র কাছে ফিরায়ে
দিয়াছি চাবি....সন্ধ্যার শান্তির অঙ্গনে
আজি ঘরে ফেরা শিশু সম।

নিয়ে যাব শুধু হাসি আর গান—শুধু
আনন্দ কাকলি—যাই মাগো যাই তব পাশে
চির সুষুপ্তিতে ঘিরে রেখো মোরে—
শেষ চুমা দানি—

গোপালের মা

স্বপ্ন ভাঙ্গা প্রথম উষার মতো
একটি ঝলক আলোর প্রকাশ নিয়ে,
দখিনপুরী সদ্য জাগে পিউ পাপিয়ার ডাকে
মুখর সেদিন কেনই নাহি জানি।
দখিন তোরণ দ্বারে আকুল হয়ে চেয়েই,
ঠাকুর বলেন—গোপাল গোপাল
ডাক শুনি রে কার ?
নন্দনেরই দূরাগত ঝঙ্কার
অনেক দিনের থমকে থাকা
অনেক চাওয়ার আগে,
অনেক পাওয়াই থাকে ;
দেখতো লাটু কে যেন আসে
দখিন হাওয়ার বন্ধ দিগন্তরে।
লাটু—গিয়েছি তো খানিক পথই আগে
কারেও ওগো দেখি নাতো,
হয় তো হ'ল ভুল,
এত ভোরে গোপাল বলে
ডাকবে কে আর বল ?
ঠাকুর—দেখনা লাটু আরো
খানিক গিয়ে, হয়তো কেউ
আকুল হ'য়েই আসে। শুনিসনি কি
গঙ্গাজলীর পথে—জোয়ার আসার আগে,
দূরাগত মন্ত্র বাজে কানে।

লাটু—পারি না আর এতো
ধ্যান এসব ছেড়ে—যাই দেখি,
কে আসে—কত চোরের
কত তুতো ভাই।

[গোপালের মার প্রবেশ]

গোপালের মা—এই তো গোপাল এই তো নয়ন মণি,
বুকেই আমার ছিল এতক্ষণ
টুকটুকে ঐ চরণ দুটি তার
দেখতে গিয়ে চেতন হারা—দুখেই যেন আসি।
দেখছি এখন দূরেই গেছে মিশে—
নন্দন আজ ধূলায় গন্ধহারা।
তখন ভোরের অনেক ছিল বাকী
আকাশ ছিল মেদুর নম্র নত—
বসেছিলাম, জপের মালা হাতে
ইষ্টপদে চিত্ত করি স্থির।
দেখি, সেকি কান্ত করুণ রূপ!
বিজলী হানা দেখছি মেঘ কত
অদ্রিশিরে জ্যোৎস্না নীল ঢালা
লহরভাঙ্গা পূর্ণ তিথির রাতে
সাগর সেও উছলে ওঠে দেখি—
গোপাল সোনার রূপ তো নয়—চন্দ্রমণির মোহ
সব পারায়ে নয়ন গেছে ঠেকি
নীল ঢালা দুষ্টু চোখে আর
মৃণাল দুটি ভুজে জড়িয়ে নিল বুকে
ডেকেই বলে—পেয়েছে বড় ক্ষুধা,
দাওনা কিছু……
হায় অভাগী কোথায় পাবো কিছু
দীন যে আমি শুকনো দুটি নাড়ু,
তাও সে করা অনেক দিনের আগে—
কি বলে হায় ধ'রেই দেব মুখে?
ব্রজের কানু রাজার রাজা সে যে!

শুনেছি তো অনেক মিঠে স্বর
দেখেছি তো রূপের রূপান্তর
মিঠেল ক'রে এমন ক'রে ডাকা
মরেও বুঝি হবে না ঋণ শোধা।
দীনের ঠাকুর—এমন করেই
করতে কি চাও পর ?
হঠাৎ দেখি তোমার রূপে মরি
বদলে নিল কান্ত কমল হরি,
ঐ দেখ—ফের তোমার মাঝেই রাজে
নব নীরোদ গোপাল আমার আজি।

ঠাকুর—মা যে তুমি গোপালেরই
যুগে যুগেই আসা
স্মৃতির তীরে দেখ মনে ক'রে
দ্বাপরেতে ফল দিয়েছ ধরি
একটি কুটি ধানের বিনিময়ে—
লীলার সাগর যুগে যুগেই সেঁচে
তুলতে কত মুক্তা মণি হেম।
নাই কি মনে - নাই বা থাকল তা'ও
ভুলে যাওয়ার লীলা মিষ্টি আরো
কুড়িয়ে পাওয়া মণির মতন জেনো
প্রেমের হাটে হারায় বারে বার।
কি এনেছ দাও না এখন খেতে
সকাল বেলা খিদেও তো পায় ছাই।
তোমার নাড়ু শুকনো কেন হবে
মিঠে সে যে নন্দনেরই পায়স—
যুগে যুগে সেইটি আমার চাই।

গোপালের মা—বুকের কথা—দুখের ঠাকুর ছাড়া
আর কে লবে জেনে ?
দুটি নাড়ু বাঁধাই আছে খুঁটে,
সবই তুমি জানো—
তবু ওগো ধরেই দেওয়া দায়—

চোখের জলে ভিজেই মরি ছাই—
সবাই না হয় আমায় একটু ধরো
এত সুখ কপালে বা নাই।

ঠাকুর—এরো পরে আছে আরো মা গো।
লীলার সাগর উছলে যদি ওঠে
কূলের মানা সেকি তখন মানে ?
এই তো দশার—প্রথম দশা মা গো
দেখবে গোপাল বায়না কত জানে
খাবার কথা বলবে নানানতরো
জপের ক্ষণের মালা নেবে কাড়ি—
বক্‌লে তখন ভারি ভারি মুখে
কাড়াই হবে আদর তাড়াতাড়ি ॥
শুতে দেবে ছেঁড়া কাঁথায় ভাবো ?
হবে না তা জেনো এখন থেকে।
রাতের বুকে প্রেমের কোলাহল
শুনতে যেন পাচ্ছি এখন থেকে।
বর্ষারাতের দাপাদাপি কত—
রান্নামুখে কাঠকুড়ানোর লীলা—
পূজার ফুলে ছড়িয়ে দিয়ে নাচন
ভাববে না তো—হলাম ভাগ্যহত ?
শুচিবায়ের তোমার যত কথা
এখন থেকে ভুলেই যেন যেও।
ঘটে ঘটে তোমার গোপাল দেখে
'মাহেশ' রথে পাবে সর্ব্বময়ে।
এখন থেকে আসবে যখন মা গো
পয়সা দিয়ে কিনো না কো কিছু—
তোমার হাতের মিষ্টি নাড়ু
চচ্চড়ি আর বড়ি—
সুধায় ভেজা—অনেক কালের সে যে,
আসবে নিয়ে—দিব্বি আমার—
ভুলবে নাকো মনেই যেন রেখো ॥

শোন্ না নরেন গোপালের মার কথা
নির্ব্বিকল্পের তুই যে সপ্তঋষি—
দেখ তো শুনে কি ওর মরম ব্যথা—
সত্য কি না—?

স্বামিজী—রূপের চেয়ে অরূপ লাগে ভালো—!
মিথ্যা মায়ার দ্বন্দ, নাম আর রূপ
লাগেনা তো ভালো। কেটেই গেছে
অনেক অমাতিথি—ভোরের আলো
যখন দেখি চোখে—কেমনে আর
মিথ্যা ঘোরে থাকবো কত ওগো?
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় যবে
নয়ন মুদে থাকতে কে চায় প'ড়ে?
শুনতে বলেন,—শুনতে আমি রাজি।
ভোরের পাখী—গগন উধাও সুরে
ভুলতে যে চায় অন্ধনীড়ের কথা
মর্ত্ত্যপারে অমর্ত্ত লোক লভি
অন্ধকারে থাকতে কে চায় তবু
দ্বৈতজ্ঞানের অনেক কথাই শুনি
অন্ধকারে ফিকে একটু আলো—
হয় তো কারো—লাগবে রঙিন নেশা
সূর্য্যোদয়ে পূর্ণপ্রকাশ হেরে—
মিথ্যা লাগে ভ্রান্তি মরীচিকা।

ঠাকুর—গোপালের মা—ছেলে নরেন এ যে,
দেখনা শুনে কি বা তার কথা—

গোপালের মা—সত্যি বাবা তোমরা বোঝ সবি
মুখ্যু আমি সত্যি কি আর হবে?
গোপাল সে যে সত্যি কথা কয়—
বলতে গিয়ে দেখনা মরি কেঁদে।

স্বামিজী—ওকি ওমা—বলতে কাঁদিস কেন?
চোখের কোনে অশ্রু সজলতা—

অনেক দুঃখ দ্বন্দ দহন শেষে
নামছে যেন পাগলা ঝোরার সোঁতা।
ব্রহ্মজ্ঞানের পারে আছে শুনি
নিত্য লোকের নিত্য সরসতা।
তোর কথা তাই কাটবো কেমন করে ?
ঢল নেমেছে, প্রেমের নিবিড়তা—
তর্কে তো আর মন ওঠে না নাচি।
ভাবি ভাল নিত্য লোকের
এও তো নিত্য মায়া—
সত্যি মিথ্যা যাচাই এখন জ্ঞানের কষ্ঠি নিয়ে
ক'রতে ওগো মন তো নহে রাজি—
সত্য মা গো। সত্য তুমি যা দেখেছ সব—
চোখের জলের সাক্ষ্য সে তো—মিথ্যা নহে ব
বুদ্ধিপারে বোধি আছে দুঃখ গহন শেষে।

তেলো ভেলোর মাঠে

মা—অন্ধকার কুণ্ডলিত ঘনাইয়া আসে—
দিগন্ত প্রসারী এই তেলো ভেলো মাঠে
সঙ্গীহীন সীমাহীন
চলিয়াছি নিষ্করুণ নক্ষত্র পানে চাহি ;
চলিয়াছি দিক দিশাহীন।
হে পরম দেবতা, হে সঙ্কট ত্রাতা,
তোমায় স্মরিয়া আজি বাহিরিছি পথে।
ধীরে ধীরে সঙ্গীদের পদশব্দ
মিলাইয়া গেছে দিক চক্রতলে
ফণীসম শ্বসিছে পবন
শিবাদলে অমঙ্গল করিছে ঘোষণা ;

বনস্পতি দল দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন
যমদূত প্রায়,
কৃতান্তের দিনান্ত প্রহরী।
হে দয়িত, দীনের ঠাকুর—লয়ে চলো ;
হে জননী দখিণ ঈশ্বরী—
সহায় মাগিছে কন্যা অন্ধ ভয়ে ভীতা
বহু আশা মগ্ন মনে।
বহু তৃষা ল'য়ে চলেছি যে দয়িতের পথে।
তুমি ছাড়া নাহি কেহ সাথী কোন দিন ;
রক্ষাময়ী রক্ষা কর—কন্যারে তোমার !

ডাকাত—কে রে হোথা ?
কোন পথচারী ! মরিবার তরে আসা দুস্তর প্রান্তরে ?
স্তব্ধ হয়ে রও।

মা—রক্ষ ভয়ে হে ভবতারিণী।
রক্ষ আজি মোরে
পড়েছি মা কৃতান্তের হাতে তেলোভেলোর মাঠে।

ডাকাত—বল্ কথা—কে তুই ওখানে ?
যমের দোসর মোরা এই পথে রই।

মা—আমি বাবা কন্যা তব,
সারদা আমার নাম।
সঙ্গী সব গেছে ছাড়ি দূর পথান্তরে,
জামাতা তোমার দখিণ সহরে রয়,
যাবো তার কাছে।

ডাকাত—একি দেখি ! দেবী না মানবী !
আপনি ধরিয়া রূপ, শঙ্করী ভবানী
নয়নে ঠিকরে যেন অগ্নি হুতাশন,
মৃত্যুর ঈশ্বরী যেন সন্মুখে আমার !
মন্দিরে দেখেছি যারে স্থির সৌদামিনী—
সেই মাতা নয়ন সমক্ষে।
সেই লোল রসনায়, বিস্তারি নয়না,
খেটক খর্পরধরা, মুণ্ডমালা গলে,

চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী—
মহাভয়ঙ্করী।
ভয় হ'তে রক্ষ মাগো পামর সন্তানে—
মা মা প্রণাম তোমায়
চির শরণেব—পদে রহি লো পড়িয়া।

মা—পিতা ব'লে ডেকেছি তোমায়—ভয় কোথা ?
আমি কন্যা সারদা যে তব,
আশ্রয় দিয়েছো মোরে দুরন্ত নিশায়
এক রাত্রে ভোর হ'ল অনন্ত রজনী।
আশ্রয় লভিলে তুমি চির চিরদিন
মোর স্নেহচ্ছায়ে।
জয় মঙ্গলার মত রহিলাম
শিয়রেতে তব।
শান্তিময়ী জেনো মোরে—অশরণ পথে।
ওঠ বৎস চল যাই দোঁহে
এক সাথে পিতা পুত্রী।
মিলনের লগ্ন আজি এসেছে ঘনায়ে।

ডাকাত—জুড়াইলে জ্বালা মাগো ডাকাত পিতার
বহু পাপে মগ্ন ছিনু, বহু-হত্যা কলুষিত কলঙ্কিত হাত
অজি তব অগ্রে হল প্রসারিত।
সাক্ষী করি কহিও মা দেবতা সকলে—
নরহন্তা আজি হ'তে হ'ল পুণ্যচারী,
আজি হ'তে লব পথ চির কল্যাণের।
আজি হ'তে তব পিতা কলুষের পথে না চলিবে আর॥
জীবনের শুভ পথ পেয়েছি সন্ধান
শ্রীমুখের ধ্রুবতারা হবে চিরলক্ষ্য মম
চির-চিরদিন।

মা—চল পিতা চল দোঁহে তারকেশ্বর পথে,
সেথা হবো সঙ্গীদলে
মিলিত সকলে।

আজি রাত্রে চটী যদি পাই কোন
সেথায় আমরা রব।
ভয়ের অনন্ত নিশা গিয়াছে কাটিয়া।
নব জীবনের সূর্য অচিরে উদিবে।
চল পিতা অগ্রসারি—

ডাকাত—আর ঐ দেখ মাতা তব।
দোঁহে আজি রহিল পশ্চাতে
তেলো ভেলো মাঠের ঈশ্বর এ ডাকাত বাবা
রহিল মা সহায় তোমার।
কুশাগ্রও বিদ্ধ নাহি হইতে গো দিব
ও দুটি চরণে।

মা—সর্বমঙ্গলায় স্মরি চল সবে যাই।
বহু ভাগ্যে পেয়েছি যে তোমা দোঁহে,
ভবানীর বরদ হস্ত
নিত্য থাক মস্তকে তোমার
করি আশীর্ব্বাদ লভ শান্তি—চিরশান্তি সুখ।

"কে কোথায় ওরে তোরা আয়।"

আজি এই মেঘমন্দ্র
বৈশাখের দিনে
তৃষা তপ্ত মনে
ক্ষণে জাগা…দাবদগ্ধ বাটে
মনে পড়ে
এলায়িত গদাধর তনু…কজ্জলিত আঁখি
ভাব ভঙ্গে চেয়ে আছে দূর নিলীমায়—
বিথারিত বলাকার-ধ্বনিত পাখায়—
কোন বারতার যেন
পেয়ছ সন্ধান।

বরষার পুঞ্জ মেঘে
দেখেছ কি তৃষাহরা
অনাগত দিনে
চির অচিনের মত
ওগো চেনা ধন
দাঁড়ায়েছ রেখে দুই বঙ্কিম চরণ
আলবালে মূলে
স্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল ধরণীর ধূলা
রাঙা হতে, পেতে ঐ অধরার ধরা
ভ্রমরিত কৃষ্ণ কেশে
দুলেছিল জোলো হাওয়া—কৃষ্ণচূড়া গন্ধী
স্নেহ অঙ্কে করিতে কি চিরতরে বন্দী
চিরাগত জনে।
বরষার প্রথম আভাষে
ডেকেছ কি চুপে চুপে
পাষাণের বুকে চির পাষাণীরে
বুঝি বা বিলাতে চেয়ে
শুভ্র শিশু হিয়া
ধরণীর ব্যথা-হত বুকে
লুটালে অমনি
যে ব্যথা শ্যামল তৃণে
থাকে অনাদরে
যে ব্যথা দীনের দেহে
জাগে অজানিতে
যে ক্ষুধা নিতি নিতি—
শতবুকে থাকে নিথরিয়া
তারে নিঙাড়িয়া চুপে
লুটালে কি—
বরষার প্রথম নিমেষে
মুকুলিত আম্র বনে
বৎস ডাকা গেহে

শ্বসিয়া কি উঠেছিল
স্বপনিম বুকে
রুদ্ধ দুটি কথা
"কে কোথায়, ওরে তোরা আয়।"

দেবতার ঠাকুরালী

হিম মলিন একটি সে রাত
বাসন্তী রাত নয়
সকল জ্বালা জুড়াবারই
সে রাত তুষারময়।
ঈশামশির জন্মতিথি
স্মরণ ক'রে সবে
উৎসবেতে মত্ত সেদিন
দুয়ার রুদ্ধ ক'রে।
বেহালাতে সুর চড়িয়ে
লণ্ডনেরই পথে
ভিক্ষু সে এক বসেই ছিল
ভগ্ন মনোরথে।
উৎসবের এমনি রাতে
রিক্ত সে আজ বড়
পথের ধারে ব্যস্ত অতি
সুর করিতে জড়।
ঈশামশির জন্মদিনে
একটি পূবের তারা
পুব দেশীয় সন্তদেরই
দিল পথের সাড়া।
হয়ত সেই একটি তারাই
সেদিন উঠেছিল

রিক্ত প্রাণের পথ দেখাতে
আৰ্ত্তজনের প্রিয়।
হঠাৎ জাগা পদশব্দে
চেয়েই দেখে একি
ভদ্র দুটি সৌম্য শান্ত
ভুলই হ'ল নাকি।
মিষ্টি হেসে শুধায় তারা
জমল কিছু হাতে
উত্তরিল হায় ভগবান
এমন দুখের রাতে,
কে আর আসে শুনতে আমার
অক্ষম এই স্বর
শীতের দিনে হায় গো আমি
আরোই ক্ষুধাতুর।
বললো তারা, সুর তোলো ভাই
সুরেই যে দিল খোলা
ভয় পেওনা তোলনা সুর
দাওনা সুরের দোলা।
ভিক্ষু বলে হতেম যদি
প্যাগানিনীর মত
এমন কি পথেই প'ড়ে
হতেম ভাগ্য হত ?
সন্ত সে জন মৃদু হেসে
নিলেন তুলি ছড
বক্র গ্রীবায় বেহালা তা'র
হলই রূপান্তর।
হঠাৎ জাগা একটি সুরে
বসন্ত বন জাগে
হাজার তারা চকমকাল
নীল আকাশের ফাঁকে।

দেখেছ কি তুহিন ঘেরা
শৈল সানু তীরে
কেমন করে রোডন দাঁড়ায়
রঙের মুকুট শিরে।
দেখেছ কি আঁধার রাতে
আলোর আলপনায়
রাতের মেরু কেমন ক'রে
হাসিটি তার ছড়ায়
সুরের যাদু কি যে করে
কেমনে কয় কথা
মনের আকাশ কেমন করে
খুলে যে যায় হেথা।
হঠাৎ দেখি শিলিং বৃষ্টি
তুষার পাতের মত
ঘরে ঘরে জানলা খোলা
হলই শত শত।
কুড়িয়ে দিল ভিক্ষু জনে
পকেট বোঝাই ক'রে
খৃষ্ট রাতি মধুর হোক
বল্‌ল হাতে ধরে।
কম্প্র কণ্ঠে ভিক্ষু বলে
কি নাম তোমার প্রভু
প্যাগানিনি নামটি আমার
এইটি জেনো শুধু।
এমনি দিনে একটি কথা
বুঝতে পারা দায়
প্যাগানিনির মত এক
পথিক পাওয়াই হায়।
গাড়ি জুড়ি ফেলেই তারা
ঠাণ্ডা মাটির বুকে

এমন দিনে আসবে কেন
হায় গো মরণ দুখে।
শিল্পী যিনি সৃষ্টি করেন
প্যাগানিনির হাত
প্যাগানিনি, নয় বা তিনি
যীশুই জগন্নাথ।

গৌরীর ভগবান

দখিণাপুরীতে নবানুরাগের
সেদিন নেমেছে বন্যা
ভগবান আর ভক্ত মিলনে
গঙ্গার সাথে যমুনা।
আদরের মেয়ে গৌরীর মনে
একটি মৌন কথা—
মুকুলিত হ'য়ে শুধু দোলা দেয়
আলোর সাথে যে আঁধা॥
গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন মাঝে
নৃত্য রভসে মত্ত
তেমনি আমার গদাধর চাঁদ
রচিবেনা লীলা বর্ত্ম॥
প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি আর
সারা গায়ে মাখা মাখি
আর কি ফিরিয়া আসিবে সে দিন
নয়ন ত্রিদিবে জাগি॥
প্রসাদ পশরা ধ'রে দিল দেবী
ভাব মন্থর কায়

সহসা যে প্রভু দাঁড়ালেন উঠি
আধো বাঁকা রাতা পায় ॥
ভরা চাঁদনীর ছিল কি সে তিথি
ছিল কি মুক্তা হাসি
তবু সেদিনের সেই আঙ্গিনায়
শ্রীবাসের বারোমাসি ॥
হুলাহুলি দেয় নরনারী সবে
ভাব বিহ্বলে পড়ি
মনে হয় যদি পাই সেই দিন
আমরাও দিব গ'ড়ি ॥